শিশু-বিশ্বকোষ : প্রথম খণ্ড

অ থেকে ঔ

শামুক জাতীয় এক সামুদ্রিক প্রাণী। শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে এরা দেহের ত্বকের নিচের বিশেষ রঙিন কোষ থেকে কালি ছুড়ে ধোঁয়ার মতো আড়াল সৃষ্টি করে আত্মরক্ষা করে। প্রাণীটির নাম কী ? —অক্টোপাস।

আগেকার দিনে লোকে ভাবত, আকাশটা পৃথিবীর উপর একটা কঠিন জিনিসের ঢাকনা, কখনো ভাবত—আকাশটা পরতে-পরতে ভাগ করা। আসলে আকাশ কী ? —গ্যাস ভর্তি ফাঁকা জায়গা। ভাল কথা, কিন্তু আকাশ যদি বর্ণহীন গ্যাসের মিশেল, তবে তা নীল দেখায় কেন?

চিরতুষার দেশের এক বিশেষ জাতি এস্কিমো। বাঁশ, কাঠ, খড়, ইট, সিমেন্ট দিয়ে তারা ঘর বানায় না, ঘর বানায় বরফ দিয়ে। তাদের এই ঘরের নাম ইগ্‌লু। লম্বা ছুরি দিয়ে বরফকে সুবিধা মতো আকারে প্রথমে কেটে নেয়, তারপর নিজের চারদিকে বরফের চাঙ্গড় গেঁথে দেওয়াল তোলে, দেওয়ালে কোনো দরজা থাকে না; দেওয়াল গাঁথা শেষ হলে ঘরের ভিতরে আটকে-পড়া কারিগর তখন সুড়ঙ্গ তৈরি করে সেই পথে বাইরে বেরিয়ে আসে, ঐ সুড়ঙ্গটাই ইগ্‌লুর দরজা। সীল মাছের তেল দিয়ে কুপি জ্বালিয়ে এস্কিমোরা ইগ্‌লু গরম রাখে। আর

(বাকি অংশ শেষ প্রচ্ছদের ফ্ল্যাপে)

চৌকি হিসাবেও তারা ব্যবহার করে বরফখণ্ড।

শরীর বড় কিন্তু মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত ক্রমশ সরু আকৃতির এক প্রাণী। নাম ইগুয়ানা। এর গলার অংশে থলের মতো একটি ঝোলানো অঙ্গ থাকে। অনেক সময় এরা এই থলে ফুলিয়ে শত্রুকে ভয় দেখায়।

ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সমাজ, সভ্যতা, উদ্ভিদজগৎ, প্রাণিজগৎসহ জ্ঞানের সকল শাখার এমনি সব কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়বস্তু নিয়ে শিশু-বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ড। ভুক্তি-বিষয়গুলোকে মানববিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি—প্রধানত এই তিন বিভাগে ভাগ করে নিয়ে জ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যরাজি এখানে তুলে আনা হয়েছে। বাংলা বর্ণক্রম অনুসারে বিন্যস্ত শিশু-বিশ্বকোষের এই খণ্ডে অ থেকে ঔ বর্ণের মোট ৫৮৫টি ভুক্তি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিভাগ অনুসারে ভুক্তি-বিষয়ের সংখ্যা এরকম :

বিভাগ	মূলভুক্তি	দ্রষ্টব্যভুক্তি	মোট
মানববিদ্যা	২১১	৩২	২৪৩
সমাজবিজ্ঞান	১৫৬	২৮	১৮৪
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১৪৩	১৫	১৫৮
মোট ভুক্তি	৫১০	৭৫	৫৮৫

মূল্য : ৳ ২০০.০০

ISBN : 984-09-0332-2

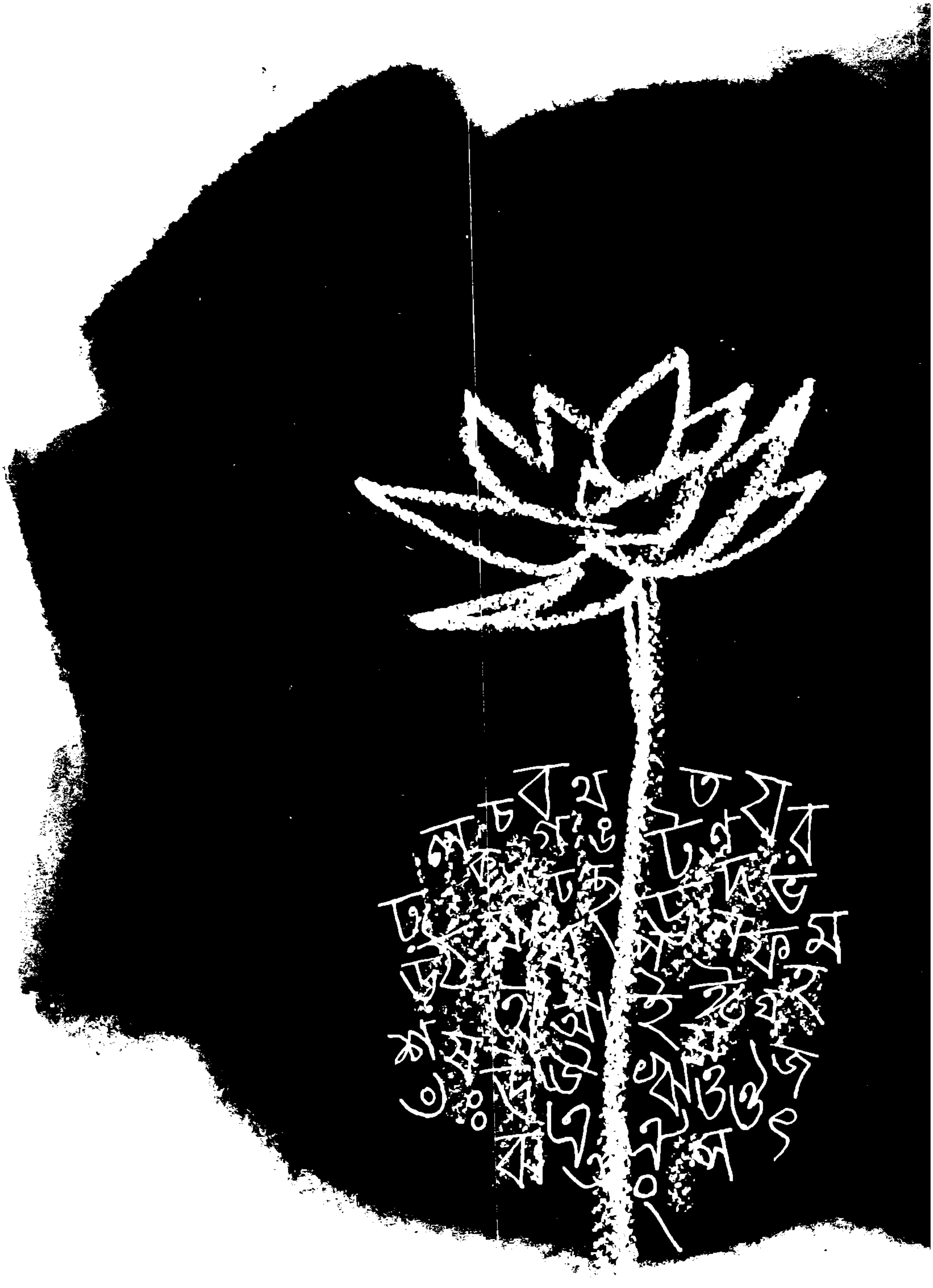

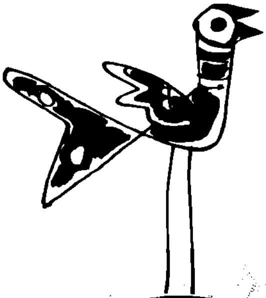

শিশু-বিশ্বকোষ

শিশু-বিশ্বকোষ : ১ম খণ্ড

বাশিশুএ ৩৩২

প্রকাশক : গোলাম কিবরিয়া, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, পুরনো হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা-১০০০। মুদ্রণ : বাংলাদেশ প্রগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজ প্রেস লিঃ, ৪৬/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৪০২, জুন ১৯৯৫।

মূল্য : ৳ ২০০.০০

SHISHU-BISWAKOSH (Children's Encyclopaedia) Vol - I. Publisher : Golam Kibria, Director, Bangladesh Shishu Academy. Old High Court Compound, Dhaka-1000, Bangladesh. Date of Publication : June 1995.

Price : Tk. 200.00
US $ 10.00

প্রচ্ছদ শিল্পী : হাশেম খান

ছবি এঁকেছেন : গোপেশ মালাকার, সিরাজুল হক, হাশেম খান

টাইটেল পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত আলোকচিত্র আনোয়ার হোসেন, মঞ্জুর আলম চৌধুরী ও আবদুল মালেক বাবুলের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রথম খণ্ড

শিশু-বিশ্বকোষ

অ থেকে ঔ

প্রকল্প পরিচালক
গোলাম কিবরিয়া
প্রকল্প সহযোগী
বিপ্রদাশ বড়ুয়া
মো. নাজিমউদ্দিন
ব্যবস্থাপনা সহযোগী
সুজন বড়ুয়া
মুদ্রণ সহায়ক
মোহাম্মদ ইবরাহিম
টিপু কিবরিয়া

সম্পাদনা পরিষদ

আবদুল্লাহ আল-মুতী—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
আহমদ রফিক—সমাজবিজ্ঞান
মনসুর মুসা—মানববিদ্যা
হায়াৎ মামুদ—শৈলী সম্পাদক ও সমন্বয়ক
হাশেম খান—শিল্প সম্পাদক

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

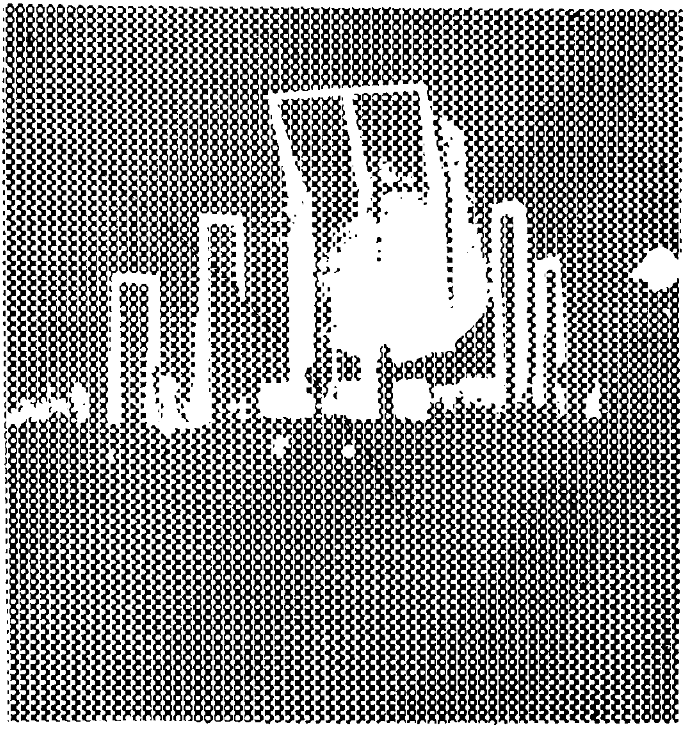

মোদের গরব মোদের আশা

আ মরি বাংলা ভাষা

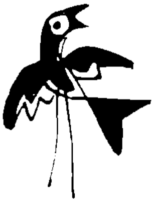

শিশু-বিশ্বকোষ

বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের চাহিদা পূরণের জন্য একটি শিশু-বিশ্বকোষের অভাব দীর্ঘদিন থেকে অনুভূত হয়ে আসছিল। বাজারে যে সমস্ত বিদেশী বিশ্বকোষ পাওয়া যায় বাংলাদেশ সম্পর্কিত তথ্য তাতে খুবই অপ্রতুল। শিশু-কিশোরদের এই চাহিদা পূরণ করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ১৯৮১ সালে একবার বিশ্বকোষ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তখন 'জ্ঞানের কথা' নামে প্রথম খণ্ড বের করার পর নানাবিধ অসুবিধার কারণে পরবর্তী খণ্ডগুলো আর প্রকাশ করা যায় নি।

ইতোমধ্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশ্বসভ্যতায় অনেক নতুন ঘটনা সংযোজিত হয়েছে। তাই পুনরায় নতুন করে বিশ্বকোষ প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং তারই পরিণতি হিসাবে বের হল একাধিক খণ্ডের 'শিশু-বিশ্বকোষ'। এই বিশ্বকোষে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান 'শিশু-বিশ্বকোষ' চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনায় 'একাডেমীর সম্প্রসারণ কর্মসূচি প্রকল্পের' একটি অংশবিশেষ। একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বকোষ প্রণয়নের জন্য যে সময় এবং লোকবলের দরকার তা আমাদের ছিল না। অতি দ্রুত কাজ শেষ করতে গিয়ে কিছু অসম্পূর্ণতা হয়তো থেকে গেছে। অনেক তথ্যে ছোটখাট কিছু ভুলভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়; যদি এমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায়, আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে সংযোজন ও সংশোধন করে নিতে পারব।

'শিশু-বিশ্বকোষ' প্রণয়নের ব্যাপারে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দসহ যেসব লেখক ও শিল্পী নিরলস পরিশ্রম করে আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছেন তাঁদের নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই 'শিশু-বিশ্বকোষ' তার কিছুটা পূরণ করতে পারলেও আমরা নিজেদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

গোলাম কিবরিয়া
পরিচালক
বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

তারিখ : ২০.৬.৯৫

ভূমিকা

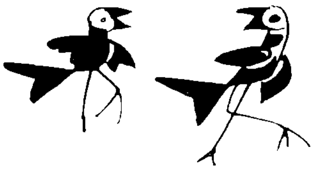

আমরা যারা এ যুগে জন্মেছি তারা খুবই ভাগ্যবান। ভাগ্যবান নানা কারণে। তার মধ্যে একটা বড় কারণ হল এই যে মানুষ এত হাজার হাজার বছর ধরে সভ্য হয়ে উঠেছে, এত কথা জেনেছে, এত রকম কলকজা আবিষ্কার করেছে, তার সব কিছু আজ আমাদের হাতের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো এত সব কিছুর কথা মোটেই জানত না। তাদের জীবন ছিল আমাদের তুলনায় একেবারে সাদামাটা। তাদের চেয়ে আমরা গড়পড়তা বেশি দিন বাঁচি; জানি তাদের চেয়ে ঢের বেশি, সে জ্ঞানকে কাজে লাগাতেও পারি অনেক বেশি।

আবার আজ আমরা যত কথা জানি আগামী দিনে মানুষ তার চেয়েও আরো বেশি জানবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন আজকের দিনে মানুষের বড় সম্পদ আর সোনা-দানা নয়, সবচেয়ে বড় সম্পদ হল মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার। যে দেশে জ্ঞানের ভাণ্ডার যত বেশি তারা তত শক্তিশালী; যে মানুষ বেশি জ্ঞানী সে তত বড়। এক কথায় জ্ঞানই হল শক্তি, জ্ঞানই হল সম্পদ।

এই যে মানুষ এত কথা জেনেছে, সেসব জ্ঞানকে গুছিয়ে রাখার জন্য নানা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। জ্ঞানের কোনো বিষয়কে আমরা বলি ইতিহাস, কোনো বিষয়কে বলি ভূগোল, কোনো বিষয়কে পদার্থবিজ্ঞান, কোনো বিষয়কে বা সমাজবিজ্ঞান। একেবারে গোড়ার দিকে জ্ঞানের বিষয়গুলো এমন ভাগাভাগি হয়ে যায় নি। মানুষের জানার বিষয় যেমন ক্রমে ক্রমে বেড়েছে তেমনি তার মধ্যে নানা রকম ভাগাভাগি করার দরকার দেখা দিয়েছে। পণ্ডিতেরা জ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে হাজার হাজার বই লিখেছেন। সেসব বইপত্র যোগাড় করলে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দালানেও তার জায়গা হবে না।

কিন্তু সেই আদ্যিকাল থেকে মানুষ জ্ঞানের নানা বিভাগের মোদ্দা কথাগুলো এক জায়গায় জড়ো করে রাখার চেষ্টা করে আসছে। এমনি জ্ঞানের নানা বিষয় এক সঙ্গে করে লেখা যে বই তাকে বলা হয় বিশ্বকোষ; ইংরেজিতে বলে এনসাইক্লোপিডিয়া (encyclopaedia)। ইংরেজি ভাষায় এই শব্দটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায় ষোড়শ শতকের শুরুতে। কিন্তু আজ থেকে প্রায় দু' হাজার বছর আগে যখন কাগজের ব্যবহারও চালু হয় নি তখনো মানুষ এ ধরনের বিশ্বকোষ লেখার চেষ্টা করেছে। এটি তৈরি করেছিলেন রোমান পণ্ডিত প্লিনী দ্য এল্ডার (২৩—৭৯ খ্রি.)। এ ছাড়া দশম শতকে এবং তার পরে আরবি ও চৈনিক ভাষায় জ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে অনেক পণ্ডিত বিশ্বকোষ ধরনের বই লিখেছেন বলে জানা যায়। ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে নামী যে বিশ্বকোষ সেই 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' প্রথম বেরোয় আজ থেকে প্রায় দু' শ' বছরের বেশি আগে–১৭৭১ সালে; আজও প্রায় প্রতি বছর এর নতুন সংস্করণ বের হচ্ছে। বছরখানেক পরেই বেরোয় ফরাসি ভাষায় বিখ্যাত জ্ঞানকোষ 'অঁসিক্লোপেদি'। সে সময়ে বুদ্ধিজীবী সমাজে এই বিশ্বকোষের বিরাট রকম প্রভাব পড়ে; বলা হয়, এর ফলে সে দেশের মানুষের মধ্যে মুক্তবুদ্ধির যে জাগরণ আসে তা এর ক'বছর পর ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯ খ্রি.) ঘটাতে সাহায্য করে। তারপর

গত দু' শ' বছরে ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় অসংখ্য বিশ্বকোষ বেরিয়েছে। সাধারণ বিশ্বকোষ ছাড়াও জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বিভাগ নিয়ে বিশেষ ধরনের বিশ্বকোষও বেরিয়েছে অনেক। বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ রচনার দিক দিয়ে আমরা বেশ পিছিয়ে আছি। কিন্তু তবু প্রথম বাংলা বিশ্বকোষ লেখার চেষ্টা হয়েছিল প্রায় পৌনে দু' শ' বছর আগে; বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার অগ্রণী ইংরেজ পাদ্রি উইলিয়াম কেরির ছেলে ফেলিক্স কেরি ১৮১৯-২১ সালে 'বিদ্যাহারাবলী' নামে দু'খণ্ডে প্রথম বিশ্বকোষ প্রকাশ করেন। এ বই সঙ্কলনে তিনি ইংরেজি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ওপর অনেকখানি নির্ভর করেছিলেন; এর ভাষা ছিল রীতিমতো সংস্কৃতঘেঁষা। আজকাল যে ধরনের বর্ণমালার ক্রম অনুসরণ করে বিশ্বকোষের বিষয়গুলো সাজানো হয় সে ধরনের বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ বাংলায় প্রথম বেরোয় ১৯০২ থেকে ১৯১১ সালে 'বিশ্বকোষ' নামে—নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব-এর সম্পাদনায় ২২খণ্ডে। এই বিশাল আকারের বইটি ছিল অবশ্য বড়দের জন্য। ছোটদের জন্য বাংলায় প্রথম বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয় ঢাকার বিক্রমপুরের যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-র সম্পাদনায় 'শিশু-ভারতী' নামে ১০ খণ্ডে—১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে। বইটি বেশ জনপ্রিয় হয়, তবে এটিতে বিষয়গুলো বর্ণক্রম অনুসারে সাজানো হয় নি। তারপর গত পঞ্চাশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে ছোটদের জন্য আরো ক'টি বিশ্বকোষ বেরিয়েছে; সেগুলোও বর্ণক্রম অনুসারে নয়।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এ দেশে প্রথম বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয় ৪ খণ্ডে খান বাহাদুর আবুদল হাকিম-এর সম্পাদনায় ১৯৭২—৭৬ সালে 'বাংলা বিশ্বকোষ' নামে। সত্তরের দশকের শেষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর পক্ষ থেকে 'জ্ঞানের কথা' নামে ১০ খণ্ডে একটা বিশ্বকোষ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এটি বর্ণক্রমিক ছিল না, ছিল বিষয়ভিত্তিক। কিন্তু ১৯৮৩ সালে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর বাকি খণ্ডগুলি আর প্রকাশিত হয় নি। অবশেষে তার এক যুগেরও বেশি পরে এই 'শিশু-বিশ্বকোষ' প্রকাশিত হল।

২

বিশ্বকোষ কথাটা শুনলেই মনে হয় বিশ্বের তাবৎ জ্ঞানের কথা সে বইতে থাকবে। আসলেই তাই; আমাদের চারদিকে যতকিছু ঘটেছে আর ঘটছে, নানা যুগের জ্ঞানী-গুণী মানুষেরা আমাদের চারপাশের পৃথিবী আর মহাবিশ্ব সম্বন্ধে যত কথা জেনেছেন আর যা কিছু করেছেন তার সবটাই থাকবার কথা বিশ্বকোষে। তাই ইতিহাস আর পুরাকীর্তি, ভূগোল আর সভ্যতার কথা, সাহিত্য আর শিল্প, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি, ধর্ম আর দর্শন, শ্রেষ্ঠ মানুষদের জীবন আর কীর্তি, নদ-নদী, গাছগাছালি, পাখপাখালি, গান-বাজনা, খেলাধুলো, কোনো কিছুই এই বিশ্বকোষের আওতা থেকে বাদ পড়ে নি।

'শিশু-বিশ্বকোষ' থেকে জ্ঞানের কোনো দিকের আসল কথাগুলো যেন বাদ না পড়ে যায় সে জন্য ভুক্তিগুলো নির্বাচন করা হয়েছে জ্ঞানের তিনটি প্রধান বিভাগ ধরে : (ক) মানববিদ্যা, (খ) সমাজবিজ্ঞান আর (গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। তারপর ভুক্তিগুলোকে যেন সহজে খুঁজে পাওয়া যায় সে জন্য বাংলা বর্ণমালার ক্রম অনুসারে সেগুলো সাজানো হয়েছে। তার ফলে বর্ণমালার তালিকাটা যার জানা আছে অর্থাৎ যে অভিধান দেখতে পারে সে সহজেই তার দরকার মতো

যে কোনো ভুক্তি খুঁজে বের করতে পারবে। আর এই বিশ্বকোষ যেহেতু বিশেষভাবে শিশু-কিশোরদের জন্য তৈরি, তাই এতে তাদের জানার আগ্রহ রয়েছে বা তাদের জানা জরুরি এমন বিষয়গুলোর ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। আবার লেখার ধাঁচেও বিশেষভাবে শিশু-কিশোরদের কথা মনে রাখা হয়েছে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে বড়রা এ কোষগ্রন্থ থেকে তেমন কিছু জানতে পাবেন না; আসলে বড়দের জানার মতো জিনিসও এতে প্রচুর রয়েছে। অবসর বা দরকার মতো এ বই পড়লে তাঁরাও এখান থেকে অনেক জানার বিষয় পাবেন।

১৯৯৩-এর মে মাসে যখন এই বিশ্বকোষ তৈরির আয়োজন প্রথম শুরু হয় তখন এর জন্য কতকগুলো নীতিমালা তৈরি করে নেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল এ ধরনের বিষয় :

- বিষয়বস্তু এবং রচনার ধাঁচ হবে মোটামুটিভাবে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপযোগী;
- বিষয় নির্বাচনে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে;
- বাংলা বানানের সমতা বিধানের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বানানের যে নিয়ম প্রবর্তন করেছে তাই অনুসরণ করা হবে। আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে কিছুটা ভিন্ন মতও ছিল; কিন্তু যাদের জন্য এ বই লেখা তারা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নির্ধারিত বানানের নিয়মে বেশি অভ্যস্ত বলে সেই বানানই অনুসরণ করা হবে বলে স্থির হয়;
- জীবনীমূলক ভুক্তি নির্বাচনের সময় জীবিত ব্যক্তিদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে না; তবে শুধু ক্রীড়াক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা যেতে পারে, কেননা খেলাধুলো সংক্রান্ত ব্যাপারে শিশু-কিশোরদের আগ্রহ অপরিসীম আর খেলোয়াড়দের আসল আয়ু যাই হোক তাদের ক্রীড়াজীবন বেশ স্বল্পায়ু;
- ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনায় তাঁদের কাজের ওপরই প্রাধান্য দেওয়া হবে, পারিবারিক জীবনের ওপর নয়।

গোড়ার দিকে ভাবা হয়েছিল তিনটি প্রধান বিষয়-বিভাগে পাঁচ শ' করে ধরে এই বিশ্বকোষে সব মিলিয়ে মোটামুটি ১,৫০০ ভুক্তি থাকবে, আর বিষয়গুলো এমনভাবে নির্বাচন করা হবে যাতে শিশু-কিশোরদের যেসব বিষয় স্কুলে পড়তে হয় তার সব বিষয়ে কিছু না কিছু আলোচনা যেন এতে পাওয়া যায়। কিন্তু এভাবে বিষয় নির্বাচন করতে গিয়ে ভুক্তিসংখ্যা বাড়তে বাড়তে আগের হিসাবের চেয়ে দ্বিগুণের ওপর হয়ে তিন হাজার ছাড়িয়ে গেল। তার পরও অনেক বিষয় এই বিশ্বকোষে দেওয়া গেল না। বইয়ের আকার আর বাড়লে বইয়ের দাম বাড়াতে হবে আর তাতে এটি সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের কেনার ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে, তা ছাড়া বই প্রকাশেও অনেক বিলম্ব ঘটবে—এসব ভেবে আরো বেশি ভুক্তি যোগ করার লোভ আমাদের সামলাতে হল। কাজে হাত দেওয়ার পর আরো দু' একটি সিদ্ধান্ত কিছুটা রদবদল না করে পারা যায় নি। যেমন—জীবনী-ভুক্তিতে জীবিত ব্যক্তির মধ্যে খেলোয়াড় ছাড়াও আবদুস সালাম ও স্টিফেন হকিং এবং মাদার তেরেসার কথা বিবেচনা করতে হয়েছে। বিজ্ঞানী সালাম এবং মানবসেবী মাদার তেরেসা দীর্ঘকাল পরে এই উপমহাদেশ থেকে সর্বশেষ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, আর শারীরিকভাবে পঙ্গু বিজ্ঞানী হকিং আজ তত্ত্বীয় বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে বর্তমানে এক 'বিস্ময়' হিসাবে বিবেচিত হচ্ছেন। এ দেশের তরুণ সমাজের জানা দরকার এঁদের কথা।

বিশ্বকোষ ধরনের যে কোনো বই তৈরি করতে গেলে লেখা সাজাবার জন্য কতকগুলো নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়; এ ধরনের নিয়ম চাহিদা মতো ভুক্তি তাড়াতাড়ি খুঁজে পেতে পাঠকদের সাহায্য করে। ভুক্তির নামকরণ এবং সাজাবার ব্যাপারে এই বিশ্বকোষে নিচের নিয়মগুলো অনুসরণ করা হয়েছে :

- ভুক্তিগুলো সাজানো হয়েছে বাংলা বর্ণমালার আদ্যক্ষর অনুসারে, বাংলা অভিধানে যে নিয়ম অনুসৃত হয়ে থাকে সেইভাবে।
- নামের ভুক্তি সাজাবার ব্যাপারে নামের যে অংশটা বেশি চলতি সেটা আগে ধরে সাজানো হয়েছে। যেমন—বরার্ট ক্লাইভ-এর বেলায় আগে এসেছে ক্লাইভ (ক্লাইভ, রবার্ট); কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর বেলায় আগে এসেছে রবীন্দ্রনাথ (কেননা ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ লিখলে নামটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হত)।
- অনেক সময় কোনো ভুক্তিতে এমন বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যাবে যে বিষয়ে এই বিশ্বকোষেই পৃথক ভুক্তি আছে। সে ক্ষেত্রে সে শব্দের পাশে (দ্র) লিখে দ্রষ্টব্য বোঝানো হয়েছে, যার অর্থ—এই বিষয়ে পৃথক ভুক্তি দেওয়া হয়েছে। কখনো একটি ভুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অন্য ভুক্তির মধ্যে রয়েছে। সে ক্ষেত্রে মোটা হরফে সেই ভুক্তির শিরোনাম লিখে বিস্তারিত আলোচনা যে ভুক্তিতে পাওয়া যাবে তার শিরোনামের পাশে দ্র দিয়ে দ্রষ্টব্য নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন অক্ষরবৃত্ত সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোনো ভুক্তিতে আলোচনা করা হয় নি, প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে 'ছন্দ' ভুক্তিতে; তাই 'অক্ষরবৃত্ত' স্বতন্ত্র ভুক্তি হিসাবে মোটা হরফে লিখে তার পাশে ছন্দ দ্র লেখা হয়েছে।
- অনেক বৈজ্ঞানিক, কারিগরি বা বিশেষ অর্থবোধক শব্দের ক্ষেত্রে তার ইংরেজি প্রতিশব্দ বা পারিভাষিক শব্দ পাঠকদের জানতে ইচ্ছে করবে; সে ক্ষেত্রে বাংলা শব্দের পরে তার ইংরেজি প্রতিশব্দ বা পরিভাষা (প্রয়োজনবোধে বাংলা উচ্চারণসহ) বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।
- অনেক সময় বিদেশী ব্যক্তি বা স্থানের নাম সে দেশে বা মূল ভাষায় এক রকম উচ্চারণ হয়, অথচ বাংলা বা ইংরেজিতে চলতি উচ্চারণ হয়তো অন্য রকম। সেসব ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় চালু উচ্চারণ ও প্রকৃত উচ্চারণ দুটোই ভুক্তিতে রাখা হয়েছে। বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে দ্র নির্দেশ করে বিকল্প ভুক্তি দেখতে বলা হয়েছে। যেমন—ইউরিপিডিস (যে নাম এ দেশে চালু) ভুক্তিতে লেখা হয়েছে : এউরিপিদেস দ্র। এর ব্যতিক্রমও কিছু আছে; যেমন—নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কিংবা ইউজিন ওনেগিন-এর ক্ষেত্রে। বিশুদ্ধ উচ্চারণ নাপলিয়ঁ বনাপার্ৎ বা ইভ্‌গিয়েনি অনিয়েগিন্ ভুক্তি রাখলে নিয়মের দিক দিয়ে ঠিকই হত, কিন্তু ভুক্তিটি সহজে হয়তো খুঁজে পাওয়া যেত না। যা হোক, মূল লক্ষ্য থেকেছে প্রচলিত ভ্রান্তি বা ত্রুটি যতদূর সম্ভব সংশোধন করে তথ্য যোগান দেওয়া, সেই সঙ্গে সব কিছুকে যতখানি পারা যায় জটিল না করে এই কোষগ্রন্থের ব্যবহারযোগ্যতা বাড়ানো।
- বছর গণনার ক্ষেত্রে বঙ্গাব্দ ও খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সহজে পার্থক্য করার জন্য বঙ্গাব্দ বোঝাতে 'সন' এবং খ্রিস্টাব্দ বোঝাতে 'সাল' ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন ভুক্তিতে বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত খ্রিস্টাব্দের ক্ষেত্রে সাধারণত খ্রি. লেখা হয় নি, কিন্তু খ্রিস্টপূর্বাব্দ বোঝাতে খ্রি. পূ. লেখা হয়েছে। উপরন্তু বঙ্গাব্দ যাতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় সে জন্য ব. লেখা হয়েছে।

- প্রতিটি ভুক্তির শেষে সেই ভুক্তি-লেখকের নামের আদ্যক্ষর দেওয়া হয়েছে। লেখকের নাম জানার জন্য বইয়ের শুরুতে নাম-সংক্ষেপের সঙ্কেত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৩

এই বিশ্বকোষটির একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি কোনো বিশেষ বিদেশী বিশ্বকোষকে অনুসরণ করে তৈরি হয় নি। এর ভুক্তিসমূহ বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষক, শিশুসাহিত্যিক, সাংবাদিকেরা নতুন করে লিখেছেন; অবশ্য তথ্যের জন্য তাঁরা প্রচলিত অন্যান্য বিশ্বকোষ থেকে সাহায্য নিয়েছেন। লেখার ধাঁচ যাতে শিশু-কিশোরদের উপযোগী হয় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। ভুক্তিগুলি লেখা হবার পর সেগুলো নিয়ে লেখকদের সঙ্গে সম্পাদকমণ্ডলীর দিনের পর দিন আলোচনা হয়েছে; প্রয়োজনে লেখকেরা অনেক সময় বার বার তাঁদের লেখা পরিমার্জনা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ের এবং বিভিন্ন লেখকের রচনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর শিল্পী হাশেম খানের নেতৃত্বে দেশের এক দল সেরা শিল্পী দিনের পর দিন খেটে অসংখ্য ভুক্তির জন্য চিত্রসজ্জা করেছেন। এসব কাজে আমরা লেখক-শিল্পীদের কাছ থেকে এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের কাছ থেকে যে সহায়তা পেয়েছি তা খুবই অসাধারণ। তাঁদের এই সহযোগিতা না হলে এত অল্প সময়ে এমন একটি বিশ্বকোষ প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভব হত না।

বিশ্বকোষ প্রণয়নের ক্ষেত্রে লেখকবৃন্দ ছাড়াও আমরা অনেকের কাছে ঋণী। বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাঁদের বইপত্র দিয়ে সাহায্যের হাত না বাড়ালে এত দ্রুত এই দায়িত্ব সম্পন্ন করা যেত না। বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী গ্রন্থাগার এবং জনাব আলমগীর রহমান ব্যক্তিগত পাঠাগার থেকে প্রয়োজনীয় প্রচুর বই-পত্র ব্যবহার করতে দিয়েছেন। মুদ্রণ সৌকর্যের ক্ষেত্রে বিগত দু'টি বৎসর যে সহৃদয় সহযোগিতা আমরা বাংলাদেশ প্রগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজ প্রেস লিমিটেড-এর কম্পিউটার বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দের কাছ থেকে পেয়েছি তা তুলনাহীন। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে সকলকে স্মরণ করি, ধন্যবাদ জানাই।

বিদেশে সচরাচর এ ধরনের একটি বিশ্বকোষ তৈরির জন্য শত শত পণ্ডিত, লেখক, শিল্পী বহু বছর ধরে কাজ করেন। তারপর আবার প্রথম সংস্করণেই তাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা যায় না; কয়েক বছর পর পরই নতুন নতুন সংস্করণের মধ্য দিয়ে বহু বছর ধরে ক্রমে ক্রমে তার উন্নয়নের কাজ চলতে থাকে। বিদেশের সেসব বিশ্বকোষের তুলনায় এ বই অনেক কম সময়ে তৈরি হয়েছে। তাই আমাদের একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও এই বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণে হয়তো অনেক অসম্পূর্ণতা থেকে যাচ্ছে। এসব বিষয়ে পাঠকেরা যদি শিশু একাডেমীকে লিখে জানান তা হলে পরের সংস্করণে এর আরো উন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়া যাবে।

আর মাত্র ক' বছর পরই আমরা বিশ শতক ছাড়িয়ে একুশ শতকে প্রবেশ করব। আমাদের আজকের শিশু-কিশোরদের একুশ শতকের পৃথিবীর উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে বিশ্বের বিশাল জ্ঞানসমুদ্রে তাদের অবগাহনের সুযোগ দিতেই হবে। সেদিকে যদি এই বিশ্বকোষ কিছুটা অবদান রাখে, তা হলে এ বইয়ের লেখক-শিল্পী-সম্পাদকদের শ্রম সার্থক হবে।

শিশু-বিশ্বকোষ ব্যবহারের পদ্ধতি

ক. সকল ভুক্তি (entry) অভিধানগ্রন্থের সাদৃশ্যে বর্ণানুক্রমিকভাবে সজ্জিত হয়েছে। সেই অনুক্রম নিম্নরূপ :

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	এ	ঐ	ও	ঔ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ						
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ						
ট	ঠ	ড	ড়	ঢ	ঢ়	ণ				
ত	ৎ	থ	দ	ধ	ন					
প	ফ	ব	ভ	ম						
য	য়	র	´(রেফ্)	ল						
শ	ষ	স	হ							

খ. ইলেক্, ফলা ও কার এবং হসন্ত সংযুক্তির ক্রমিক উদাহরণ :

অ	অং	অঃ	অঁ	অক	অক্‌ত	অক্ক ইত্যাদি		
ক	কই	কউ	কও	কং	কঃ	কঁ		
ক ক	ককো	ককি	ককী	ককু	ককূ	ককৃ	ককে	ককৈ
	ককো	ককৌ	কক্					
কক্ক…	কক্ত…	কক্ব…	কক্য…	কক্র…	কক্ল…	কক্ষ		
কখ…	কঠ…	কড…	কড়…	কঢ…	কঢ়…	কণ…	কত…	কৎ…
	কথ…	কদ…	কধ…	কন…	কপ…	কফ…	কব…	কভ…
	কম…	কয…	কয়…	কর…	করৌ…	কর্…	কর্ক…	কর্ক্…
	কর্কট…	কর্হ…						
কল	কশ	কষ	কস	কহ…	কহৌ	ইত্যাদি		

গ. দেশী বা বিদেশী যে কোনো নামের ক্ষেত্রে চলতি রেওয়াজ মানা হয়েছে : নামটি আমরা সচরাচর যেমন বলে থাকি, অর্থাৎ নামের যে অংশটি প্রধানত মনে রাখি ভুক্তিতে সেভাবে দেওয়া হয়েছে। তবে বিদেশী নাম খুঁজবার একটা স্বাভাবিক পদ্ধতি প্রচলিত আছে—পদবি ধরে খোঁজা। আমরা সে নিয়মও মেনেছি; যেমন—উইলিয়াম শেক্সপীয়র, আলবার্ট আইনস্টাইন, জিগমুণ্ড ফ্রয়েড ইত্যাদি নাম পেতে হলে উইলিয়াম, আলবার্ট, জিগমুণ্ড ইত্যাদি না খুঁজে তাঁদের বংশগত পদবি (Surname বা family name) শেক্সপীয়র, আইনস্টাইন, ফ্রয়েড ইত্যাদি খুঁজে দেখতে হবে। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা কাজী নজরুল ইসলামকে পেতে হলে ঠাকুর বা ইসলাম খুঁজলে পাওয়া যাবে না, 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'কাজী' খুঁজে বের করতে হবে। অন্য দিকে আতাউল গনি ওসমানী কি সঙ্গীতজ্ঞ আলাউদ্দিন খাঁ-কে পেতে হলে ওসমানী (যেহেতু নামের এই অংশটুকুই সবাই জানেন) এবং ওস্তাদ আলাউদ্দিন (যেহেতু এঁদের নামের পূর্বে সর্বদা আমরা 'ওস্তাদ' বলে থাকি) খুঁজতে হবে।

ঘ. ভুক্তির ভিতরে কোথাও দ্র থাকলে বুঝতে হবে যে এর পূর্ববর্তী শব্দটির জন্য পৃথক ভুক্তি যথাস্থানে রয়েছে। যেমন ধরা যাক—'ওদিসি' ভুক্তির রচনাতে হোমার, মহাকাব্য, ভার্জিল, ঈনীদ ও জয়েস শব্দগুলোর পরে দ্র মুদ্রিত হয়েছে; এর অর্থ, এই বিশ্বকোষের নির্দিষ্ট খণ্ডের ভিতরে উপর্যুক্ত পাঁচটি ভুক্তিতে এসব প্রসঙ্গের আলোচনা আছে। কখনো-বা একটি ভুক্তির জন্য অন্য ভুক্তির শিরোনামের পাশে দ্র লিখে তা দেখবার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

ঙ. ভুক্তির ভিতরে ব্যবহৃত শব্দসঙ্কেত নিম্নরূপ :

আ.	=	আলায়হিস্ সালাম
আনু.	=	আনুমানিক
কিমি	=	কিলোমিটার
কেজি	=	কিলোগ্রাম
খ্রি.	=	খ্রিস্টাব্দ
খ্রি. পূ.	=	খ্রিস্টপূর্বাব্দ
ড.	=	ডক্টর
ডা.	=	ডাক্তার
দ্র	=	দ্রষ্টব্য
ব.	=	বঙ্গাব্দ
মি.	=	মিটার
মিমি	=	মিলিমিটার
রা.	=	রাদি'য়াল্লাহু আন্‌হু
শা.	=	শাসনকাল
স.	=	সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম
সিসি	=	কিউবিক সেন্টিমিটার
সে.	=	সেন্টিগ্রেড / সেলসিয়াস
সেমি	=	সেন্টিমিটার

লেখকদের নাম-সঙ্কেত

অ. ব.	=	অজয় বড়ুয়া
আ. আ.	=	ড. আলী আসগর
আ. আ. মু.	=	ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী
আ. আ. হা.	=	ডা. আফরোজা আখতার হালিদা
আ. ই.	=	আমীরুল ইসলাম
আ. ক.	=	অধ্যাপক আহমদ কবির
আ. কা.	=	আবু কায়সার
আ. ন. ম. আ. র.	=	ডা. আ. ন. ম. আমিনুর রহমান
আ. মা.	=	আহমাদ মাযহার
আ. র.	=	ডা. আহমদ রফিক
আ. হ. খ.	=	আবদুল হক খন্দকার
আ. হা.	=	আবুল হাসানাত
আ. হু.	=	আখতার হুসেন
আজ. ই.	=	আজহার ইসলাম
ক. গো.	=	ড. করুণাময় গোস্বামী
ক. চৌ.	=	অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
কা. আ. আ.	=	কাজী আবদুল আলীম
কা. ম.	=	কাজী মদিনা
খু. জা.	=	অধ্যাপক খুরশীদ জাহান
টি. কি.	=	টিপু কিবরিয়া
ত. চ.	=	তপন চক্রবর্তী
নি. অ.	=	নিরঞ্জন অধিকারী
ফ. মা.	=	ফরহাদ মাহমুদ
ফ. র.	=	ফরিদুর রহমান
ফা. ন.	=	ফারুক নওয়াজ
ব. চৌ.	=	ডা. এ. কিউ. এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী
বি. ব.	=	বিপ্রদাশ বড়ুয়া
ম. আ.	=	মতলুব আলী
ম. আ. খা.	=	মনসুর আহমদ খান
ম. মু.	=	অধ্যাপক মনসুর মুসা
ম. র.	=	মনজুরুর রহমান
ম. হ.	=	মফিদুল হক
মা. র.	=	ডা. মাসউদুর রহমান
মু. আ.	=	মুহাম্মদ আলী
মু. ই.	=	ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
মু. এ.	=	মুহাম্মদ এলতাসউদ্দিন
মু. মা.	=	মুস্তাফা মাসুদ
মু. হা.	=	মুনির হাসান
মে. খা.	=	মেহ্জাবীন খান
মো. ই.	=	মোহাম্মদ ইবরাহিম
মো. হো.	=	মোস্তফা হোসেইন
র. শা.	=	রহীম শাহ
র. হা.	=	রশীদ হায়দার
রু. হা.	=	ডা. এস. কে. রুহুল হাসিন
শ. আ.	=	শফিউল আলম
শ. আহ.	=	শফি আহমেদ
শ. খা.	=	শরীফ খান
শা. চৌ.	=	শামসুদ্দিন চৌধুরী
শা. ত.	=	ড. শাহজাহান তপন
শা. হ.	=	শামসুল হক
শু. চৌ.	=	ডা. শুভাগত চৌধুরী
স. রা.	=	ড. সত্যব্রত রায়
সা. এ.	=	ডা. সাইফুদ্দীন একরাম
সি. আ.	=	সিরাজউদ্দীন আহমেদ
সি. না. হ.	=	ডা. সিকদার নাজমুল হক
সু. ব.	=	সুব্রত বড়ুয়া
সুজ. ব.	=	সুজন বড়ুয়া
সে. এ.	=	সেতারা এলিন
সে. শা.	=	সেলিনা শাহজাহান
সে. হো.	=	সেলিনা হোসেন
সৈ. আ. ই.	=	সৈয়দ আমীরুল ইসলাম
সৌ. মা.	=	সৌম্য মামুদ
হা. খা.	=	অধ্যাপক হাশেম খান
হা. মা.	=	ড. হায়াৎ মামুদ
হা. র.	=	হাসানুর রহমান
হো. আ.	=	হোসনে আরা

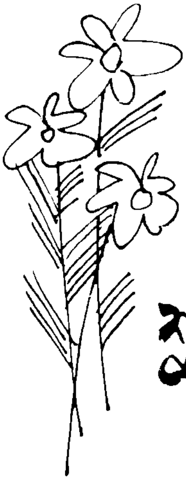

সূচনা

অ

অং সান [১৯১৫—১৯৪৭]

ব্রহ্মদেশের বা মায়ান্‌মারের (দ্র) স্বাধীনতা সংগ্রামের মুখ্য নেতা ও সমরনায়ক। জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি ক্ষুদ্র শহর নাটমাউকে। শিক্ষাজীবনের সূচনা স্থানীয় প্রথাবদ্ধ বিদ্যালয়ে। মেধাবী ছাত্র হিসাবে কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষাজীবন শেষ করেন।

রাজনীতির হাতেখড়ি রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে। তাঁর বড় কৃতিত্ব 'অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট পিপল্‌স্ ফ্রিডম্ লীগ-'এর (AFPFL) প্রতিষ্ঠা। এই সংগঠনই ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়।

জাপানি হামলার সময় তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরে যোগ দেন প্রতিরোধ আন্দোলনে। ১৯৪৫ সালের ন্যাশনাল আর্মির কমাণ্ডার নিযুক্ত হন এবং এই বাহিনীকে মিত্রবাহিনীর শিবিরভুক্ত করেন। ১৯৪৭ সালের বিধানসভার নির্বাচনে এ এফ পি এফ এল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই সংগঠনই অনতিবিলম্বে ডাক দেয় ব্রহ্মদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার। অং সান তখন অস্থায়ী সরকারের প্রধান।

১৯৪৭ সালের ১৯শে জুলাই তিনি তাঁর অপর কয়েক জন গুরুত্বপূর্ণ সহযোগীসহ আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। দুঃখজনক এই ঘটনাটি ঘটে ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা-চুক্তি স্বাক্ষরের মাত্র কয়েক মাস আগে।

আ. হ্.

অঁপ্যার্, অঁদ্রে মারি অ্যাম্পেয়ার দ্র

অক্টোপাস (octopus)

অক্টোপাস শামুক জাতীয় প্রাণী। অক্টোপাসের দেহ গোলাকৃতির। এদের মুখের চতুর্দিকে চার জোড়া পা রয়েছে। প্রতিটি পায়ে দু'সারি করে চোষক থাকে। শামুক-জাতীয় প্রাণী হলেও অক্টোপাসের দেহে কোনো শক্ত আবরণ নেই, বরং এদের দেহ বেশ নরম ও তুলতুলে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০ প্রজাতির অক্টোপাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের সবাই সামুদ্রিক। সবচেয়ে ছোট অক্টোপাস মাত্র ৫ সেন্টিমিটার, অন্য দিকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অক্টোপাস প্রায় ১০ মিটার লম্বা। এর নাম ডলফিনি অক্টোপাস। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে (দ্র) এর বাস। অক্টোপাস নিশাচর ও মৃদু গতিসম্পন্ন প্রাণী। সাধারণ অবস্থায় এরা পা নেড়ে-চেড়ে মৃদু গতিতে সাঁতার কাটে। কিন্তু বিপদে পড়লে এরা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। এদের দেহের পেছনে মাথার নিচে একটি

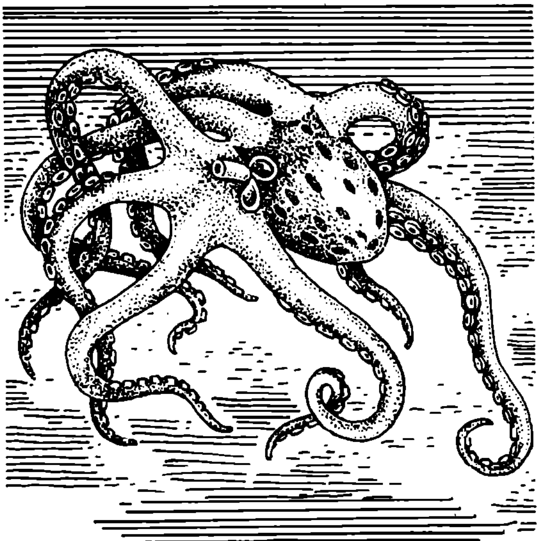

নলাকার 'ফানেল' থাকে। এই ফানেলের ভিতর জলপূর্ণ করে দ্রুতবেগে বের করে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে দূরে সরে যায়। অক্টোপাসের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল রঙ বা বর্ণ পরিবর্তনের ক্ষমতা। এর ত্বকে আঁচিলের মতো ফুস্কুড়ি থাকে। ত্বকের নিচে অনেকগুলি ক্রোমাটোফোর (chromatophore) আছে। ক্রোমাটোফোরে নানা রঙের কোষ থাকে। এসব কোষের সাহায্যেও ওরা দেহের রঙ পাল্টায়। অক্টোপাসের দেহে 'কালি থলে' (ink sac) থাকে। শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে অক্টোপাস থলের কালি ছুঁড়ে কালো ধোঁয়ার মতো সৃষ্টি করে। কালি শত্রুর ঘ্রাণশক্তি সাময়িকভাবে বিকল করে দেয় এবং শত্রুর সামনে একটি আড়াল সৃষ্টি করে। স্ত্রী অক্টোপাস প্রায় দেড় লাখ ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়। বাচ্চা বের হবার পর মা অক্টোপাস মারা যায়। অক্টোপাস ভয়ঙ্কর প্রাণী নয়। ওরা লাজুক ও ভীতু। ওরা মাংসাশী।

ত. চ.

অক্ষ

অক্ষ হচ্ছে কোনো বস্তুর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটি কল্পিত সরলরেখা, যার উপর বা যাকে ঘিরে বস্তুটি ঘোরে। যেমন– পৃথিবীর (দ্র) কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু বরাবর একটি সরলরেখা কল্পনা করা হয়

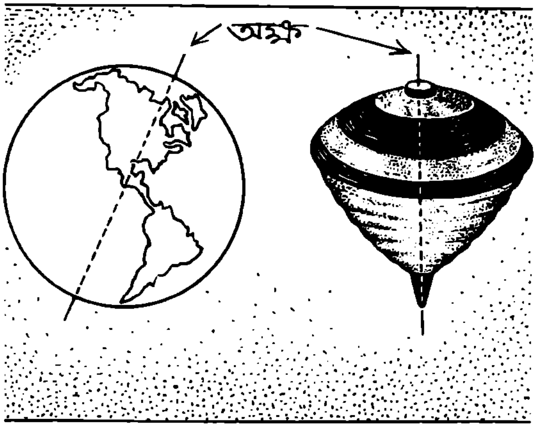

যাকে কেন্দ্র করে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘোরে। একে পৃথিবীর অক্ষ বা মেরুরেখা বলে। পৃথিবী তার অক্ষে সম্পূর্ণরূপে এক বার ঘুরতে ২৪ ঘন্টা সময় নেয়।

যে রেখা কোনো সুষম বস্তু অথবা চিত্রকে দু'টি প্রতিসম অংশে বিভক্ত করে তাকে অক্ষ বলে। যেমন– বৃত্তের ব্যাস।

গণিতে কোনো তথ্যের লেখচিত্র আঁকতে গেলে একটি অনুভূমিক ও একটি উল্লম্ব রেখা এমনভাবে আঁকতে হয় যেন তারা পরস্পরকে ছেদ করে। এই রেখা দু'টিকে অক্ষ বলে। এই অক্ষ দু'টি যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে মূল বিন্দু বলে।

হো. আ.

অক্ষয়কুমার বড়াল [১৮৬০—১৯১৯]

জন্ম কলিকাতায় (দ্র)। বিহারীলাল চক্রবর্তীর ভাবশিষ্য কবি। আত্মকেন্দ্রিক, কল্পনাভিত্তিক কবিতার (দ্র) রচয়িতা। প্রেম ও সৌন্দর্য তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের (দ্র) সমসাময়িক কবি হলেও তাঁর কাব্যে স্বকীয়তা রয়েছে। 'প্রদীপ', 'ভুল', 'কনকাঞ্জলি' 'শঙ্খ', 'এষা' তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

মে. খা.

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় [১৮৬১—১৯৩০]

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সিমলা-নদীয়ায় ১লা মার্চ ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মথুরানাথ। তিনি প্রথমে কুমারখালিতে পড়াশোনা করেন, পরে রাজশাহীতে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কলিকাতায় পড়াশোনা করে রাজশাহীতে ফিরে আসেন এবং রাজশাহী কলেজ থেকে বি. এল. পাশ করে সেখানে ওকালতি আরম্ভ করেন।

বাল্যকাল থেকে অক্ষয়কুমার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি আরম্ভ করেন। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। উভয় সাহিত্য নিয়েই তিনি অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তবে তাঁর খ্যাতি প্রধানত ঐতিহাসিক রচনার জন্য। তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক রচনা 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৮৯৮) লিখে তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। 'মীরকাসিম' (১৯০৬) নামে তাঁর আর একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ আছে। তাঁর আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'গৌড়লেখমালা'য় (প্রথম স্তবক ১৯১২) তিনি পালরাজাদের তাম্রশাসন ও শিলালিপির সাহায্যে প্রাচীন ব্রহ্মদেশের ইতিহাস তুলে ধরেন। তাঁর রচিত 'রানী ভবানী' ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অতুলনীয় অবদান অন্ধকূপহত্যার কাহিনীকে মিথ্যা প্রমাণ করা। ১৯১৬ সালের ২৪শে মার্চ এশিয়াটিক সোসাইটিতে এক সভায় তিনি প্রমাণ করেন যে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে (দ্র) যে হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করেন তা মিথ্যা প্রচার।

'বঙ্গদর্শন', 'সাহিত্য', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক অক্ষয়কুমার নিজে ১৮৯১ সালে একটি ইতিহাস বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছিলেন। তার নাম 'ঐতিহাসিক চিত্র'; এটি ত্রৈমাসিক পত্র ছিল।

সরকার তাঁকে 'সি আই ই' (CIE=Companion of the Order of the Indian Empire) উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি 'কৈসর-ই-হিন্দ' সুবর্ণপদকও পান ১৯১৫ সালে। ১৯৩০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

আ. হা.

অক্ষর

একবারে উচ্চারণযোগ্য শব্দের সবচাইতে ছোট অংশের নাম অক্ষর। অক্ষরের জন্ম কখন হয়েছে, তার সঠিক

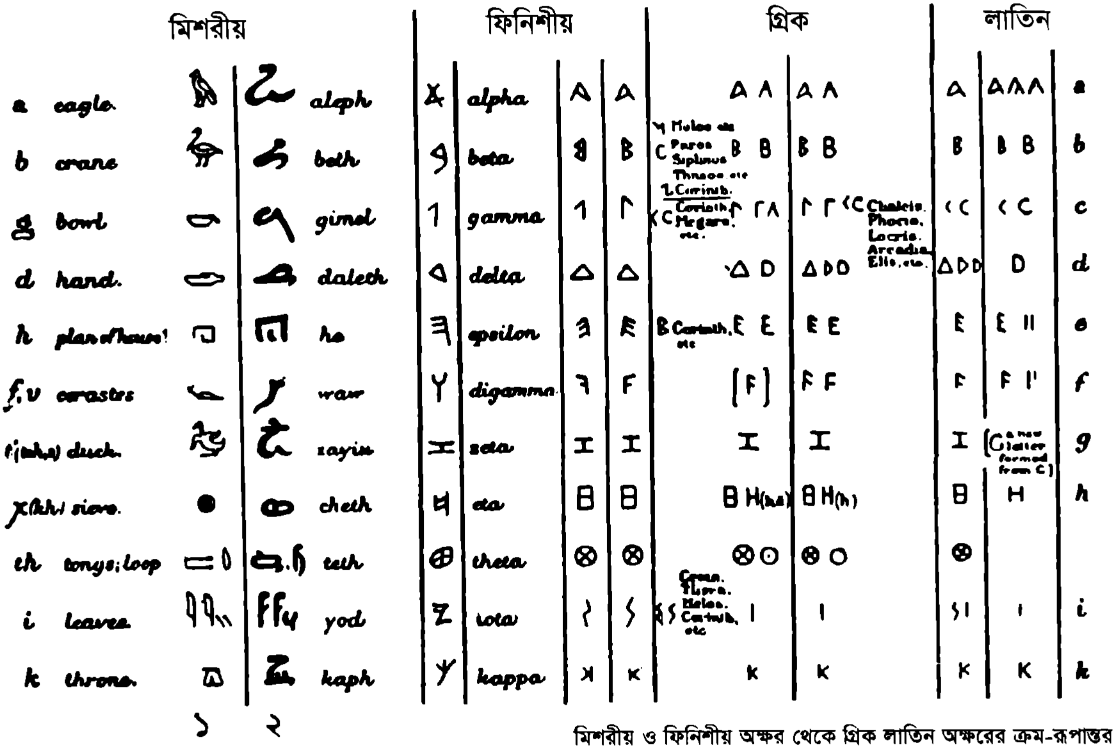

মিশরীয় ও ফিনিশীয় অক্ষর থেকে গ্রিক লাতিন অক্ষরের ক্রম-রূপান্তর
(১) প্রাচীনতম বর্ণমালা-হাইরোগ্লিফিক (২) হাইরেটিক।

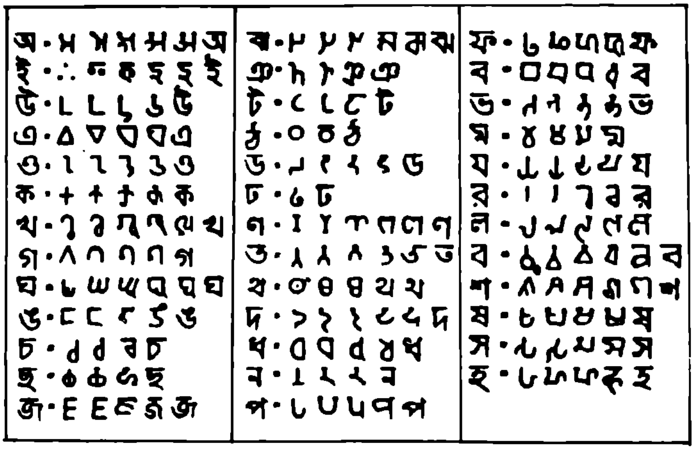

প্রাচীন ব্রাহ্মী বর্ণমালা থেকে বাংলা বর্ণের ক্রমবিকাশ

বামে উপরে : রাজা গণেশের আমলে (১৪১৫-১৭) মুদ্রায় বাংলা অক্ষরের প্রতিলিপি। নিচে : সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৫৩৩-৮৮) আমলের পাথরে খোদিত বাংলা লেখা।

ইতিহাস জানা যায় না। তাই অক্ষরের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা দেশে সৃষ্টি হয়েছে নানা উপকথা। চীনদেশের উপকথা থেকে জানা যায়, সাং চিয়েন (Ts'ang Chien) নামে ড্রাগনমুখো এক লোক অনেক দিন আগে চীনা অক্ষর তৈরি করেছিলেন। পাখির ঠোঁটের মতো মাথাওয়ালা আর মানুষের শরীরওয়ালা দেবতা থথ্ (Thoth) সৃষ্টি করেছিলেন মিশরীয় হরফ। হিন্দু দেবতা ব্রহ্মা ভারতবর্ষে আবিষ্কার করেছিলেন প্রাচীন লিপি। ব্রহ্মার নাম অনুসারে ঐ লিপির নাম হয়েছে ব্রাহ্মীলিপি।

প্রকৃতপক্ষে ছবি থেকে এসেছে চিত্রলিপি (দ্র) এবং চিত্রলিপি থেকে সৃষ্টি হয়েছে লিপি বা অক্ষরের। পঁচিশ হাজার বছরেরও আগে গুহার দেয়ালে বা পাথরের গায়ে আঁকা ছবির নমুনা আবিষ্কৃত হয়েছে। হাজার হাজার বছরের বিবর্তনের ফলে কোনো কোনো চিত্র চিত্রলিপিতে পরিবর্তিত হয়েছে এবং আরো পরে হয়েছে অক্ষর বা বর্ণ। যতটুকু জানা যায়, ভূমধ্যসাগরের (দ্র) তীরে অবস্থিত ফিনিশিয়া (Phoenicia) দেশে চিত্রলিপি থেকে প্রথম বাইশটি অক্ষরের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে ঐ লিপির সবগুলিই ছিল ব্যঞ্জনবর্ণ। গ্রিক ও হিব্রু জাতি ফিনিশীয়দের নিকট থেকে ঐ সব লিপি গ্রহণ করেছিল। গ্রিকদের অক্ষরের সংখ্যা ছিল চব্বিশটি। ওরা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের ব্যবহার চালু করেছিল। পরে গ্রিকদের কাছ থেকে অক্ষর গ্রহণ করে রোমানেরা। ওদের অক্ষরের সংখ্যা ছিল তেইশটি। রোমানেরা এক সময় জয় করে নিয়েছিল গ্রেট ব্রিটেন। ব্রিটেনবাসীরা গ্রহণ করে রোমান হরফ। পাঁচটি স্বরবর্ণ এবং একুশটি ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিয়ে মোট ছাব্বিশটি অক্ষর দিয়ে গঠিত হয় ইংরেজি বর্ণমালা। ক্রমে রোমানদের বর্ণমালা ছড়িয়ে পড়ে সারা ইউরোপে।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন, প্রাচীন ফিনিশীয় লিপি থেকে সৃষ্টি হয়েছে ব্রাহ্মীলিপির। কিন্তু সিন্ধুর মহেনজোদারো (দ্র) এবং পাঞ্জাবের হরপ্পা (দ্র) সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে পণ্ডিতদের এ ধারণা পাল্টে গেছে। তাঁরা এখন মনে করেন, বিদেশী লিপির প্রভাব থাকলেও প্রাচীন ভারতবাসীরা নিজেরাই স্বাধীনভাবে লিপি আবিষ্কার করেছে এবং সিন্ধুলিপিকে ব্রাহ্মীলিপির পূর্বসূরি বলে তাঁরা মনে করেন। অবশ্য মহেনজোদারো ও হরপ্পার লিপি এখনো কেউ পড়ে উঠতে পারেন নি। ঋগ্বেদে একাধিকবার 'অক্ষর' কথাটির উল্লেখ আছে এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও অক্ষর শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। খ্রিস্টের জন্মের পাঁচ শ' বছর আগে থেকে প্রায় ৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মীলিপি চালু ছিল। এ লিপির প্রথম বিবর্তন লক্ষ করা যায় অশোকলিপি (দ্র) বা মৌর্য লিপিতে। এর পরের স্তরে পাওয়া যায় কুষাণলিপি। প্রথম থেকে তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কুষাণ রাজাদের আমলে এ লিপির প্রচলন ছিল বলে এ লিপির এই নামকরণ হয়েছে। এরপর ব্রাহ্মীলিপি দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে যায়—একটি উত্তরী এবং অন্যটি দক্ষিণী। উত্তরীর মধ্যে রয়েছে গুপ্তলিপি—চতুর্থ ও পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে প্রচারিত। গুপ্তলিপি থেকে সৃষ্টি হয়েছে কুটিল লিপি। এ লিপির প্রচার ছিল ষষ্ঠ থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত। কুটিল লিপি থেকে উদ্ভব হয়েছে নাগরী লিপির। প্রাচীন নাগরী বা উত্তর ভারতীয় কুটিল লিপির পূর্ব শাখা থেকে উৎপত্তি হয়েছে বাংলা লিপি বা অক্ষরের। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে মূল বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছে বলে জানা যায়। কম্বোজের রাজা নয়পালদেবের ইর্দার দানপত্রে এবং প্রথম মহীপালের বাণগড়ের দানপত্রে সর্বপ্রথম আদি বাংলা বর্ণমালা দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা অক্ষর দুই রকম—স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ। অ আ ই ঈ ইত্যাদি এগারোটি স্বরবর্ণ এবং ক খ গ ঘ ঙ ইত্যাদি ঊনচল্লিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ। বাংলা ভাষায় (দ্র) মোট অক্ষরের সংখ্যা ৫০। এদের বলা হয় বর্ণমালা।

শা. হ.

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ দ্র

অক্সাইড অক্সিজেন দ্র

অক্সিজেন (oxygen)

অক্সিজেন একটি মৌলিক গ্যাস। সাংকেতিক চিহ্ন O। বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন পদার্থ। পারমাণবিক ওজন ১৬, পারমাণবিক সংখ্যা ৮। অন্যান্য গ্যাসের সঙ্গে বাতাসে (দ্র) মিশে আছে। আয়তনে বায়ুর প্রায় এক পঞ্চমাংশ। সব রকম দহনকার্য ও জীবের শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া এ ছাড়া চলে না। তরল বায়ু থেকে আংশিক বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ

অক্সিজেন পাওয়া যায়। পানিতে সামান্য দ্রবণীয়। ১৭৭৪ সালে বিজ্ঞানী প্রিস্টলি এটি আবিষ্কার করেন। অক্সিজেন অম্ল বা অ্যাসিড (দ্র) তৈরি করতে প্রয়োজন। তাই একে বাংলায় 'অম্লজান'ও বলা হয়।

বাতাস ছাড়া আমরা বেশিক্ষণ বাঁচি না। কিন্তু বাতাসের যে অংশটি আমাদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য তা হল অক্সিজেন, যা বাতাসের আয়তনের শতকরা ২০·৯ ভাগ। এই অক্সিজেন ছাড়া জীবজন্তুর জীবনধারণ অসম্ভব। খাদ্য ও পানির অভাবে আমরা দু' চার দিন বাঁচতে পারি। কিন্তু অক্সিজেনের অভাবে আমরা পাঁচ মিনিটের বেশি বাঁচি না। বাতাস থেকে অক্সিজেন যদি সরিয়ে নেওয়া যায় তবে মিনিটখানেকের মধ্যে ডাঙার জীবজন্তু শ্বাসরোধের কারণে ছটফট করে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে থাকবে এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে সকলেরই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। জলাভূমি, নদী-নালা, সমুদ্রপৃষ্ঠ অগণিত মাছ ও অন্যান্য জলজ জীবের মৃতদেহে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে; কেননা জলজ জীবজন্তুর জীবন পানিতে যে অক্সিজেন দ্রবীভূত থাকে তার ওপর নির্ভর করে। কাজেই অক্সিজেনের অভাবে স্বল্প কালের মধ্যেই পৃথিবীর (দ্র) বুকে কোথাও আর কোনো প্রাণচাঞ্চল্য থাকবে না। অবশ্য উদ্ভিদ জগতে সহসা তেমন বিপর্যয় দেখা দেবে না। কিছু কাল পর্যন্ত তারা বেঁচে থাকবে বটে, তবে শেষ পর্যন্ত তারাও সমূলে ধ্বংস হবে; কেননা পরিপূর্ণ জীবনধারণের জন্য উদ্ভিদেরও কিছু পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন। শুধু ধ্বংস হবে না কতক জাতের জীবাণু বা ব্যাক্টেরিয়া (দ্র)—এদের জীবনধারণ-কৌশল এমনই আশ্চর্যের যে অক্সিজেনবিহীন পরিবেশেও এরা বেঁচে থাকতে পারে।

আমাদের জীবনধারণের জন্য বাতাসের অক্সিজেন যদিও অপরিহার্য, তবু অবিমিশ্র অক্সিজেন কিন্তু আমাদের জীবনধারণের পক্ষে অনুকূল নয়, বরং মারাত্মক। শুধু অক্সিজেনে বেশিক্ষণ শ্বাস নিলে দেহের তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাণীর জীবনধারণের জন্য যেমন উপযোগী নয়, তেমনি তার পরিমাণের স্বল্পতাও জীবনধারণের প্রতিকূল।

বাতাসে সচরাচর যে পরিমাণ অক্সিজেন থাকে তা হল বাতাসের আয়তনের অনুপাতে শতকরা প্রায় ২১ ভাগ। বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা ৭ ভাগের কম হলে সে বাতাসে অতি অল্প কালের জন্যই আমরা বেঁচে থাকতে পারি।

অক্সিজেন একটি সক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ। তাই এটি প্রায় সকল মৌলিক পদার্থের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। অক্সিজেন জীবদেহে হাইড্রোজেন (দ্র), কার্বন (দ্র) এবং অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে সংযুক্ত বা মিলিত অবস্থায় থাকে। আর এভাবে আমাদের দেহের ওজনের তিন ভাগের মধ্যে দু' ভাগই হল অক্সিজেন। কাজেই আমাদের দেহের অধিকাংশই অক্সিজেন দিয়ে গঠিত।

সাধারণ তাপে (দ্র) অক্সিজেন অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে অবশ্য খুব ধীরে ধীরে মিলিত হয়। অক্সিজেন অন্য কোনো পদার্থের সঙ্গে সংযুক্ত হলে যে পদার্থটি তৈরি হয় তাকে বলা হয় অক্সাইড আর এই প্রক্রিয়া বা বিক্রিয়াটিকে বলে জারণপ্রক্রিয়া। এই জারণপ্রক্রিয়ায় অক্সাইড ছাড়াও উৎপন্ন হয় উত্তাপ।

এখন এই জারণপ্রক্রিয়াটি যদি দ্রুত সম্পন্ন হয় তবে অনেক ক্ষেত্রে এতটাই উত্তাপের সৃষ্টি হয় যে আগুন জ্বলে ওঠে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে বিরাট বিস্ফোরণও ঘটে। তবে সাধারণ তাপে এই জারণপ্রক্রিয়াটি চলে অতি ধীরে ধীরে অর্থাৎ মৃদু তালে, তাই সেটিকে বলা হয় মৃদু দহন। অক্সিজেন সকল জীবিত প্রাণীদেহে সর্বদা এই মৃদু দহনের কাজ করে চলেছে। এতে প্রাণীদেহে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে বটে, কিন্তু সে তাপের পরিমাণ এতটা বেশি নয় যে প্রাণীরা সে উত্তাপে পুড়ে মরবে। তবে এক দিকে তা প্রাণীদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে আর অন্য দিকে যোগায় দৈহিক ও মানসিক কাজ করার ক্ষমতা বা শক্তি।

আমরা জানি, আমাদের দেহ বহু জীবকোষ দিয়ে গঠিত। আমরা যে খাবার খাই তা হজম হওয়ার পর তার সারবস্তু রক্তে (দ্র) মিশে শেষটায় এই সব জীবকোষে গিয়ে জমে। আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে যখন বাতাস টেনে নিই তখন বাতাসে যে অক্সিজেন থাকে তা ফুসফুসের (দ্র) মাধ্যমে ঐ রক্তে শোষিত হয়। সে অক্সিজেন তারপর যে শরীরের সকল কোষে-কোষে জমে সেটি ঘটে এক অপূর্ব কৌশল বা

প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। রক্তে লোহিত কণিকা (দ্র) নামে এক প্রকার পদার্থ থাকে। এই লোহিত কণিকার মধ্যে থাকে 'হিমোগ্লোবিন' নামে এক ধরনের উপাদান, যার রঙ লাল আর সেই রঙের সূত্রেই রক্তের রঙটিও লাল দেখায়। এখন এই 'হিমোগ্লোবিন' যেমন সরাসরি এবং সহজে অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হতে পারে, তেমনি আবার তার সঙ্গে সংযুক্ত অক্সিজেনকে সহজেই মুক্তি দিতে পারে। অর্থাৎ অক্সিজেনের সঙ্গে হিমোগ্লোবিনের বন্ধন অটুট নয়, অনেকটাই অস্থায়ী।

তাই শ্বসনপ্রক্রিয়ায় রক্তের লোহিতকণিকা সহজেই বাতাসের অক্সিজেনকে শোষণ করে নিতে পারে তার মধ্যকার হিমোগ্লোবিনের দৌলতে, তৈরি হয় অক্সি-হিমোগ্লোবিন নামক একটি অস্থায়ী পদার্থ। শরীরের কোষে কোষে বাতাসের অক্সিজেন এসে যে মিলিত হয় ঐ সব কোষে সঞ্চিত খাদ্যের সারবস্তুর সঙ্গে, তা ঘটে ঐ অক্সি-হিমোগ্লোবিনেরই সূত্রে। আর যেহেতু অক্সি-হিমোগ্লোবিন একটি অস্থায়ী পদার্থ, তাই অক্সিজেন সহজেই মুক্তি পেতে পারে ওর কবল থেকে। ফলে কোষের মধ্যে খাদ্যের সারবস্তুর সংস্পর্শে যখন অক্সি-হিমোগ্লোবিন আসে, তখন অক্সিজেন মুক্তি পেয়ে খাদ্যের সারবস্তুকে জীবিত করে তাপের সৃষ্টি করে। এই তাপের বদৌলতেই বজায় থাকে আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা, দৈহিক ও মানসিক কাজ করার ক্ষমতা ও দক্ষতা।

কাজেই অক্সিজেনের অভাব ঘটলে আমাদের কাজ করার কোনো ক্ষমতাই থাকত না। অক্সিজেন তাই আমাদের জীবনধারণের জন্য যে কতটা জরুরি তা সহজেই বোঝা যায়।

অবশ্য হিমোগ্লোবিনের অভাবেও রক্তে অক্সিজেন মিশতে পারে; তবে তার পরিমাণ এতই সামান্য হবে যে আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ কখনোই তা সরবরাহ করতে পারবে না। অবশ্য আমাদের দেহের রক্তের পরিমাণ যদি বহু গুণ বেশি হত এবং ফুসফুসের আকারটা যদি হত অতিশয় বিশাল, তবে হয়তো কোনোক্রমে বেঁচে থাকা সম্ভব হত। কিন্তু ঐ বিপুল পরিমাণ রক্ত আর ঐ বিশাল ফুসফুসটাকে ধারণ করতে আমাদের দেহটাকেও বিরাট আকার ধারণ করতে হত।

আ. হ. খ.

অক্সি-হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন দ্র

অগত্যা

পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত রম্য ও ব্যঙ্গধর্মী মাসিক পত্রিকা। এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে (বাংলা ১৩৫৬ সনের আষাঢ় মাসে)। সাময়িকীটির বৈশিষ্ট্য ছিল তৎকালীন প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক সরকারের সুবিধাবাদ, ভ্রষ্টাচার এবং সমাজে বিদ্যমান নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তীব্র, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষণ করে বিভিন্ন ধরনের রচনা ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করা।

অগত্যার সম্পাদনা (দ্র) ও পরিচালনা পরিষদ ছিল এইরূপ—সাধারণ উপদেষ্টা : ফতেহ লোহানী; সম্পাদক সমবায় : বিশ্ব-পরিক্রমায়— খোন্দকার আবদুল হামিদ, সংস্কৃতি সংবাদে— তসিকুল আলম, প্রচারে— সাবের রেজা করীম, সৌষ্ঠব রচনা ও আঙ্গিক পরিকল্পনায়— কামরুল হাসান ও সিন্দ্‌বাদ, সঙ্গীতে— আবদুল আহাদ, স্টুডিও সংবাদে—কাজী আলাউদ্দিন এবং সম্পাদক— ফজলে লোহানী।

সাময়িকীটির কার্যালয় ছিল ১০৭ ইসলামপুর রোড, ঢাকা এবং মুদ্রিত হত ২ রমাকান্ত নন্দী লেনস্থ পাইওনিয়ার প্রেস অর্থাৎ আজকের পাইওনিয়ার প্রিন্টিং প্রেস লিমিটেড-এর আদি মুদ্রণালয় থেকে। অগত্যার প্রকাশক ও মুদ্রক ছিলেন আবু সঈদ নসির।

এর পাতায় প্রকাশিত কয়েকটি ব্যঙ্গরচনার নমুনা :

"সকালে উঠিয়া আমি জোরে জোরে বলি
সারাদিন আমি যেন ঘুষ খেয়ে চলি
আদেশ করেন যাহা লীগ গুরুজনে
আমি যেন সেই কাজ করি অকারণে।"

অথবা

"প্রশ্ন : আমাদের বর্তমান নেতারা জনসাধারণ সম্বন্ধে কতখানি সচেতন ! এ সম্বন্ধে আপনার কি কোন স্পষ্ট ধারণা আছে ?
উত্তর : জি হ্যাঁ, যতক্ষণ নেতারা ঘুমিয়ে থাকেন, জনসাধারণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকেন, ঘুম ভাঙ্গলেই আবার স্বাভাবিকভাবেই অচেতন হয়ে পড়েন।"

অগত্যার নিয়মিত লেখক ও অন্য সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আনিস চৌধুরী, শামসুর রাহমান, বদরুল হাসান, সরদার জয়েনউদ্‌দীন (দ্র), হাবীবুর রহমান (দ্র), আতাউর রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান (দ্র), মাহবুব জামাল জাহেদী, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আনিসুজ্জামান, আবদুল গাফফার চৌধুরী, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্, ফতেহ্ লোহানী (দ্র), ফজলে লোহানী (দ্র), ফয়েজ আহমদ, মুর্তজা বশীর, নাজীর আহমদ (দ্র) ও কামরুল হাসান (দ্র) প্রমুখ।

সাময়িকীটির আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে বাংলা ১৩৫৯ সনের শ্রাবণ মাসে। এর প্রকাশনা সেকালে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

বাংলা একাডেমীর (দ্র) 'ড. শহীদুল্লাহ্ পাঠাগারে' অগত্যার কিছু সংখ্যা সংরক্ষিত আছে।

আ. হু.

অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র

আগুন (দ্র) নেভানোর যন্ত্র (দ্র)। পানি বা রাসায়নিক পদার্থপূর্ণ একটি বিশেষ ধাতব পাত্র, সহজে বহনযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য। আগুন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আগে এর দ্বারা অগ্নিশিখা আয়ত্তে আনা বা নিভিয়ে ফেলা যায়।

দাহ্য পদার্থ ও আগুনের প্রকৃতি অনুযায়ী আগুন চার শ্রেণীর। আগুনের শ্রেণী অনুসারে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র তিন ধরনের—

১. পানি নির্বাপক : পানি দ্বারা পূর্ণ। A শ্রেণীর (সাধারণ দাহ্য পদার্থ কাঠ, কাগজ, কাপড় থেকে উৎপন্ন) আগুন নেভাতে ব্যবহৃত হয়।

২. তরল ও গ্যাস নির্বাপক : কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) বা হ্যালন নামক গ্যাস দ্বারা পূর্ণ। B শ্রেণীর (গ্যাস [দ্র], তেল [দ্র], পেট্রোল, গ্যাসোলিন প্রভৃতি তরল পদার্থ থেকে উদ্ভূত) আগুন নেভাতে ব্যবহৃত হয়।

৩. শুষ্ক রাসায়নিক নির্বাপক : রাসায়নিক গুঁড়ো দ্বারা পূর্ণ। C শ্রেণীর (মোটর, সুইচ ইত্যাদি বৈদ্যুতিক যন্ত্র থেকে উৎপন্ন) এবং D শ্রেণীর (ধাতব পদার্থ থেকে উৎপন্ন) আগুন নেভাতে ব্যবহৃত হয়।

অধিক পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত যন্ত্রটি হল কার্বন ডাই-অক্সাইড বা হ্যালন গ্যাস নির্বাপক। সিনেমা-হল, স্কুল, কলেজ, মিলনায়তন প্রভৃতির দেয়ালে প্রকাশ্য স্থানে একটি অগ্নিনির্বাপক সিলিণ্ডার ঝুলিয়ে রাখা হয়। সিলিণ্ডারটি উচ্চ চাপে তরল গ্যাসে ভর্তি থাকে। অথবা গ্যাস উৎপাদনের জন্য এর মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়কগুলি সাজিয়ে রাখা হয়।

সিলিণ্ডারটির সঙ্গে একটি হাতল, বায়ুমাপযন্ত্র এবং একটি নজল্‌যুক্ত হোসপাইপ লাগানো থাকে। বিশেষ পদ্ধতিতে হাতলটি চেপে ধরলে যন্ত্র থেকে গ্যাস নির্গত হয়। অগ্নিশিখার ওপর এই গ্যাস ধরলে শিখাটি স্তিমিত হয় এবং ধীরে ধীরে নিভে যায়। প্রত্যেক নির্বাপক যন্ত্রের গায়ে ব্যবহারের নির্দেশ লেখা থাকে।

স. রা.

অগ্নিপূজা

বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় অম্লজান (অক্সিজেন) ও অঙ্গারের (কার্বন) সমন্বয়ে আগুনের সৃষ্টি হয়। আলো (দ্র), শক্তি (দ্র) ও ঔজ্জ্বল্যের কারণে আগুন আদিম মানবের কাছে রহস্যময় ও আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। বনের আগুন ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত দেখে তারা ভীষণ ভয় পেয়ে যেত। তারপর তারা কৌতূহলের বশে ধাতু ও পাথরের সঙ্গে সংঘর্ষে আগুন জ্বালানোর কৌশল এক সময় আবিষ্কার করে। আগুনের অসাধারণ উপযোগিতার কারণে প্রাচীন কাল থেকে সারা পৃথিবীর (দ্র) মানুষ আগুনকে ভয়, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজা করতে থাকে। ভারতীয় আর্যগণ, ইরানীয়দের আদি পুরুষগণ এবং ইউরোপের (দ্র) মানুষ শীত নিবারণ, উষ্ণতাসাধন ও হিংস্র জন্তুকে ভয় দেখানোর জন্য এবং সাংসারিক কাজে আগুনকে প্রধান উপকরণরূপে ব্যবহার করত। এভাবে ধীরে ধীরে আর্যগণ অগ্নি এবং আলোকের উৎস ও সন্তান হিসাবে উষা, সূর্য (দ্র) ও অগ্নির পূজা শুরু করে। প্রাচীন কালে ইন্দো-ইরানীয়গণ ছিল মূলত অগ্নি-উপাসক। ক্রমে আর্যজাতি পাঞ্জাবে এলে তারা আগুনের দ্বারা মৃতদেহ পবিত্র করা বা শবদাহপ্রথার প্রচলন করে। তবে এই প্রথা ইরানীয় আর্যগণ কখনো গ্রহণ করে নি।

প্রাচীন ইরানের সমগ্র সভ্যতা অগ্নিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। জরথুস্ত্র (দ্র) একেশ্বরবাদ প্রচার করে যজ্ঞের পরিবর্তে পূজাবিধি প্রচলন করেন, কিন্তু মূর্তিপূজা, গোমেধ ও সুরাপান নিষিদ্ধ করেন। প্রাচীন ইরানে আতর্ (atar) ধর্মবিশ্বাসের মূলরূপে স্বীকৃত হয়। ইরানীয় পরিবারের অগ্নিকুণ্ডে আতর রক্ষিত হত। খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে হেরোদোতাস্ (দ্র) বলেছেন যে ইরানে মূর্তিপূজা নেই। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ অব্দে পার্থিয়ান যুগে সবার উপাসনার জন্য অগ্নিকে উন্মুক্ত স্থানে রাখা হত। ২২৫ খ্রিস্টাব্দে সারাসিন যুগে দুর্গের ছাদে অগ্নি রাখা হত। ক্রমে জনসাধারণের জন্য গৃহ নির্মাণ করে আতর রক্ষার ব্যবস্থা হল। এ সময় জনসাধারণ আতর-এর কাছে স্বাস্থ্য, সন্তান এবং পিতৃপুরুষের জন্য প্রার্থনা জানাত। ক্রমে জনসাধারণের কাছে তার নাম হল দদ্-গাহ্ (বা ধর্মসম্মত)। অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর কাছে তার নাম হল আতরগাহ্ (পার্বণসম্মত)। ধীরে ধীরে অগ্নিগৃহগুলোতে বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, অর্থকোষ ও বিচারশালা স্থাপিত হতে থাকে। এভাবে তারা অগ্নিকেন্দ্রিক সংস্কৃতির সৃষ্টি করে।

খ্রিস্টীয় ৬৫১ অব্দে আরব কর্তৃক ইরান বিজয়ের পর জরথুস্ত্র সম্প্রদায়ের অগ্নি-উপাসক পার্সিগণ ভারতবর্ষে পালিয়ে আসে। ভারতে বসবাস করার পাঁচ বছরের মধ্যে ৭৯০ খ্রিস্টাব্দে তারা আতর্ বাহরামকে বিশিষ্টরূপে ইরানশাহ নাম দিয়ে স্থাপন করে। ঐ অগ্নি গুজরাটের উদ্‌বাডোতে এখনো প্রজ্জ্বলিত আছে। শাস্ত্রমতে এই সম্প্রদায়কে একেশ্বরবাদী বলা হয়। মহাকবি ফেরদৌসী (দ্র) পারস্যের মহাকাব্য (দ্র)শাহনামা (দ্র)-তেও তা-ই লিখেছেন। পার্সি সমাজে অগ্নি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এবং বৈশিষ্ট্যময়—গৃহে সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে আতর দিনরাত জ্বলতে থাকে, গোঁড়া পার্সিগণ সেখানে কখনো কিছুই অপবিত্র করত না। ফুঁ দিয়ে আগুন নেভাত না, ধূমপান করত না ইত্যাদি। ভারতের রাজারা সহজেই পার্সি সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে শক যুগে এবং ইরানের প্রাচীন মুদ্রায় অগ্নিদেবীর চিত্র পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে শক রাজাদের পুরোহিতগণের বংশ থেকে বাংলার সেন রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল। সম্রাট আকবরও অগ্নিপূজার বিষয় পাঠ করতেন বলে জানা যায়।

ভারতবর্ষে তিন জন অগ্রগণ্য দেবতার মধ্যে অগ্নি অন্যতম। যজ্ঞের অগ্নিরূপেই অগ্নি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পূজিত হত। অগ্নি ব্যতীত যজ্ঞ হয় না, সে জন্য অগ্নি পুরোহিত। ঋগ্বেদের প্রথমেই অগ্নিবন্দনা আছে এবং অগ্নির বন্দনা দিয়েই ঋগ্বেদ সমাপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে নানাভাবে অগ্নির উল্লেখ পাওয়া যায়। অগ্নিদেবের বাহন ছাগ। অগ্নি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন— অনল, পাবক, হুতাশন, বৈশ্বানর, অব্জহস্ত, ধূমকেতু, তোমরধর, হুতাশ, হুতভুজ, বহ্নি, রোহিতাশ্ব, ছাগরথ, সপ্তজিহ্বা।

বি. ব.

অগ্ন্যাশয় (pancreas)

অগ্ন্যাশয় দেখতে অনেকটা ইংরেজি 'জে' অক্ষরের মতো। ওজন প্রায় ১৭০ গ্রাম। এর শীর্ষ অংশ ডিউডিনামের (duodenum) অর্ধবৃত্তাকার বাঁকের মধ্যে অবস্থিত। বাকি অংশ সেখান থেকে আড়াআড়িভাবে উদরগহ্বরের পিছন দিকে প্রসারিত।

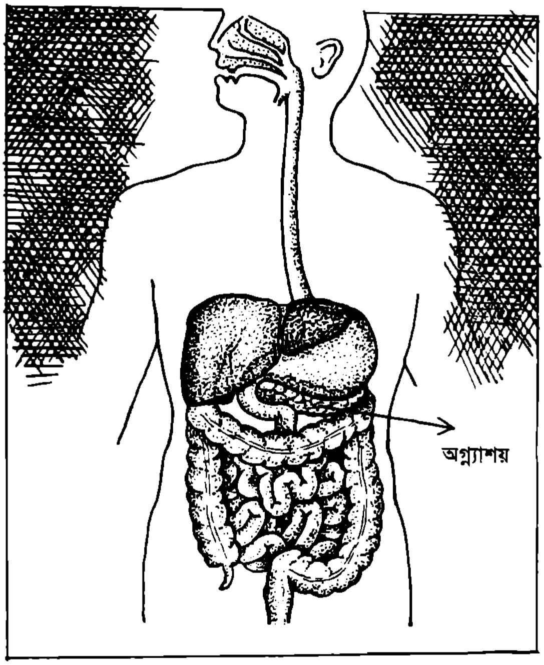

অগ্ন্যাশয় একই সঙ্গে অন্তঃস্রাবী (দ্র) ও বহিঃস্রাবী গ্রন্থি হিসাবে কাজ করে। অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত পাচকরসের এনজাইম (দ্র) প্রোটিন, শ্বেতসার ও চর্বি জাতীয় খাদ্য

পরিপাকে সাহায্য করে। অন্য দিকে অগ্ন্যাশয়ে অবস্থিত ল্যাঙ্গারহান্স কোষপুঞ্জ (islets of Langerhans) থেকে নিঃসৃত হরমোন (দ্র) গ্লুকাগন (আল্ফাকোষ থেকে), ইনসুলিন (বিটাকোষ থেকে) (দ্র) এবং সোমাটোস্ট্যাটিন ('ডি' কোষ থেকে) রক্তের (দ্র) শর্করা-মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এজন্যই অগ্ন্যাশয়ের কোনো রোগে এই সব কোষ নষ্ট হলে রক্তে শর্করা-মাত্রা বেড়ে গিয়ে ডায়াবেটিস (দ্র) রোগ দেখা দেয়।

রু. হা.

অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য ও শিশুনাট্য পুরস্কার

অগ্রণী ব্যাংকের অর্থানুকূল্যে শিশুসাহিত্য রচনা ও নাটক (দ্র) মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বছরের সেরা শিশুসাহিত্যগ্রন্থ রচনা এবং অলঙ্করণের জন্য সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় শ্রেষ্ঠ লেখক ও শিল্পীকে অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ১৩৮৮ সন থেকে এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

বিষয় অনুসারে শিশুসাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমকে মোট ৭টি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। শাখাগুলি হচ্ছে—

ক. কবিতা-ছড়া-গান
খ. গল্প-উপন্যাস-রূপকথা
গ. স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি
ঘ. জীবনী-প্রবন্ধ
ঙ. অনুবাদ-ভ্রমণকাহিনী
চ. নাটক
ছ. বুক ইলাস্ট্রেশন

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী (দ্র) এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

কোনো একটি শাখায় এক জন লেখক একাধিক বার এই পুরস্কার পেতে পারেন। কিন্তু এক বছর পুরস্কার পাওয়ার পর পরবর্তী দুই বছর একই শাখায় তিনি পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হতে পারেন না।

শিশুনাটক প্রযোজনা ও মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ব্যাংক শিশুনাট্য পুরস্কার প্রতিযোগিতা ১৩৮৮ সন থেকে শিশুসাহিত্য পুরস্কারের সঙ্গে প্রবর্তিত হয়। নাটক মঞ্চায়নের মোট ছয়টি শাখায় এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। শাখাগুলি হল—

ক. শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা
খ. শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা
গ. শ্রেষ্ঠ আলোকপরিকল্পনা
ঘ. শ্রেষ্ঠ মঞ্চব্যবস্থাপনা
ঙ. শ্রেষ্ঠ আবহসঙ্গীত
চ. শ্রেষ্ঠ অভিনয়

ফা. ন.

অঙ্কুরোদ্‌গম

বীজের ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা ভ্রূণের জাগরণের ফলে চারাগাছের উৎপত্তি হয়। সুপ্তাবস্থার পরে ভ্রূণের চারাগাছে পরিণত হওয়াকে অঙ্কুরোদ্‌গম বলা হয়। তবে ভ্রূণের

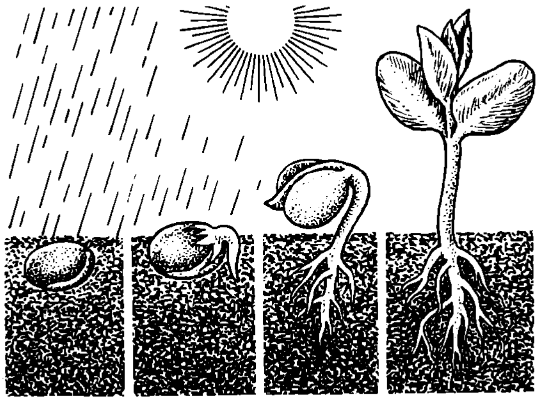

জাগরণ ও বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি শর্ত থাকে। যেমন—পানি ছাড়া অঙ্কুরোদ্‌গম সম্ভব নয়। পানি বীজত্বককে নরম করে, প্রোটোপ্লাজ্‌মকে উজ্জীবিত ও ক্রিয়াশীল করে, অক্সিজেন (দ্র) ও অন্যান্য গ্যাসের (দ্র) বিনিময় সহজ করে, বীজপত্রে সঞ্চিত খাদ্য পানিতে দ্রবীভূত হয়ে ভ্রূণের বর্ধনশীল অংশে পৌঁছানোয় সাহায্য করে; পানি দ্বারা ফুলে ওঠা ও বর্ধনশীল ভ্রূণের চাপে বীজত্বক ফেটে যায়। অঙ্কুরোদ্‌গমের জন্য আরো প্রয়োজন অক্সিজেন, তাপ (দ্র) ও আলো (দ্র)। অঙ্কুরোদ্‌গমের সময় কোষবিভাজন ঘটে। এতে ভ্রূণের কলেবর বৃদ্ধি পায়। কোষবিভাজন ও নতুন কোষসমূহের বৃদ্ধির জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। বীজে সঞ্চিত খাদ্য থেকে

শক্তি সঞ্চার হয় সবাত শ্বসনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সবাত শ্বসনের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন। উপযুক্ত তাপ না থাকলে ভ্রূণ সক্রিয় হয় না এবং ভ্রূণের বিপাকক্রিয়াও দ্রুত সম্পন্ন হয় না। বিভিন্ন বীজে ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। অঙ্কুরোদ্‌গমের জন্য ন্যূনতম ৪° সে. এবং ঊর্ধ্বে ৪৫° সে. তাপের দরকার। বেশির ভাগ বীজের জন্য উৎকৃষ্ট তাপমাত্রা হল ২৫° সে. থেকে ৩০° সে.। সকল বীজের জন্য নয়, কতকগুলো বীজ যেমন তামাকের (দ্র) জন্য আলোর প্রয়োজন হয়। আবার ধুতুরা উদ্‌গমের জন্য আঁধারেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। এ ছাড়া অঙ্কুরোদ্‌গমে প্রভাব সৃষ্টি করে খাদ্য, রাসায়নিক দ্রব্য বা হরমোন (দ্র), সুপ্তাবস্থা ও অঙ্কুরোদ্‌গমের ক্ষমতা। বীজে পর্যাপ্ত খাদ্য সঞ্চিত থাকা দরকার। অঙ্কুরোদ্‌গম নিয়ন্ত্রণ করে অক্সিন, জিবরালিন্ ও ডর্মিন্ নামক হরমোন। নির্দিষ্ট সুপ্তাবস্থা অতিক্রম না করলে অঙ্কুরোদ্‌গম হয় না। বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমের ক্ষমতা নির্দিষ্ট সময়ের পর নষ্ট হয়ে যায়।

ত. চ.

অঙ্গীকার

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের একটি প্রতীক ভাস্কর্য 'অঙ্গীকার'।

চাঁদপুর শহরে এটি অবস্থিত। এটি তৈরি হয়েছে ১৯৮৯ সালে। সিমেন্ট ও বালিতে তৈরি এই ভাস্কর্যের উচ্চতা বেদীসহ ১৫ ফুট। অঙ্গীকার—দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হাত, মুঠিতে ধরা এক ধাতব অস্ত্র। বলিষ্ঠ হাত আর দৃঢ় মুষ্টি—মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের দৃঢ়তা ও মিলিত শক্তি আর ধাতব অস্ত্র, যার মাধ্যমে জনগণের মিলিত শক্তির প্রকাশ ঘটেছে।

এই ভাস্কর্যের শিল্পী সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ।

হা. খা.

অঙ্গীকার—ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ

অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব / অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

মধ্যযুগের বাংলার একটি দার্শনিক মতবাদ। শ্রীচৈতন্যদেব (দ্র) প্রবর্তিত মতবাদের নাম বৈষ্ণব মত। এই মতবাদ গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় বৈষ্ণব মত নামেও পরিচিত। (বাংলাদেশের প্রাচীন নাম গৌড় (দ্র)। প্রাচীন কালে বাংলাদেশ পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত ছিল—বরেন্দ্র, বঙ্গ, মিথিলা, রাঢ়, বকদ্বীপ। এর নাম পঞ্চগৌড়)। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুচর ছিলেন রূপ, সনাতন, সার্বভৌম, রামানন্দ, স্বরূপদামোদর প্রমুখ গোস্বামী। এঁরা শ্রীচৈতন্যদেবের মুখনিঃসৃত বাণী থেকে কৃষ্ণতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর অভিমত অবগত হয়েছিলেন। এসব যাবতীয় তত্ত্ব জীবগোস্বামী প্রণীত 'ভাগবতসন্দর্ভ' দর্শনগ্রন্থে লেখা আছে। এটি বৈষ্ণবদের সর্বপ্রধান দার্শনিক গ্রন্থ। জীবগোস্বামী তাঁর এই গ্রন্থের ব্যাখ্যায় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ স্থাপন করেন। বাংলা ভাষায় রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৈষ্ণবদর্শনের যাবতীয় তত্ত্ব বিধৃত করেন। পরে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁদের রচিত গ্রন্থে বৈষ্ণবদর্শনের আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে পুষ্টিসাধন

করেছেন। এসব গ্রন্থে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করা হয়।

বাংলার বৈষ্ণব আচার্যগণের মতে, জগৎ নশ্বর, কিন্তু মিথ্যা নয়। তাঁদের মতে, স্রষ্টা ব্রহ্মের অতিরিক্ত আর কোনো তত্ত্ব নেই। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিভিন্ন শক্তিমান ও শক্তির প্রকাশ মাত্র। বাংলার বৈষ্ণবগণের মতে, এ জন্য জীব ও জগৎ সমস্তই পরমব্রহ্মের শক্তি। জীবগণ পরমব্রহ্মের জীবশক্তির অংশ। এর মধ্যে শক্তিমান ও শক্তির মধ্যে ভেদ ও অভেদ একই সঙ্গে বর্তমান। সংক্ষেপে এর নাম অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব। এই ভারতীয় দর্শন এক অমূল্য সম্পদ।

বি. ব.

অজয় ভট্টাচার্য [১৯০৬—১৯৪৩]

বিখ্যাত গীতরচয়িতা। কুমিল্লায় জন্ম। গ্রামোফোন (দ্র) রেকর্ড ও চলচ্চিত্র (দ্র)–উভয় মাধ্যমেই তাঁর নাম ব্যাপক সাড়া জাগায়। বাংলা সবাক চিত্রের প্রথম দিক থেকেই তাঁর গান সাদরে গাওয়া হতে থাকে। চলচ্চিত্রের জন্য কাহিনী ও সংলাপ রচনা ছাড়াও তিনি পরিচালকরূপে যশস্বী হন। অজয় ভট্টাচার্য-রচিত গানের সংখ্যা দুই হাজারের ওপর। তাঁর রচিত গানের কয়েকটি সঙ্কলন (দ্র) প্রকাশিত হয়।

ক. গো.

অজ্ঞাবাদ (agnosticism)

একটি দার্শনিক মতবাদ। এর অর্থ—আত্মা, ঈশ্বর ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত সত্তা সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানলাভ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সব অতীন্দ্রিয় তত্ত্বগুলো বাস্তবিক আছে কি নেই, অজ্ঞাবাদী (agnostic) সেই বিষয়ে কিছুই বলতে চান না। কারণ তাঁর মতে, এই বিষয়ে কোনো জ্ঞানই তাঁর হয় নি এবং হতেও পারে না। অজ্ঞাবাদী অবশ্য এ কথা বলেন না যে আত্মা নেই বা ঈশ্বর নেই। অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের বাইরে যেসব বিষয় আছে সেই তত্ত্বের) তত্ত্বসমূহের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন জড়বাদী ও অবিশ্বাসী নাস্তিক। এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের দাবি করেন জ্ঞানবাদী (gnostic)। অবিশ্বাসী ও জ্ঞানবাদীদের মতবাদ পরস্পরের বিরুদ্ধে। এই দুই বিরুদ্ধ মতবাদ পরিহার করে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেন অজ্ঞাবাদী। ইন্দ্রিয়ের অতীত তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞাবাদী কিছু স্বীকার করেন না, আবার অস্বীকারও করেন না।

এই মতবাদ ভারতীয় দর্শনের অঙ্গ। পরবর্তী কালে পাশ্চাত্য দর্শনে অজ্ঞাবাদ আধুনিক কালে প্রবর্তন করেন টি. এইচ. হাক্সলি। এই দার্শনিক মতবাদ বিশেষভাবে স্বীকৃত না হলেও মানতে হয় যে মানবমনের পক্ষে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের সকল রহস্য সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটন সম্ভব নয়। সুতরাং অজ্ঞাবাদ গ্রহণ করি বা না করি এ-কথা বলাই যায় যে অতীন্দ্রিয় চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু না জানতেও পারি।

বি. ব.

অটোক্লেভ (autoclave)

উচ্চ তাপ ও চাপে বাষ্পের মাধ্যমে জীবাণু (দ্র) মুক্ত করার জন্য অটোক্লেভ নামক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এ যন্ত্রটি মূলত একটি আবদ্ধ ধাতব পাত্র, যা উচ্চ তাপ (দ্র) ও চাপ সহ্য করতে পারে। জীবাণুমুক্ত করার জন্য এ যন্ত্রের ভেতরে ফুটন্ত পানি থেকে নির্গত বাষ্পের উত্তাপকে কাজে লাগানো হয়।

স্বাভাবিক বায়ুচাপে পানির স্ফুটনাঙ্ক (দ্র) ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কিন্তু উচ্চচাপে পানির স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধি পায়। অটোক্লেভে প্রতি বর্গইঞ্চিতে ১৫ পাউণ্ড চাপ সৃষ্টি করে পানির স্ফুটনাঙ্ক ১২১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উন্নীত করা হয়। যে সকল জীবাণু ধ্বংস করার জন্য ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি তাপমাত্রা দরকার হয়, সেগুলোর জন্যই অটোক্লেভের ব্যবহার। সাধারণত সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, ড্রেসিং গজ, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি অটোক্লেভের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

সি. না. হ.

অণু

মৌল বা যৌগের ক্ষুদ্রতম কণা যা ঐ পদার্থের গুণাবলি অক্ষুণ্ণ রেখে মুক্তভাবে অবস্থান করতে সক্ষম, তাকেই বলা

হয় অণু। সাধারণত প্রতিটি অণু দুই বা ততোধিক পরমাণু দিয়ে গঠিত। হাইড্রোজেনের (দ্র) প্রতিটি অণুতে দু'টি পরমাণু থাকে। কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) একটি কার্বন ও দু'টি অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে গঠিত। কোনো কোনো মৌলিক পদার্থ, যেমন—আর্গন (দ্র), হিলিয়াম (দ্র), সোডিয়াম, তামা (দ্র) প্রভৃতির পরমাণুগুলি স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে সক্ষম। এসব ক্ষেত্রে অণু এবং পরমাণু অভিন্ন। মৌলিক পদার্থ থেকে যে পরমাণু পাওয়া যায় তারা একই ধর্মাবলম্বী এবং যৌগিক পদার্থ থেকে যে পরমাণু পাওয়া যায় তারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী।

পরমাণু ও অণুর পার্থক্য :

১. অণু মৌল ও যৌগের ক্ষুদ্রতম কণা, যার স্বাধীন অস্তিত্ব আছে।

২. অণু না ভেঙে রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

৩. দুই বা ততোধিক একই মৌলের পরমাণু দিয়ে মৌলিক অণু এবং ভিন্ন মৌলের পরমাণু দিয়ে যৌগিক অণু গঠিত হয়।

৪. মৌলিক অণু মৌলের এবং যৌগিক অণু যৌগের ধর্ম প্রকাশ করে।

আ. হ. খ.

অণুজীববিদ্যা

অণুজীববিদ্যা শব্দটি ইংরেজি মাইক্রোবায়োলজি (microbiology)-র অনুবাদ। অণুজীববিদ্যার অর্থ অণুবীক্ষণ যন্ত্রেই (দ্র) দেখা যায় এমন অতি ক্ষুদ্র জীবের পরিচয়, ক্রিয়াকলাপ ও অন্যান্য চরিত্র সম্পর্কে অনুশীলন ও জ্ঞান অর্জন। মানবদেহে রোগসৃষ্টির কারণে চিকিৎসাবিজ্ঞানে অণুজীববিদ্যার চর্চা গুরুত্বপূর্ণ। 'মাইক্রোবায়োলজি' শব্দটি যদিও চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রথম ব্যবহার করেন খ্যাতনামা ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর (দ্র), তবু অণুবীক্ষণে অণুজীবের উপস্থিতি প্রথম শনাক্ত করেন হল্যাণ্ডবাসী অণুবীক্ষণবিদ আন্টোন্ ভান্ লেভেন্হুক্ (দ্র) ১৬৭৫ সালে।

এর দীর্ঘকাল পর চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই শাখাটির তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক ভিত্তি তৈরি হয় লুই পাস্তুর, রবার্ট কক (দ্র) প্রমুখ গবেষকের হাতে। ক্ষুদ্রতম প্রাণী প্রোটোজোয়া (দ্র), ছত্রাক (দ্র), খমির (দ্র) ও অন্যান্য পরজীবী এবং জীবাণু (দ্র) ও ভাইরাস (দ্র) নিয়ে অণুজীববিদ্যার চর্চাক্ষেত্র। সেই সঙ্গে সংক্রমণের কারণ, পদ্ধতি, মারীতত্ত্ব (এপিডেমিওলোজি), গবেষণাগারে রোগনির্ণয়, অনাক্রম্যতা (দ্র) ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের চর্চা অণুজীববিদ্যার অন্তর্গত।

বর্তমানে অণুজীববিদ্যার একাধিক শাখা রয়েছে। যেমন—জীবাণুর ইতিহাস, বংশবিস্তার, ক্রিয়াকলাপ, রোগ উৎপাদনক্ষমতা, রোগের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চর্চার জন্য হয়েছে জীবাণুবিদ্যা (bacteriology); একইভাবে ভাইরাস গবেষণার জন্য ভাইরাসবিদ্যা (virology), পরজীবী ও ছত্রাক বিষয়ের জন্য যথাক্রমে প্যারাসাইটোলজি ও মাইকোলজি। সম্প্রতি অনাক্রম্যতার নানা দিক নিয়ে কাজ (অনাক্রম্যতত্ত্ব বা ইমিউনোলজি) এবং অণুজীবের জীনতত্ত্ব (জেনেটিক্স) নিয়ে গবেষণা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৪ সালে অতি শক্তিশালী ইলেক্ট্রন (দ্র) অণুবীক্ষণ আবিষ্কার অণুজীব গবেষণা, বিশেষ করে ভাইরাস গবেষণাকে অনেক এগিয়ে দিয়েছে। সম্ভব হচ্ছে জীন নিয়ে ব্যাপক গবেষণা, যা নানাভাবে মানবকল্যাণে নিয়োজিত।

রু. হা.

অণুবীক্ষণ যন্ত্র (microscope)

ইংরেজি মাইক্রোস্কোপ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ অনুবীক্ষণ যন্ত্র। micro অর্থ ক্ষুদ্র, scope অর্থ দেখা। অর্থাৎ অতিক্ষুদ্র জিনিসকে বড় করে দেখার যন্ত্র (দ্র)। এক বা একাধিক লেন্স বা পরকলা সহযোগে এই যন্ত্র তৈরি করা হয়। সতেরো শতকের শেষে এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। এ যন্ত্রে কোনো বস্তুকে তার দ্বিগুণ দেখা যেত। এর পর একে একে আবিষ্কৃত হয়েছে জ্যানসেন অণুবীক্ষণ যন্ত্র, রবার্ট হুকের অণুবীক্ষণ যন্ত্র, গ্রাটনের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি। এসব অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রতিটি আগেরটির চেয়ে উন্নত। এভাবে ধীরে ধীরে উন্নত হতে হতে বর্তমানে স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এই যন্ত্রে একটি বস্তুকে তার মূল আকারের আড়াই লক্ষ গুণ বড় দেখা যাবে, অর্থাৎ একটি সিকিকে দেখা যাবে ঢাকা শহরের চেয়েও বড়।

সাধারণত খালি চোখে দেখা যায় না বা ভালভাবে

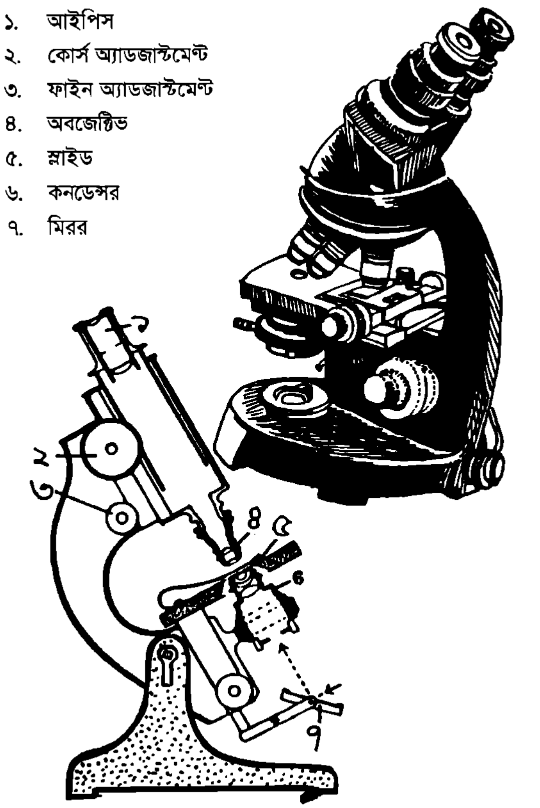

বোঝা যায় না এ ধরনের বস্তু দেখার জন্যই অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞানে (দ্র) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। আরো সূক্ষ্ম বস্তু দেখার জন্যই ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন ধাতুর কাজেও অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এদের মেটালার্জিক্যাল অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে। ধাতুর গঠনশৈলী পর্যবেক্ষণসহ ধাতুর বিভিন্ন কাজে মেটালার্জিক্যাল অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

ত. চ.

অতিবেগুনি রশ্মি

সূর্যরশ্মির বর্ণালিতে (দ্র) দেখা যায় পর পর সাজানো সাতটি বর্ণরেখা। এই বর্ণালির এক প্রান্তের বর্ণরেখা বেগুনি এবং অন্য প্রান্তের বর্ণরেখা লাল। বেগুনি রশ্মির পরেও রশ্মি থাকে। কিন্তু তা আমরা চোখে দেখতে পাই না, কারণ এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুবই কম (৪ ন্যানোমিটার থেকে ৪০০ ন্যানোমিটার; ১ ন্যানোমিটার = $১০^{-৯}$ সেন্টিমিটার)।

এই অদৃশ্য রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটে ধরা পড়ে। অতিবেগুনি রশ্মি মানুষের দেহে ভিটামিন-ডি তৈরি করার কাজে সাহায্য করে। জীবাণুনাশক হিসাবেও এই রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

সু. ব.

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান [৯৮২—১০৫৪]

৯৮২ খ্রিস্টাব্দে (দ্র) বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী গ্রামে রাজা কল্যাণশ্রী ও রানী প্রভাবতীর মধ্যম পুত্র চন্দ্রগর্ভ (অতীশ দীপঙ্কর) জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রগর্ভ প্রথম জীবনে তান্ত্রিক ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন, পরে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান হন। তার পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিহারে (দ্র) অধ্যয়ন শেষে ৩১ বৎসর বয়সে তিনি মালয়দেশের সুবর্ণদ্বীপে গমন করেন। সেখানে প্রখ্যাত আচার্য ধর্মকীর্তির (দ্র) কাছে ১২ বছর বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন শেষে ৪৪ বছর বয়সে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন।

এর পর ১৫ বছর তিনি ভারতের ওদন্তপুরী (দ্র), সোমপুরী এবং বিশেষ করে বিক্রমশীল বিহারে অধ্যাপনা ও পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে ও একান্ত আগ্রহে ৫৮ বছর বয়সে বিক্রমশীল বিহার থেকে তিনি তিব্বতে যান। সেখানে মহাযান (দ্র) বৌদ্ধধর্ম (দ্র) প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন। দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ (দ্র) ও সম্পাদনা (দ্র) করে তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিব্বতবাসীরা শ্রেষ্ঠ গুরু হিসাবে গৌতম বুদ্ধের (দ্র) পরেই তাঁকে সম্মান ও পূজা করেন। সেখানে তাঁকে 'জোবো ছেনপো' বা মহাপ্রভুরূপে মান্য করা হয়। বাংলাদেশে (দ্র) তিনি অতীত বাংলার এক জন শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসাবে খ্যাত। তিনি তিব্বতের ধর্ম, ইতিহাস, রাজকাহিনী, জীবনীগ্রন্থ, স্তোত্রনামা ও সর্বোপরি 'তাঞ্জুর' নামে বিশাল শাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্কলন (দ্র) করেন। অতীত তিব্বতের কোনো আলোচনাই তাঁকে ছাড়া সম্ভব নয়। তিব্বতের লামারা এখনো সেখানকার রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ক্ষমতার প্রায় একচ্ছত্র অধিপতি। এই লামারা নিজেদেরকে

ধর্মগুরু, কবি, দার্শনিক, চিকিৎসক, পরিকল্পনাবিদ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পরলোকগমন করেন।

১৯৭৮ সালের ২৮শে জুন পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পবিত্র দেহভস্ম চীন থেকে ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ-বিহারে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় আনয়ন ও সংরক্ষণ করা হয়। ঢাকার অদূরে বিক্রমপুরে অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান এখনো 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' নামে পরিচিত।

বি. ব.

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান—ব্রোঞ্জের তৈরি ভাস্কর্য

অতীশের শিষ্য ও উত্তরাধিকারী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। বর্তমানে তিব্বত চীনের অধীন হলেও অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের প্রভাব এখনো সেখানকার ধর্ম-সংস্কৃতিতে বিদ্যমান।

অতীশের রচনা, যা তাঁর মাতৃভাষা বাংলা কিংবা সংস্কৃত ভাষায় ছিল তার সবই এখন অবলুপ্ত। কিন্তু তাঁর প্রায় সব গ্রন্থের অনুবাদ আজও তিব্বতে রক্ষিত আছে। তিব্বতি মহাগ্রন্থ 'তাঞ্জুরে' সংরক্ষিত আছে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নিজের করা ৭৯টি গ্রন্থের তিব্বতি অনুবাদ। এ ছাড়া তাঞ্জুরে রক্ষিত তাঁর যেসব গ্রন্থের অনুবাদকর্মে তিনি অংশগ্রহণ করেন নি তার সংখ্যা ৩৮টি।

১৩ বছর তিব্বতে বাস করে ৭২ বছর বয়সে অর্থাৎ ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে লাসার কাছে ঞেথাং বিহারে পণ্ডিত,

অতুলপ্রসাদ সেন [১৮৭১—১৯৩৪]

জন্ম ২০শে অক্টোবর ১৮৭১, ঢাকায়। মৃত্যু ২৬শে আগস্ট ১৯৩৪, লখ্‌নৌ শহরে। পিতা রামপ্রসাদ সেনের আদি নিবাস ফরিদপুর জেলার মগর গ্রাম। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম। ঢাকায় চিকিৎসক ছিলেন। অতুলপ্রসাদ অল্প বয়সে পিতৃহারা হয়ে মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের কাছে বড় হন। ১৮৯০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিলেত গিয়ে তিনি ব্যারিস্টারি পাশ করেন। তার পর কলিকাতা (দ্র) ও রংপুরে কিছু দিন আইন ব্যবসা করে পরে লখ্‌নৌতে গিয়ে আইনজীবী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। সেখানে তিনি আমৃত্যু ছিলেন।

সঙ্গীত রচনার জন্য তাঁর খ্যাতি অসাধারণ। তাঁর গানের সুর ও ভাব আধুনিক বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর গানগুলো অতুলপ্রসাদের গান বা অতুলপ্রসাদী নামে খ্যাত। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা দুই শতের কিছু বেশি। তাঁর ভগবৎসঙ্গীত, প্রকৃতি ও প্রেমগীতি গভীর ও মর্মস্পর্শী। তিনি তাঁর গানে বাউল ও কীর্তনের সুরের যোগ সাধন করেছেন। এ ছাড়া বাংলা কাব্যগীতির বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন না করে, তিনি হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের সুর ও ঢঙের সার্থক যোজনা করেন। তাঁর গানের কথা বা বাণী অত্যন্ত ভাবসমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের (দ্র) দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর গান স্বকীয়তায়

উজ্জ্বল। তাঁর গানগুলো 'গীতিগুঞ্জ' (১৯৩১) গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে। 'কাকলি' গ্রন্থমালায় এসব গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে।

অতুল রাজনীতিসচেতন ছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষের বেদনা তাঁর গানে স্বদেশপ্রেম হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। দীন-দুঃখীদের তিনি মুক্তহস্তে দান করতেন। নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। লখ্‌নৌ শহরে তাঁর নামে সড়কের ও বিশ্ববিদ্যালয় 'হল'-এর নামকরণ হয়েছে। তিনি 'উত্তরা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর অর্জিত অর্থের বড় অংশ তাঁর জীবৎকালে লোকসেবায় ব্যয়িত হত। অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকাংশ, তাঁর বাসগৃহ ও গ্রন্থস্বত্ব তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দান করে গেছেন।

বি. ব.

'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য
পরিচালক ঋত্বিক ঘটক

অদ্বৈত মল্লবর্মণ [১৯১৪-১৯৫১]

ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক। তিনি ১৯১৪ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি কুমিল্লা কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য তাঁর পড়াশোনা বেশি দূর এগোয় নি। জীবিকার অন্বেষণে তিনি কুমিল্লার বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজসেবক ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র দত্তের সঙ্গে কলিকাতা (দ্র) চলে যান।

কলিকাতার 'নবশক্তি' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসাবে অদ্বৈত মল্লবর্মণ সাংবাদিকতা শুরু করেন। এই পত্রিকায় তিনি বিশিষ্ট কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের (দ্র) সহকর্মী ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি 'আজাদ', 'মোহাম্মদী' (দ্র), 'যুগান্তর' এবং সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায়ও কাজ করেন। তিনি বিশ্বভারতীর (দ্র) সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি অদ্বৈত মল্লবর্মণ সাহিত্যচর্চাও করতেন। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় 'তিতাস একটি নদীর নাম' শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে তাঁর একটি উপন্যাস (দ্র) প্রকাশ হতে থাকলে পাঠকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়েই তিনি লেখক হিসাবে সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু উপন্যাসটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হবার আগেই এর পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। তখন শুভার্থী পাঠকদের আগ্রহ ও অনুরোধে তিনি পুনরায় এই উপন্যাসটি রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই এটি বই আকারে প্রকাশিত হয়।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন জাতিতে মালো। 'তিতাস একটি নদীর নাম' সেই মালোদেরই জীবনচিত্র। তাঁর যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা ও তাঁর দেখা বাস্তব চিত্রই তিনি এই উপন্যাসে অকপটে তুলে ধরেছেন। চরিত্র-চিত্রণের নিপুণতা ও গল্প বলার আন্তরিকতায় এটি এক অনন্য সৃষ্টি। এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-নির্মাতা ঋত্বিক ঘটক (দ্র) ১৯৭৩ সালে এই কাহিনীটিকে চলচ্চিত্রে (দ্র) রূপদান করেছেন।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন বিচিত্র পাঠপিপাসু মানুষ। সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ও শিল্পকলা সব বিষয়েই তাঁর ছিল সমান আগ্রহ। নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যেও তিনি এসব বিষয়ে সংগ্রহ করেছেন সহস্রাধিক দুর্লভগ্রন্থ। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থভাণ্ডার রামমোহন লাইব্রেরিকে দান করা হয়।

১৯৫১ সালের ১৬ই এপ্রিল অদ্বৈত মল্লবর্মণ মাত্র ৩৭ বছর বয়সে যক্ষ্মা (দ্র) রোগে আক্রান্ত হয়ে কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

অন দ্য অরিজিন অব স্পিসিজ ডারউইন, চার্লস দ্র

অনশন ধর্মঘট

কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অথবা কোনো অন্যায় ঘটনার প্রতিবাদে ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক এককভাবে কিংবা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক সম্মিলিতভাবে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ না করার কর্মসূচিই অনশন ধর্মঘট বলে অভিহিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকেই অনশনব্রত (দ্র) পালনের নজির আছে, কিন্তু এই অনশনকে একটি রাজনৈতিক পন্থা কিংবা দাবি আদায়ের হাতিয়ার হিসাবে ধর্মঘটে (দ্র) রূপ দেওয়ার প্রয়োগ-প্রচলনের ঘটনা সাম্প্রতিক কালের।

রুশ সম্রাট জার আলেক্সান্দ্রের শাসনামলে (১৮৮১–১৮৯৪) কারাগারে আটক এক দল মহিলা ১৮৮৯ সালে কারাকর্তৃপক্ষের নিকট থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায়ের দাবিতে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ফলে এই বিব্রতকর অবস্থা নিরসনে অনশন ধর্মঘটী মহিলাদের জোর করে খাদ্যগ্রহণ করানো হয়। এই ঘটনার পরিণতিতে রুশ কারাগারকর্তৃপক্ষ কারাবন্দি ঐ মহিলাদের কিছু দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন।

এই উপমহাদেশে অনশন ধর্মঘট পালনের সূচনা হয় প্রধানত ইংরেজ শাসনামলের শেষ দিক থেকে। অবিভক্ত ভারতে অনশন ধর্মঘটের প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন অহিংস আন্দোলনের উদ্‌গাতা মহাত্মা গান্ধী (দ্র)। জেলের বাইরে তিনি একাধিক বার এর আশ্রয় নেন—কখনো ইংরেজ সরকারের কোনো অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে, কখনো নিজের আত্মাকে 'পরিশুদ্ধ' করার জন্য।

অনশন ধর্মঘট পালনের নেপথ্যে বেশ কিছু কারণ কাজ করে। যেমন : ১. আন্দোলনকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক আত্মহননের মতো এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে দ্রুত দাবি আদায়ের পথ প্রশস্ত করা, এবং ২. গৃহীত ধর্মঘটপদ্ধতিতে ধর্মঘটী কারো মৃত্যু হলে বা তার জীবন বিপন্ন হওয়ার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে যে আলোড়নের সৃষ্টি হবে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তার বা তাদের দাবিদাওয়ার প্রতি ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সমর্থন আদায় করা। তাই অনশন ধর্মঘট ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত দাবি আদায়ের এক অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আধুনিক কালে অনেক বড়-বড় রাজনৈতিক নেতা অনশন করে দাবি আদায় করে থাকেন। এ ছাড়া দাবি আদায়ের জন্য গণ-অনশনও হয়।

১৯২১ সালে লাহোর দুর্গে বন্দি বাংলার বিপ্লবী নেতা যতীন দাস (দ্র) বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে একনাগাড়ে ৬৩ দিন অনশন ধর্মঘট পালন করেন। এতে তাঁর মৃত্যু হলে তৎকালীন সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকগ্রস্ত হন এবং তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদসভাতেও যোগ দেন।

আন্দামান সেলুলার জেলে (দ্র) আটক বিপ্লবী রাজবন্দিরাও বহু বার অনশন ধর্মঘট পালন করেন। এর ফলে তাঁদের প্রতি কারাকর্তৃপক্ষের নির্যাতনমূলক মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং ঐ কারাগারের অভ্যন্তরে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

পাকিস্তান আমলে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাজবন্দিরা কারাকর্তৃপক্ষের অমানবিক আচরণের প্রতিবাদে ১৯৪৯-৫০ সালে ৫৮ দিনের অনশন ধর্মঘট কর্মসূচির সূচনা করেন। এই অনশনে কুষ্টিয়ার বামপন্থী শ্রমিক নেতা শিবেন রায় মৃত্যুবরণ করেন। কারাগারকর্তৃপক্ষ তাঁকে 'বলপূর্বক' নাক দিয়ে খাদ্যগ্রহণে বাধ্য করাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। শিবেন রায়ের মৃত্যুর এই ঘটনায় দেশব্যাপী প্রতিবাদ ওঠে।

ভারতের বাইরে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডেও ১৯৮২ সালে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অনশন ধর্মঘট পালন করতে গিয়ে বেশ কয়েক জন রাজবন্দি মৃত্যুবরণ করেন।

অনশন ধর্মঘট শুধু জেলের অভ্যন্তরেই নয়, বাইরেও পালিত হয়ে থাকে।

আ. হু.

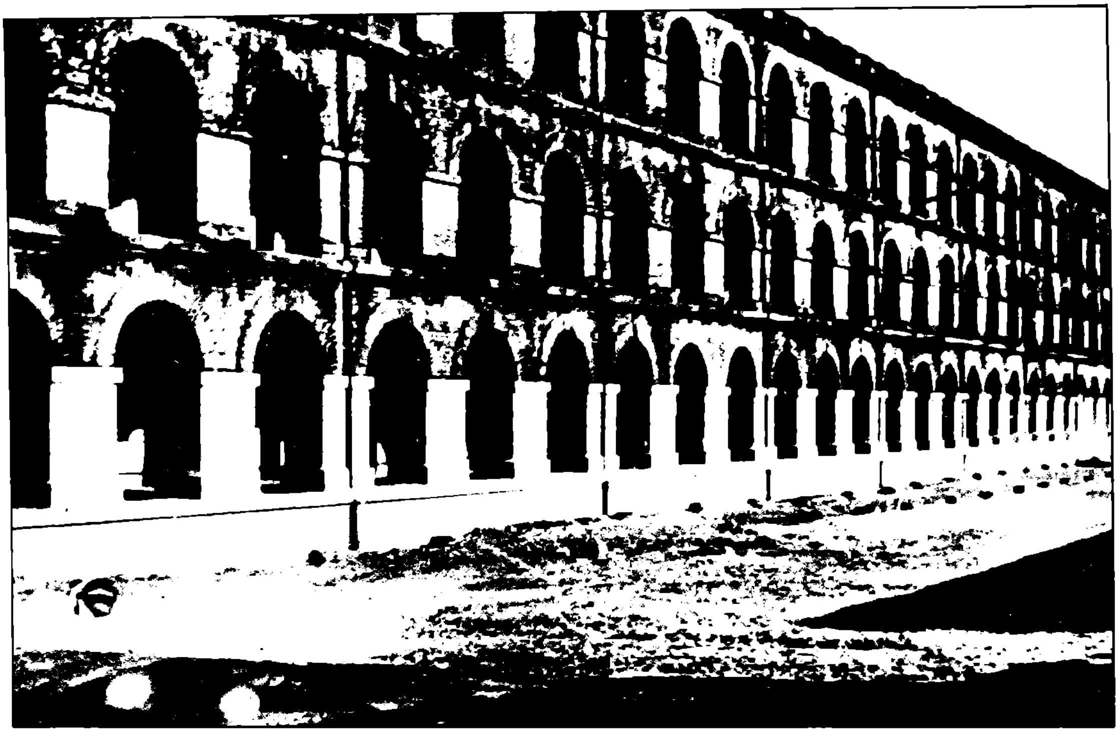

আন্দামানে সেলুলার জেল

অনশনব্রত

অনশনব্রত বস্তুতপক্ষে অনশন-ধর্মঘট (দ্র) নয়। অনশন অর্থ উপবাস বা ভোজন থেকে বিরত থাকা বোঝায়। অনশনব্রত হল আহার পরিত্যাগের সঙ্কল্প। এই ব্রত বলতে কোনো কিছু অর্জন না করা পর্যন্ত বা মৃত্যুসঙ্কল্পপূর্বক উপবাস বোঝায়। স্তরভেদে অনশন তিন প্রকার—স্বল্প অনশন, অর্ধ অনশন ও পূর্ণ অনশন। প্রথম দুটি আংশিক অনশন, কিন্তু পূর্ণ অনশন হল পানি পর্যন্ত গ্রহণ না করে উপবাস।

প্রাচীন কাল থেকে অনশন প্রচলিত আছে। বর্তমান কালে সভ্য বা প্রাচীন সকল জাতির মধ্যেই এই প্রথা বিদ্যমান। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে প্রাচীন কালেও অনশন হত, বর্তমানেও হয়ে থাকে।

কোনো কোনো জাতির মধ্যে প্রতিহিংসা গ্রহণ করে লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত অনশনের প্রথা আছে। অতি প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতিতে অনশনব্রত পালনের বিধান আছে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য চিকিৎসকগণ আংশিক অনশনের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। প্রায়শ্চিত্তের জন্য ও ইচ্ছাপূরণের জন্যও অনশনে থাকার প্রথা আছে। আবার ঋণ আদায়ের জন্য ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার দরজায় হত্যা দিয়ে পড়ে থাকেন। প্রায়শ্চিত্ত, শোকানুষ্ঠান, সমবেদনা জ্ঞাপন, কামনা-বাসনা পূরণ, দীক্ষা, জাদুবিদ্যা ও বিশেষ শক্তি লাভের জন্য অনশনব্রত সুপরিচিত।

যতীন্দ্রনাথ দাস

বিভিন্ন ধর্মমতে অনশনব্রত আছে। চীনে তাওবাদে অনশন স্বীকার্য। ইহুদিগণও ধর্মকাজে ও প্রায়শ্চিত্তে অনশনব্রত পালন করেন। যিশুখ্রিস্ট (দ্র) স্বয়ং অনশন

করতেন এবং অনুসারীদেরও তা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলাম ধর্মে রোজা (দ্র) পালনের নিয়ম আছে। জরথুস্ত্র (দ্র) পন্থীদের মধ্যে অনশন পাপ, কিন্তু কেউ মরলে তাঁরা তিন রাত উপবাস করে থাকেন। জৈনদের মধ্যে অনশনব্রত প্রায় প্রত্যেক ধর্মকাজের অঙ্গ। এ ছাড়া অনশন করে মৃত্যুর বিধানও রয়েছে। হিন্দুধর্মে (দ্র) নানা রকম অনশনব্রত সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত। বাহাই (দ্র) ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রোজা প্রচলিত। জড়বাদী প্রাচীন সমাজ ও আদিবাসীদের (দ্র) মধ্যেও অনশনব্রত রয়েছে।

বি. ব.

অনাক্রম্যতা (immunity)

আমাদের চারপাশে অসংখ্য রোগজীবাণু রয়েছে। জীবাণু (দ্র), পরজীবী (দ্র), ভাইরাস (দ্র)—এদের হামলা শরীরের উপর আসছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু প্রতিরোধের জন্য শরীরের ভিতরেও ব্যবস্থা আছে। শরীরের ভিতর নিরন্তর যুদ্ধ চলছেই। হামলাকারী জীবাণু দেখতে খুবই ছোট। দেহরক্ষীরা নীরবে এই শত্রুদের ধ্বংস করে চলেছে। এই দেহরক্ষীরা শরীরে গড়ে তুলেছে অনাক্রম্যতা।

রক্তে (দ্র) আছে শ্বেত কণিকা (দ্র)। শরীরের বাইরের রক্ষাব্যূহ ভেদ করে রোগজীবাণু যখন রক্তে প্রবেশ করে তখন শ্বেত কণিকারা ছুটে আসে, এদের ঘিরে ফেলে এবং ধ্বংস করে। শ্বেত কণিকার জন্ম অস্থিমজ্জায়। এরা হল গ্রাসক কোষ এবং লসিকাকোষ। লসিকাকোষ দু'রকমের— 'টি'-কোষ ও 'বি'-কোষ। এদের কাজ হল অপরিচিত, আগন্তুক শত্রুদের চিহ্নিত করা ও ধ্বংস করা। গ্রাসক কোষের কাজ হল রোগজীবাণু, ধূলি, ময়লা সব কিছু গিলে ফেলা। অপরিচিত শত্রুদের শরীরে যে চিহ্ন আছে তার নাম 'এন্টিজেন'। টি-কোষ এই এন্টিজেনকে চিনতে পারে এবং চিনে নিয়ে এদের ধ্বংস করে ফেলে। যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হলে টি-কোষ আরো গ্রাসক কোষকে আহ্বান করে। এরা এর পর ছুটে যায় প্লীহা ও লসিকাগ্রন্থিতে। আমাদের দেহের শেষ রক্ষাব্যূহ বি-কোষের কাছে যুদ্ধের সংকেত পৌঁছায়। বি-কোষ তৈরি করে এন্টিজেনের বিরুদ্ধে এন্টিবডি। এন্টিবডি এন্টিজেনের গায়ে সাপ্‌টে যায় এবং শত্রুকে ধ্বংস করে। যুদ্ধ জয়ের পর সন্ধি হয়। আরো এক দল টি-কোষ এসে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে, আমরাও রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাই। এমনি করে তৈরি প্রতিরোধব্যবস্থা তথা অনাক্রম্যতা কখনো তাৎক্ষণিক কখনো স্থায়ী হয়ে থাকে। যেমন— হাম (দ্র) বা জলবসন্ত (দ্র) রোগে স্থায়ী অনাক্রম্যতা তৈরি হয়।

আমাদের দেহরক্ষী সেনাদের দিয়ে সব সময় রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। তাই কৃত্রিমভাবে শরীরে অনাক্রম্যতা তৈরি করা হয়ে থাকে। এ জন্য আমরা 'টিকা' (দ্র) নিই। টিকাতে থাকে নির্দিষ্ট ধরনের জীবাণু বা ভাইরাস (দ্র)। তবে সে ভাইরাস মৃত অথবা দুর্বল হয়ে থাকে, যাতে এটি আমাদের শরীরে রোগ তৈরি করতে না পারে। টিকা দিয়ে আমাদের শরীরে তৈরি করা হয় এন্টিবডি বা প্রতিরক্ষা-শক্তি। এরাই আমাদের রোগ প্রতিরোধ করে। এ পর্যন্ত আমরা কয়েকটি সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে টিকা পেয়েছি। যেমন—ডিপথেরিয়া (দ্র), হুপিং কফ (দ্র), টিটেনাস (দ্র), পোলিও (দ্র), যক্ষ্মা (দ্র), হেপাটাইটিস-বি (দ্র), মাম্প্‌স্ (দ্র), জলাতঙ্ক (দ্র), বসন্ত (দ্র) ইত্যাদি।

শু. চৌ.

অনাগারিক ধর্মপাল [১৮৬৪—১৯৩৩]

১৮৬৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কায় (দ্র) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালের ২৯শে এপ্রিল বারানসীর সারনাথে দেহত্যাগ করেন। তিনি শ্রীলঙ্কার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী ও ধর্মীয় নেতা। একাধারে সমাজ-সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, লেখক ও বাগ্মী। তিনি শ্রীলঙ্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর সন্তান ও বৌদ্ধধর্মের (দ্র) সেবার জন্য সরকারি চাকরি ছেড়ে দেন। ১৮৯১ সালে বুদ্ধগয়ায় গিয়ে তিনি সেখানে বৌদ্ধদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মহাবোধি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে মহাধর্মসভায় যোগদান করেন। সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা হিসাবে প্রভূত সুনাম অর্জন করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র), ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, থাইল্যাণ্ড (দ্র), ব্রহ্মদেশ (মায়ান্‌মার) (দ্র), চীন (দ্র), জাপান

(দ্র) এবং আরো অনেক দেশ পরিভ্রমণ করেন। তাঁর চেষ্টায় গয়া, বুদ্ধগয়া ও সারনাথে পান্থশালা নির্মিত হয় তীর্থযাত্রীদের জন্য। তিনি সারনাথে একটি শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা (দ্র) ও সারনাথে বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর চেষ্টায় লণ্ডনে বৌদ্ধ মিশন স্থাপিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের (দ্র) সময় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তিনি জেলে অন্তরীণ হন। ভারতবাসীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং শিক্ষা ও শিল্প বিষয়ক জাগরণের জন্য তিনি অবিরাম সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর প্রাপ্য পৈতৃক সম্পত্তি দিয়ে তিনি 'অনাগারিক ধর্মপাল ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩১ সালে তিনি সারনাথে বৌদ্ধ ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি বলেছিলেন যে ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও বিকাশের জন্য তাঁকে আরো পঁচিশ বার সেই দেশে জন্মগ্রহণ করতে হবে।

বি. ব.

অনাত্মবাদ

একটি দার্শনিক মতবাদ। একে নৈরাত্মবাদও বলা হয়। চার্বাক (দ্র) ও বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এই মতের সমর্থক। তবে দুই ধর্মের মতবাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য বিরাজমান। এঁরা আত্মাকে স্বীকার করেন না। কিন্তু আত্মা যাঁরা স্বীকার করে থাকেন তাঁদের মতে আত্মা অবিনশ্বর।

চার্বাকের মতে, প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য কিছুই বিশ্বাস করা যায় না; অনুমানকে প্রমাণ বলে মানা যায় না; প্রত্যক্ষ জ্ঞান যেহেতু একমাত্র প্রমাণ, সেহেতু আত্মার অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ আত্মা মানেন না। আত্মার স্থায়িত্ব বা অবিনশ্বরতা কোনোটিই মানেন না। তাঁদের মতে, নিত্য, ধ্রুব কিছুই বর্তমান থাকে না আর সংঘাতের প্রতিটি উপাদান ক্ষণিক বা ক্ষণস্থায়ী। কোনো ক্ষণিক উপাদান থেকে চিরস্থায়ী কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। উৎপত্তির অব্যবহিত পরক্ষণেই প্রতিটি উপাদান অপর একটি উপাদান উৎপন্ন করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আত্মা এরূপ ক্ষণিক উপাদানসমূহের ধারামাত্র। বৌদ্ধ দর্শন এজন্য অনাত্ম দর্শন। ডেভিড হিউমের (দ্র) মতবাদ বৌদ্ধমতের সঙ্গে তুলনীয়।

বি. ব.

অনুপাত

দু'টি পরিমাণের একটি অপরটির তুলনায় কত গুণ বা একটি অপরটির কত অংশ তা দেখিয়ে ঐ দু'টি পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করে অনুপাত। যেমন, ৮ লিটার দুধ দুই লিটারের তুলনায় চার গুণ (২×৪=৮) বেশি, আবার দুই লিটার আট লিটারের চার ভাগের এক ভাগ (৮÷৪=২)। এখানে ৮ লিটার ও ২ লিটারের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। অনুপাত দিয়ে আসলে দুটি সংখ্যা বা রাশির পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। রাশি দু'টিকে একই রকম বা একই একক দ্বারা প্রকাশিত হতে হবে। যেমন, উপর্যুক্ত উদাহরণটিতে লিটারের সঙ্গে লিটারের তুলনা করা হয়েছে। তেমনি মাইলের (বা মিটারের) সঙ্গে মাইলের (বা মিটারের) তুলনা হয়; মাইলের সঙ্গে মিটারের নয়। অন্য কথায়, অনুপাতকে দু'টি একই জাতীয় বা একই এককে প্রকাশিত সংখ্যার ভগ্নাংশও (quotient) বলা যায়। ভগ্নাংশের সব নিয়মই অনুপাতের বেলায় খাটে।

অনুপাত প্রকৃত ও অপ্রকৃত উভয় প্রকার ভগ্নাংশই হতে পারে। অনুপাত প্রকাশের চিহ্ন 'ঃ'। দু'টি রাশির অনুপাত বের করতে হলে ১ম রাশিকে ২য় রাশি দিয়ে ভাগ করতে হয়। এক্ষেত্রে ১ম রাশিকে পূর্ব-রাশি ও ২য় রাশিকে উত্তর-রাশি বলে। কাজেই, ৫ ও ৭-এর অনুপাত হবে $\frac{৫}{৭}$। একে অনুপাতের চিহ্ন ব্যবহার করে ৫ ঃ ৭ আকারে লেখা যায়। এখানে ৫ পূর্ব-রাশি এবং ৭ উত্তর-রাশি। কোনো অনুপাতের মান ১-এর কম হলে তাকে লঘু অনুপাত, ১-এর বেশি হলে তাকে গুরু অনুপাত এবং ১ হলে তাকে একানুপাত বলে। চারটি রাশি নিয়ে হয় সমানুপাত। এক্ষেত্রে ১ম ও ২য় রাশির অনুপাত ৩য় ও ৪র্থ রাশির অনুপাতের সমান হয়। অর্থাৎ, দু'টি অনুপাত সমান হলে তাদের সমানুপাত বলে। যেমন, ৫ ঃ ১৫ = ৬ ঃ ১৮ ($\frac{৫}{১৫} = \frac{৬}{১৮}$ বা $\frac{১}{৩} = \frac{১}{৩}$) একটি সমানুপাত। সমানুপাতের বেলায় চারটি রাশি এক রকম হওয়ার দরকার পড়ে না। প্রতিটি অনুপাতের রাশি দুটি এক জাতীয় হলেই চলে। ব্যবসায়ীগণ তাদের মূলধন বা আসল টাকার অনুপাতে লাভ-ক্ষতি হিসাব করে থাকে।

হো. আ.

অনুবাদ

শব্দটির মূলগত অর্থ ভাষান্তর। এক ভাষা থেকে দ্বিতীয় একটি ভাষায় কোনো গ্রন্থ, পুস্তিকা, নিবন্ধ, সংবাদভাষ্য বা প্রচারপত্র ভাষান্তর করার কাজকেই অনুবাদ বলে।

অনুবাদকর্ম আজ বিশ্বের দেশে দেশে পৃথক ও বিশেষ অনুশীলনের বিষয় হিসাবে স্বীকৃত। একে বলা হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার মর্মবাণী দেশ থেকে দেশে স্থানান্তরের অন্যতম প্রধান বাহন বা বাহক-শক্তি।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের অভিমত, এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় যথার্থ অনুবাদ সত্যিকার অর্থেই এক দুরূহ কাজ। কেননা প্রত্যেকটি দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি তার আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তাই ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐসব বৈশিষ্ট্যের অনুবাদ সহজে সম্ভব নয়। কিন্তু আরেক দল পণ্ডিতের বক্তব্য : সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ভিন্নতা সত্ত্বেও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যেহেতু বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের রূপ একই, সেহেতু অনুবাদ বা ভাষান্তরের ভেতর দিয়ে সে-সবের রূপায়ণ অসম্ভব নয়। তাই রুশ ভাষায় (দ্র) রবীন্দ্রনাথের (দ্র) রচনাকর্মের অনুবাদ পাঠে রুশ ভাষাভাষী জনগণ যেমন রসভোগ করে থাকেন, তেমনি একইভাবে রসভোগ করে থাকেন বাংলা ভাষাভাষী পাঠকবৃন্দ বাংলা ভাষায় লিয়েফ্ তল্স্তোয় (দ্র) বা আন্তোন্ চেখফের (দ্র) রচনাকর্মের অনুবাদ পাঠে।

সাধারণত দু'টি উপায়ে সাধিত হয়ে থাকে অনুবাদকর্ম—মৌখিকভাবে ও লিখিতভাবে। মৌখিকভাবে এ কাজ যিনি সম্পাদন করেন, তাঁকে বলা হয় দোভাষী এবং লিখিতভাবে যিনি করেন, তাঁকে বলা হয় অনুবাদক। দোভাষীর কাজ হচ্ছে দু'জন ভিন্ন ভাষাভাষী ব্যক্তির মধ্যে কথা বলায় সাহায্য করা, এবং অনুবাদকের দায়িত্ব হচ্ছে ভিন্ন একটি ভাষার রচনা দ্বিতীয় কোনো ভাষায় রূপান্তরিত করা।

সাহিত্য অনুবাদের কাজে যিনি নিরত, তাঁর যেমন এক বা একাধিক ভাষার ওপর দখল থাকতে হয়, তেমনি মাতৃভাষাতেও তাঁর একই রকম অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। পাশাপাশি ব্যাকরণের (বিদেশী যে ভাষার ওপর তাঁর অধিক দখল সেই ভাষাসহ মাতৃভাষার) ওপরও তাঁর দখল থাকা চাই অনুপুঙ্খ। এ ছাড়া যে বিশেষ বিদেশী ভাষা থেকে মাতৃভাষা অথবা দ্বিতীয় কোনো ভাষায় রূপান্তর বা অনুবাদের কাজে তিনি নিরত, সেই ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে থাকতে হবে তাঁর পুরোপুরি জ্ঞান।

অনুবাদকর্ম বা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় ভাষান্তরের কাজ একটি প্রাচীন রীতি। এবং এর উদ্ভব বা প্রচলন মানবজাতির পারস্পরিক জ্ঞানপিপাসা মেটানোর স্বার্থেই। ১১৩০ সালে স্পেনের তোলেদো-র আর্চবিশপ রেমন্দ্ এই লক্ষ্য সাধনে প্রতিষ্ঠা করেন 'তোলেদোর অনুবাদ-বিদ্যালয়'। অনুবাদকর্মের আনুষ্ঠানিক ও সংগঠিত প্রচলন-প্রথার সম্ভবত এটিই প্রথম দৃষ্টান্ত। এই বিদ্যালয় থেকে আর্চডিকন দোমিনিকো গান্দিসাল্ভির পর্যবেক্ষণাধীনে ইহুদি ইওহানেস বেন দাভিদের সহায়তায় বিশ বছর সময়সীমার ভেতরে যাবতীয় প্রাচীন আরব দর্শন লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়। এক শতাব্দীরও অধিক কাল ধরে তোলেদোয় আরবিতে অনূদিত গ্রিক গ্রন্থাবলি ছাড়াও আরবি চিকিৎসা ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থসমূহের অনুবাদ অব্যাহত থাকে। গান্দিসাল্ভি স্বয়ং তিনটি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। দীর্ঘ ৫০ বছর কাল ধরে এখানে অবস্থান করে ক্রেমোনার জেরার্ড একাই ৭৬টি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। স্যাব্বিওলেটার জেরার্ড, নব্য-মুসলিম ইহুদি এভেণ্ডিথ (ইওহানেস হিস্পালেসস্), সেভিইয়ে-র জন্, তোলেদোর মার্কাস্ ও জার্মানির হার্মান প্রমুখ এই বিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অনুবাদকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মূলত এঁদের অনূদিত উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের মাধ্যমেই পাশ্চাত্য জগতে আরবের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গ্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র গড়ে ওঠে এবং এর কিছুকাল পরেই ইতালিতে রেনেসাঁসের (দ্র) অভ্যুদয় ঘটে। বর্তমানে অনেক মূল আরবি গ্রন্থ বিলীন হয়ে গেলেও তোলেদোর অনুবাদ-বিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনূদিত লাতিন ভাষার মাধ্যমে ঐসব গ্রন্থ তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। আরব জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলি সংরক্ষণে তাই এই বিদ্যালয়ের অবদান অপরিসীম। এই রকম আরো দুটি বিখ্যাত অনুবাদ-বিদ্যালয় ছিল ইতালির সালের্নো এবং পালের্মো-য়।

বহুবিধ কারণে অনুবাদকর্ম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যুগে যুগে এক দেশের দর্শন বা সাহিত্যের মহৎ সব অনূদিত গ্রন্থ

ভিন্নভাষী দেশের সমাজজীবনে এনেছে সংস্কার বা পরিবর্তনের অভিন্নমুখী আন্দোলনের ঢেউ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে ঘটিয়েছে নতুন চিন্তার সূত্রপাত, সাহিত্য-শিল্পকলার ক্ষেত্রে এনেছে নতুন রীতি-বৈশিষ্ট্য বা শৈলী-সৌকর্য। অনুবাদকর্মের গুরুত্ব তাই কোনো কালে ফুরোবার নয়।

আ. হ.

অনুশীলন সমিতি

ব্রিটিশ ভারতে বাংলার একটি বিপ্লববাদী গুপ্ত সংগঠন। ১৯০১-১৯০২ সালে কলিকাতায় (দ্র) এটি গঠিত হয়। এর প্রধান সংগঠক ও নেতা ছিলেন ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫৩-১৯১১)। 'অনুশীলন' নামটি গ্রহণ করা হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (দ্র) 'অনুশীলন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ থেকে।

অনতিকালের মধ্যে সারা বাংলায় এই সমিতির শাখা-সংগঠন গড়ে ওঠে। প্রথম দিকে অরবিন্দ ঘোষ (দ্র) ও সতীশচন্দ্র বসু ছিলেন এর অন্যতম মন্ত্রণাদাতা। সংগঠনটির অন্যান্য প্রথম সারির নেতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ (দ্র), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র মল্লিক, সরলা দেবী চৌধুরানী, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

অনুশীলন সমিতির সদস্যদের কার্যক্রম প্রথম দিকে শরীরচর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও অল্পকালের মধ্যে তাদেরকে একটি সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলায় গড়ে তোলা হয়। বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণও দেওয়া হয় এর সভ্যদের। পরে এদেরকে নিয়েই গড়ে তোলা হয় 'জাতীয় স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনী'।

কলিকাতার পরেই অনুশীলন সমিতির সবচেয়ে শক্তিশালী শাখা ছিল ঢাকায়। এখানকার প্রধান সংগঠক ছিলেন পুলিনবিহারী দাস ও আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী। ঢাকার তৎকালীন 'ন্যাশনাল স্কুল' ছিল এই সমিতির প্রধান আখড়া (দ্র)।

এ দলের সদস্যরা ভারতে অবস্থানকারী ইংরেজ রাজকর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর বহু দুঃসাহসিক আক্রমণ চালান। বোমা, পিস্তল ও অন্যবিধ অস্ত্রের সাহায্যে পরিচালিত

সম্মুখে বামদিক থেকে অনুশীলন সমিতির সভাপতি প্রমথনাথ মিত্র, অন্যতম প্রধান সংগঠক পুলিন বিহারী দাস
পেছনে—সম্পাদক সতীশচন্দ্র বসু ও মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী

তাঁদের উপর্যুপরি হামলায় বহু অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজকর্মকর্তা-কর্মচারী হতাহত হয়। এই সব অভিযান চালাতে গিয়ে সমিতির বহু সদস্য ধরাও পড়েন। বিচারে কারো জেল হয় বিভিন্ন মেয়াদে। কাউকে প্রাণ দিতে হয় ফাঁসিকাঠে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ (দ্র) প্রতিরোধের আন্দোলন শুরু হলে এই সমিতির কার্যক্রম তীব্র রূপ ধারণ করে এবং ১৯০৮ সালের মধ্যে এটি অবিভক্ত বাংলার বৃহত্তম সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে পরিণত হয়। তবে ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকের সন্ধিক্ষণে এসে এই সমিতির বহু নেতা ও কর্মী সন্ত্রাসবাদের আদর্শ ত্যাগ করে মার্ক্সবাদে (দ্র) দীক্ষিত হন।

আ. হ.

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি (endocrine glands)

দেহের যেসব কোষ (দ্র) বা যন্ত্র কোনো উপাদান নিঃসৃত করে তাকেই বলে গ্রন্থি। কোনো কোনো গ্রন্থি বহিঃস্রাবী, এদের নালী আছে, নিঃসৃত রস নালীপথে বেরিয়ে আসে। আবার কোনো কোনো গ্রন্থি অন্তঃস্রাবী, এরা নালীহীন,

এদের রস নিঃসৃত হয় সরাসরি রক্তে (দ্র)। অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি দেহের নানা কাজকর্মের রাসায়নিক নিয়ন্ত্রক। এই সব গ্রন্থি থেকে যে রস রক্তস্রোতে নিঃসৃত হয়ে শরীরে পৌঁছায় তাকে বলা হয় 'হরমোন' (দ্র)।

দেহের ভেতর চলমান কাজকর্মের নিয়ন্ত্রক হল অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি, যেমন—দেহের বৃদ্ধি, যৌন পরিপক্বতা, বংশবিস্তার ইত্যাদি। দেহে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি মূলত ৮টি—পিটুইটারি, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অ্যাড্রেনাল, অগ্ন্যাশয়ের (দ্র) ল্যাঙ্গারহান্স কোষপুঞ্জ (islets of Langerhans) এবং স্ত্রী ও পুরুষ জননগ্রন্থি।

খুলির ভেতর মস্তিষ্কের নিচে একটি বড় মটরের আকৃতির 'পিটুইটারি' হল অন্যান্য অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিগুলোর পরিচালক। এই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় ৮টি হরমোন। দেহের বৃদ্ধি, স্তনের দুগ্ধক্ষরণ, দেহে পানির ভারসাম্য রক্ষা করা—এমনি অনেক কাজের কাজী এই গ্রন্থিটি। প্রতিটি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এই ছোট্ট পিটুইটারি গ্রন্থি। প্রত্যেকের জন্য রয়েছে আলাদা পরিচালক তথা নিয়ন্ত্রক হরমোন।

গলদেশের সামনে শ্বাসনালীকে ঘিরে রয়েছে প্রজাপতি-আকৃতি 'থাইরয়েড'। এই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন 'থাইরোক্সিন' দেহের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। শরীরের বৃদ্ধি, ওজন, বুদ্ধির বিকাশ—এমনি বহু কাজের জন্য প্রয়োজন এই হরমোন। থাইরোক্সিন তৈরিতে লাগে আয়োডিন (দ্র)। আয়োডিনের অভাব হলে গলগণ্ড (দ্র) রোগ হয়, মানুষ খর্বকায় ও নির্বুদ্ধি হয়ে যায়।

থাইরয়েডের দুই পাশে ডুবে আছে গম-শস্যের আকৃতির দুই জোড়া 'প্যারাথাইরয়েড'। এর হরমোন 'প্যারাথ্‌হরমোন' অস্থি ও রক্তের মধ্যে ক্যালসিয়ামের (দ্র) বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে।

দু'টি কিডনির (দ্র) উপর অবস্থিত হলুদ-বাদামি রঙের মুকুটের আকৃতিবিশিষ্ট দু'টি অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি। এর হরমোন অ্যাড্রেনালিন শরীরকে আপদ-বিপদ, চাপ মোকাবেলায় সাহায্য করে। এ ছাড়া এই গ্রন্থি থেকে আসে স্টেরোয়েড হরমোন। এই হরমোন দেহের পানি ও লবণের সমতা রক্ষা করে, খাদ্যের বিপাকে সাহায্য করে, রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে দেহে প্রতিরোধব্যবস্থায় সহায়তা করে।

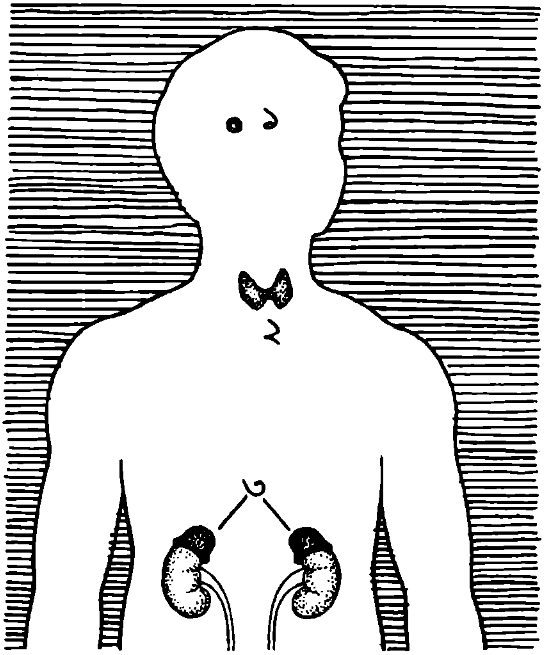

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি
১. পিটুইটারি ২. থাইরয়েড ৩. অ্যাড্রেনাল

পাকস্থলীর নিচে ও পেছনে রয়েছে অগ্ন্যাশয়। এতে আছে বিশেষ ধরনের কোষপুঞ্জ, নাম ল্যাঙ্গারহান্স কোষপুঞ্জ। এ থেকে নিঃসৃত হয় হরমোন ইন্‌সুলিন (দ্র) ও গ্লুকাগন। এরা দেহের শর্করামান বজায় রাখে। ইন্‌সুলিনের অভাব হলে ডায়াবেটিস (দ্র) বা মধুমেহ দেখা দেয়। নারীর তলপেটের দু'দিকে আছে স্ত্রী জননগ্রন্থি দু'টি ডিম্বাশয়। এর হরমোন ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরোন নারীর যৌনচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। পুরুষের জননগ্রন্থি শুক্রাশয়দ্বয়-এর হরমোন টেস্টোস্টেরোন পুরুষের যৌনচক্র নিয়ন্ত্রণ করে, দেহের প্রোটিন তৈরিতে সাহায্য করে।

শু. চৌ.

অন্তরা

গানের বা গতের অংশবিশেষের নাম। ধ্রুপদীয় ধারায় গানে বা গতে চারটি অংশ বা তুক্ বা ধাতু থাকে। অধ্রুপদীয় গানে বা গতে তুক্ থাকে দু'টি। ধ্রুপদী রচনায় 'অন্তরা' দ্বিতীয়

তুক্। বাকি তিনটি তুক্ হচ্ছে স্থায়ী, সঞ্চারী ও আভোগ। অধ্রুপদী রচনায় 'অন্তরা' দ্বিতীয় বা সর্বশেষ তুক্। অপর তুক্টি হচ্ছে স্থায়ী। তুক্কে স্তবকও বলা যায়।

ক. গো.

অন্তর্জলি যাত্রা গঙ্গাযাত্রা দ্র

অন্ত্র পরিপাকতন্ত্র দ্র

অন্ধত্ব চক্ষুরোগ দ্র

অন্ধশিক্ষা

দৃষ্টিহীন লোককে শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ পদ্ধতি আছে। নানা দেশের বহু খ্যাতিমান শিক্ষাবিদের প্রচেষ্টায় এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রথমে স্পেনদেশের ফ্রান্সিস্কো লুকাস কাঠের ওপর খোদিত অক্ষরের সাহায্যে অন্ধশিক্ষার প্রয়াস পান। এর পর শক্ত কাগজ কেটে অক্ষর তৈরির প্রচেষ্টাও চলে। কিন্তু সেসব চেষ্টা সফল হয় নি।

লুই ব্রেই (Louis Braille : ১৮০৯-১৮৫২) নামে এক ফরাসি গুণী অন্ধশিক্ষার একটি বাস্তবসম্মত পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এতে কাগজে ছয়টি উঁচু-উঁচু বিন্দুর সমাহারে অক্ষর (দ্র), ছেদচিহ্ন ও সংখ্যা প্রভৃতি লেখা থাকে। এর এক বা একাধিক বিন্দুর অবস্থানে বিশেষ বিশেষ রদবদল ঘটিয়ে এটিকে ৬৩ প্রকার অর্থবোধক চিহ্নে রূপান্তর করা যায়। বিশেষভাবে তৈরি ছিদ্রযুক্ত একটি ধাতব পাতের সাহায্যে পঙ্ক্তি অনুসরণ করে ধাতব লেখনীর দ্বারা নরম কাগজে এই পদ্ধতিতে লিখতে হয়। এ ছাড়া বিশেষ ধরনের টাইপরাইটার (দ্র) যন্ত্রের (দ্র) সাহায্যেও লেখা যায়। এই ব্যবস্থায় লিখিত ও মুদ্রিত পুস্তকগুলো আঙুলের স্পর্শানুভূতির ওপর নির্ভর করে পড়তে হয়।

ব্রেই-য়ের আবিষ্কৃত এই পদ্ধতিকে আমাদের দেশে 'ব্রেইল্পদ্ধতি' বলা হয়। ১৮২৯ সালে এটি প্রকাশিত হয়। বর্তমানে দেশে দেশে অন্ধদের শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তা ব্রেইলপদ্ধতিরই আদর্শ রূপ।

লুই ব্রেই নিজেও অন্ধ ছিলেন। তিন বছর বয়সে তিনি

এক দুর্ঘটনায় চোখে আঘাত পেয়ে দৃষ্টিশক্তি হারান। তিনি ভালেন্ত্যাঁ ওঈ (Valentin HaÜy) নামে অন্ধদরদী এক ব্যক্তির স্কুলে ছাত্র ছিলেন। ওঈ-কে সকলে 'অন্ধদের দেবতা' বলে ডাকত। যাই হোক, পরে তিনি প্যারিসের জাতীয় অন্ধ স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়ে পড়ার সময় রাত্রিকালীন যোগাযোগ সংক্রান্ত একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন সম্পর্কে এক সামরিক কর্মকর্তার আপত্তির কথা তিনি জানতে পেরে মাত্র ১৫ বছর বয়সেই সেই জটিল সাঙ্কেতিক চিহ্নের উৎকর্ষ সাধন করেন। আজ ব্রেইল্পদ্ধতি অন্ধদের সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে দিয়ে বহির্জগৎকে উপস্থিত করেছে। বাংলাদেশেও অন্ধশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ঢাকার (দ্র) শেরে বাংলা নগরে এই উদ্দেশ্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে অন্ধদের শিক্ষার

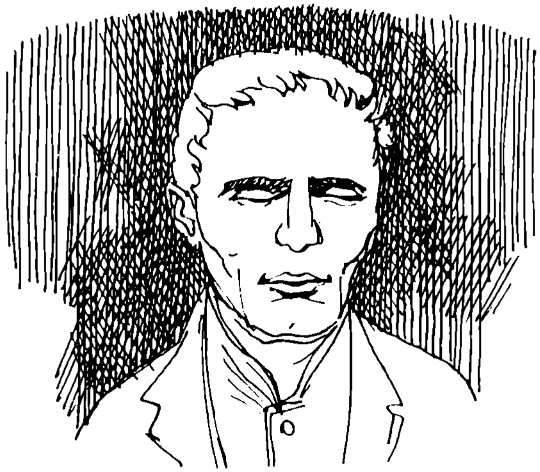

লুই ব্রেই ও নিচের ছবিতে লুই ব্রেই আবিষ্কৃত অন্ধদের শিক্ষাদান পদ্ধতি—ব্রেইল পদ্ধতি

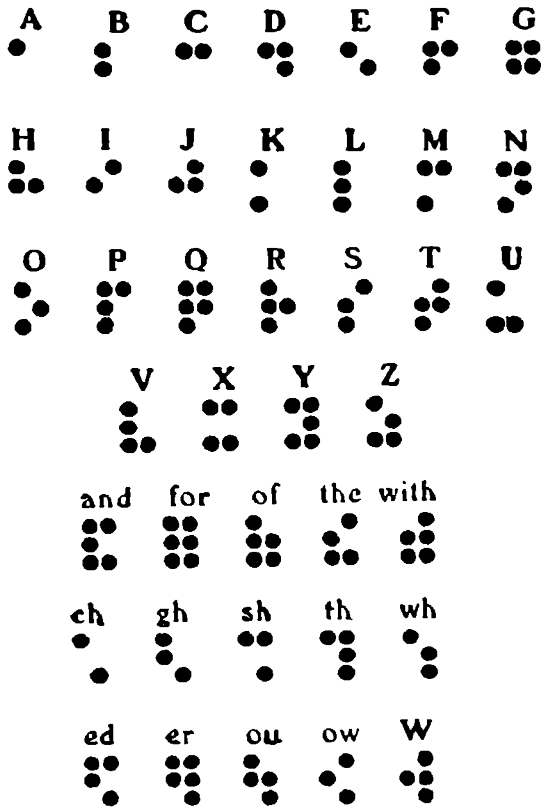

সুযোগ আছে। তবে তা অত্যন্ত সীমিত। এ সুযোগ দেশে অন্ধ মানুষজনের সংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল।

সুজ. ব.

অন্নদামঙ্গল

কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের (দ্র) শ্রেষ্ঠ কাব্য (দ্র) অন্নদামঙ্গল। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে রচিত—১. অন্নপূর্ণামঙ্গল বা অন্নদামঙ্গল, ২. কালিকামঙ্গল এবং ৩. মানসিংহ। পাণ্ডিত্য, কবিত্ব এবং ভাষাবৈদগ্ধ্যে এ কাব্য মধ্যযুগের অনবদ্য সৃষ্টি। মিশ্র ভাষারীতি এই কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের কাহিনী এরকম : দেবী অন্নদা তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য কুবেরের পুত্র নলকুবেরকে নির্বাচিত করেন। নলকুবের দেবী অন্নদার শাপে ভবানন্দ মজুমদার নামে মর্তের মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। ভবানন্দ মজুমদার সম্রাট জাহাঙ্গীরের সেনাপতি রাজা মানসিংহকে সহায়তা করায় যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। ভবানন্দকে নিয়ে মানসিংহ দিল্লি (দ্র) যান, উদ্দেশ্য– ভবানন্দকে পুরস্কৃত করা। কিন্তু ভবানন্দের মুখে দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য শুনে সম্রাট জাহাঙ্গীর ক্ষিপ্ত হন এবং ভবানন্দকে বন্দি করে রাখেন। বন্দি ভবানন্দের দুর্দশায় দুঃখিত হয়ে দেবী অন্নদা দিল্লি নগরীতে ভূত-প্রেতের উপদ্রব শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত সম্রাট জাহাঙ্গীর দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য মেনে নিয়ে ভবানন্দকে মুক্তি দেন। মুক্ত হয়ে ভবানন্দ দিল্লিতে দেবীর মন্দির তৈরি করে পূজা শুরু করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরও দেবীর পূজা করেন। এভাবেই দেবীর মহিমা প্রচার হতে থাকল।

মে. খা.

অন্নপূর্ণা –১

শক্তির দেবতার (বা দেবীর) রূপভেদ। এই দেবী রক্তবর্ণা, বিচিত্রবসনা, অন্নপ্রদানরতা, ভবদুঃখহারী। তাঁর মাথার ওপর থাকেন স্বামী শিব, এ জন্য তিনি হাসিমুখ। চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষের অষ্টমীতে এই দেবীর পূজা হয়। কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের (দ্র) 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে এই (দ্র) দেবীর

মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' এই কাব্যেই উক্ত হয়েছে। কাশীর অন্নপূর্ণার পূজা ও উৎসব প্রসিদ্ধ।

বি. ব.

অন্নপূর্ণা–২

অন্নপূর্ণা নেপালের (দ্র) একটি পর্বতের নাম। এই পর্বত হিমালয় পর্বতমালার (দ্র) অংশ। এর শিখরে সারা বছর বরফ জমা থাকে। মোরিস এর্জগ (Maurice Herzog) পরিচালিত ফরাসি পর্বত-অভিযাত্রীদল ১৯৫০ সালে এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করেন। এই পর্বতের দু'টি শৃঙ্গ। সর্বোচ্চটির উচ্চতা ২৬,৫০২ ফুট, এবং অন্যটির উচ্চতা ২৬,০৪১ ফুট। পৃথিবীর (দ্র) নানা দেশ থেকে ভ্রমণবিলাসীরা এই পর্বত দেখতে যান।

বি. ব.

অন্নপ্রাশন

শিশুর (দ্র) প্রথম অন্নগ্রহণের উৎসব। এই উৎসব বা অনুষ্ঠান হয় ছেলে-শিশুর জন্য ছয় বা আট মাসে, কন্যা-সন্তানের জন্য সাত বা নয় মাসে। শিশুর দাঁত ওঠার আগে এই উৎসব করতে হয়। পৃথিবীর সব দেশে শিশুর জন্য এই অনুষ্ঠান বা উৎসব কোনো-না-কোনোভাবে হয়ে থাকে। প্রাচীন সমাজের মানুষের মধ্যেও এই উৎসবের প্রচলন আছে। শিশুর জন্য পালনীয় দশকর্মের (দ্র) মধ্যে এই আচার-অনুষ্ঠান অন্যতম। তবে অনেকে আজকাল এই উৎসব করেন না।

বি. ব.

অপটিক্যাল ফাইবার (optical fibre)

অপটিক্যাল ফাইবার বা আলোকতন্তু যোগাযোগব্যবস্থায় এক নতুন ধরনের তার। বিদ্যুৎ (দ্র) চলাচলের জন্য ব্যবহার করা হয় তামার তার। অর্থাৎ তামার (দ্র) তার দিয়ে বিদ্যুৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। টেলিফোন (দ্র), কেব্‌ল্‌-টেলিভিশন (দ্র), কম্পিউটার (দ্র) ইত্যাদি প্রায় সব রকম যোগাযোগে তামার তার ব্যবহার করা হয়। এই তার

অন্নপূর্ণার দু'টি শৃঙ্গ-নেপাল

বিদ্যুৎরূপে তথ্য বা সংবাদকে বহন করে। আলোকেও (দ্র) বিদ্যুতের মতো তার দিয়ে প্রবাহিত করানো যায়। তবে এই তার কাচের (দ্র) তৈরি, ধাতুর (দ্র) তৈরি নয়। আলো চলাচলের জন্য যে কাচের তার ব্যবহার করা হয় তা চুলের মতো খুব সরু। এর নামই অপটিক্যাল ফাইবার। বাংলায় একে আলোকতন্তু বলা যায়। এই তারে তথ্য বহনের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার না করে আলো ব্যবহার করা হয়। ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী জন টিণ্ডেল্‌ ১৮৭০ সালে ফাইবার অপটিকসের (fibre optics) ধারণা উপস্থাপন করেন। পরবর্তী কালে ১৯৫৫ সালে ড. নরেন্দর কাপানি লণ্ডনের ইম্পেরিয়েল কলেজে কাচের অতি ক্ষুদ্র তন্তুর ডিজাইন করেন, যা অপটিক্যাল ফাইবার বা আলোকতন্তু নামে পরিচিত। এটি খুবই নমনীয়—ইচ্ছামতো বাঁকানো বা দোমড়ানো যায়। ফলে কোনো বাঁক পেরিয়ে কোনো কিছু দেখতে হলে এর ব্যবহার অপরিহার্য। এই ধর্মের কারণে কোনো ব্যক্তির শরীরের ভেতরের ছবি তুলতে গ্যাসট্রোস্কোপ যন্ত্রে এই তন্তু ব্যবহৃত হয়। কোনো ছবিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতেও এই তন্তু ব্যবহার করা হয়। অপটিক্যাল ফাইবার এতই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার যে ৩৫ কিলোমিটার পুরু শীট সাধারণ জানালার কাচের মতোই স্বচ্ছ দেখায়। চলাচলের সময় আলো তন্তু থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না, কারণ এতে একটি বহিরাবরণ দেওয়া থাকে। আলো এই

অপরাজেয় বাংলা—ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ

তন্তুর ভেতর দিয়ে এদিক-সেদিক লাফিয়ে চলে বা প্রতিফলিত হয়ে অগ্রসর হয়। অতি আধুনিক ও অতি দামী অপটিক্যাল ফাইবারে আলো সরলরেখায় গমন করে। লেজার রশ্মি (দ্র) ব্যবহারের সময় এ ধরনের তন্তু ব্যবহার করা হয়। টেলিফোন যোগাযোগে এই তন্তুর ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে ক্যালিফোর্নিয়ার জেনারেল টেলিফোন কোম্পানি টেলিফোন যোগাযোগে প্রথম অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে।

এরপর জাপানের (দ্র) ওসাকায় এবং কানাডার এলি (Elie) শহরে টেলিফোন যোগাযোগে এই তন্তু ব্যবহৃত হয়। অপটিক্যাল ফাইবার তামা বা ধাতব তারের তুলনায় অনেক বেশি তথ্য বহন করতে পারে। ভিডিও, ফ্যাক্স, কম্পিউটার, ভিডিওফোন ইত্যাদি যোগাযোগে অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যাপক ব্যবহার হতে পারে।

শা. ত.

অপরাজেয় বাংলা

স্বাধীনতার প্রতীক ভাস্কর্য। বাংলাদেশের (দ্র) ছাত্রসমাজ বাহান্নর ভাষা-আন্দোলন (দ্র), চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট (দ্র) গঠন, আইয়ুব খানের (দ্র) সামরিক শাসনবিরোধী ও পরবর্তী আন্দোলন, ৬ দফা, ১১ দফা, গণঅভ্যুত্থান '৬৯-এর (দ্র) আন্দোলন এবং একাত্তরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ (দ্র)-সব ক'টি আন্দোলনে সফল ভূমিকা পালন করে। এই ভূমিকাকে স্থায়ী করে রাখার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে নির্মাণ করা হয়েছে এই ভাস্কর্য—নাম, অপরাজেয় বাংলা। এটি নির্মাণ করেন মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ।

১৯৭৩ সালে ভাস্কর্যটি তৈরি করা শুরু হয়, শেষ হয় ১৯৭৯ সালে। ৬ ফুট উঁচু বেদির ওপর নির্মিত মূল ভাস্কর্যের উচ্চতা ১২ ফুট, প্রস্থ ৮ ফুট ও ব্যাস ৬ ফুট।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত তিন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। দুই তরুণের হাতে রাইফেল—ভঙ্গিমায় যুদ্ধজয়ের অকুতোভয় দৃঢ়তা, সঙ্গে তরুণী—ঔষধের ব্যাগ কাঁধে সেবা ও সহযোগিতার মানসে সহযোদ্ধা।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সৃষ্টিশীল বোধকে সম্বল করে এই সফল শিল্পকর্মটি দাঁড় করানো হয়েছে। সীমিত উপকরণে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে ও বিষয়বস্তুর কারণে অপরাজেয় বাংলা বাংলাদেশের ভাস্কর্যশিল্পে এক নতুন ও সাহসী মাত্রা এনে দিয়েছে।

হা. খা.

অপরাধ ও শাস্তি

দস্তইয়েফস্কির (দ্র) উপন্যাস (দ্র) 'প্রিস্তুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে'। ইংরেজি অনুবাদে এর নাম Crime and Punishment। ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছে।

এই বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসটি ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলে খ্যাত 'অপরাধ ও শাস্তি'র বিষয়বস্তু একটি হত্যা এবং হত্যাকারীর মানসিক যন্ত্রণা ও শেষ পর্যন্ত পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ। উপন্যাসটি নাট্যরূপে ও চলচ্চিত্র হিসাবেও বিশ্বজোড়া খ্যাতি পেয়েছে।

হা. মা.

অপালা

ব্রহ্মের ভক্তা। পিতার নাম অত্রি। অপালার পিতার মাথায় টাক ছিল আর অপালার শরীরের সমস্ত লোম খসে যায়। এ জন্য স্বামী তাঁকে ত্যাগ করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট অপালার প্রার্থনা ছিল—'আমাদের পিতার উষর ক্ষেত্র, আমার শরীর ও আমার পিতার মাথা এই সকলকে তুমি লোমযুক্ত কর। ইন্দ্র বহু বার আমাদিগকে সামর্থ্য দান করুন, আমাদের বহু ধন দান করুন ....।'

ইন্দ্র অপালার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দান করেন। ফলে অপালা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা হয়েছিলেন, এবং তাঁর অন্যান্য প্রার্থনাও পূরণ হয়েছিল। অপালা ঋগ্বেদের (দ্র) একটি সূক্তের বা মন্ত্রের ঋষি।

বি. ব.

অপেরা

গীতিনাট্য। সঙ্গীত ও নাট্যকলার মিলনে অপেরা গঠিত। ষোড়শ শতকে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে অপেরা রচনার সূত্রপাত ঘটে। ফ্লোরেন্সের জনৈক কাউন্ট জোভান্নি বার্দি (Giovanni Bardi : ১৫৩৪-১৬১২) প্রাচীন গ্রিক নাটককে পুনরায় জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে সেখানকার সঙ্গীতসংঘ 'কামেরেতা'র সদস্যদের তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ জানান। গ্রিক নাটকের সঙ্গে সঙ্গীত মিলিয়ে সকলে এমন একটা কিছু সৃষ্টি করেন যা সম্পূর্ণ নতুন এক বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এ থেকেই অপেরার সূচনা। কামেরেতার সদস্য, বিশিষ্ট সঙ্গীতরচয়িতা ওত্তাভিও রিনুচিনি (Ottavio Rinuccini : ১৫৬৭-১৬২১) ১৫৯৭ সালে আদি অপেরা 'দাফ্নে' রচনা করেন। এর পর রিনুচিনির কাব্য 'ইউরিদিস'-এ সুরারোপ করে পেরি (Jacopo Peri) যে দ্বিতীয় অপেরা (১৬০০) রচনা করেন সেটিকেই প্রথম সফল অপেরা বলা হয়। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য অপেরা রচনা করেন ক্লোদিও মোন্তেভের্দি (Claudio Monteverdi : ১৫৬৭-১৬৪৩)। তাঁর সেই অপেরা 'ওর্ফে'(Orfe) অর্থাৎ অর্ফিউস ১৬০৭ সালে মঞ্চস্থ হয়। ভেনিস শহরে প্রথম অপেরা হাউজ (১৬৩৭) স্থাপিত হয়। অল্প দিনের মধ্যেই সেখানে আরো অপেরা হাউজ গড়ে ওঠে। ফলে অপেরা রচনায় ও মঞ্চায়নে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি হয়। সে সময় অপেরাকে দু'টি প্রধান অংশে ভাগ করা হত—রেসিটেটিভ ও আরিয়া। রেসিটেটিভ বর্ণনাত্মক অংশ, এর ভেতর দিয়ে অপেরায় কাহিনী বর্ণিত হত। আরিয়া অংশে থাকত গান। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে স্কার্লাত্তি (Alessandro Scarlatti : ১৬৬০-১৭২৫) নেপল্স্ শহরে অপেরা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও অপেরা আন্দোলনকে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন। গ্লুক্ (Christoph Gluck : ১৭১৭-১৭৮৭)-এর মাধ্যমে জার্মানিতে অপেরার প্রতিষ্ঠা ঘটে। ইতালি থেকে ফ্রান্সেও অপেরার বিস্তার ঘটে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগেই। রাশিয়ায়ও উল্লেখযোগ্য অপেরা রচিত হয়। জার্মান রচয়িতা ভাগ্নের (দ্র) সর্বশ্রেষ্ঠ অপেরা রচয়িতা বলে বিবেচনা করা হয়। তিনি তাঁর অপেরা রচনাকে বলেছেন মিউজিক ড্রামা। গ্লুক, ভের্দি, রস্সিনি

(Rossini), পুচিনি (Puccini), স্ট্রাউস, গুনো (Gounod), বিজে (Bizet), ভাগ্‌নের, মোৎসার্ট (দ্র), বেলিনি (Bellini), দোনিজেত্তি (Donizetti) বিখ্যাত অপেরা রচয়িতা।

অপেরার টেক্সট্ বা পাঠকে বলা হয় লিব্রেত্তো (libretto)। যে অপেরা সম্পূর্ণটি গেয় বা যার সম্পূর্ণ লিব্রেতোই সুরারোপিত, তাকে বলা হয় গ্র্যাণ্ড অপেরা। কথ্য অংশ থাকলে তাকে বলা হয় কমিক অপেরা। মজার ব্যাপার হল, এই নাম দু'টি এসেছে 'গ্র্যাণ্ড অপেরা' ও 'অপেরা কমিক' নামক দু'টি অপেরা হাউজের নাম থেকে। কথ্য সংলাপযুক্ত ক্ষুদ্র অপেরাকে 'অপেরাত্তা'ও বলা হয়। একক, দ্বৈত ও সম্মেলক রীতিতে নানা শ্রেণীর গান, আবৃত্তি, সংলাপসহ অভিনয়, শুধুমাত্র আঙ্গিক অভিনয়, নৃত্য, দৃশ্যসজ্জা, অঙ্গসজ্জা প্রভৃতি বহু বিষয়ের আয়োজন থাকে অপেরায়। এই সব বিষয়ের সামঞ্জস্য স্থাপনের মধ্যে অপেরার শক্তি নিহিত থাকে। বাংলা গীতিনাট্যের ওপর অপেরার প্রভাব আছে।

ক. গো.

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৭১—১৯৫১]

কলিকাতার (দ্র) বিখ্যাত জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারে জন্ম। দ্বারকানাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র গুণেন্দ্রনাথ, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ (দ্র) ও মধ্যম ভ্রাতা সমরেন্দ্রনাথ। 'অবন ঠাকুর' নামেও ইনি পরিচিত।

তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে ঘরের শান্ত পরিবেশে। দাস-দাসী পরিবৃত তাঁর শৈশব ছিল কল্পনার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। স্কুলের চেয়ে গৃহশিক্ষকের কাছেই তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষা ফলপ্রসূ হয়েছে। ইংরেজি (দ্র), ফরাসি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার (দ্র) শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গীতচর্চাও করেন। কিন্তু চিত্রকলার প্রতি ছিল তাঁর সহজাত আকর্ষণ। পিতা গুণেন্দ্রনাথ এক সময় আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। শৌখিন পরিবেশ ও ঘরের দেয়ালে টাঙানো নানা পট তাঁর মনকে করেছিল আরো সৃজনশীল ও কল্পনাপ্রবণ। প্রথম শিক্ষক গিলার্ডি ছিলেন তৎকালীন আর্ট স্কুলের অন্যতম শিক্ষক। দ্বিতীয় শিক্ষক পামারও শিল্পী ছিলেন। তাঁদের কাছে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীমন

অনুপ্রেরণা পেয়ে দেশী ছবির জগতে সম্পূর্ণরূপে ঢুকে পড়ে। তাঁর অন্তর্মুখী মন বিলাতি পদ্ধতির চেয়ে নিজের আবিষ্কৃত দেশী পথের দিকে ছুটে চলে।

কলিকাতা আর্ট স্কুলের তৎকালীন অধ্যক্ষ হ্যাভেলের চেষ্টায় তিনি সহকারী অধ্যক্ষের পদে যোগ দেন ১৮৯৮ সালে। তারপর ভারতীয় শিল্প আরো ভালভাবে অনুশীলন করে জাপানি অঙ্কনরীতিও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেন। ১৯০৫ সালে তিনি শিল্পগুরুরূপে জীবন শুরু করেন। তাঁর প্রভাবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ক্রমশ একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। নানা দিক থেকে তাঁর জীবন ও ঠাকুরবাড়ি ভারতীয় পরিবেশে ভরে ওঠে, বিশাল সংগ্রহশালায় পরিণত হয়। ১৯১৩ সালে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমসাময়িক অনুবর্তীদের শিল্পসৃষ্টি লণ্ডনে ও পরে প্যারিস শহরে প্রদর্শিত হয়। দেশে তিনি বিশেষভাবে পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ করেন। শিল্প ও সাহিত্যে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গি তুলনারহিত। এক কথায় বলা যায়, চিত্রশিল্পে তাঁর সিদ্ধি প্রবাদতুল্য।

তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিও উল্লেখযোগ্য। তাঁর সাহিত্যকে শিল্পসৃষ্টির পরিপূরক বলে মনে করা হয়। তাঁর লেখার স্বকীয়তা তুলনাহীন। শিশুদের জন্য সৃষ্ট তাঁর জগৎ বিস্ময়ে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা দু'টি ছবি : বুদ্ধ ও সুজাতা — পদ্ম হাতে রাজকুমারী

ভরপুর। তাঁর দীর্ঘ লেখকজীবনে ছোট-বড় সবার জন্য লেখা 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬) 'নালক' (১৯১৬), 'ভূতপত্রীর দেশ' (১৯০৯) 'রাজকাহিনী'(১৯০৯), 'খাতাঞ্চির খাতা' (১৯২১), 'বুড়ো আংলা' (১৯৪১), 'আলোর ফুলকি' (১৯৪৭), 'মাসি' (১৯৫৪), 'মারুতির পুঁথি' (১৯৫৬) প্রভৃতি বই শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত বয়সকে নানাভাবে আন্দোলিত করে, অমল আনন্দ দান করে। চিত্রশিল্পের ওপর তাঁর বই 'সহজ চিত্রশিক্ষা' (১৯৪৬), 'শিল্পায়ন' (১৯৫৫) এবং বড়দের জন্য 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী' (১৯৪১) অসামান্য বই।

তাঁর প্রচুর বই শিশু ও কিশোরদের জন্য রচিত। শিশুদের জগৎ নিয়ে তিনি কল্পনার জগৎকে করেছেন অবারিত। তিনি এণ্ডারসেন্ (দ্র), লিউইস্ ক্যারোল্ (দ্র), জেম্স্ ব্যারির (দ্র) কাহিনীর ছায়ায় গল্প রচনা করেছেন দেশীয় ঐতিহ্যের অনুসরণে। তাঁর ঘুমপাড়ানি দাসী, কথকঠাকুর, চাঁই বুড়ো তুলনারহিত ও চির উজ্জ্বল। তাঁর 'বুড়ো আংলা'কে ভোলা যায় না। এ বইতে তাঁর গদ্যভঙ্গি যেন কথা বলে। রবীন্দ্রনাথ (দ্র) এই ভঙ্গি সম্পর্কে বলেছেন, 'অবন যেন কথা কইছে আমি শুনতে পাচ্ছি।'

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পে বাংলা সাহিত্যের এক জন শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

বি. ব.

অবলোকিতেশ্বর

বৌদ্ধধর্মের (দ্র) মহাযানী (দ্র) সম্প্রদায়ের প্রধানতম বোধিসত্ত্ব (দ্র)। তিনি ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভর (দ্র) মানসপুত্র। তিনি লোকনাথ এবং লোকেশ্বর নামেও পরিচিত। তাঁর কাজ মানুষকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে চারদিক অবলোকন করা। এটিই অবলোকিতেশ্বরের ধারণার মূল কথা। তিনি জ্ঞান ও করুণার প্রতিমূর্তি। তাঁর প্রতীক পদ্ম এবং রঙ গাঢ় লাল। তাঁর ডান হাত বরদাতার মতো স্থির এবং বাঁ হাতে থাকে পদ্ম। তাই তাঁর আরেক নাম পদ্মপাণি। এই ভঙ্গিতে তিনি মূর্তি বা প্রতিমায় উপস্থাপিত হন।

মহাযানী গ্রন্থ 'সুখাবতীব্যূহ' এবং 'কারণ্ডব্যূহ'তে বলা হয়েছে যে মানুষের মঙ্গলের জন্য অবলোকিতেশ্বর সকল দেবতার রূপ ধারণ করতে পারেন। সম্ভবত এই কারণেই তিনি অসংখ্য রূপে কল্পিত হয়েছেন। কমপক্ষে তাঁর ১০৮ প্রকার রূপের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এগুলো লোকেশ্বর নামে পরিচিত।

সুজ. ব.

অবেদন

শরীরের যে কোনো অংশে অনুভূতিলোপ বা অসাড়তা সৃষ্টির নাম অবেদন বা 'এনেস্থেসিয়া' (anaesthesia)। বেদনাহীন অস্ত্রোপচারের জন্য কৃত্রিম উপায়ে স্থানিক অসাড়তা বা সংজ্ঞাহীনতা তৈরি বোঝাতেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীন কালে স্থূল উপায়ে এই কাজটি সম্পন্ন হত, যেমন সুরা বা ভেষজের সাহায্যে। ১৮৪৬ সালে মার্কিন দন্তচিকিৎসক উইলিয়াম টমাস গ্রিন মর্টন প্রথম দাঁত তোলার কাজে অবেদনিক হিসাবে ইথার-বাষ্প ব্যবহার করেন। একই বছর জেম্‌স্ ওয়ারেন ইথার ব্যবহার করে রোগীর গ্রীবাদেশ থেকে একটি টিউমার (দ্র) অপসারণ করেন। এরপর ১৮৪৭ সালে জেম্‌স্ সিম্প্‌সন্ নামক এক জন স্কুল চিকিৎসক ইথারের পরিবর্তে ক্লোরোফর্ম (দ্র) ব্যবহার শুরু করেন। অস্ত্রোপচারে এরপর দীর্ঘদিন ইথার ও ক্লোরোফর্মের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়েছে। এখন নানা ধরনের রাসায়নিক উপাদান অবেদনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অবেদন মোটামুটি হিসাবে চার ধরনের। যেমন সাধারণ অবেদন (জেনারেল এনেস্থেসিয়া), যে ক্ষেত্রে রোগীকে সংজ্ঞাহীন করা হয়; স্থানিক অবেদন, যে ক্ষেত্রে অবেদনিক ঔষধ অস্ত্রোপচারের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটিতে সরাসরি ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। কোনো কারণে রোগীকে সংজ্ঞাহীন করা যুক্তিযুক্ত না হলে মেরুদণ্ডের নালীতে ('স্পাইনাল ক্যানাল'-এ) ঔষধ প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় অঙ্গে অসাড়তা সৃষ্টি করা হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'স্পাইনাল এনেস্থেসিয়া' (মেরুদণ্ডীয় অবেদন)। মেরুরজ্জু থেকে বেরিয়ে আসা নির্দিষ্ট স্নায়ুমূল বা স্নায়ুপথে অবেদনিক প্রয়োগ করে আঞ্চলিক অবেদন ('রিজিওনাল এনেস্থেসিয়া') সম্পন্ন করা যায়। এর ফলে এই নির্দিষ্ট স্নায়ু যেসব অঞ্চলে বিস্তৃত একমাত্র সেখানেই অসাড়তা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এক সময় স্থানীয় অবেদনিক হিসাবে কোকেন (দ্র) ব্যবহৃত হত, কিন্তু আসক্তির সম্ভাবনা থাকায় পরে কোকেনের বদলে প্রোকেন ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রোকেন এবং এর পরিবর্তিত একাধিক রূপের ঔষধ স্থানিক, আঞ্চলিক ও মেরুদণ্ডীয় অবেদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। লিগনোকেন একটি বহুল ব্যবহৃত স্থানিক অবেদনিক ঔষধ।

বর্তমানে সব ধরনের অবেদনের কাজেই উন্নত ধরনের ঔষধ এবং পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে।

আ. র.

অবেস্তা (Avesta)

প্রাচীন পারসিক ধর্মগুরুর নাম জরথুস্ত্র। তাঁর ধর্মগ্রন্থের নাম জেন্দ্ আবেস্তা বা শুধু অবেস্তা। অবেস্তা আবার ভাষারও নাম। এই ভাষা ঋগ্বেদের (দ্র) সংস্কৃত ভাষার নিকট-আত্মীয়। দুই ভাষার মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য আছে। কারণ খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ বছরেরও আগে ইরান অঞ্চলের একটি মূল ভাষা ইন্দো-ইরানীয় আর্য ভাষা বর্তমান ছিল। আর্যরা সেই দিক থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের (দ্র) দিকে প্রাচীন অবেস্তা ভাষার মধ্যে কতগুলো শব্দ পাওয়া যায় যা ঋগ্বেদের শব্দগুলো থেকে প্রাচীনতর। তারপর খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত লেখায় সত্যকার অবেস্তা ভাষা দেখা যায়।

ধর্মগ্রন্থরূপে অবেস্তা গ্রন্থাবলিকে পশ্চিম এশিয়ার আর্যদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান বলা যায়। অবেস্তা শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' বা 'জ্ঞানের মূলাধার'। অবেস্তা সাহিত্য বলতে বোঝায় 'হপ্তংহৈতি' গদ্য-রচনা, প্রাচীন পদ, জরথুস্ত্র-রচিত স্বর্গীয় সঙ্গীত, প্রাচীন দেবতাগণের পূজামন্ত্রপাঠ ইত্যাদি, সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর, দানবদের বিরুদ্ধে শাস্ত্র, দেবস্তুতি ইত্যাদি প্রাচীন ইরানীয় দেবতার স্তব ও তাঁদের অবদান। ইরানের আর্য জাতিদের ধর্ম ও জীবনদর্শন এতে জানা যায়। এ ছাড়া জ্যোতির্বিদ্যা (দ্র), বিজ্ঞান (দ্র), চিকিৎসা (দ্র), পুরোহিতকাহিনী, ধর্ম ও রাজনীতির বিধানসমূহও এতে রয়েছে।

ফার্সি মহাকবি ফেরদৌসী (দ্র) রচিত 'শাহ্নামা' (দ্র) মহাকাব্যে (দ্র) মুসলিমপূর্ব যুগের পুরাণকথা, উপাখ্যান ও ইতিহাস কাব্যাকারে লিখিত হয়েছে। অবেস্তা গ্রন্থে ও নানা পহ্লবী (প্রাচীন ইরানীয় ভাষা) গ্রন্থে এসব উপাখ্যানের কিছু কিছু প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়।

বি. ব.

অব্দ

কালবোধক বর্ষ-নিরূপণসূচক সংখ্যা। যেমন—শকাব্দ, বঙ্গাব্দ, খ্রিস্টাব্দ, হিজরি, বুদ্ধাব্দ ইত্যাদি। দু'টি ঘটনার অন্তর্গত সময় নিরূপণের উদ্দেশ্যে অব্দ গণনার প্রচলন হয়। ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের পারম্পর্য রক্ষা করার জন্যও অব্দের প্রয়োজন হয়। মানবজাতির সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এই কালজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে। তখন থেকে কোনো না কোনো রকম অব্দের ব্যবহারের প্রচলন হতে থাকে। প্রাচীন কালে প্রতাপশালী রাজাদের অভিষেকের কাল থেকে এক রকম অব্দ গণনা হত। এই রাজকীয় অব্দ বেশি দিন চলত না। নতুন রাজার অভিষেকে আবার নতুন অব্দের চল হত। অল্পকালব্যাপী এই রকম অব্দের দ্বারা কাল নির্ণয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সাধিত হত না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য রাজগোষ্ঠীর মধ্যে আদিকাল থেকে অব্দ গণনার প্রথা প্রচলিত হয়। কোনো কোনো স্থলে প্রথম দিকে এই অব্দসংখ্যা এক শ' বছরের বেশি হয়ে গেলে শত সংখ্যা বাদ দিয়ে গণনা চালিয়ে যাওয়া হত। পরে এই প্রথাও পরিত্যক্ত হয় এবং ক্রমবর্ধমান অখণ্ড অব্দ গণনার পদ্ধতি প্রচলিত হয়।

খুব প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে পাঁচ বর্ষে একটি যুগ হত এবং তার প্রচলন ছিল। এ থেকে পঞ্চবর্ষাত্মক যুগের উৎপত্তি। ৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পঞ্চবর্ষাত্মক যুগগণনাপদ্ধতি এই দেশে প্রচলিত ছিল। বৃহস্পতি গ্রহ ১২ বছরে এক বার রাশিচক্র আবর্তন করে। এর ভিত্তিতে ১২ বছরে এক যুগের উৎপত্তি হয়। এভাবে পরে ৬০ বছরে যুগ গণনাপদ্ধতির প্রচলন হয়। অতি প্রাচীন কালে ১০০ বছরে শতাব্দী গণনার একটি পদ্ধতির প্রচলন ছিল। আবার ৩১৭৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মঘাকাল বা মঘাশতাব্দীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সে সময় যুধিষ্ঠিরাব্দের উল্লেখও পাওয়া যায়। এর আরম্ভকাল ২৪৪৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। আবার ৩১০২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কলিযুগের আরম্ভে শুরু হয় কল্যব্দ। বিখ্যাত গাণিতিক আর্যভট্ট বলেন, তাঁর কালে কল্যব্দের ৩৬০০ বছর অতীত হয়েছে।

বাংলাদেশ (দ্র) ছাড়া উত্তর ভারতে বিক্রমসংবৎ প্রচলিত। এর আরম্ভ হয় ৫৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। ৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয় শকাব্দ। কে এই অব্দের প্রবর্তক তা ঠিক করে বলা যায় না। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, শক সম্রাট কনিষ্ক এর প্রবর্তক। এর অন্য নাম শকসংবৎ, শককাল, শকভূপকাল, শকেন্দ্রকাল। ভারতের সকল জ্যোতিষগ্রন্থে এই কাল প্রচলিত।

বুদ্ধাব্দ গণনা শুরু হয় গৌতম বুদ্ধের (দ্র) নির্বাণের (দ্র)) বছর, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দ থেকে। শ্রীলঙ্কায় এই অব্দ খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে প্রচলিত। বাংলাদেশে বৌদ্ধেরা এই অব্দ গণনা করে থাকেন।

গুপ্ত রাজবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক ৩১৯ খ্রিস্টাব্দে গুপ্তঅব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের মধ্য প্রদেশে ২৪৮–৪৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে কলচুরি অব্দ শুরু হয়। হর্ষবর্ধনের সিংহাসনে আরোহণের সময় ৬০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে হর্ষাব্দ শুরু হয়। ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভাটিক অব্দ শুরু হয়।

৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুলাই শুক্রবার থেকে হিজরি অব্দ গণনা শুরু হয়। ঐ বছর হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র) মক্কা (দ্র) থেকে মদিনায় (দ্র) হিজরত (দ্র) করেন। সেই স্মৃতিকে রক্ষা করার জন্য এই অব্দের প্রচলন হয়। ১২টি চান্দ্রমাসে অর্থাৎ ৩৫৪ দিনে হিজরি বছর পূর্ণ হয়। খলিফা হযরত উমর (রা.) (দ্র) ৬৩৮–৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে এই অব্দের প্রচলন করেন। ইসলামের সব রকম ধর্মীয় কাজ এই অব্দ অনুসরণে হয়ে থাকে।

চট্টগ্রামে প্রচলিত মঘাব্দ ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে আরম্ভ হয়। নেপালে (দ্র) প্রচলিত নেওয়ার অব্দ শুরু হয় ৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

দাক্ষিণাত্য থেকে আগত সেন রাজবংশ (দ্র) বাংলাদেশে শকাব্দ প্রচলিত করেন। পরে মুসলমানদের আগমনের পর এ দেশের রাজকার্যে হিজরি অব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে। কিন্তু হিজরি অব্দ ৩৫৪ দিনে পূর্ণ হয় বলে এর বছরের আরম্ভ একেক বছরে একেক দিনে হয়। এতে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত রাজকাজে অসুবিধা দেখা দেয়। সম্রাট আকবরের সময় একে বঙ্গাব্দে বা বাংলা সনে পরিবর্তিত করা হয়। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে হিজরি অব্দ ৯৬৩-এর সঙ্গে পরবর্তী সৌর বছরসংখ্যা যোগ করে বাংলা সন করা হয়েছে।

পৃথিবীর সর্বত্র খ্রিস্টাব্দ প্রচলিত। দিওনিসিউস্ এক্সিগিউয়ুস্ (Dionysius Exiguus) কর্তৃক ৫৩০ খ্রিস্টাব্দে এর প্রথম প্রচলন হয়। এর প্রচলন হয়েছিল সেই সময়ে জানা মতে যিশুখ্রিস্টের জন্মকাল হতে। পরে গবেষণায় জানা গেছে, যে বছর থেকে খ্রিস্টাব্দ গণনা করা হয়, যিশু সম্ভবত তার ৪ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

জাপানে প্রচলিত জাপানি অব্দের আরম্ভকাল ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে। ব্রহ্মদেশে বা মায়ান্‌মারে (দ্র) প্রচলিত অব্দ আরম্ভ হয় ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে। এ ছাড়া সারা পৃথিবীতে (দ্র) নানা ধরনের অব্দের প্রচলন আছে। কিন্তু সেগুলো তত প্রসিদ্ধি লাভ করে নি।

সন বলতে বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে নির্ণীত বছর বা সালকে বোঝায়। বাংলায় বছর গণনা-পদ্ধতিতে 'সন' শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় (দ্র) বঙ্গাব্দকে ও খ্রিস্টাব্দকে 'সাল' হিসাবে উল্লেখ করা চলে, কিন্তু 'সন' শুধুই বঙ্গাব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বি. ব.

অভিধর্মকোষ / অভিধম্মকোশ

বিখ্যাত দার্শনিক বসুবন্ধু এই অমূল্য গ্রন্থের রচয়িতা। সুবৃহৎ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের (দ্র) তিনটি খণ্ড। তার মধ্যে তৃতীয় খণ্ডটি অভিধর্ম, এতে ধর্ম (দ্র) ও দর্শন বিষয়ে আলোচনা আছে। বসুবন্ধু অভিধর্মের প্রায় সকল বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাঁর এই মহাগ্রন্থে। দার্শনিক গ্রন্থ হিসাবে এটি বিখ্যাত হয়ে আছে। এটি মহাযান (দ্র) মতবাদের অন্তর্গত সর্বাস্তিবাদী সমর্থকদের জন্য রচিত। সর্বাস্তিবাদীদের জন্য হলেও এটি সকল সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধদের জন্য অবশ্যপাঠ্য বলে বিবেচিত। বসুবন্ধুর ভাই অসঙ্গও (দ্র) খ্যাতিমান দার্শনিক। খ্রিস্টীয় ৫ম শতাব্দীতে তাঁরা জীবিত ছিলেন। সেই সময় থেকে পরবর্তী কালে এই গ্রন্থটি ভারতবর্ষে ও বাইরে প্রভূত খ্যাতি লাভ করে। মহাকবি বাণভট্ট তাঁর 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে একটি আশ্রমের বর্ণনা প্রসঙ্গে অভিধর্মকোষের কথা বলেছেন। সেই আশ্রমে শুকপাখিরাও অভিধর্মকোষ আবৃত্তি করেছে বলে লিপিবদ্ধ আছে।

এই মহাগ্রন্থের মূল সংস্কৃত পাওয়া যায় না। তবে এর টীকাগ্রন্থ পাওয়া গেছে। টীকাগ্রন্থটি রচনা করেছেন যশোমিত্র নামে আর এক পণ্ডিত। মূল গ্রন্থটির চীনা অনুবাদ করেন হিউএন্-ৎসাঙ্ (দ্র)। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন চীনা অনুবাদ (দ্র) ধরে পুনরায় সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করেছেন।

বি. ব.

অভিধান

অভিধান বলতে বোঝায় এমন একটি গ্রন্থ, যে গ্রন্থে একটি বিশেষ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী কর্তৃক ব্যবহৃত ভাষার যাবতীয় শব্দ সঙ্কলিত হয়।

ইংরেজি ডিকশনারি (dictionary) শব্দটি পাওয়া যায় মধ্য যুগে। তার আগে lexicon, glossary, thesaurus ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হত। ডিকশনারি শব্দটি লাতিন থেকে পাওয়া। এই উপমহাদেশে অভিধানকে প্রাচীন কালে 'শব্দকোষ' বলা হত। শব্দকোষ বলতে বোঝায় বিশেষ বা বাছাই করা শব্দের সংগ্রহ। ভারতবর্ষে পাওয়া সর্বপ্রাচীন শব্দকোষ হল বাছাই করা কিছু কঠিন বৈদিক শব্দের তালিকা। তার নাম 'নিঘণ্টুঃ'। প্রাচীন সংস্কৃতে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শব্দকোষ হল অমরসিংহের 'নামলিঙ্গানুশাসন'। সচরাচর এটি 'অমরকোষ' (দ্র) নামে প্রচলিত। অমরসিংহ ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁর কোষটি তখনকার দিনের অভাব মিটিয়েছিল। পালি ভাষায় (দ্র) শব্দকোষ হল 'মহাব্যুৎপত্তি'। প্রাকৃত ভাষায় (দ্র) দু'টি উল্লেখযোগ্য শব্দকোষ—ধনপালের 'পাইয়লচ্ছী-নামমালা' (১৩শ শতাব্দী) এবং হেমচন্দ্রের 'দেশী নামমালা' (১২শ শতাব্দী)। 'অভিধান-রাজেন্দ্র' এ

যুগের সবচেয়ে বড় প্রাকৃত শব্দের অভিধান।

পাশ্চাত্য জগতে অভিধানের সূত্রপাত হয় খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে গ্রিসে। এর পর লাতিন ভাষায় বিশাল ও সুবিখ্যাত অভিধান সঙ্কলন (দ্র) করেন ব্রোজির ক্যালেপিনো ১৫০২ সালে। ইংরেজিতে প্রথম রচিত হয়েছিল দ্বিভাষিক অভিধান —১৪৬০ সালে প্রকাশিত হয় উইলিয়াম ক্যাক্সটনের 'French-English Vocabulary'। প্রথম ইংরেজি অভিধান প্রকাশিত হয় ১৬০৪ সালে। তার নাম 'A Table Alphabetical, conteyning and teaching the true writing and understanding of hard usuall English wordes, borrowed from the Hebrew, Greeke, Latine or French &C.' এই দীর্ঘ নামের অভিধানের সঙ্কলক রবার্ট কাউড্রে। এর শব্দসংখ্যা ছিল ৩,০০০। এর পর ১৭৫৫ সালে স্যামুয়েল জনসন-কৃত সুবিখ্যাত ইংরেজি অভিধান 'Dictionary of the English Language'। মাত্র দু'জন সহকর্মীর সহযোগিতায় তিনি ৪৩,৫০০ শব্দ সঙ্কলন করেন। এ বইয়ের প্রধান আকর্ষণ ১,১৮,০০০ উদ্ধৃতি। পৃথিবীর (দ্র) বৃহত্তম অভিধান 'The Oxford English Dictionary'। ১২ খণ্ডে সমাপ্ত এই অভিধানটি ১৮৮৪ থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। প্রায় ১৫,৫০০ পৃষ্ঠায় তিন কলাম জুড়ে শব্দমালা এতে মুদ্রিত হয়েছে। মোট শব্দসংখ্যা ৪,১৪,৮২৫ এবং প্রয়োগ-উদ্ধৃতি ১৮,২৭,৩০৬ টি। স্থির করা হয় যে এই প্রামাণ্য অভিধানে কোনো সংশোধন হবে না, হবে শুধু সংযোজন। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বুকে (দ্র) এ অভিধানকে পৃথিবীর বৃহত্তম অভিধান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাংলা ভাষার প্রথম শব্দকোষগুলো ইউরোপীয়দের কৃতিত্ব। পর্তুগিজ পাদ্রি মানোএল্ দা আস্‌সুম্প্‌সামের (Manoel da Assumpsam) পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ রোমান হরফে 'Vocabulario em Idioma Bengalla, e Portuguez' নামে ১৭৪৩ সালে লিস্‌বনে ছাপা হয়। বাংলা ভাষায় (দ্র) মুদ্রিত প্রাচীনতম অভিধান প্রকাশিত হয় ১৭৯৩ সালে; সঙ্কলকের নাম জানা যায় না, মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন এ. আপ্‌জন্। অতঃপর ১৭৯৯-এ হেন্‌রি পিট্‌স্ ফর্স্টারের দু'-খণ্ডের ইংরেজি-বাংলা ও বাংলা-ইংরেজি অভিধান, এবং পরে তিরিশ বৎসরের একনিষ্ঠ পরিশ্রমের ফসল উইলিয়াম কেরীর (দ্র) বিশাল অভিধান (১৮১৫-২৫) প্রকাশিত হয়েছিল। এ সবেরও পরে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 'বঙ্গভাষাভিধান' (১৮১৭)। রামকমল সেনের ইংরেজি-বাংলা অভিধান (১৮৩৪) স্যামুয়েল জনসনের ডিকশনারি অবলম্বনে রচিত। বাংলা তৎসম শব্দের প্রথম ভাল অভিধান হল রামকমল বিদ্যালঙ্কার সঙ্কলিত 'প্রকৃতিবাদ অভিধান' (১৮৬৬)। এতে ১৬ হাজার শব্দ স্থান পেয়েছে। একটি অভিধান ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় (১৮৬৪) 'শব্দদীধিতি' নামে, সঙ্কলক ঢাকা নর্মাল স্কুলের শিক্ষক শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বাংলা অভিধান' (১৮৭৪), সুবল মিত্রের 'সরল বাঙ্গালা অভিধান (১৯০৬), রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদের 'বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু' (১৯০৭) প্রকাশিত হয়। তদ্ভব শব্দকোষের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সংগ্রহ 'বাঙ্গালা শব্দ-কোষ' ৪ খণ্ডে ১৩২০-২২ বাংলায় প্রকাশিত হয়; এখন এটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (১৯১৭) ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (১৯৩২-৫১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অভিধান। হরিচরণ দীর্ঘ ২৭ বছর একক প্রচেষ্টায় তাঁর অভিধান সঙ্কলন করেন। ১৯৭৮ সালে অভিধানটি দুই খণ্ডে পুনরায় মুদ্রিত হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের তুলনায় এটি আকারে বড়। দু'টি অভিধানই একক প্রচেষ্টা ও শ্রমের ফসল। ১৯৩০ সালে রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' প্রকাশিত হয়। এতে বাছাই করে প্রচলিত ও আধুনিক অর্থে ব্যবহৃত শব্দাবলি তুলে ধরা হয়। ১৩শ সংস্করণে এতে শব্দসংখ্যা দাঁড়ায় ৩০ হাজার। এটি সাধারণের জন্য উপযোগী অভিধান। ১৯৫৫ সালে 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান' প্রকাশিত হয়। সঙ্কলন করেন শৈলেন্দ্র বিশ্বাস। কাজী আবদুল ওদুদ সঙ্কলিত 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' (১৯৫৩)-এর বিশিষ্টতা হল, এতে মুসলমান সমাজে প্রচলিত প্রচুর আরবি-ফার্সি শব্দ সংযোজিত হয়েছে। এ ছাড়া ঋষি দাস ১৯৫৪ সালে 'আধুনিকী' প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' একটি উল্লেখযোগ্য শব্দকোষ। এর স্বরবর্ণ অংশ ড. মুহম্মদ এনামুল হকের (দ্র) সম্পাদনায় ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। ব্যঞ্জনবর্ণ অংশ প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর সম্পাদনায়। বাংলা একাডেমী

প্রকাশিত এই অভিধানের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১২০, শব্দসংখ্যা ৫০ হাজারের বেশি। এ ছাড়া 'পূর্ব-পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৯৬৫–৬৮)। সম্পাদক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (দ্র)। পরে এটি 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' নামে দুই খণ্ডে ১৯৭৩ সালে আবার মুদ্রিত হয়েছে। এ রকম দুই খণ্ডে মুদ্রিত আরেকটি অভিধানের নাম 'লৌকিক শব্দকোষ' (১৯৬৮–৭১)। এর সঙ্কলক ড. কামিনীকুমার রায়।

অভিধান নানান বয়সী পাঠকের প্রয়োজন ও মেধা বিবেচনায় রেখে প্রণীত হতে পারে। যেমন স্কুলের ছেলে-মেয়েদের জন্য অভিধান। এমন একটি অভিধান হল বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'ছোটদের অভিধান' (১৯৮৩), পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩১২। মুস্তাফা পান্না সঙ্কলিত ও হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত 'কিশোর বাংলা অভিধান'(১৯৮৮) এ রকম আরেকটি অভিধান।

অভিধান যে শুধু শব্দকোষই হবে এমন নয়। জীবনী-অভিধান বা চরিতাভিধান, ইতিহাস-অভিধান, চলচ্চিত্র-অভিধান, চিকিৎসা-অভিধান প্রভৃতি বহু বিষয়ভিত্তিক অভিধান প্রণীত হচ্ছে এখন নানান দেশে, এবং বাংলা ভাষাতেও এ জাতীয় অভিধানের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।

বি. ব.

অভিনবগুপ্ত

কাশ্মীরি পণ্ডিত। ভারতবর্ষের মধ্য যুগের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষাসম্পন্ন পুরুষ। তিনি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি নানা বিদ্যায় অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। খুব অল্প বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। পিতার কাছে ব্যাকরণ শিখে ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। তারপর বিভিন্ন পণ্ডিতের কাছে শিক্ষালাভ করে ব্রহ্মবিদ্যা, দর্শন, গীতা (দ্র), সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি বিচিত্র বিদ্যায় পারদর্শী হন। জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব দর্শন, তর্ক ও বৈশেষিক দর্শন আয়ত্ত করেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। কথিত আছে, পরিণত বয়সে তিনি ১২ শত শিষ্যসহ শ্রীনগরের নিকটস্থ ভৈরবগুহায় প্রবেশ করে স্বেচ্ছায় দেহ বিসর্জন দেন।

আচার্য অভিনবগুপ্ত সাহিত্যকলার অলঙ্কারশাস্ত্র ও নাট্যশাস্ত্রের ওপর অনেকগুলো গ্রন্থ ও টীকা রচনা করে যান। সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে অভিনবগুপ্তের মত, রসতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বে তাঁর টীকা-টিপ্পনি সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি ধরা হয়। সাহিত্যপাঠে হৃদয়ে যে সুখ, দুঃখ, উৎসাহ, ক্রোধ, অনুরাগ, ভয়, বিস্ময়, বৈরাগ্য প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক হয় তাকে এবং সেই ভাব অন্তরকে দ্রবীভূত করলে তাকে বলে 'রস'। এই রস নিয়ে 'রসতত্ত্ব'। রসতত্ত্বকে তিনি দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। রসতত্ত্ববিষয়ে তাঁর মতবাদ 'অভিব্যক্তিবাদ' রূপে পরিচিত। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'ধ্বন্যালোকলোচন', 'অভিনবভারতী', 'তন্ত্রালোক', 'তন্ত্রসার', 'বোধ-পঞ্চদশিকা' ইত্যাদি।

বি. ব.

অভিব্যক্তিবাদী চিত্রকলা এক্সপ্রেশনিস্ট আর্ট দ্র

অভিযোজন

উদ্ভিদজগৎ ও মানুষসহ প্রাণিজগতের সকল সদস্যের নিজ নিজ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর নাম অভিযোজন। জীবনের প্রতিপালনের জন্য এ অভিযোজন প্রয়োজন। জীব বিভিন্নভাবে পরিবেশের বিভিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে। পরিবেশের পরিবর্তনসমূহের মধ্যে জীব, জড়বস্তু এবং আবহাওয়া (দ্র) অন্তর্ভুক্ত।

কোনো কোনো জীব অপরাপর জীব অপেক্ষা সহজেই খাপ খাওয়াতে পারে। উদাহরণ হিসাবে মানুষের কথা বলা যায়। মানুষ বিভিন্ন ধরনের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে সক্ষম। জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদে প্রতিটি মানুষকে তার নিজ প্রাকৃতিক পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। কারণ এ ছাড়া সে টিকে থাকতে পারবে না। তাই নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে শুরু করে মেরু অঞ্চলের সর্ববিধ পরিবেশে মানুষ বসবাস করতে পারে। মানুষের দেহই তাকে পৃথিবীর (দ্র) বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে এমনকি মাধ্যাকর্ষণহীন মহাশূন্যে চলমান বায়ুবিহীন মহাকাশযানে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে।

পক্ষান্তরে মশার মতো একটি ক্ষুদ্র প্রাণী বা বাঁশের মতো একটি উদ্ভিদের জন্যও প্রয়োজন বিশেষ বিশেষ ধরনের পরিবেশের। শরীরের গঠনের কারণে এগুলো

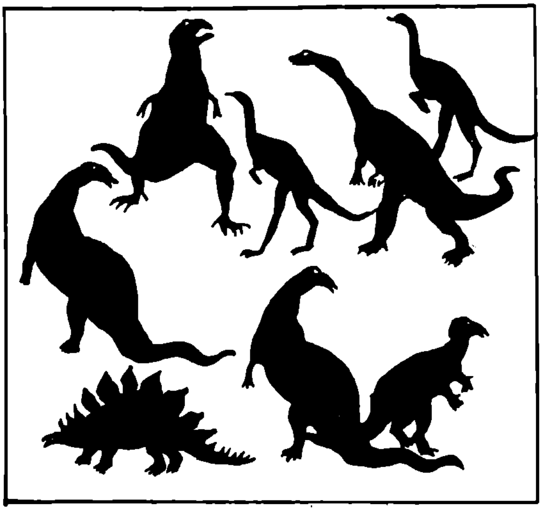

পরিবেশের কারণে অতিকায় ডাইনোসরও হারিয়ে যায়

কেবল উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতেই বসবাস করতে পারে।

অনেক জীব পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে বাধ্য হয়। নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদ ও প্রাণী যারা একদা পৃথিবীর বুকে বসবাস করত আজ তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন– ডাইনোসর (দ্র) নামক বিরাটাকার সরীসৃপ দশ-পনেরো কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে দল বেঁধে চলাফেরা করত। কিন্তু তাদের বসবাসের উপযোগী জলাভূমি ক্রমে শুকিয়ে যায়, জলবায়ু ও খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে পরিবর্তন আসে। ফলে ডাইনোসর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে না পেরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মু. আ.

অভিসন্দর্ভ (thesis)

কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. ফিল., পিএইচ.ডি. বা ঐ জাতীয় ডিগ্রি লাভের জন্য পেশকৃত তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞানগর্ভ রচনাকে অভিসন্দর্ভ বা থিসিস বলা হয়। অভিসন্দর্ভ রচনার কিছু নিয়ম-কানুন আছে। ভূমিকা, অধ্যায়ভাগ, উপসংহার, মূল প্রতিপাদ্যের সংক্ষিপ্তসার, উদ্ধৃতির ব্যবহার, পাদটীকা, গ্রন্থপঞ্জি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত সুনির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করতে হয়।

থিসিস কথাটি যুক্তি দ্বারা সমর্থিত বা সমর্থনীয় যে-কোনো বিবৃতি বা তত্ত্ব বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়। সেই সূত্রেই আমরা সাহিত্যের অঙ্গনে থিসিস উপন্যাস, থিসিস নাটক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি। মার্কিন লেখিকা হ্যারিয়েট বীচার স্টৌ (দ্র)-র দাসপ্রথাবিরোধী বিখ্যাত উপন্যাস (দ্র) 'টম চাচার কুটির' (দ্র)-কে আমরা উপরোক্ত অর্থে থিসিস উপন্যাস বলতে পারি। অনুরূপভাবে নরওয়ের লেখক হেনরিক্ ইব্‌সেনের (দ্র) 'পুতুলের সংসার' (১৮৭৯) নাটকটিকেও থিসিস নাটক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। ঐ নাটকের অন্যতম বিষয় নারী-স্বাধীনতা।

ক. চৌ.

অভিস্রবণ (osmosis)

অভিন্ন বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও তাপমাত্রায় একই দ্রাবক (পানি)-বিশিষ্ট দু'টি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ (solution) পাশাপাশি অথচ একটি অর্ধভেদ্য ঝিল্লী দ্বারা আলাদা থাকলে দ্রাবক পদার্থ যে প্রক্রিয়ায় বেশি ঘনত্বের (পানির পরিমাণ বেশি ও দ্রবণ কম) এলাকা থেকে এর কম ঘনত্বের (পানির পরিমাণ কম ও দ্রবণ বেশি) এলাকার দিকে ব্যাপ্ত হয়, সেই প্রক্রিয়ার নাম অভিস্রবণ। ইংরেজিতে একে অসমোসিস বলে। দু'টি দ্রবণ একই ঘনত্বের দ্রবণে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মূলের এককোষী মূলরোমগুলো মৃত্তিকার পানির সংস্পর্শে আসে। মূলরোমের ভ্যাকুওলের ভেতরের কোষরস মৃত্তিকার পানির চেয়ে বেশি গাঢ়। ফলে মৃত্তিকার লঘু দ্রবণ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মূলরোমে প্রবেশ করে।

অভিস্রবণ দুই প্রকার—

ক. অন্তঃঅভিস্রবণ (endosmosis) : যে অভিস্রবণে দ্রাবক (পানি) বাইরে থেকে ভেতরে প্রবেশ করে তাকে অন্তঃঅভিস্রবণ বলে।

খ. বহিঃঅভিস্রবণ (exosmosis) : যে অভিস্রবণে দ্রাবক (পানি) কোষের ভেতর থেকে এর বাইরে গমন করে তাকে বহিঃঅভিস্রবণ বা এক্সোসমোসিস বলে।

অভিন্ন বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও তাপমাত্রায় একটি দ্রবণ ও এর বিশুদ্ধ দ্রাবককে যদি একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা আলাদা

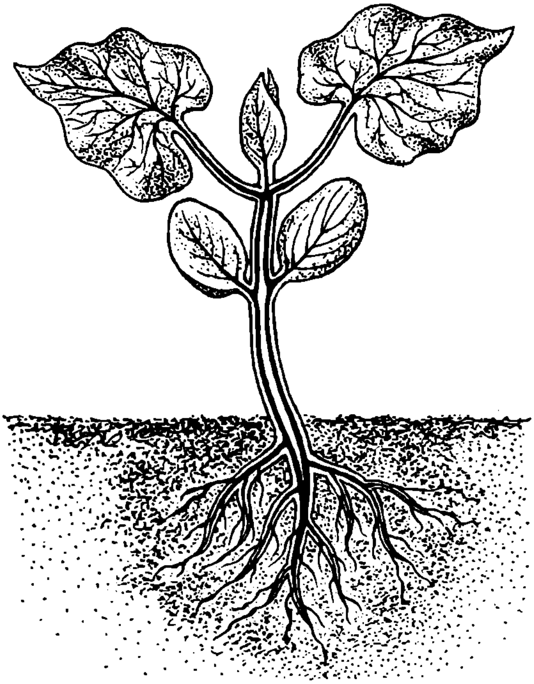

করে রাখা হয়, তবে অর্ধভেদ্য ঝিল্লী ভেদ করে বিশুদ্ধ দ্রাবকের (পানির) বেশি ঘন দ্রবণে প্রবেশকে পুরোপুরি বন্ধ করার জন্য বেশি ঘনত্বের দিক থেকে যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তাকে উক্ত দ্রবণের আভিস্রবণিক চাপ (osmotic pressure) বলে। দু'টি দ্রবণের ঘনত্বের মধ্যে যত বেশি পার্থক্য থাকবে আভিস্রবণিক চাপও তত বেশি হবে। পার্থক্য কম থাকলে চাপ কম হবে। ঘনত্ব সমান হলে কোনো অভিস্রবণ হবে না এবং কোনো চাপ থাকবে না।

মু. আ.

অভ্র (mica)

খনিজ পদার্থ। দেখতে স্বচ্ছ কাচের (দ্র) মতো। পাতলা পাতার মতো স্তরে স্তরে সঞ্চিত যৌগ। ইংরেজিতে একে 'মাইকা' বলে। প্রকৃতিতে সাত রকমের অভ্র পাওয়া যায়:

১. মাসকোডাইট বা পটাশিয়াম অভ্র, ২. প্যারাগোনাইট বা সোডিয়াম অভ্র, ৩. লেপিডোনাইট বা লিথিয়াম অভ্র, ৪. ফ্লাগাসাইট বা ম্যাগনেসিয়াম অভ্র, ৫. বায়োটাইট বা ম্যাগনেসিয়াম-লোহা অভ্র, ৬. জিনওয়ালডাইট বা লিথিয়াম-লোহা অভ্র এবং ৭. লেপিডোমিলেন বা লোহা অভ্র।

অভ্রের তাপ- ও বিদ্যুৎ- সহনক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। অভ্রের পাতা পরতে পরতে খুলে খুব মিহি পাতলা পাতায় বিচ্ছিন্ন করা যায়। এই বিরল গুণের জন্য সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ইত্যাদিতে অভ্র ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া রং বা পেইন্ট, রাবার (দ্র), পিচ্ছিলক বা লুব্রিক্যান্ট, প্লাস্টিক শিল্পেও অভ্র ব্যবহৃত হয়।

ভারত (দ্র), ব্রাজিল, আমেরিকা (দ্র), তান্‌জানিয়া, রোডেশিয়া এবং আর্জেন্টিনায় প্রচুর অভ্র পাওয়া যায়। পাথরের স্তরে স্তরে প্রায়ই অভ্র মেলে।

স. রা.

অমর একুশে ভাষা-আন্দোলন দ্র

অমরকোষ

অমর বা অমরসিংহ প্রণীত সরল পদ্যে ১,৫০০ শ্লোকে রচিত বিশ্ববিখ্যাত সংস্কৃত অভিধান (দ্র)। অমরকোষের প্রকৃত নাম 'নামলিঙ্গানুশাসন'। তিন খণ্ডে বিভক্ত বলে ত্রিকাণ্ড বা ত্রিকাণ্ডী হিসাবেও পরিচিত। বিভিন্ন পাশ্চাত্য ভাষাতেও এর ভাবানুবাদ করা হয়েছে। অমরকোষের শব্দতালিকায় বেশ কিছু প্রাচীন বাংলা শব্দ স্থান পেয়েছে। সে জন্য বাংলা অভিধানের ইতিহাসেও অমরকোষ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

মে. খা.

অমরুশতক

সংস্কৃত খণ্ডকাব্যের (দ্র) নাম। এর চারটি রূপ আছে। যেমন- দক্ষিণ ভারতীয়, বঙ্গীয়, পশ্চিম ভারতীয় এবং মিশ্র। বিভিন্ন রূপে এর শ্লোকসংখ্যা ৯৬ থেকে ১১৫। সকল রূপে সাধারণ শ্লোকসংখা ৫১ আর টীকার সংখ্যা ১৯। এই কাব্যের (দ্র) উপজীব্য বিষয় হল জীবনের বিভিন্ন ধাপে নারীর রূপ-সৌন্দর্য। শ্লোকগুলো সরস ভাষা, নিপুণ ছন্দবৈচিত্র্য ও চিত্ররূপময় কাব্যব্যঞ্জনায় ভরা। এর রচয়িতার নাম অমরু। এই কবির জীবন ও কাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু

জানা যায় না। খ্রিস্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগে আনন্দবর্ধন বিখ্যাত কবি হিসাবে অমরুর নাম উল্লেখ করেছেন।

সুজ. ব.

অমলেন্দু বিশ্বাস [১৯২৫-১৯৮৭]

বাংলাদেশের (দ্র) বিখ্যাত যাত্রানট ও নির্দেশক। তিনি ১৯২৫ সালে রেঙ্গুনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছোট কুমিরা, মসজিদ্দা, চট্টগ্রাম।

অমলেন্দু বিশ্বাস বাল্যকালেই নাটকের (দ্র) প্রতি আগ্রহী হন। এ কারণে তাঁর ভাগ্যে যথেষ্ট পারিবারিক নিগ্রহ জোটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) শুরু হলে তিনি মিত্রবাহিনীতে এবং যুদ্ধশেষে চট্টগ্রামে রেলের চাকুরিতে যোগ দেন। চাকুরিজীবনের পাশাপাশি নাটকে অভিনয় এবং গণসঙ্গীতচর্চা অব্যাহত রাখেন। ১৯৫০-এর দশকের সূচনায় তিনি তাঁর কয়েক জন সতীর্থের উদ্যোগে 'বাবুল থিয়েটার' নামে একটি নাট্যদল গড়ে তোলেন। ১৯৫৪ সাল নাগাদ এই দলটিই 'বাবুল অপেরা'য় পরিণত হয়।

এরপর অমলেন্দু বিশ্বাস রেলের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে মুক্ত মঞ্চকেই তাঁর শিল্পীজীবনের প্রধান মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন। গ্রামবাংলার চিরায়ত লোকনাট্যমাধ্যম যাত্রাশিল্পের বিকাশ সাধনই তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হয়ে ওঠে। তাঁর একান্ত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাতেই এক দিন 'বাবুল অপেরা' জননন্দিত যাত্রাদলে পরিণত হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অমলেন্দু বিশ্বাস 'চারণিক যাত্রাসমাজ' নামে একটি যাত্রাদলের গোড়াপত্তন করেন। পরে এর নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'চারণিক নাট্যগোষ্ঠী'। দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে তিনি পেশাদার যাত্রামঞ্চকে নিজের প্রতিভাগুণে সমৃদ্ধ করতে থাকেন। সামগ্রিকভাবে যাত্রাশিল্প ও শিল্পীদের মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে।

অমলেন্দু বিশ্বাস অসংখ্য পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক পালার বিভিন্ন ধরনের চরিত্র রূপারোপে ও সে-সবের নির্দেশনায় নিজেকে যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিশালী যাত্রাভিনেতা ও নির্দেশক হিসাবে প্রতিপন্ন করেন, তেমনি যাত্রাশিল্পে জীবনঘনিষ্ঠ পালা মঞ্চায়নেও অগ্রণী ভূমিকা

পালন করেন।

১৯৭৮-৭৯ সালে তাঁর অভিনীত ও নির্দেশিত যাত্রাপালা 'মাইকেল মধুসূদন' বিপুলভাবে দর্শকনন্দিত ও প্রশংসিত হয়। ১৯৭৯-'৮০ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত প্রথম ও দ্বিতীয় জাতীয় যাত্রা উৎসবে তিনি পরপর দু'বার 'শ্রেষ্ঠ অভিনেতা'র সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেন।

তাঁর অভিনীত ও নির্দেশিত যাত্রাপালাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'মাইকেল মধুসূদন', 'একটি পয়সা', 'জানোয়ার', 'সম্রাট জাহান বাদশা', 'লেনিন' ও 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' ইত্যাদি। এসব যাত্রাপালার প্রত্যেকটির নামভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছিলেন। তিনি মরণোত্তর 'একুশে পদক' লাভ করেন। অমলেন্দু বিশ্বাস ১৯৮৭ সালের ১৩ই অক্টোবর পরলোকগমন করেন।

আ. হ.

অমিতাভ

মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আদিবুদ্ধ (দ্র) মতবাদে উল্লিখিত পাঁচ ধ্যানীবুদ্ধের এক জন। অন্য চার ধ্যানীবুদ্ধ হলেন : বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভার ও অমোঘসিদ্ধি। পাঁচ ধ্যানীবুদ্ধের মধ্যে অমিতাভ হলেন চতুর্থ। মহাযানীদের

ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের ব্রোঞ্জমূর্তি

মতে বর্তমানকাল ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের কাল। তাঁর পূর্বে তিন ধ্যানীবুদ্ধ গত হয়েছেন। তাঁর বোধিসত্ত্বের (দ্র) নাম পদ্মপাণি, যিনি অবলোকিতেশ্বর নামেও পরিচিত।

অমিতাভের বাহন হল এক জোড়া ময়ূর, প্রতীক পদ্ম এবং তাঁর গায়ের রঙ গাঢ় লাল। মূর্তি বা প্রতিমায় তিনি কোলের ওপর হাতের এক তালু অপর তালুতে রেখে সমাধিমুদ্রায় আসীন। ভারতবর্ষ, চীন (দ্র) ও তিব্বতে তাঁর অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে। প্রাচীন কালে তিব্বত ও চীনদেশে তাঁর প্রচার হলেও জাপানেই (দ্র) তিনি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

সুজ. ব.

অমিয় চক্রবর্তী [১৯০১—১৯৮৬]

রবীন্দ্রনাথের (দ্র) পরবর্তী কালের এক জন উল্লেখযোগ্য কবি অমিয় চক্রবর্তী। তিরিশের পাঁচ জন কবির মধ্যে তিনিও এক জন। অন্য চার জন হলেন জীবনানন্দ দাশ (দ্র), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (দ্র), বুদ্ধদেব বসু (দ্র) ও বিষ্ণু দে (দ্র)। অমিয় চক্রবর্তী আধুনিক কবিতার ভাবে ও রূপে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

অমিয় চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন ১৯০১ সালের ১০ই এপ্রিল, পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরে। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র এবং অক্সফোর্ড থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি পান; এক সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) ইংরেজির অধ্যাপকও ছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি আমেরিকায় (দ্র) চলে যান (১৯৪৮) এবং সেখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানত তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ইংরেজি কাব্য, তুলনামূলক সাহিত্য, মানবিকী বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাপক হিসাবে বহু দিন কাটান। প্রায় সব ক'টি মহাদেশের অসংখ্য দেশ নানাবিধ কর্মসূত্রে ভ্রমণ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসাবে বক্তৃতা দিয়েছেন। এই কারণে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় আন্তর্জাতিক বিশ্বপরিবেশের বর্ণনা ও চিত্র আছে, আছে অনেক ভৌগোলিক স্থানের নাম। তাঁর কবিতা বিশ্বকে ধারণ করেছে। এটি তাঁর কবিতার বিশিষ্টতা। তাঁর কবিতায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী

মরমীয়া সুর আছে, আছে আধ্যাত্মিক ভঙ্গি।

অমিয় চক্রবর্তী প্রথম জীবনেই রবীন্দ্রনাথের নিকট-সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সচিবও ছিলেন। শেষ জীবনে অমিয় চক্রবর্তী বিদেশ থেকে শান্তিনিকেতনে (দ্র) ফিরে আসেন এবং সেখানেই ১৯৮৬ সালের ১২ই জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ১৫টি। প্রথম প্রকাশিত কবিতার বইয়ের নাম 'কবিতাবলী' (১৯২৪-২৫)। অন্য কাব্যগুলো হল : 'উপহার' (১৯২৭) 'খসড়া' (১৯৩৮), 'এক মুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেয়াল' (১৯৪২), 'অভিজ্ঞান বসন্ত' (১৯৪৩), 'পারাপার' (১৯৫৩), 'পালাবদল' (১৯৫৫), 'ঘরে ফেরার দিন' (১৯৬১), 'হারানো অর্কিড' (১৯৬৬), 'পুষ্পিত ইমেজ' (১৯৬৭), 'অমরাবতী' (১৯৭২), 'অনিঃশেষ' (১৯৭৬) এবং 'নতুন কবিতা' (১৯৮০)।

কবিতার জন্য অমিয় চক্রবর্তী বহু সম্মান ও পুরস্কার পান। তাঁর গদ্যের বইও আছে। নাম— 'চলো যাই' (১৯৬২), 'সাম্প্রতিক' (১৯৬৩)। ইংরেজিতে রচিত তাঁর বইয়ের সংখ্যা ৯টি।

বিশ্বভারতী (দ্র) বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দেশিকোত্তম' (১৯৬৩) এবং ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' (১৯৭০) উপাধিতে ভূষিত করে সম্মান জানায়।

আ. ক.

অমেরুদণ্ডী

যেসব প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া থাকে না, তাদের অমেরুদণ্ডী প্রাণী বলা হয়। মেরুদণ্ড খাড়া একটি লাঠির মতো। এটি অনেকগুলো খণ্ড, অস্থি নিয়ে গঠিত। মেরুদণ্ড দেহকে খাড়া রাখতে এবং এদিক-সেদিক বাঁকাতে সাহায্য করে। যাদের দেহে মেরুদণ্ড নেই, তাদের দেহ দৃঢ় পেশির সাহায্যে মজবুত থাকে। অ্যামিবা, জেলিফিশ, কৃমি (দ্র), কেঁচো (দ্র), প্রজাপতি (দ্র), বিছা, চিংড়ি (দ্র), শামুক, তারামাছ (দ্র) প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের নয়টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে (দ্র) যেসব প্রাণীকে দেখতে হয়, সে ধরনের প্রাণীদেরকে রাখা হয়েছে প্রোটোজোয়া (Protozoa) পর্বে।

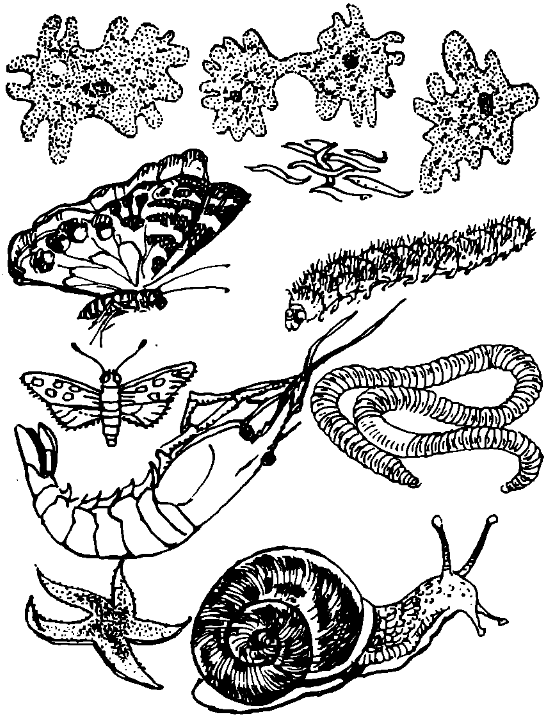

প্রোটো মানে প্রথম, জোয়া মানে প্রাণী, অর্থাৎ প্রথম প্রাণী। অ্যামিবা, ম্যালেরিয়া (দ্র) জ্বরের জীবাণু প্রভৃতি এই পর্বের প্রাণী। এদের থেকে একটু জটিল দেহের স্পঞ্জজাতীয় প্রাণীরা পরিফেরা (Porifera) পর্বে রয়েছে। জেলিমাছ, সমুদ্রসজারু, হাইড্রা ইত্যাদির দেহ আরো একটু জটিল। এরা সিলেন্টারেটা (Coelenterata) পর্বের প্রাণী। এরপর প্ল্যাটিহেলমিন্থিস (Platyhelminthes) পর্ব। ফিতাকৃমি জাতীয় প্রাণী এই পর্বের অধীন। আবার গোলকৃমিরা নিমাটোহেলমিন্থিস পর্বের প্রাণী। অনেলিডা (Annelida) পর্বের প্রাণীতেই প্রথম দেহকে খণ্ড খণ্ড ভাগে বিভক্ত দেখা গেল। কেঁচো হাতে নিয়ে দেখলে বিষয়টি বোঝা যায়। তেলাপোকা, প্রজাপতি, চিংড়ি ইত্যাদির দেহে পা বা উপাঙ্গ রয়েছে। প্রাণীজগতে প্রথম পা-ওয়ালা প্রাণী আর্থ্রোপোডা (Arthropoda) পর্বের প্রাণী। শক্ত খোলসের ভেতরে গোটানো শামুকেরা মোলাস্কা (Mollusca) পর্বের অন্তর্ভুক্ত। সর্বশেষ পর্ব একাইনোডার্ম্যাটা (Echinodermata)। এদের ত্বকে কাঁটার মতো বস্তু রয়েছে। একাইনো অর্থ কাঁটা,

ডার্ম্যাটা মানে ত্বক। এদের তা হলে কণ্টকত্বকী প্রাণী বলা যায়। তারামাছ দেখলে এ সত্য বোঝা যায়।

ত. চ.

অম্বুবাচী

অম্বুবাচী বলতে বোঝায় উর্বরা ধরিত্রী বা ধরিত্রীর উর্বরাকাল। এটি প্রাচীন বিশ্বাস থেকে গড়ে ওঠা একটি কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান। ৬ই থেকে ১০ই আষাঢ় চার দিন বাংলার মহিলারা এই অনুষ্ঠান পালন করেন। মাটি খোঁড়া ও চাষবাসের কাজ এই সময় নিষিদ্ধ। বিধবা মহিলাদের কিছু বিধিনিষেধও তখন মেনে চলতে হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ কয়েক প্রকার পিঠে-পুলি বানাবার নিয়ম চালু আছে।

সুজ. ব.

অম্ল অ্যাসিড দ্র

অয়দিপাউস্‌ ঈডিপাস দ্র

অরণ্যষষ্ঠী

হিন্দুদের একটি ব্রত পূজার তিথি। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লষষ্ঠীতে এটি পালন করা হয়। পুত্র-কন্যা–জামাতার কল্যাণ কামনা করে স্ত্রীলোকেরা বনে গিয়ে সন্তানরক্ষাকারিণী দেবী বিন্ধ্যবাসিনী ষষ্ঠীর উদ্দেশ্যে পূজা দেয়। পূজার ফলমূল-মিষ্টান্ন পরে সন্তান ও সন্তানস্থানীয়দের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ষষ্ঠীদেবীকে যেসব ফলমূল ও মিঠাই উপহার দেওয়া হয়, তার সংস্কৃত নাম বায়ন অর্থাৎ বায়না বা বাঁটা। সম্ভবত এই অর্থ থেকেই পূজার উপকরণগুলো জামাতা ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত হয়েছে। এর সঙ্গে সামর্থ্য অনুসারে নতুন কাপড়ও উপহার দেওয়া হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠান 'জামাইষষ্ঠী' নামেও পরিচিত।

সুজ. ব.

অরন্ধন

আনুষ্ঠানিকভাবে রান্নাবান্না বর্জনের নাম অরন্ধন। জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাসে, গঙ্গাপূজার দিন ও সরস্বতী পূজার পরের দিন এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি (মাসের শেষ দিন) অরন্ধনের দিন, এই অরন্ধনব্রতের নাম বৃদ্ধারন্ধন। আগের দিনের রান্না এই দিনে খেতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাপূজার দিন এই অরন্ধনব্যবস্থা হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (দ্র) উপলক্ষে আশ্বিন সংক্রান্তিতে অরন্ধন অনুষ্ঠানের প্রবর্তন হয়। এই দিন বঙ্গভঙ্গের জন্য দুঃখ প্রকাশের উপবাস হয় এবং রাখিবন্ধনের (দ্র) ব্যবস্থা হয় দুই বাংলার মিলনের উদ্দেশ্যে।

পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) অরন্ধন ব্যবস্থা শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে এবং কার্তিক সংক্রান্তির দিনে। সরস্বতী পূজার পরের দিনও এই ব্যবস্থা হয়। আবার ভাদ্র মাসের যে কোনো দিন অরন্ধন হলে তাকে বলে ইচ্ছা-অরন্ধন। বর্তমানে এসব প্রথা প্রায় উঠে গেছে।

বি. ব.

অরবিন্দ ঘোষ [১৮৭২—১৯৫০]

ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতা, যোগী ও দার্শনিক। ১৮৭২ সালে কলিকাতায় (দ্র) জন্ম। পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র। শৈশবেই শিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হয় এবং সুদীর্ঘ ১৪ বছর লণ্ডন ও কেম্ব্রিজে থেকে পড়াশোনা শেষ করেন। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার লিখিত অংশে ভাল ফল করেন। কিন্তু অশ্বারোহণ পর্বে অনুপস্থিত থাকায় চাকুরি পান নি। ১৮৯৩ সালে দেশে ফিরে বরোদা কলেজে প্রথমে অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষ হন। ভারতীয় ভাষা ও সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। বরোদা থাকাকালীন তিনি ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদীদের সংস্পর্শে আসেন ও তাঁদের সঙ্গে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। ছোটভাই বারীন্দ্রকুমারকেও বিপ্লবের দীক্ষা দেন। বিপ্লবী দল গঠন করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে (দ্র) যোগ দেন এবং গোপন সন্ত্রাসীদের সংগঠিত করেন। ১৯০৬ সালে তিনি বরোদা ত্যাগ করে

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের নতুন কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেন। এই সময়েই অরবিন্দ তৎকালীন স্বরাজ বা স্বাধীনতাকামী চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী দলের সম্মানিত নেতা হিসাবে অহিংস প্রতিরোধের পক্ষে মতবাদ গড়ে তোলেন। ইংরেজি দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' ছিল তাঁর দলের মুখপত্র। ১৯০৮ সালে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে অরবিন্দ গ্রেফতার হন। এক বছর বন্দিজীবন কাটিয়ে ১৯০৯ সালে মুক্তিলাভ করেন। এই সময়ে তাঁর মানসিকতা পরিবর্তিত হয়। তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচার ও এই লক্ষ্যে জাতীয় দল সংগঠনে মনোযোগী হন। তাঁর সম্পাদনায় ইংরেজি সাপ্তাহিক 'কর্মযোগিন' এবং বাংলা সাপ্তাহিক 'ধর্ম' প্রকাশিত হয়। ১৯১০ সালে তিনি সব কর্মতৎপরতা ত্যাগ করে পণ্ডিচেরিতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে যোগসাধনায় নিরত হন। তখন থেকে রাজনীতি নয়, অধ্যাত্মজীবনের পূর্ণ বিকাশই তাঁর জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর ভক্ত শিষ্য শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও ছিল। ইংরেজি দার্শনিক সাময়িক পত্র 'আর্য'তে তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর ধর্মীয় দর্শনের মাধ্যমে তিনি শুধু উপমহাদেশেই নন, পাশ্চাত্যেও ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে 'Essays on the Gita', 'The Foundations of Indian Culture' 'The Life Divine', 'The Significance of Indian Art', 'Lights on Yoga', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর সমস্ত রচনাই ইংরেজিতে লিখিত।

মে. খা.

অরোরা বোরিয়ালিস (aurora borealis)

উত্তর গোলার্ধ, বিশেষ করে মেরুবৃত্তের ভেতরকার অঞ্চলে দীর্ঘ রাতের আকাশে দেখা দেয় এক রকম আলোকছটা। এটি অরোরা বোরিয়ালিস, 'উত্তরা আলো' অথবা 'মেরুজ্যোতি' নামে পরিচিত। এতে আকাশ জোড়া নানা রঙের আলোর খেলা হঠাৎ-হঠাৎ ছটা দিয়ে যায়। কখনো বহু রেখা, কখনো বহু ফিতার সমন্বয়ে এটি যেন আকাশে আঁকাবাঁকা নকশিকাঁথার পর্দা রচনা করে। মেরুবৃত্তের ভেতরে নিত্যকার ঘটনা হলেও এর বাইরে অনেক কম অক্ষাংশেও এটি মাঝে মাঝে দেখা গেছে। দক্ষিণ গোলার্ধে অনুরূপ আলোকে বলা হয় অরোরা অস্ট্রালিস (aurora australis)। রোমান উপকথায় অরোরা হচ্ছেন ভোরের দেবতা।

অরোরা বোরিয়ালিস

মনে করা হয়, মহাশূন্য থেকে বৈদ্যুতিক চার্জসম্পন্ন যেসব অসংখ্য কণিকা নিত্য বর্ষিত হয়, তাদের সঙ্গে পৃথিবীর (দ্র) বায়ুমণ্ডলের কণিকার সংঘর্ষের ফলেই অরোরা সৃষ্টি হয়। টিউব লাইটের (দ্র) মধ্যে যেভাবে আলো উৎপাদিত হয় প্রক্রিয়াটি অনেকটা সেরকম। চার্জসম্পন্ন কণিকাগুলোর উপর পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের (দ্র) প্রভাবে দুই মেরুর কাছেই এটি বেশি দেখা যায়। সৌর কলঙ্কের পর্যায়ক্রমিক উথলানোর সঙ্গে অরোরা বৃদ্ধির একটি সম্পর্ক লক্ষ করা গেছে।

মু. ই.

অর্কেস্ট্রা

ঐকতান বাদন। পাশ্চাত্যে বিকাশপ্রাপ্ত মিলিত যন্ত্রসঙ্গীত বাদনের একটি বিশিষ্ট রূপ। ১৬০০ সাল থেকে অর্কেস্ট্রা বাদনের প্রথম যুগ বা অভিব্যক্তিপূর্ণ বাদন-রীতির সূচনা। অর্কেস্ট্রা বাদনে বাখ (দ্র) ও হাণ্ডেল যুগরূপে কথিত দ্বিতীয় যুগের সূচনা ১৭০০ সালের পরবর্তী সময় থেকে। ১৮০০ সালের পর থেকে অর্কেস্ট্রার আধুনিক যুগের সূচনা। বিশ শতকের প্রথম দিকে অর্কেস্ট্রা বাদনের নিরীক্ষামূলক যুগের সূচনা ঘটে। অর্কেস্ট্রাযন্ত্র-বিন্যাস প্রধানত চার ভাগে বিভক্ত : স্ট্রিং, উডউইণ্ড, ব্রাস ও পার্কাশন। অর্কেস্ট্রায় স্ট্রিং

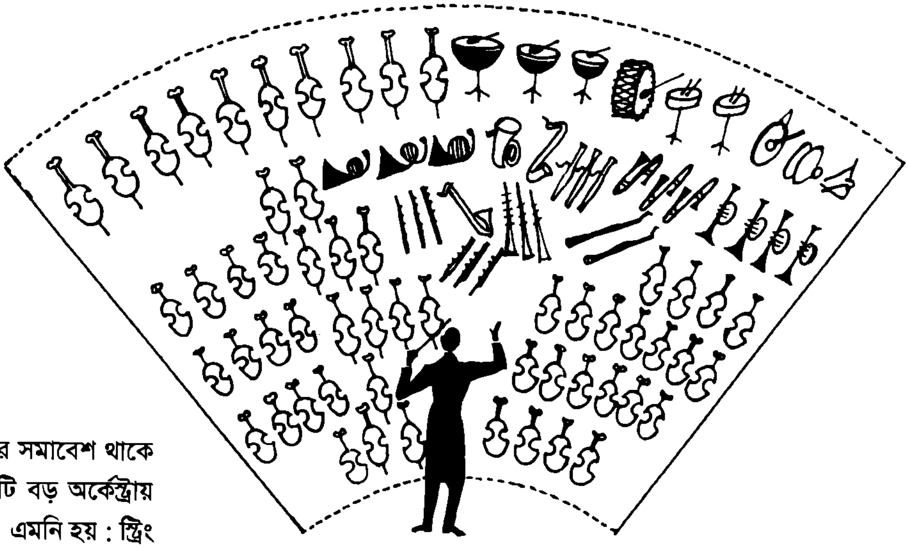

বা তারযন্ত্রের সমাবেশ থাকে বেশি। একটি বড় অর্কেস্ট্রায় যন্ত্রসমাবেশ এমনি হয় : স্ট্রিং শাখায় ফার্স্ট ভায়োলিন ১৮, সেকেণ্ড ভায়োলিন ১৫, ভায়োলা ১২, ভায়োলেঞ্চেলো ১২, ডাবল বেস ৯; উডউইণ্ড শাখায় ফ্লুট ৩, পিকোলো ১, ওবো ৩, ইংলিশ হর্ন ১, ক্ল্যারিওনেট ৩, বেস ক্ল্যারিওনেট ১, ব্যাসুন ১, ডাব্‌ল্ ব্যাসুন ১; ব্রাস শাখায় হর্ন ৪ বা ৬, ট্রাম্পেট ৪, ট্রম্বোন ৩, ট্যুবা ১; পার্কাশন শাখায় কেট্‌ল্‌ড্রাম ১, ২ থেকে ৪টি বেস ও সাইড ড্রাম, সেলেস্টা, জাইলোফোন, ট্রায়াঙ্গেল, সিম্ব্যাল, ট্যাম্বুরিন প্রভৃতি। কখনো কখনো অর্কেস্ট্রায় হার্প, অর্গ্যান, পিয়ানো প্রভৃতি যন্ত্রের সমাবেশ ঘটানো হয়ে থাকে। অর্কেস্ট্রাবাদন যিনি পরিচালনা করেন তাঁকে বলা হয় কণ্ডাক্টর। তিনি তাঁর সামনে রাখা স্কোরে বর্ণিত অর্কেস্ট্রার সঙ্গীতনির্দেশ সম্পন্ন করেন। অর্কেস্ট্রার একটি কেন্দ্রীয় বিষয় থাকে। যন্ত্রবাদনের সাহায্যে এই বিষয়টি আদায় করা কণ্ডাক্টরের মূল দায়িত্ব। অর্কেস্ট্রার জন্য রচিত 'সোনাটা'কেই বলা হয় সিম্ফনি (দ্র)।

ক. গো.

অর্গ্যান (organ)

শুষির শ্রেণীর বিখ্যাত পাশ্চাত্য সঙ্গীতযন্ত্র। দেখতে অনেকটা বাক্সের মতো। এর ওপরের দিকে স্বরপর্দাসমূহ অক্টেভক্রমে সাজানো থাকে। পর্দায় টিপ দিলেই ধ্বনি বাজে। পর্দাগুলো সাদা ও কালো দুই রঙের হয়। সাদা পর্দা টিপলে শুদ্ধ স্বর ধ্বনিত হয় এবং কালো পর্দা টিপলে কোমল স্বর। ধাতব নলে বায়ু (দ্র) প্রবেশ করিয়ে অর্গ্যানে ধ্বনি সৃষ্টি করা হয়। অক্টেভক্রমে নলের ব্যাস মোটা বা চিকন হয়। অর্থাৎ ধ্বনি চড়া থেকে খাদের দিকে আসতে থাকলে নলের ব্যাস ক্রমে মোটা হতে থাকে বা খাদ থেকে চড়ার দিকে যেতে থাকলে নলের ব্যাস ক্রমে চিকন হতে থাকে। দুই ধরনের নল হয়। নল স্বর-ছিদ্রযুক্ত ফ্লুনল হয়, আর রিডযুক্ত নলের ব্যবহারও আছে। পূর্বে বেলো চেপে নলে বায়ু প্রবেশ করানো হত। বর্তমান কালে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় বায়ু চালনা করা হয়ে

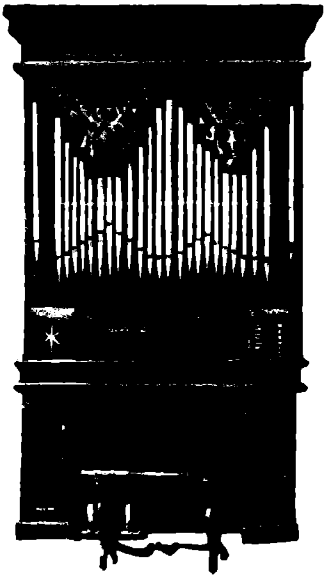

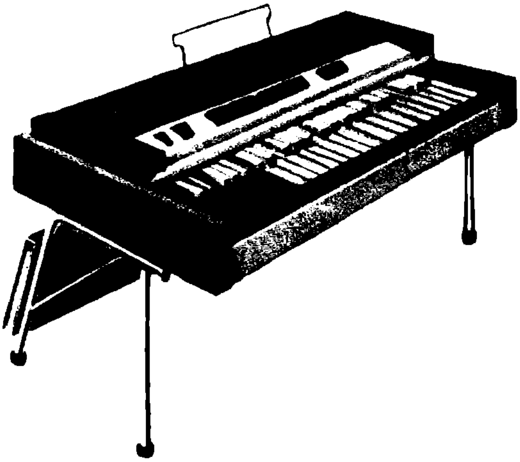

উপরে : দু'ধরনের অর্গ্যান ও নিচে : বৈদ্যুতিক অর্গ্যান

থাকে। এখনকার দিনে অর্গ্যান নির্মাণকৌশলের অভাবিত উন্নতি হয়েছে। একটি আধুনিক বহু উদ্দেশ্যসাধক অর্গ্যানে সঙ্গীত সৃষ্টির বহুবিধ সুযোগ আছে। আধুনিক অর্গ্যানে রিদ্‌ম্‌বক্স বা তালবাদনী থাকে। সাধারণ আকারের অর্গ্যানে পাঁচ অক্টেভ থাকে। বৃহদাকার অর্গ্যানের অক্টেভসংখ্যা আরো বেশি। পাশ্চাত্যে কণ্ঠসঙ্গীতের বিশেষ সহযোগী হিসাবে অর্গ্যান বাজানো হয়ে আসছে।

অর্গ্যান প্রাচীন যন্ত্র (দ্র)। খ্রিস্টের জন্মের পূর্বেও এই ধরনের সঙ্গীতযন্ত্রের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে গির্জায় প্রার্থনাসঙ্গীতের সঙ্গে অর্গ্যানবাদন

প্রচলিত হয়। সে সময় স্পেনে গির্জায় অর্গ্যানবাদন বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। ৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে পোপ ভিটালিয়ান অর্গ্যানের সাধারণ ব্যবহার অনুমোদন করলে সারা ইউরোপে অর্গ্যানবাদনের বিস্তার ঘটে এবং এর নির্মাণকৌশল নিয়ে নানা চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। দশম শতাব্দীতে উইনচেস্টার ক্যাথিড্রেল-এ এক অতি বৃহৎ অর্গ্যান নির্মিত হয়। ৪০০ নলযুক্ত এই অর্গ্যানে বায়ু প্রবেশ করানোর জন্য ৭০ জন লোককে বেলো চাপতে হত। একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতক জুড়ে অর্গ্যান নির্মাণে নানা উৎকর্ষ সাধিত হয়। চতুর্দশ শতকে এসে অর্গ্যানে স্বরযোজনার কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়। সে সময়ই সেমিটোন ধ্বনিত করার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় ও স্বাধীন বাদনের জন্য অর্গ্যানের ব্যবহার প্রশস্ত হয়। এর আগে শুধু গানের সঙ্গে অর্গ্যান বাজানো হত। পঞ্চদশ শতকে এসে অর্গ্যানে রিডের ব্যবহার ঘটে। সপ্তদশ শতকে জার্মানিতে যে উন্নত মানের অর্গ্যান নির্মিত হয় তাকেই আধুনিক অর্গ্যানের পূর্বসূরি হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

ক. গো.

অর্জুন গাছ

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র অর্জুন গাছ রয়েছে। অর্জুন গাছ নানা ধরনের রোগ নিরাময়ের কাজে আসে বলে মানুষ এই গাছ লাগায়। গাছটি বেশ বড় হয়। এর কাণ্ড দীর্ঘ, সরল, উন্নত, মসৃণ। বাকল ধূসরাভ ও পাতলা। বাকলের নিচের রঙ পাংশু। গাছের শাখাগুলো উর্ধ্বমুখী, দীর্ঘ। গাছের শীর্ষদেশ ছত্রাকৃতির, প্রসারিত ও ছায়াঘন। ভূমির কাছাকাছি কাণ্ড খাঁজযুক্ত। অর্জুনের পাতা লম্বা ডিম্বাকৃতির। পাতা একটু পুরু ও মসৃণ। অর্জুন পত্রমোচী বৃক্ষ। অর্থাৎ শীতে পাতারা ঝরে পড়ে, বসন্তে নতুন পাতা গজায়। সেই সঙ্গে গাছে ফুল আসে। ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় গাছ। ছোট ছোট হালকা হলুদ ফুল। উগ্রগন্ধী বা দুর্গন্ধযুক্ত ফুল। মৌমাছিদের খুব প্রিয় অর্জুনের ফুল। ফুল থেকে ফল হয়। ফল ডিম্বাকৃতির। এতে পাঁচটি খাঁজ থাকে। ফল বেশ শক্ত। ধরেও অজস্র। গাছের তলা ফলে ফলে ভরে যায়। অর্জুন গাছের কাঠ বেশ শক্ত, কিন্তু আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য উপযুক্ত নয়। নৌকা, ঘরের চৌকাঠ, পাল্লা ও গরুর গাড়িতে

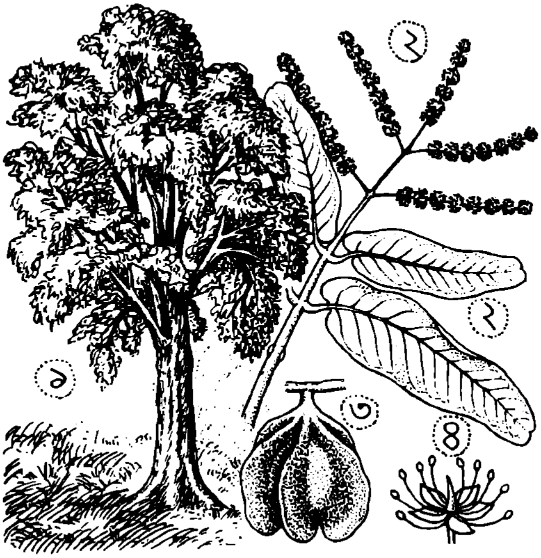

অর্জুন গাছ। ১. গাছের আকৃতি ২. পাতা ও মঞ্জরী ৩. ফল ৪. ফুল

এই কাঠ ব্যবহার করা যায়। এর পাতায় তসর পোকার চাষ হয়। চামড়া প্রক্রিয়াকরণ বা ট্যানিং এবং রঞ্জন পদার্থে বাকল ব্যবহৃত হয়। অতি প্রাচীনকাল থেকে আয়ুর্বেদী চিকিৎসায় এই গাছ ব্যবহার করা হচ্ছে। হৃদ্‌রোগে খুব সুফলদায়ক বলে প্রমাণিত। বিশেষ করে এর বাকলই ভেষজ হিসাবে কাজে লাগে। বাকল পানিতে ভিজিয়ে রাখলে বাকলের কষ পানিতে মেশে। রোগীকে এই কষ-মেশানো পানি পান করানো হয়। এ ছাড়া অরেচক, ক্ষত ও রক্তশূন্যতায় অর্জুন খুব উপকারী। অর্জুনের বাকল থেকে ঔষধ (দ্র) তৈরি হয় বলে মানুষ গাছটির বাকল প্রায়ই ছাড়িয়ে নেয়। অতিরিক্ত বাকল ছিলে নিলে গাছের ক্ষতি হয়।

ত. চ.

অর্থোপেডিক্স (orthopedics)

চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি শাখা অর্থোপেডিক্সের পত্তন করেন ফরাসি শল্যবিদ নিকোলাস আন্দ্রে। শিশুদের পঙ্গুত্ব ও অঙ্গবিকৃতির চিকিৎসা সম্পর্কে ১৭৪১ সালে প্রকাশিত তাঁর বইটিতেই প্রথম এই শব্দটির ব্যবহার। এটি গ্রিক শব্দ, অর্থ শিশুদের সোজাভাবে লালন করা।

অর্থোপেডিক্স এখন শিশুপঙ্গুত্ব সংশোধনের চেষ্টাতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সব বয়সী মানুষের দেহকাঠামোর বিভিন্ন অংশ, যেমন—অস্থি (দ্র), পেশি (দ্র), অস্থিসন্ধি, টেণ্ডন ইত্যাদির নানা রোগ, গঠনবিকৃতি, আঘাতজনিত ক্ষয়-ক্ষতি, টিউমার (দ্র) ইত্যাদির চিকিৎসা অর্থোপেডিক্সের অন্তর্গত।

চিকিৎসার এই ব্যবস্থাটি খুবই পুরানো। প্রাচীন মিশরীয়, ভারতীয় এবং গ্রিক চিকিৎসকদের হাতে অস্থিভঙ্গের ব্যবস্থার মাধ্যমে এই চিকিৎসারীতির সূচনা।

দীর্ঘকাল পর বিশেষ ব্যবস্থাসহ প্রথম অর্থোপেডিক্স হাসপাতাল স্থাপিত হয় সুইজারল্যাণ্ডে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে। এরপর প্রথমে বার্মিংহামে, পরে লণ্ডনে এ ধরনের বিশেষ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে অর্থোপেডিক্স চিকিৎসার প্রযুক্তিগত উন্নতির মধ্য দিয়ে টেণ্ডন পুনঃস্থাপন, ছিন্ন স্নায়ুসূত্র সংযোজন ইত্যাদি নানা ধরনের চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্ভাব্য পঙ্গুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। আমাদের দেশে অর্থোপেডিক্সের এখনো শৈশব-অবস্থা।

আ. র.

অর্হৎ ও অর্হত্ব

নির্বাণ (দ্র) বৌদ্ধধর্মের (দ্র) পরম লক্ষ্য। নির্বাণ লাভের শেষ ধাপে উপনীত তৃষ্ণামুক্ত ভিক্ষু বা ব্যক্তিকে বৌদ্ধধর্মে 'অর্হৎ' বলা হয়। অর্হৎ মাত্রই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য রিপুজয়ী। তিনি জীবনের যাবতীয় ব্রত সম্পন্ন করেছেন, জাগতিক সকল দুঃখ থেকে মুক্ত, সকল ভাবনামুক্ত, সম্যক জ্ঞানের অধিকারী এবং নির্বাণসুখও তিনি ক্ষণে ক্ষণে উপলব্ধি করতে সক্ষম। ইতঃপূর্বে তিনি নির্বাণ লাভের সকল স্তর অতিক্রম করে এসেছেন। সকল প্রকার আসক্তি থেকেও তিনি মুক্ত।

স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোনো বয়সে এবং গৃহী বা গৃহত্যাগী যে কেউ অর্হত্ব লাভে সক্ষম। বুদ্ধের সঙ্গে এক জন অর্হতের পার্থক্য শুধু এই যে বুদ্ধ কতিপয় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং সর্বজ্ঞ, যা এক জন অর্হতের আয়ত্তের বাইরে। বুদ্ধগণ অর্হত্বের অধিকারী। বৌদ্ধধর্মে গৌতম বুদ্ধ (দ্র) ছাড়া আরো বুদ্ধের আবির্ভাব ও তিরোভাবের কথা আছে। ভবিষ্যতে এক জন বুদ্ধের আবির্ভাব হবে বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা সবাই অর্হৎ ছিলেন। এ জন্য বৌদ্ধ দর্শন ও সাহিত্যে এই বিশেষ অর্থে অর্হৎ ব্যবহৃত হয়। গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের আগে অর্হৎ শব্দের অর্থ ছিল সম্মানীয়, পূজনীয় ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তা ছাড়া তখন সকল সন্ন্যাসীকে এই বিশেষণে অভিহিত করা যেত।

বি. ব.

অলঙ্কৃত পাণ্ডুলিপি

পাণ্ডুলিপি (দ্র) হচ্ছে হাতে লেখা কাগজ বা বই। সর্বপ্রাচীন পাণ্ডুলিপি মিশরে লেখা হয়েছিল প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে প্যাপিরাস (দ্র) নামক নলখাগড়া জাতীয় গাছের ছালে। প্যাপিরাসের কিছু অলঙ্কৃত পাতা থেকে জানা যায় যে খ্রিস্টের জন্মের আগেও নকশাদার হরফ ও ছবি দিয়ে পাণ্ডুলিপি চিত্রিত করার রেওয়াজ ছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে (দ্র) সংরক্ষিত প্যাপিরাস পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত হায়ারোগ্লিফিক লিপি ও মাটির চাকতির ওপর খোদাই করা কিউনিফর্ম লিপির শিল্পচাতুর্য সেকালের লিপিকুশলতা ও শিল্পীমনের সম্যক পরিচয় বহন করে। তবে ছবি আঁকার উপাদান

মাটির চাকতির ওপর কিউনিফর্ম লেখা বা কীলক লিপি

হিসাবে প্যাপিরাস ভাল ছিল না। ভেলাম (vellum, গরুর বাছুরের পাতলা ও মসৃণ চামড়া) আবিষ্কৃত হওয়ার পর পাণ্ডুলিপিতে সত্যিকার রূপসজ্জার সূচনা হয়।

বারো শতক পর্যন্ত বাইবেল (দ্র) ও যিশুখ্রিস্টের (দ্র) জীবনীকে কেন্দ্র করে রচিত পাণ্ডুলিপিতে অলঙ্করণের

পবিত্র কুরআন শরীফের একটি পৃষ্ঠা

তৎপরতা জোরদার থাকে। অঙ্গসজ্জার ক্ষেত্রে আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্যবহৃত আদ্যক্ষরগুলির অলঙ্করণ। রোমান আমলে আদ্যক্ষর আরো বড় হয়েছিল এবং সেগুলি প্রায়ই লাল ও সিঁদুর রঙ দিয়ে অলঙ্কৃত করা হত। অলঙ্করণের এই কাজ বিভিন্ন মঠে করা হত। পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রায় ৮০০ খ্রিস্টাব্দে আইরিশ মঠে তৈরি 'বুক অব কেল্স' এবং উত্তর ইংল্যাণ্ডের সিণ্ডিসফার্ন মঠে প্রায় ৭০০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি বাইবেলের পাণ্ডুলিপি প্রসিদ্ধ। লাল রঙের ভেলাম-এর ওপর রুপালি ও সোনালি অক্ষরে লেখা 'কোডেক্স আর্জেটিয়াস' নামক আর একটি বিখ্যাত পাণ্ডুলিপি বর্তমানে সুইডেনের উপ্সালা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

মধ্য যুগে পাণ্ডুলিপি অলঙ্করণে মুসলমানেরাও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। এ সময় পাণ্ডুলিপি তৈরির জন্য 'খোশনবিশ' নামে বিশেষ এক শ্রেণীর নকলনবিশের সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলামে (দ্র) জীব-জন্তুর ছবি আঁকা নিষিদ্ধ ছিল বলে খোশনবিশেরা তাঁদের শিল্পীসত্তার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন নানা বৈচিত্র্যময় লিপি উদ্ভাবন করে। কুরআন শরীফকে (দ্র) অলঙ্করণের সৌন্দর্যে মণ্ডিত করতে গিয়ে নানা প্রকার লিপিশৈলীর ব্যবহার ঘটে। কুরআন শরীফকে কেন্দ্র করে লিপিশৈলীর বিবর্তন আরবি-ফার্সি ভাষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

খ্রিস্টীয় বা মুসলিম জগতে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যসৃষ্টি ও শিল্পায়নে যে অনুরাগ বা উদ্দীপনা দেখা যায়, তা বাংলা পাণ্ডুলিপিলেখকের বেলায় প্রায় দুলর্ভ। বাংলা ভাষায় (দ্র) লিখিত মধ্য যুগের যে সকল হস্তলিপি পুঁথি আমরা সাধারণত দেখতে পাই, সেগুলো মূলত তাদের বক্তব্য পাঠোদ্ধারের জন্যই পঠিত হয়। পঠন-পাঠনের সেই বিদ্যাকে বিশেষ মূল্য দিয়ে স্বীকৃতিও দেওয়া হয়। কিন্তু পঠিত সেই পাণ্ডুলিপির সৌন্দর্য ও অক্ষরবিন্যাসের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অবশ্য আমাদের পাণ্ডুলিপি এবং লিপিরও অন্য ধরনের নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে সেই বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য দেখতে হবে।

শা. হ.

অলিন্দ রক্তসংবহনতন্ত্র দ্র

অলিভার্ টুইস্ট্ (Oliver Twist)

ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস্ ডিকেন্সের (দ্র) লেখা উপন্যাস (দ্র)। ১৮৩৮ সালে প্রকাশিত হয়।

অলিভার টুইস্ট নামে ন' বছরের একটি বালক, এই কাহিনীর নায়ক; তার নামেই উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে। অনাথ ছেলেটি কয়লাখনির শ্রমিক ছিল আর থাকত এক মহিলার চালানো মেস বাড়িতে আরো অনেক ছেলের সঙ্গে। যৎসামান্য আহার মিলত এবং বিন্দুমাত্র দুষ্টুমি করলেই শাস্তি। কষ্ট সইতে না পেরে অলিভার শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যায়, কিন্তু চোরডাকাতের খপ্পরে গিয়ে পড়ে। অনেক ভাগ্যবিপর্যয়ের পরে সে উদ্ধার পায়।

'অলিভার টুইস্ট'-এর বিশেষত্ব হল উনবিংশ শতকে ইংল্যাণ্ডের জীবনযাত্রা কেমন ছিল তা যথাযথভাবে এখানে অঙ্কিত হয়েছে।

হা. মা.

অলিম্পিক গেম্‌স্ (Olympic Games)

প্রাচীন গ্রিসে দেবতাদের বাসভূমি বলে গণ্য অলিম্পাস পাহাড়ের পাদদেশে দেবতাদের সম্মানার্থে যে খেলাধুলা হত, তাকে অলিম্পিক খেলা বলা হয়। ৭৭৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ হতে চলে ৩৯৬ খ্রিস্টাব্দে এই খেলা বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৮৯৬ সালে ফরাসি দেশের ব্যারন্ পিয়ের্ দ্য কুবের্ত্যাঁর (Pierre de Coubertin : ১৮৬৪–১৯৩৭) (দ্র) উদ্যোগে এই খেলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। সেই অবধি এই খেলা প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯১৩ থেকে ১৯১৯ এবং ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (দ্র) জন্য অনুষ্ঠিত হতে পারে নি।

বাংলাদেশ (দ্র) আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদস্য। ১৯৮০ সালের মস্কোতে (দ্র) অনুষ্ঠিত অলিম্পিক ব্যতীত প্রতিটি অলিম্পিকে সদস্য ও প্রতিযোগী পাঠিয়ে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে আসছে। পরবর্তী অলিম্পিক ১৯৯৬ সালে উত্তর আমেরিকার আটলাণ্টায় এবং ২০০০ সালের অলিম্পিক খেলা হবে অস্ট্রেলিয়ার (দ্র) সিডনিতে।

প্রাচীন কালে পূত গ্রিক রক্তের অধিকারী না হলে কেউ অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করতে পারত না। ১৮৯৬ সালের আধুনিক অলিম্পিক থেকে বর্তমানের সব কয়টি অলিম্পিকে, অলিম্পিকের সদস্য-দেশের যে কোনো প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করতে পারে। অলিম্পিক যতই এগিয়ে যাচ্ছে, এর খেলার বিষয়, খেলোয়াড়সংখ্যা, অংশগ্রহণকারী দেশ ও জাতির সংখ্যা শতাব্দীর প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকগুলোর চেয়ে বেড়ে প্রায় দশ গুণেরও বেশি হয়েছে। ১৮৯৬ সালে মাত্র ১৩টি দেশ অলিম্পিকে যোগ দিয়েছিল আর ১৯৯২ সালের বার্সিলোনা অলিম্পিকে যোগ দিয়েছে ১৭২টি দেশ। তবে বিজ্ঞানের (দ্র) সহায়তায় এবং উন্নত প্রযুক্তি ও অনুশীলন-প্রশিক্ষণের সহায়তায় বিশ্বের সবচেয়ে সেরা এই খেলা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

অলিম্পিকের আসর কোন সালে কোথায় বসেছিল ও বসবে তার তালিকা নিম্নরূপ :

শহরের নাম	সাল	শহরের নাম	সাল
এথেন্স	১৮৯৬	প্যারিস	১৯০০
সেন্ট লুইস	১৯০৪	লণ্ডন	১৯০৮
স্টকহোল্‌ম্	১৯১২	এন্টওয়ার্প	১৯২০
প্যারিস	১৯২৪	আমেস্টার্ডাম	১৯২৮

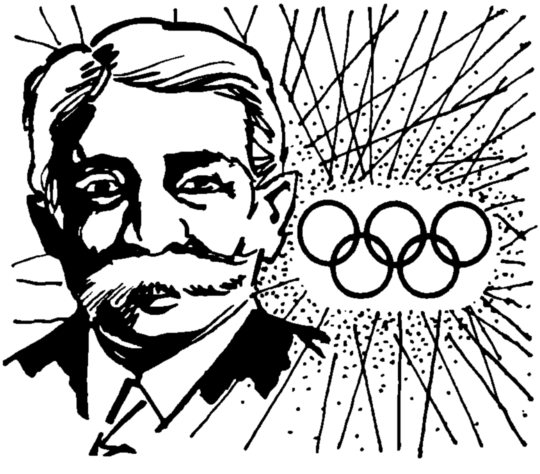

আধুনিক অলিম্পিকের জনক পিয়ের্ দ্য কুবের্ত্যাঁ

লসএঞ্জেলস	১৯৩২	বার্লিন	১৯৩৬
লণ্ডন	১৯৪৮	হেলসিঙ্কি	১৯৫২
মেলবোর্ন	১৯৫৬	রোম	১৯৬০
জাপান	১৯৬৪	মেক্সিকো	১৯৬৮
মিউনিখ	১৯৭২	মন্ট্রিয়েল	১৯৭৬
মস্কো	১৯৮০	লসএঞ্জেলস	১৯৮৪
সিউল	১৯৮৮	বার্সিলোনা	১৯৯২
অ্যাটলান্টা	১৯৯৬	সিডনি	২০০০

কা. আ. আ.

অলিম্পিক মশাল ও অলিম্পিক পতাকা

অলিম্পিক মশালের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। গ্রিস দেশের অলিম্পিয়াতে জিউস দেবের মন্দিরে এর যাত্রা শুরু। মন্দিরের পুরোহিতের উপস্থিতিতে আতস কাচের সাহায্যে সূর্যরশ্মি দিয়ে এই পবিত্র মশালে আগুন জ্বালানো হত। এক জন ক্রীড়াবিদ নতজানু হয়ে পুরোহিতের সামনে টর্চটি ধরে থাকে। শিখা জ্বলে উঠলে হাতে হাতে সেই অনির্বাণ জ্যোতি এথেন্স পর্যন্ত যায়। সেখান থেকে আবার হাতে হাতে দৌড়ানো রিলে রেসের মাধ্যমে মূল ক্রীড়াভূমিতে ফিরে আসে। যে দেশের উপর দিয়ে টর্চ যাবে সে দেশের অলিম্পিক কমিটির দায়িত্ব থাকে টর্চকে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও রাত্রে কোথাও টর্চ রাখতে হলে সারা রাত তাকে পাহারা দেওয়া। টর্চ বহন করার সম্মান যে দেশের উপর দিয়ে টর্চ যাবে সেই দেশের প্রখ্যাত ক্রীড়াবিদেরাই পাবে। তাদেরই টর্চ বহন করার কাজে নিয়োজিত করা হয়ে থাকে। সাধারণত শেষ ধাপের সম্মান দেওয়া হয় সেই দেশেরই কোনো বিখ্যাত ক্রীড়াবিদকে। সে স্টেডিয়াম ঘুরে এসে অলিম্পিক টর্চের শিখা দিয়ে অলিম্পিকের অখণ্ড জ্যোতিকে জ্বালিয়ে দেয়। যত দিন অলিম্পিক খেলা চলবে তত দিন এই আগুন জ্বলবে। অলিম্পিক খেলার সমাপ্তিতে অলিম্পিকের আগুনও ধীরে ধীরে নিভে গিয়ে সমস্ত ক্রীড়াকাণ্ডের সমাপ্তি ঘটাবে।

অলিম্পিক পতাকা হল ক্রীড়াক্ষেত্রে সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী পবিত্র প্রতীক। এই পতাকা আধুনিক অলিম্পিকের জনক ব্যারন্ পিয়ের্ দ্য কুবের্ত্যাঁর (দ্র) পরিকল্পনায় নির্মিত। এটা ১৯২০ সালে এন্টওয়ার্পের অলিম্পিক থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পতাকাটিতে সাদা জমির উপর পাঁচ রঙের পাঁচটি বৃত্ত আঁকা থাকবে। এই

প্রাচীন অলিম্পিকের কয়েকটি দৃশ্য

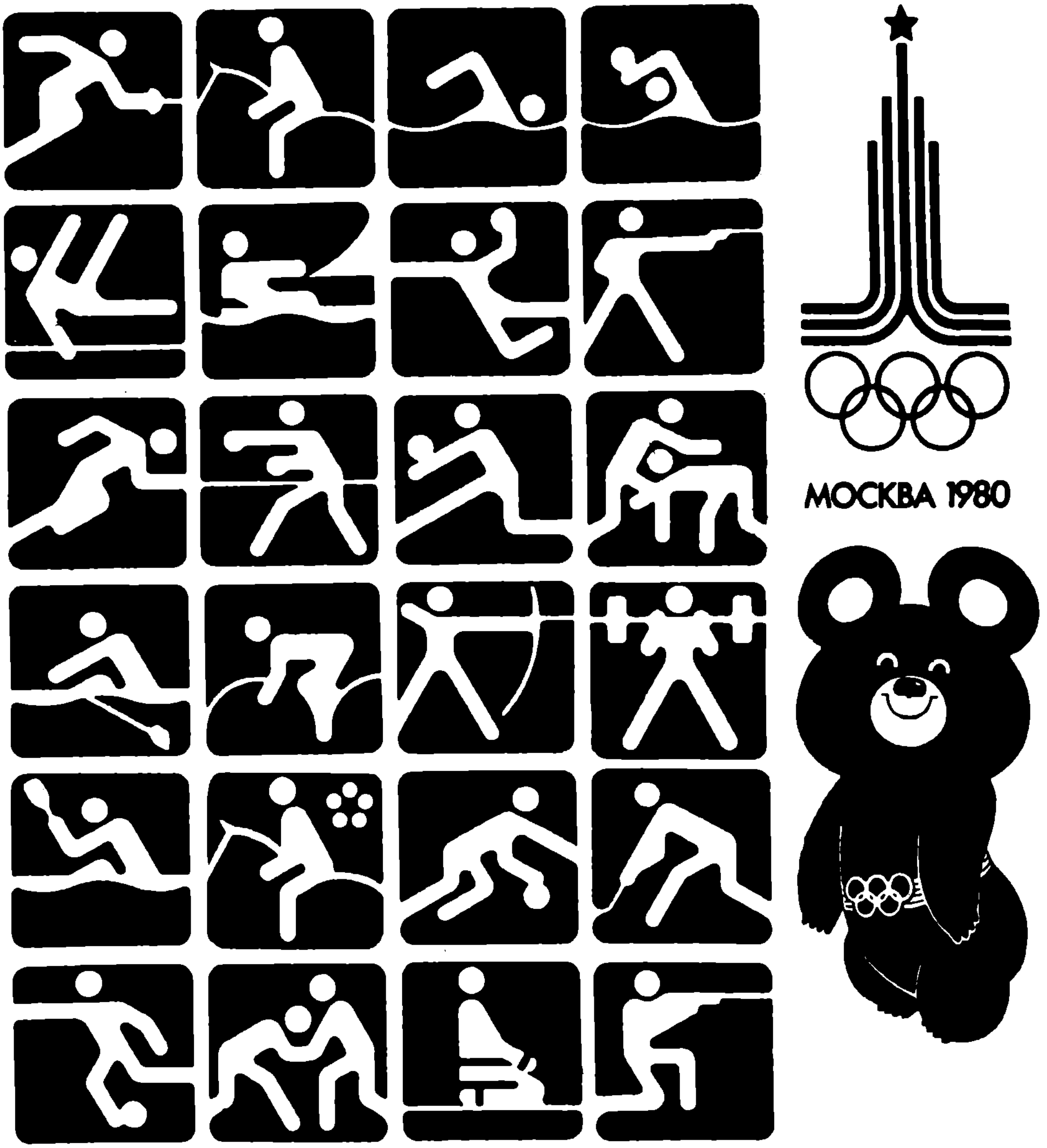

১৯৮০ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকের পিক্টোগ্রাফ।
ডানে উপরে : প্রতীক ও নিচে : মাসকট ভালুক

বৃত্তগুলির রঙ হবে নীল, হলুদ, কালো, সবুজ আর লাল। পৃথিবীর সব দেশের জাতীয় পতাকার রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই রঙগুলি বাছাই করা হয়েছে। এই বৃত্তগুলি সাজাবারও নিয়ম আছে। এই পাঁচটি বৃত্ত হল অ্যান্টার্কটিকা (দ্র) বাদে পাঁচটি মহাদেশের (দ্র) প্রতীক, আর 'সিটিয়াস, অল্টিয়াস, ফর্টিয়াস' (অর্থাৎ 'তুরীয়ান, তুঙ্গীয়ান, বলীয়ান') এই কথা তিনটি লেখা থাকে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি কর্তৃক এই প্রতীকচিহ্নের সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। অর্থকরী কোনো ব্যাপারে এই প্রতীক ব্যবহৃত হবে না।

কা. আ. আ.

অশোক [খ্রি. পূ. ২৭৩—২৩২]

মৌর্যবংশের (দ্র) তৃতীয় সম্রাট। ২৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ক্ষমতায় বসে প্রথমেই তিনি কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য মারা যায়। তা ছাড়া যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি তো আছেই। এই সব দেখে বেদনাহত অশোক ভাবলেন—আক্রমণ নয়, ভালবাসা দিয়েই দেশ জয় করতে হবে।

সম্রাট তখন বৌদ্ধ ধর্মে (দ্র) দীক্ষা নিলেন। প্রচার করতে লাগলেন অহিংসা ও ভালবাসার মন্ত্র। নিজেকে উৎসর্গ করলেন জনগণের সেবায়। এ কারণেই বিশাল ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট হলেন তিনি। প্রজাহিতৈষী সম্রাট দেশের সর্বত্র রাস্তা নির্মাণ, পান্থশালা স্থাপন, পথের পাশে বৃক্ষরোপণের কাজও হাতে নিয়েছিলেন। এক কথায় প্রজারক্ষণই ছিল তাঁর ধর্ম।

অশোকের রাজত্বকাল ছিল প্রায় চল্লিশ বছর। খ্রিস্টপূর্ব ২৩২ অব্দে তিনি মারা যান। অশোক পৃথিবীর এক জন শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি বলতেন, সকল মানুষের সেবা করাই আমার কর্তব্য।

আ. ই.

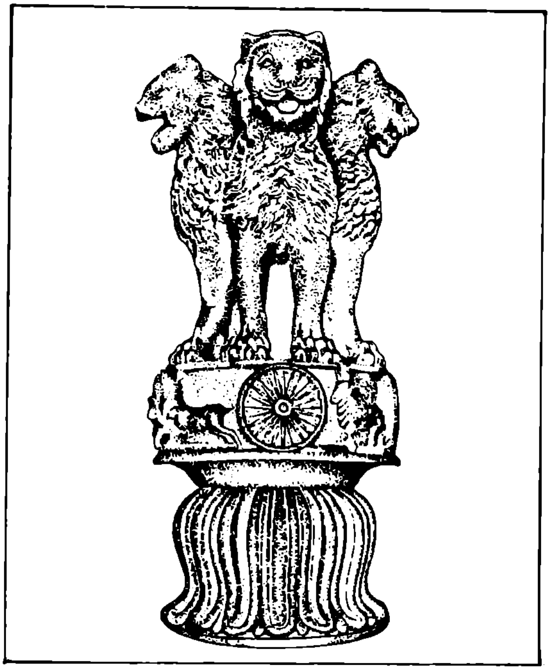

উপরে : অশোকস্তম্ভ ও নিচে : অশোকলিপি

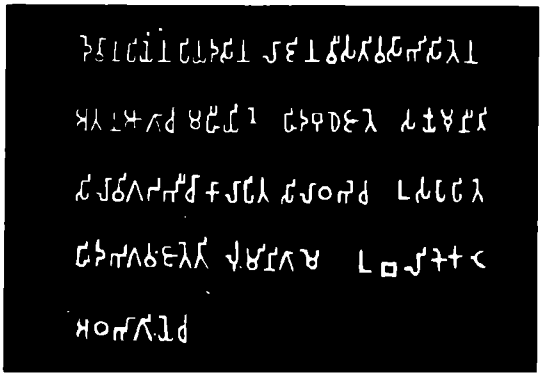

অশোকলেখ/অশোকলিপি

ভারতীয় উপমহাদেশে যেসব প্রাচীন শিলালেখ পাওয়া গেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনগুলো হল মৌর্যবংশীয় রাজা অশোকের (দ্র) সময়ের। অর্থাৎ সে সব খ্রি.পূ. তৃতীয় শতাব্দীর এবং বিশাল পাষাণস্তম্ভ ও বিস্তীর্ণ পাষাণময় পর্বতগাত্রে খোদিত। এগুলোর নাম অশোকলেখ। সেসব লেখমালা পেশোয়ার থেকে শুরু করে মহীশূর এবং কাথিয়াবাড় থেকে ওড়িশা পর্যন্ত প্রায় সারা ভারতবর্ষে পাওয়া গেছে। মহামতি অশোক প্রজাদের মঙ্গলের জন্য এসব শিলালেখ তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র রেখে গেছেন। বৌদ্ধ ধর্ম (দ্র) গ্রহণ করার পর তিনি আর যুদ্ধ করেন নি। যুদ্ধ না করে মৈত্রীপূর্ণ বাণীদ্বারা তিনি সারা ভারতবর্ষকে একত্রিত করেছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যের সাধারণ মানুষ যাতে নীতিকথা ও বুদ্ধের বাণী সহজে পড়তে পারে এ জন্য তাঁর নির্দেশে শিলালেখগুলো বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়। মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ নেই, জীবহত্যা করা অন্যায় ইত্যাদি নীতিকথা এসব শিলালেখের বিষয়। যেসব জায়গায় তাঁর শিখালেখগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো হল পাঞ্জাবের ইয়ুসুফজাই ও হাজারা জেলা, দিল্লি (দ্র), দেরাদুন, সারনাথ, লোরিয়া-মথিয়া-বিহার, বাংলার শাহাবাদ, নেপালের (দ্র) রুম্মিনদেই, ওড়িশা,রাজপুতানা, গিরনার, বোম্বাই, সাঁচী, মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ, মহীশূর ও এলাহাবাদ (দ্র)। ব্রাহ্মী লিপি, খরোষ্ঠী লিপি ইত্যাদি বিভিন্ন লিপিতে এই লেখাগুলো উৎকীর্ণ হয়েছিল।

বি. ব.

অশৌচ

নিকট-আত্মীয়ের জন্ম, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে উদ্ভূত ঘটনার ফলে সাময়িক অশুচি বা অপবিত্রতা দূরীকরণের জন্য হিন্দু ধর্মে অশৌচ পালন করা হয়। এ জন্য সাময়িক অশুচি থেকে শুদ্ধি দরকার। অশৌচকালে ধর্মকাজ করার অধিকার থাকে না। আত্মীয়জনের ঘনিষ্ঠতা, দূরত্ব ও তারতম্য অনুসারে অশৌচ পালনের জন্য সময় নির্ধারিত থাকে। আবার ব্রাহ্মণ ও জাতিভেদেও এই সময়ের তারতম্য হয়। এই হেরফের অনুসারে অশৌচকাল এক মাস, দশ দিন, তিন দিন বা এক দিন মাত্র হয়ে থাকে। মৃত্যুর কারণে অশৌচ পালনের ক্ষেত্রে পুত্র বা পরিবারের অত্যন্ত নিকটজন ক্ষৌরকর্ম ও মাছ-মাংস খেতে পারে না। মৃত্যুজনিত এরকম অশৌচ পালনকারী কারো স্পর্শ করা অন্ন খেতে পারে না। মা-বাবা বা স্বামীর মৃত্যুর পর এক বছর পর্যন্ত ছেলে ও স্ত্রীর দেহ-অশৌচ ও কাল-অশৌচ পালন করতে হয়। কাল-অশৌচে জুতো, ছাতা, খাট-পালঙ্ক, মালা ও অপরের দেওয়া অন্ন গ্রহণ করা যায় না। শরীরের কোনো অংশে রক্তপাত হলে এক দিনের অশৌচ পালনের নাম ক্ষত-অশৌচ। এ ছাড়া এ সম্পর্কে আরো নিয়ম-কানুন আছে।

বি. ব.

অশ্বঘোষ

সংস্কৃত সাহিত্যের অসাধারণ প্রতিভাধর কবি অশ্বঘোষ বৌদ্ধ মহাযান (দ্র) সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বৌদ্ধ দার্শনিকরূপে কীর্তিমান। কাব্য (দ্র), নাটক (দ্র) ও দর্শনগ্রন্থ রচনা করে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও বৌদ্ধ চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। চীনা ও তিব্বতি ভাষায় তাঁর রচনা সেই প্রাচীন কালেই অনূদিত হয় এবং সেই সূত্র থেকেই আমরা অশ্বঘোষের সাহিত্য ও জীবনের পরিচয় পাই।

অশ্বঘোষের জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক সন-তারিখ জানা যায় না। তাঁর আবির্ভাব ও জীবনকাল খ্রিস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে বলে ধরা হয়। তিনি সরযূ নদীর তীরে সাকেত (বর্তমান অযোধ্যা) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম সুবর্ণাক্ষী, কিন্তু পিতার নাম এখন আর জানা যায় না। তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন ব্রাহ্মণ। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রভা নাম্নী এক বৌদ্ধ পরিবারের যুবতীকে তিনি ভালবেসেছিলেন। ধর্মের কারণে তাঁদের বিবাহ হতে পারে নি এবং প্রভা নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করেন। তারপর অশ্বঘোষ বৌদ্ধ ধর্মে (দ্র) দীক্ষা নিয়ে ভিক্ষু হয়ে গৌতম বুদ্ধের (দ্র) বাণী প্রচার ও সাহিত্য রচনায় জীবন উৎসর্গ করেন।

তাঁর তিব্বতি জীবনবৃত্তান্তে জানা যায় যে তিনি যৌবনে সঙ্গীতশিল্পী ও সুরস্রষ্টা ছিলেন। নিজে সঙ্গীত রচনা করে এবং সঙ্গীত ও নাট্যদল নিয়ে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর গানের অন্যতম বিষয় ছিল জীবনের দুঃখ ও ক্ষণস্থায়িত্ব। এইরূপে তিনি বহু মানুষকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরাগী করেছিলেন। হিউএন্-ৎসাঙ (দ্র) লিখেছেন, 'জগৎ আলোকিত করেছে চারটি সূর্য—অশ্বঘোষ, দেব, নাগার্জুন এবং কুমারলব্ধ।'

'বুদ্ধচরিতম্' মহাকাব্য অশ্বঘোষকে অমর করে রেখেছে। 'সৌন্দরানন্দম্' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। 'শারিপুত্র প্রকরণ' তাঁর রচিত নাটক। অন্যান্য রচনার মধ্যে 'বজ্রসূচী' ও 'সূত্রালঙ্কার' অন্যতম। এ ছাড়া তাঁর আরো কয়েকটি বই আছে। তিব্বতে তাঁর নামে আরো কবিতা আছে। এ ছাড়া তিনি 'মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ' নামে একটি দার্শনিক তত্ত্বসমৃদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। 'গণ্ডীস্তোত্রগাথা' নামে একটি গীতিকাব্যের রচয়িতারূপে তাঁর নাম করা হয়।

'সৌন্দরানন্দম্' ও 'বুদ্ধচরিতম্' মহাকাব্য দু'টির সমাপ্তিতে আছে—'মহাকবি, মহাবাগ্মী, ভিক্ষু-আচার্য সাকেতের সুবর্ণাক্ষীর পুত্র অশ্বঘোষ এই মহাকাব্য রচনা করেছেন।'

অশ্বঘোষ সম্রাট কনিষ্কের সভাকবি ও আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন। শুধুমাত্র অশ্বঘোষের কারণেই কনিষ্ক বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির সভাপতি ছিলেন আচার্য বসুমিত্র এবং সহ-সভাপতি ছিলেন অশ্বঘোষ। এ থেকে মনে করা হয় যে অশ্বঘোষের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৫০ অব্দ থেকে খ্রিস্টীয় ৫০ অব্দের মধ্যেই হবে।

বি. ব.

অশ্বত্থ বা পিপ্পল

ডুমুর জাতীয় বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ দ্বিতীয় বৃহত্তম। বট এই পরিবারের সর্ববৃহৎ সদস্য। প্রথম অবস্থায় এই গাছ প্রায়ই অন্য গাছে, ভাঙা দেয়ালে, কার্নিসে, ভাঙা দেউলে জন্মায়।

অশ্বত্থ,
পাতা,
কুঁড়ি ও ফল

পাখির বিষ্ঠার সঙ্গে বীজ ছড়ায় বলে এভাবে জন্মাতে পারে। অশ্বত্থ ও বটের দড়ির মতো শেকড় ক্রমে বড় হয়ে আশ্রয়দানকারী গাছ বা দেয়ালকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। ভাঙা দেউলে বা দেয়ালে এই গাছ সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক। অশ্বত্থকে (উচ্চারণ অশ্‌শথ্‌থো) পিপ্পলও বলে। চলতি বাংলায় আমরা অশ্বত্থকে সর্বদা 'অশথ' বলে থাকি।

ছায়াতরু হিসাবে অশ্বত্থ রাস্তার ধারে রোপণ করা হয়। এই গোত্রের আর একটি গাছ পাকুড়, দেখতে অনেকটা অশ্বত্থের মতোই। অশ্বত্থের বৈজ্ঞানিক নাম *ফিকাস রিলিজিওসা (Ficus religiosa Linn)* গোত্র মোরাসি (Moraceae)। এই ধরনের আর একটি গাছ হল নন্দীবৃক্ষ বা গয়া অশ্বত্থ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *ফিকাস রামফি ব্লুম (Ficus rumphii Blume)*। সারা পৃথিবীতে (দ্র) এই পরিবারের ৬০০ প্রজাতি (species) আছে, বাংলাদেশ-ভারতে আছে ১২ টি প্রজাতি।

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে অশ্বত্থের পাতা ঝরে যায়। এ সময় ও কখনো কখনো একটু পরে ফুল আসে। চৈত্র-বৈশাখে নতুন তামাটে পাতায় গাছ ভরে যায়। কৃচিৎ দু' একটি গাছে সবুজ রঙের পাতা আসে। এই গাছের পাতার আগায় থাকে দীর্ঘ শীর্ষ। অশ্বত্থের পাতা হৃদপিণ্ড আকৃতি। বোঁটা দীর্ঘ বলে হাওয়ায় পত্‌পত্‌ শব্দ করে। তার এই বৈশিষ্ট্য অনন্য। কিছু দিনের মধ্যেই এর পাতার তামাটে রঙ কচি সবুজ ও পরে ঘন সবুজে পরিণত হয়। এ জন্য একে বলে তাম্রপত্রী গাছ এবং এ থেকে সাদা ক্ষীর বের হওয়ার জন্য বলে একে ক্ষীরীবৃক্ষ। এই কষ বা ক্ষীর নানা রোগের ঔষধ (দ্র)। বর্ষার মধ্যে ফল পাকে। ফল পাখিদের প্রিয়। ঢাকার (দ্র) হাইকোর্ট ও চারুকলা কলেজ এলাকায় অনেকগুলো শতবর্ষী অশ্বত্থ আছে।

গৌতম বুদ্ধ (দ্র) এই অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে জ্ঞানলাভ করেছিলেন বলে বৌদ্ধেরা একে বলে বোধিদ্রুম বা জ্ঞান-বৃক্ষ। বুদ্ধগয়ার সেই মূল বোধিদ্রুমের চারা শ্রীলঙ্কায় (দ্র) নিয়ে যান মহামতি সম্রাট অশোকের (দ্র) পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা। সেই গাছটি এখনো শ্রীলঙ্কায় আছে এবং তার চারা পৃথিবীর সারা দেশে বৌদ্ধ বিহার (দ্র) ও প্যাগোডায় (দ্র) রোপণ করা হয়। বাংলাদেশের (দ্র) প্রায় সব বৌদ্ধ বিহারে শ্রীলঙ্কা থেকে আনা বোধিদ্রুম রয়েছে।

অশ্বত্থের পাতা, ছাল, শেকড়, ক্ষীর নানা রোগের মহৌষধ। এ জন্য বলা হয় 'অশ্বত্থ চিরকাল থাকে'।

বি. ব.

অশ্বমেধ যজ্ঞ

প্রাচীন ভারতে সব রাজা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা যজ্ঞ করতেন। অশ্বমেধ সবার মধ্যে প্রধান যজ্ঞ। সন্তান কামনায়, সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হওয়ার আশায়, দেশ জয় করার আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন। নিরানব্বইটি যজ্ঞ করার পর কোনো রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করার অধিকারী হতেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করার উদ্দেশ্যে সর্বসুলক্ষণযুক্ত একটি অশ্ব ছেড়ে দিতে হত। সেই অশ্ব হত মেঘের মতো কালো, সোনার বরণ তার মুখ, দু'পাশে আধখানা চাঁদের মতো চিহ্ন, লেজ বিদ্যুতের শিখার মতো উজ্জ্বল, পেট কুন্দ ফুলের মতো সাদা, পা লাল, কান সিঁদুরের মতো লাল, জিভ আগুনের (দ্র) শিখার মতো, চোখ সূর্যের (দ্র) মতো জ্বলজ্বলে আর বেগ প্রচণ্ড। সেই সর্বসুলক্ষণযুক্ত ঘোড়ার কপালে জয়পত্র বেঁধে ছেড়ে দেওয়া

হত। অশ্বমেধের ঘোড়াকে রক্ষা করার জন্য সৈন্যসহ রাজা সঙ্গে সঙ্গে যেতেন। এক বছর পর্যন্ত এই ঘোড়া পৃথিবীর নানা দেশে খুশি মতো ঘুরতে পারত। তার অগ্রগতি কোনো রাজা রোধ করতে এলে প্রমাণ হত যে তিনি অশ্বের মালিক রাজার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন না। তখন সেই বিরুদ্ধপক্ষীয় রাজার সঙ্গে হত যুদ্ধ। এভাবে অশ্বের অধিকারী রাজা অন্য সমস্ত রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারলে তিনি 'রাজচক্রবর্তী রাজা' উপাধিলাভে সমর্থ হতেন। এক বছর পরে অশ্ব ফিরে এলে শাস্ত্রমতে অশ্বমেধ যজ্ঞের আরম্ভ হত। অশ্বটি তখন শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণেরা বধ করতেন। রাতে রাজার পত্নীরা অশ্বের মৃতদেহ রক্ষা করতেন। যজ্ঞের অধিকারী রাজা অশ্বের বুকের মেদ আগুনে পুড়িয়ে ধোঁয়া গ্রহণ করতেন। যজ্ঞশেষে ব্রাহ্মণেরা পেতেন দক্ষিণা, নিমন্ত্রিত রাজারা ও অন্যান্য অতিথিরা পেতেন যোগ্য উপহার। যজ্ঞের ফলে হয় সব রকম পাপের ক্ষয় ও পরিণামে স্বর্গলাভ। শত বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে পারলে রাজা মৃত্যুর পর স্বর্গের রাজা ইন্দ্র হতে পারতেন। এ জন্য ইন্দ্রের অন্য নাম শতক্রতু। রামচন্দ্র (দ্র) ও যুধিষ্ঠির দুই জনেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

বি. ব.

অশ্বশক্তি

শক্তি (দ্র) পরিমাপের একটি একক। ইংরেজিতে একে বলা হয় হর্সপাওয়ার (horsepower)। ৫৫০ পাউণ্ড ওজনের কোনো বস্তু এক সেকেণ্ডে এক ফুট উঁচুতে তুলতে যে পরিমাণ শক্তি খরচ করতে হয় তাকেই বলে এক অশ্বশক্তি। ডায়নামো, মোটর প্রভৃতি যন্ত্রের কাজ করার শক্তি এই হর্সপাওয়ার বা অশ্বশক্তি এককে প্রকাশ করা হয়। ১ অশ্বশক্তি = ৭৮৬ ওয়াট = ০.৭৫ কিলোওয়াট (প্রায়)।

সু. ব.

অশ্বারোহণ-ক্রীড়া ইকুইস্ট্রিয়ান দ্র

অষ্টশীল শীল দ্র

অষ্টাবক্র

বিখ্যাত মহর্ষি অষ্টাবক্র 'সংহিতা' নামক দার্শনিক গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর পিতার নাম কহোড় ও মায়ের নাম সুজাতা বা সুমতি। ভারতীয় পুরাণে কথিত আছে যে অষ্টাবক্র মায়ের গর্ভে থাকতেই পিতার বেদপাঠে ভুল ধরেছিলেন। এতে পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে শরীরের অষ্ট স্থানে বক্র হয়ে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দেন। কারণ ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই যখন তার স্বভাব বাঁকা, তখন ভূমিষ্ঠ হলে যেন তার দেহের আটটি স্থান বাঁকা হয়। যথাসময়ে জন্মের পর দেখা গেল, শিশুর আটটি অঙ্গ বাঁকা। এ জন্য নাম হল অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্রের জন্মের আগেই পিতা কহোড় জনকরাজার সভাপণ্ডিতের কাছে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হয়ে বন্দি হন। পরাজিত হয়ে তিনি তর্কযুদ্ধের শর্ত অনুযায়ী পানিতে আটক ছিলেন। অষ্টাবক্র বারো বছর বয়সে মায়ের কাছে পিতার দুরবস্থার বিবরণ জানতে পারেন। তখন অষ্টাবক্র মামার বাড়িতে থেকে বিদ্যাশিক্ষা করতেন। অষ্টাবক্র মামা শ্বেতকেতুর সঙ্গে জনকরাজার সভায় গিয়ে পিতার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে বিজয়ী পণ্ডিতকে তর্কে পরাজিত করে পিতাকে উদ্ধার করে আনেন। তখন পিতা কহোড় সন্তুষ্ট হয়ে অষ্টাবক্রকে সমঙ্গা নদীতে স্নান করতে আদেশ দেন। নদী থেকে স্নান করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়ে গেলেন সুন্দর স্বাভাবিক এক যুবক। তাই অষ্টাবক্রের নাম হল সমঙ্গা, অর্থাৎ সুষম অঙ্গসম্পন্ন পুরুষ।

অষ্টাবক্র অনেক পরীক্ষা দিয়ে বদান্য ঋষির কন্যা সুন্দরী সুপ্রভাকে বিয়ে করেন। অষ্টাবক্র জনকরাজাকে যে উপদেশসমূহ দিয়েছিলেন তারই নাম 'অষ্টাবক্র সংহিতা'।

বি. ব.

অসঙ্গ

বৌদ্ধ দর্শনকে চরম বিকাশে উন্নীত করার ক্ষেত্রে আচার্য অসঙ্গের দান অপরিসীম। এই কাজে তাঁর ভাই আচার্য বসুবন্ধুও ছিলেন মহান অংশীদার। অসঙ্গ ও বসুবন্ধু ছিলেন পুরুষপুরের (বর্তমান পেশোয়ারের) পাঠান সম্প্রদায়ের দুই ভাই। দার্শনিক চিন্তা ও বিকাশের ক্ষেত্রে বসুবন্ধুর অবদান আরো বহুমুখী। তাঁদের তৃতীয় ভাই বিরিঞ্চিবৎস-র খ্যাতির কোনো পরিচয় জানা যায় না।

অসঙ্গ তাঁর অধিকতর খ্যাতিমান অনুজ বসুবন্ধুকে স্বীয় মতের অনুরাগী করে তোলেন। অসঙ্গ ছিলেন 'অভিসময়ালঙ্কার' গ্রন্থের প্রণেতা মৈত্রেয়নাথের শিষ্য। অসঙ্গ ছিলেন সাধক। তাঁর দর্শনচিন্তায় তাই সাধনমার্গের পরিচয় মেলে। তাঁর দু'টি রচনা 'মহাযান সূত্রালঙ্কার' ও

'মহাযান সম্পরিগ্রহশাস্ত্র'। এ ছাড়াও চীনা ও তিব্বতি ঐতিহাসিকগণের মতে তাঁর আরো দু'টি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়—'যোগাচারভূমিশাস্ত্র' ও 'মহাযানাভিধর্ম সঙ্গীতিশাস্ত্র'। এ ছাড়া তাঁর আরো একটি বইয়ের টীকার চীনা অনুবাদ (দ্র) পাওয়া যায়। কিন্তু এসব বইয়ের মূল সংস্কৃত বই এখন আর পাওয়া যায় না।

অসঙ্গ ৩৫০ খ্রিস্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তাঁর 'যোগাচারভূমিশাস্ত্র' একটি সুবিশাল গ্রন্থ। এই মহাগ্রন্থটি ১৭টি ভূমিতে বিভক্ত। যেমন- বিজ্ঞানভূমি, মনভূমি, শ্রাবক ভূমি, প্রত্যেক বুদ্ধ ভূমি, বোধিসত্ত্ব ভূমি ইত্যাদি। অসঙ্গকে 'ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী' বলা হয়।

বি. ব.

অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০—১৯২২)

ভারতে (দ্র) ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে অসহযোগ আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অসহযোগ আন্দোলনের জনক ছিলেন মহাত্মা গান্ধী (দ্র)। গান্ধী অহিংসা, অসহযোগ, আইন অমান্য আন্দোলন (দ্র), স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ও বিদেশী পণ্য বর্জনে বিশ্বাসী ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে এদেশবাসীর অসহযোগিতার মাধ্যমে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে সরকারকে জনগণের দাবি মেনে নিতে বাধ্য করা।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য :

১. সরকারপ্রদত্ত খেতাব, পদক ত্যাগ
২. স্কুল-কলেজ বর্জন
৩. আদালত বর্জন
৪. বিলাতি বস্ত্র বর্জন ও দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার
৫. মাদক দ্রব্যাদি পরিহার
৬. শান্তিপূর্ণ পিকেটিং
৭. অভিযুক্ত হলে আত্মপক্ষ সমর্থন না করে কারাবরণ।

অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে কয়েকটি হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজি ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ ঘোষণা করেন।

খু. জা.

উপরে : আসাম বেঙ্গল রেল ধর্মঘটের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিচে : কলিকাতার রাজপথে অসহযোগ আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী

অসহযোগ আন্দোলনের জনক মহাত্মা গান্ধী, শিল্পী : নন্দলাল বসু

আক্রমণাত্মক অসিচালনার খেলা বা তলোয়ার খেলা। এই খেলা তিন ধরনের পদ্ধতিতে হয়—ফয়েল, ইপি এবং স্যাবার। প্রত্যেকটি অস্ত্রের নিজস্ব আইনকানুন, ইতিহাস ও বিশেষত্ব রয়েছে। তবে আধুনিক সব ফেন্সিং বা অসিচালনা প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য হল—তরবারির ভোঁতা মাথা দিয়ে বিপক্ষের দেহের টার্গেট বা নিশান ছোঁয়া।

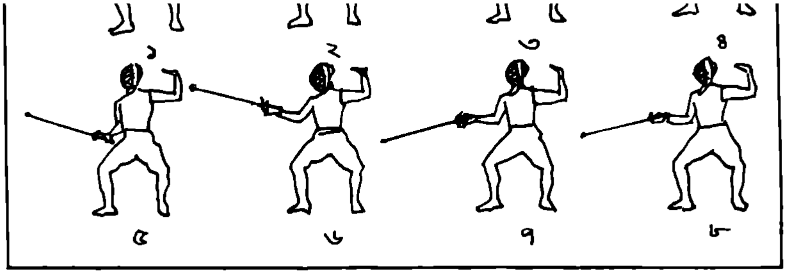

১৮৯৬ সালে প্রথম আধুনিক অলিম্পিক গেম্স্ (দ্র)-এ এটা যুক্ত হয়। ১৯১৩ সালে ফেন্সিংয়ের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন গঠিত হয়। বর্তমানে ৬০টিরও অধিক দেশ এই ফেডারেশনের সদস্য। বারুদ আবিষ্কারের পূর্বে অসিই ছিল মানুষের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত হাতিয়ার। তাই বর্তমানে আগ্নেয়াস্ত্রের যুগেও মানুষ তার অতীত যুগের বন্ধু অসিকে সম্পূর্ণ বাদ না দিয়ে খেলার মাধ্যমে বরণ করেছে। ১৮৯৬ সালের পর থেকে প্রতিটি অলিম্পিক খেলায় পুরুষ ও মহিলাদের ফেন্সিং অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

ফেন্সিংয়ে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দেহের ভারসাম্য, দম, তড়িৎবেগে নড়াচড়ার ও স্থান পরিবর্তনের ক্ষমতা, ধৈর্য ইত্যাদির প্রয়োজন হয়ে থাকে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে আমরা কখনো কখনো ফেন্সিং দেখে থাকি, তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত ফেন্সিংয়ের কোনো শিক্ষাব্যবস্থা বা ক্লাব এ দেশে গড়ে ওঠে নি। এর কোনো ফেডারেশনও এখানে নেই।

কা. আ. আ.

অস্কার সত্যজিৎ রায় দ্র

অস্কার ওয়াইল্ড [১৮৫৪—১৯০০]

উনিশ শতকের শেষ দিকের প্রখ্যাত ইংরেজ লেখকদের অন্যতম। তিনি একাধারে নাট্যকার, কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার ও ছোটগল্প রচয়িতা। জাতিতে আইরিশ। পুরো নাম অস্কার ফিন্‌গাল ও' ফ্লাহার্টি উইল্‌স্ ওয়াইল্ড হলেও কেবল 'অস্কার ওয়াইল্ড' (Oscar Wilde) নামেই তিনি লিখতেন।

জন্ম ডাবলিনে ১৮৫৪ সালের ১৬ই অক্টোবর। সাহিত্যরচনার হাতেখড়ি হয় তাঁর সাহিত্যানুরাগী মায়ের কাছে। পিতা ছিলেন চক্ষুচিকিৎসক।

অস্কার প্রথমে ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে, পরে অক্সফোর্ডের ম্যাগডালেন কলেজে পড়াশোনা করেন। শেষোক্ত কলেজে পড়ার সময় তিনি 'এস্থেটিক মুভমেণ্ট' নামের একটি সাহিত্য-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

তাঁর প্রতিভার খ্যাতি অচিরেই ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষত ১৮৭৮ সালে একটি কবিতা লিখে 'নিউডিগেট' পুরস্কার পেলে। তাঁর অভিনব বেশভূষা, রসাত্মক বাক্‌চাতুর্য এবং রচনাশৈলীতে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা তাঁকে প্রায় কিংবদন্তির চরিত্র করে তোলে। ১৮৮১ সালে তাঁকে কেন্দ্র করে একটি নাটক (দ্র) পর্যন্ত লেখা হয়। ১৮৯৩ সালে লর্ড কুইন্সবেরি নামের এক ঝগড়াটে ব্যক্তি ওয়াইল্ডের নামে মামলা করলে তার রায়ে তাঁর দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কারাবাসকালে তাঁকে ঘোষণা করা হয় দেউলিয়া। জেলজীবনের স্মৃতিজড়িত তাঁর দু'টি গ্রন্থ রয়েছে—'ব্যালাড অব রিডিং জেল' (Ballad of Reading Gaol, ১৮৯৮) এবং 'দে প্রোফুন্দিস (De Profundis)'। শেষোক্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর ১৯০৫ সালে।

দু' বছরের সশ্রম কারাদণ্ড শেষে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য ওয়াইল্ড চলে যান ইতালি ও ফ্রান্স সফরে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হচ্ছে : 'দ
পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে' (১৮৯১) এবং ি
রূপকথা, বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারে যেগুলো অ
হিসাবে বিবেচিত। এ ছাড়া রয়েছে তাঁর কয়ে
নাটক : 'লেডি উইণ্ডারমেয়ার্স ফ্যান' (১৮৯২), 'এ উওম্যান অব নো ইম্পর্টান্স' (১৮৯৩), 'অ্যান আইডিয়াল হাজব্যাণ্ড' (১৮৯৫), 'দ্য ইম্পর্টান্স অব বিয়িং আর্নেস্ট' (১৮৯৫) এবং ফরাসি ভাষায় রচিত 'সালোমে' (১৮৯৩)। এই সব নাটকের বৈশিষ্ট্য হল বাগ্বৈদগ্ধ্য, অতুলনীয় রসবোধ, গভীর সৌন্দর্যস্পৃহা এবং নাটকের পাত্র-পাত্রীদের শাণিত যুক্তিবাদিতা।

আ. হ.

অস্ট্রালোপিথেকাস (Australopithecus)

বহু নৃবিজ্ঞানী মনে করেন যে অস্ট্রালোপিথেকাস হল মানব-জাতীয় জীবের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। এরা আফ্রিকায়

...থেকাস শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ অস্ট্রালিস
...বং গ্রিক শব্দ পিথেকাস (অর্থ 'এপ')
... প্রথম হোমিনিড বলা হয়। হোমিনিড
...সিক মানবসদৃশ জীবদের বোঝায়।

অনেকে চার ধরনের অস্ট্রালোপিথেকাসের অস্তিত্ব চিহ্নিত করেন : ১. অস্ট্রালোপিথেকাস আফারেন্‌সিস (afarensis)—চল্লিশ লক্ষ বছর আগে পূর্ব-আফ্রিকার অধিবাসী ছিল এরা; ২. অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস (africanus)—২৫ লক্ষ বছর আগে এরা দক্ষিণ আফ্রিকায় জীবিত ছিল; ৩. অস্ট্রালোপিথেকাস বোইসেই (boisei)—২৫ লক্ষ বছর আগে পূর্ব-আফ্রিকায় এদের দেখা যেত; এবং ৪. অস্ট্রালোপিথেকাস রোবাস্টাস (robustus)—বিশ লক্ষ বছর আগে ওরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করত।

অস্ট্রালোপিথেকাস সোজা হয়ে দাঁড়াতে এবং দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারত। এরা ছিল চার থেকে পাঁচ ফুট (১২০ থেকে ১৫০ সেন্টিমিটার) দীর্ঘ। আধুনিক মানুষের

অস্ট্রালোপিথেকাস আফারেন্‌সিস, অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানাস, অস্ট্রালোপিথেকাস বোইসেই ও অস্ট্রালোপিথেকাস রোবাস্টাস

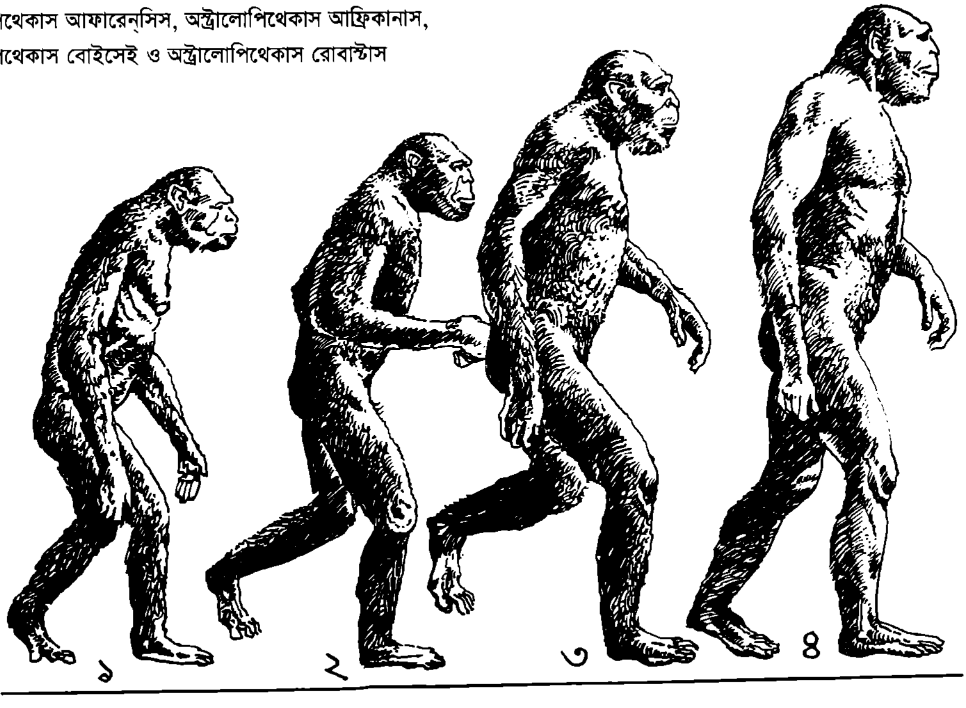

মস্তিষ্কের তিন ভাগের এক ভাগ ছিল এদের মস্তকের পরিমাপ। বহু নৃবিজ্ঞানী মনে করেন, ক্ষুদ্র অস্ট্রালোপিথেকাস থেকেই মানুষের উদ্ভব হয়েছে।

১৯২৪ সালে এদের ফসিল বা জীবাশ্ম প্রথম পাওয়া যায়। অস্ট্রেলীয় নৃতত্ত্ববিদ রেমণ্ড এ. ডার্ট (Raymond Arthur Dart) একটি শিশুর মাথার খুলি দক্ষিণ আফ্রিকায় পান। তিনি একে হোমিনিডভুক্ত জীব বলে মনে করেন, কিন্তু অনেকে আবার একে অবলুপ্ত 'এপ'-এর শেষ চিহ্ন বলে মনে করেন। প্রাপ্ত বিভিন্ন ফসিল থেকে এদের বর্তমানে হোমিনিড (hominid) বলেই বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। ইথিওপিয়া, তান্‌জানিয়া ইত্যাদি অঞ্চলেও এদের ফসিল পাওয়া গেছে। এসব ফসিল দেখে মনে হয় মানবসদৃশ এই সব জীব মানুষ কর্তৃক অস্ত্র তৈরির আরো বহু আগে থেকেই, প্রায় বিশ লক্ষ বছর আগেই, সোজা খাড়াভাবে হাঁটতে পারত।

সৈ. আ. ই.

অস্ট্রেলিয়া (Australia)

পৃথিবীর (দ্র) ষষ্ঠ বৃহত্তম দেশ। অস্ট্রেলিয়া ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং একটি পৃথক মহাদেশ (দ্র)। এর আয়তন ৭৬,৮৬,৮১০ বর্গ কিমি; লোকসংখ্যা ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৪৭ হাজার (১৯৯২); অস্ট্রেলিয়াবাসীরা খ্রিস্টান ধর্মের (দ্র) অনুসারী এবং তাদের মাতৃভাষা ইংরেজি (দ্র)। অস্ট্রেলিয়ার রাজধানীর নাম ক্যানবেরা। মূলত এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো দ্বীপ। এর উত্তরে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে রয়েছে ভারত মহাসাগর (দ্র) আর পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর (দ্র)।

অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে কম জনবসতিপূর্ণ মহাদেশ। লাতিন শব্দ 'অস্ট্রালিস' (যার অর্থ দক্ষিণ) থেকে এসেছে অস্ট্রেলিয়া। দক্ষিণ গোলার্ধে প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর দিয়ে পরিবেষ্টিত এই মহাদেশটির উত্তরে আবহাওয়া (দ্র) খুব উত্তপ্ত আর দক্ষিণে ঠাণ্ডা ও আর্দ্র। এর ভূমিরূপ সবচেয়ে পুরানো। অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর সমতল দেশগুলোর একটি। এর গড় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে থাকে। এখানে জীবনযাত্রা প্রধানত শহরভিত্তিক। ১০০ জন লোকের মধ্যে ৮৫ জনই শহরে বাস করে। অস্ট্রেলিয়ার বনে ক্যাঙারু (দ্র), কোয়ালা (koala), ওমব্যাট (wombat), পস্যাম (possum), ওয়ালেবি (wallaby) ইত্যাদি মার্স্যুপিয়াল (marsupial) জাতীয় প্রাণী দেখা যায়। মার্স্যুপিয়াল হল সেসব প্রাণী যারা পেটের দিকে একটি থলিতে তাদের বাচ্চা বহন করে। ইউক্যালিপটাস অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত দেশজ গাছ। এ ধরনের গাছ মরুভূমি থেকে পাহাড়ী তুষারপাত অঞ্চল পর্যন্ত সব জায়গায় জন্মে থাকে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইউক্যালিপটাসের উৎপত্তি হলেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এ গাছ জন্মায়। পশম, গম ও মাংস উৎপাদনে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বের সব দেশ থেকে এগিয়ে আছে।

এশিয়া (দ্র) মহাদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ার দূরত্ব মাত্র ৩৫০ কিমি। অস্ট্রেলিয়ার আদি অধিবাসীরা ৪৫ হাজার বছর ধরে সেখানে বসবাস করেছে। শিকার করা ও মাছ ধরা তাদের জীবিকা ছিল। ইউরোপীয়দের কাছে প্রথম এ দেশটির অস্তিত্ব ধরা পড়ে। সপ্তদশ শতাব্দীতে একটি ওলন্দাজ জাহাজ এ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। কিন্তু শুকনো, অনুর্বর ভূমিতে বসতি স্থাপনের চিন্তা বাতিল করে দেয়। ১৭৬৮ সালে এই অজানা দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশটির খোঁজে ব্রিটেন ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ কুক্‌কে (দ্র) পাঠায়। ১৭৭০ সালে কুক্ অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলে এসে পৌঁছান এবং এই এলাকাটিকে 'নিউ সাউথ ওয়েলস' (New South Wales) নাম দিয়ে ব্রিটেনের জন্য দাবি করেন। এভাবে ইউরোপীয়দের আগমনে ধীরে ধীরে অস্ট্রেলিয়ার প্রকৃত আদিম অধিবাসীদের বিলুপ্তি ঘটে।

সে. শা.

অস্তিত্ববাদ (existentialism)

আধুনিক দর্শনের একটি বিশেষ চিন্তাধারা। এ দর্শনের মূল বিষয় ব্যক্তির অস্তিত্ব ও স্বাধীনতার প্রশ্নকে ঘিরে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পর জার্মানি ও ফ্রান্সে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র)-সহ পৃথিবীর (দ্র) বিভিন্ন দেশে অস্তিত্ববাদী দর্শনের বিকাশ ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীতে ডেনমার্কের কিয়ের্কেগার্ড (Søren Kierkegaard : ১৮১৩-১৮৫৫) এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জার্মানির কার্ল ইয়েস্পার্স (Karl Jaspers : ১৮৮৩-১৯৬৯) ও মার্টিন হাইডেগার (Martin Heidegger : ১৮৮৯-১৯৭৬) অস্তিত্ববাদী চিন্তার সূত্রপাত করেন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে

ফ্রান্সের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও দার্শনিক জঁ পল্ সার্ত্র (দ্র) এবং আলবের্ কাম্যু (দ্র) অস্তিত্ববাদী চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেন। সার্ত্র ও কাম্যু তাঁদের কয়েকটি উপন্যাস ও নাটকে অস্তিত্ববাদী দর্শনকে অসামান্য শিল্পকুশলতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। সার্ত্র মনে করেন যে প্রকৃত মানুষ নিজেই সব কিছুর নিয়ন্ত্রক। নিজেকে গড়ে তোলার ব্যাপারে তার সচেতন ইচ্ছার বিষয়টি মুখ্য। পরিপার্শ্বের চাপ, ভাবাবেগ বা আকস্মিক যোগাযোগের ফলে যে কর্ম সাধিত হয় তার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা বা দায়িত্ববোধের প্রকাশ ঘটে না। সাফল্য বা ব্যর্থতা নয়, সচেতনভাবে কোনো কাজ স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়াটাই অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল কথা। এক জন মানুষ সচেতন ও স্বাধীনভাবে নিজের পথ বেছে নেওয়ার পর তার যাবতীয় ফলাফল মাথা পেতে নেবে, তার জন্য অন্যকে বা ভাগ্যকে দায়ী করবে না। তবে, এই বেছে নেওয়াটা খামখেয়ালি নয়। মানুষ তার একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতার বোধ সত্ত্বেও তার কাজের জন্য যেমন নিজের কাছে দায়ী, তেমনি দায়ী তার চারপাশের মানুষের কাছেও। তাই এক জন মানুষ যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে শুধু নিজের জন্যই নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্যও ঐ সিদ্ধান্ত নেয়। অন্তত জঁ পল্ সার্ত্র অস্তিত্ববাদী দর্শনকে এভাবেই দেখেছেন। এদিক থেকে অস্তিত্ববাদী দর্শন মানুষের মহত্ত্বকেই তুলে ধরে।

বাংলা সাহিত্যে (দ্র) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস (দ্র) 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) ও 'কাঁদো নদী কাঁদো'র (১৯৬৮) মধ্যে অনেকে অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রভাব লক্ষ করেছেন।

ক. চৌ.

অস্থি (bone)

অস্থি বা হাড় দেহের অন্যতম সংযোজক কলা। দেহের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন এই কোষকলা (দ্র) অস্থিকোষ ও আন্তকৌষিক উপাদানে তৈরি। শেষোক্ত অংশ কোলাজেন ও ক্যালসিয়াম ফসফেট দ্বারা গঠিত। অস্থির কঠিন আবরণটির নাম 'পেরিঅস্টিয়াম'। কাঠিন্য অনুযায়ী অস্থি কঠিন ও স্পঞ্জি—এই দুই ভাগে বিভক্ত।

অস্থিকোষ তিন ধরনের—গঠনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও

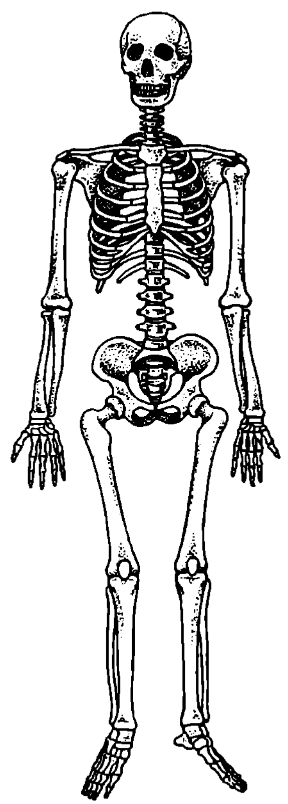

বিনাশকর্তা; এদের নাম যথাক্রমে অস্টিয়োব্লাস্ট, অস্টিয়োসাইট এবং অস্টিয়োক্লাস্ট। এই তিনের সমন্বিত ক্রিয়া অস্থির গঠন ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করে।

অস্থির কাজ একাধিক। দেহকাঠামো গঠনের মাধ্যমে দৈহিক আকৃতি বজায় রাখা, গুরুত্বপূর্ণ দেহযন্ত্রকে (যেমন মস্তিষ্ক) সুরক্ষিত অবস্থানে রাখা, খনিজ পদার্থের (যেমন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস) উৎস হিসাবে কাজ করা, রক্তকোষ তৈরির উৎস লোহিত মজ্জা ধারণ, পেশি চালনায় সাহায্য করা ইত্যাদি। অস্থিগঠন এবং অস্থিসংক্রান্ত যাবতীয় অনুশীলন অস্থিবিদ্যার অন্তর্গত। অস্থির উল্লেখযোগ্য রোগের মধ্যে রয়েছে অস্থির টিউমার, ক্যান্সার ও যক্ষ্মা, রিকেট্স্, অস্টিয়োমায়েলাইটিস ইত্যাদি।

রু. হা.

অস্থিসন্ধিরোগ (joint disease)

দেহের সংযোজক কলা অস্থি ও অস্থিসন্ধির রোগসমূহের শ্রেণীবিন্যাস সন্তোষজনক নয়। সাধারণভাবে এগুলোকে রিউমেটিক রোগ বা বাতরোগ বলা হয়, যদিও এই নামকরণের বিষয়েও সবাই একমত নন। এসব রোগের প্রধান লক্ষণ দেহকাঠামোর বিভিন্ন অংশে ব্যথা ও জড়তা; ফলে সংশ্লিষ্ট অংশের তৎপরতা হ্রাস। বর্তমানে এই সব রোগ প্রধানত রোগতাত্ত্বিক ভিত্তিতে প্রদাহী, বিপাকীয় এবং অবক্ষয়ী এই তিন গ্রুপে চিহ্নিত করা হয়।

প্রদাহজনিত রোগের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ রিউমেটয়েড সন্ধিপ্রদাহ (rheumatoid arthritis) এবং সংক্রমণজনিত সন্ধিপ্রদাহ। বিপাকীয় গোলযোগের কারণে সৃষ্ট রোগের মধ্যে রয়েছে বহুপরিচিত গাউট বা গেঁটে বাত। অন্য দিকে অবক্ষয়ী রোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অস্টিয়োআর্থ্রোসিস (osteoarthrosis) এবং স্পণ্ডাইলোসিস (spondylosis)। এগুলোর প্রাদুর্ভাব মোটেই কম নয়। আমাদের দেশে পরিসংখ্যানের অভাব সত্ত্বেও বিদেশী পরিসংখ্যানে এদের গুরুত্ব বোঝা যায়। ব্রিটেনের মতো স্বল্প জনবসতির দেশেও বছরে দুই কোটি লোক বিভিন্ন ধরনের রিউমেটিক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

রিউমেটয়েড সন্ধিপ্রদাহের কারণ স্পষ্ট নয়। তবে এতে অনাক্রম্যতাত্ত্বিক কারণ বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে বলে আজকাল মনে করা হচ্ছে। সাধারণত হাত-পায়ের আঙুলের সন্ধি এই রোগে আক্রান্ত হয়। সন্ধিগুলো গরম হয়, ফুলে ওঠে এবং নাড়াচাড়ায় ব্যথা অনুভূত হয়। সঙ্গে জ্বরও থাকে। লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে দেখা দেয়; দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সন্ধিগুলোর গঠনবিকৃতি। যে কেনো বয়সে এই রোগ দেখা দিতে পারে। চিকিৎসায় নিরাময় ঘটে না, তবে লক্ষণের সাময়িক উপশম ঘটে এবং রোগের অগ্রগতি কমে আসে।

সংক্রমণজনিত সন্ধিপ্রদাহ আকস্মিকভাবে দেহের যে কোনো সন্ধিতে দেখা দিতে পারে। সন্ধিতে আঘাত বা ইনজেকশান, দেহে অস্ত্রোপচার এবং অনুরূপ পটভূমিতে জীবাণু সংক্রমণের কারণে সন্ধিপ্রদাহ প্রকাশ পায়। জ্বর (দ্র), সন্ধিবেদনা, সন্ধিস্ফীতি সচরাচর লক্ষণ। বিভিন্ন ধরনের জীবাণু এই সংক্রমণে অংশ নিয়ে থাকে। উচ্চমাত্রায় সঠিক এণ্টিবায়োটিকের (দ্র) দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা এবং সন্ধির বিশ্রামে সুফল পাওয়া যায়।

দেহে প্রোটিনজাতীয় পিউরিন উপাদানের বিপাকক্রিয়ার গোলযোগ গাউট-এর প্রধান কারণ। এই রোগে রক্তে (দ্র) ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং তা সন্ধির কোমলাস্থিতে সঞ্চিত হতে থাকে। গাউট কমবয়সীদের রোগ। পরিবেশ ও বংশগত ত্রুটি কারণ হিসাবে গণ্য। হাত-পায়ের, বিশেষ করে পায়ের আঙুলের সন্ধি সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। জানু, গোড়ালি, কনুইসন্ধিও আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত সন্ধি উত্তপ্ত ও রক্তিম হয়ে ওঠে। ফোলা সন্ধিতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। সঙ্গে জ্বর এবং আনুষঙ্গিক লক্ষণ উপস্থিত থাকে। ইউরিক অ্যাসিডের রেচনবর্ধক ও বেদনানাশক ঔষধে রোগের উপশম ঘটে।

অস্টিয়োআর্থ্রোসিস বার্ধক্যের রোগ। মেরুদণ্ড, কাঁধ, জানু ইত্যাদি ভারবহনকারী সন্ধি সর্বাধিক আক্রান্ত হয়। সন্ধির কোমলাস্থি ও অন্যান্য অংশ অবক্ষয়ের প্রভাবে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে রোগের প্রকাশ ঘটায়। ক্ষয়ের পাশাপাশি নতুন অস্থি ও সংযোজক কলার গঠন অস্থিসন্ধিতে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে। অস্টিয়োআর্থ্রোসিসের কারণও সঠিকভাবে জানা যায় না। এ রোগের প্রধান লক্ষণ সন্ধিতে ব্যথা, ক্রমে সন্ধিব্যবহারে অসুবিধা। এই দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত সন্ধির স্বাভাবিক গঠন নষ্ট হয়ে যায় এবং সন্ধি আর ব্যবহারযোগ্য পর্যায়ে থাকে না। চিকিৎসা স্বভাবতই সন্তোষজনক নয়। বেদনানাশক ব্যবহার ও সংশ্লিষ্ট পেশির ব্যায়াম রোগের প্রক্রিয়া বিলম্বিত করে মাত্র। গ্রীবাদেশের কশেরুকায় (দ্র) এই অবক্ষয়ী প্রক্রিয়া সচরাচর দেখা যায়, নাম সার্ভাইকাল (গ্রীবাদেশীয়) স্পণ্ডাইলোসিস। যেমন দেখা যায় কটিদেশের কশেরুকায় (সাধারণ নাম লাম্বাগো), তেমনি কাঁধের সন্ধিতে (shoulder joint)। শেষোক্ত অবস্থাটির সাধারণ নাম 'ফ্রোজেন শোল্ডার'। আক্রান্ত সন্ধিতে এসব ক্ষেত্রে তাপপ্রয়োগ ('আলট্রাভায়োলেট' কিংবা 'সর্টওয়েভ') এবং ব্যায়াম অবস্থা আয়ত্তে রাখে, ব্যথার উপশম ঘটায়।

আ. র.

অস্পৃশ্যতা

কয়েকটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ স্পর্শের অযোগ্য বলে প্রচলিত কোনো কোনো সমাজের একটি সংস্কার বা ধর্মীয়

বিধান। ভারতবর্ষীয় সমাজব্যবস্থায় এই বিধানের সূচনাকাল সঠিকভাবে জানা যায় না। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কূটনীতিবিশারদ মন্ত্রী কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র আগে রচিত 'অত্রিধর্মসূত্রে' ধোপা, চর্মকার, চণ্ডাল, কৈবর্ত, ভিল্ল ইত্যাদি জাতিকে নীচকুলজাত বলা হলেও অস্পৃশ্য বলা হয় নি। সম্ভবত আরো পরে পুরোহিতশাসিত সময়ে এই বিধানের প্রচলন হয়। লক্ষ করা যায়, যেসব জাতির বংশগত বৃত্তি বা পেশার সঙ্গে মানুষ বা পশুর মৃতদেহ বা রক্ত-মল-মূত্রাদির সম্পর্ক আছে, তারাই কেবল প্রাচীন কাল থেকে অস্পৃশ্য বলে গণ্য হতে থাকে। শুধু স্পর্শ নয়, ভারতের (দ্র) বহু স্থানে অস্পৃশ্যের দিকে তাকানো, এমনকি তার ছায়া মাড়ানোও অশুচির পর্যায়ে পড়ে। কোনো মন্দির বা ধর্মশালায় প্রবেশ এবং জনসাধারণের ব্যবহৃত পুকুর, পাতকুয়া বা টিউবওয়েল ব্যবহার অস্পৃশ্যদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। সাইমন কমিশনের ১৯৩০ সালের হিসাব অনুযায়ী ভারতে তখন শতকরা ১৪ জন অস্পৃশ্য ছিল।

ব্রাহ্মণ্য এবং নানা উপজাতির সংস্কার অনুসারেও অস্পৃশ্যতার কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে। যেমন রজস্বলা নারী এবং জন্ম বা মৃত্যু ঘটলে পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা সাময়িকভাবে অস্পৃশ্য বিবেচিত হন।

মহাত্মা গান্ধী (দ্র) অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯৩৫-৩৬ সালে সাধারণ ভোজনালয়ে, মন্দিরে, যানবাহনে, পথেঘাটে অস্পৃশ্যদের সামাজিক অধিকার আইনগতভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। আইনভঙ্গকারীকে দণ্ড দানের বিধানও রয়েছে। তবু নানান সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে ভারতের গ্রাম-সমাজে অস্পৃশ্যতার ঘটনা এখনো ঘটতে দেখা যায়।

সুজ. ব.

অহল্যা

ঋষি গৌতমের পত্নী। এক দিন ইন্দ্র ঋষি গৌতমের রূপ ধরে অহল্যার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে কলুষিত করে। এ সময় গৌতম এসে পড়লে ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে আর অহল্যাকে অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপে অহল্যা সহস্র বছর কেবল বায়ুসেবন করে, সবার কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে গৌতমের আশ্রমে থাকবেন। রামচন্দ্র (দ্র) গৌতমের আশ্রমে পদার্পণ করে অহল্যাকে দর্শন দিলে তিনি শাপমুক্ত হবেন। এভাবে অহল্যা দীর্ঘকাল শাপগ্রস্ত হয়ে গৌতমের আশ্রমে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে থাকেন। পরে রামচন্দ্র বনবাসে এসে দর্শন দিলে তিনি শাপমুক্ত হন।

কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণে এই কাহিনী একটু ভিন্ন। সেখানে অহল্যা স্বামী গৌতমের শাপে পাষাণে পরিণত হন এবং রামের পাদস্পর্শে আবার জীবন ফিরে পান ও কলুষমুক্ত হন। ঋষি গৌতম ও অহল্যার সন্তানের নাম শতানন্দ ঋষি। অহল্যা পঞ্চ প্রাতঃস্মরণীয় নারীর অন্যতম। অন্য চার নারী যাঁদের নাম স্মরণ করলে মহাপাপ নাশ হয়, তাঁরা হলেন কুন্তী, দ্রৌপদী (দ্র), তারা ও মন্দোদরী।

বি. ব.

অহীন্দ্র চৌধুরী [১৮৯৫—১৯৭৪]

বিখ্যাত নাট্যশিল্পী ও চলচ্চিত্রাভিনেতা। ১৮৯৫ সালের ৬ই আগস্ট (মতান্তরে ১২ই আগস্ট) কলিকাতায় (দ্র) জন্মগ্রহণ করেন।

কলিকাতার লণ্ডন মিশনারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষাজীবন-শেষে কিশোর বয়সেই তিনি থিয়েটার (দ্র) ও যাত্রাভিনয়ের

সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯১১ সালে বন্ধুবর্গের সঙ্গে মিলে তিনি 'রঘুবীর' নাটক (দ্র) প্রযোজনা করেন। ১৯১৮ সালে ভবানীপুর বান্ধবসমাজের 'অভিমন্যুবধ' যাত্রায় অভিনয় করে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন।

১৯২২ সালে তিনি একটি শৌখিন নাট্যসম্প্রদায়ের হয়ে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের সেলুকাস চরিত্রে অভিনয় এবং সে বছরই স্বপরিচালিত 'সোল অফ এ স্লেভ' চলচ্চিত্রে প্রথম চলচ্চিত্রাভিনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯২৩ সালের ৩০শে জুন প্রথম পেশাদার রঙ্গশালায় 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকে 'অর্জুন' চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতির অধিকারী হন।

১৯২৩ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দী-কালের অভিনয়জীবনে অহীন্দ্র চৌধুরী বহু নাটকের প্রায় প্রতিটি চরিত্রে স্মরণীয় অভিনয় করে একটি যুগের সৃষ্টি করেন, যাকে 'অহীন্দ্রযুগ' বলে অভিহিত করা হয়।

এ ছাড়া তিনি ১৯৩১ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ১২৫টিরও বেশি সবাক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। এক্ষেত্রেও তাঁর অভিনয়প্রতিভার স্বাক্ষর অঙ্কিত।

অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর অভিনয়জীবন ও প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির অধ্যক্ষ ও ডীন নিযুক্ত হন, ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন, সে বছরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) গিরিশ অধ্যাপকরূপে বক্তৃতা দানের সম্মান লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তিনি ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত হন, ১৯৭০ সালে নিজস্ব নাট্যসংগ্রহশালা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং এটি পরিচালনার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৭২ সালে নাট্যশতবার্ষিকীতে তিনি স্টার থিয়েটার প্রদত্ত পদক লাভ করেন।

১৯৭৪ সালের ৪ঠা নভেম্বর তিনি কলিকাতায় ৭৯ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

আ. হ.

অ্যাকোয়া রিজিয়া (aqua regia)

এক ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) ও তিন ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl)-এর সংমিশ্রণে এটি তৈরি হয়। স্যাক্‌রারা সোনা গলাতে এটি ব্যবহার করে। সোনা (দ্র), রূপা (দ্র) প্রভৃতি নোবল্ মেটাল (noble metal) এতে গলে যায়, যা অপর কোনো অ্যাসিড (দ্র) এককভাবে পারে না। এই মিশ্রণ খোলা রাখলে বাতাসের (দ্র) সংস্পর্শে হলদে হয়ে যায়, নাইট্রোসিল ক্লোরাইড জন্মায় ও ক্লোরিন গ্যাস বেরিয়ে বাতাসে মিশে যায়। এটি প্রস্তুতির জন্য আমরা অ্যালকেমিস্টদের কাছে ঋণী। সোনার একমাত্র দ্রাবক হল এই অ্যাকোয়া রিজিয়া। সোনা গলানোর এই অ্যাসিড মিশ্রণটি প্রাচীন অ্যালকেমিস্টরাই উদ্ভাবন করেছিলেন এবং তাঁদের দেওয়া অ্যাকোয়া রিজিয়া নামটি এখনো চলছে। অ্যাকোয়া রিজিয়াতে দ্রবীভূত সোনা গোল্ড ক্লোরাইড নামক লবণের(দ্র) হলদে দানার আকারে দ্রবণ (দ্র) থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। সোনার এই ক্লোরাইড লবণের জলীয় দ্রবণ ফটোগ্রাফের ছবি পরিস্ফুট করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আ. হ. খ.

অ্যাকোয়ারিয়াম (aquarium)

অ্যাকোয়া শব্দটি লাতিন। এর অর্থ জল। স্থির জলাধারে বা পুষ্করিণীতে নানা প্রকারের প্রাণী (দ্র) ও উদ্ভিদ (দ্র) বাস করে। এ সকল জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীকে মানুষ মুখ্যত শখের

বশে কৃত্রিম জলাধার বা পুষ্করিণীতে চাষ করে। এই কৃত্রিম জলাধারের নাম অ্যাকোয়ারিয়াম।

অ্যাকোয়ারিয়ামের কাঠামো লোহা (দ্র), অ্যালুমিনিয়াম (দ্র) বা প্লাস্টিক (দ্র) দিয়ে তৈরি করা যায়। কাঠামো প্রস্থে ২·৫৪ সেন্টিমিটার এবং দৈর্ঘ্যে ৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। যে ঘরে এটি রাখা হবে সেই ঘরের আয়তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাঠামো নির্মাণ করা হয়। কাঠামোর কাচ ৬-

৯ মিলিমিটার পুরু হওয়া চাই। কাঠামোতে কাচ সংযোগ করার পর একে শক্ত স্ট্যাণ্ডের উপর স্থাপন করতে হয়। স্ট্যাণ্ডে স্থাপিত কাঠামোর ভিতরে বালি ও নুড়ি পাথর এবং জল দিতে হবে। কাঠামোতে জলের উপরে কিছু অংশ ফাঁকা থাকবে। কাঠামোর ঢাকনার নিচে জলের উপরে একটি ৪০-৬০ ওয়াটের বাল্ব জ্বালাতে হবে। প্রতিদিন কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা আলো জ্বলবে। সূর্যের আলো ও তাপের বিকল্প হল এই বৈদ্যুতিক আলো এবং আলোসৃষ্ট তাপ। কাঠামোর ভিতরে তাপমাত্রা ৭২°-৮০° ফারেনহাইট হলে চলবে। অ্যাকোয়ারিয়ামের ভিতরে বাতাস (দ্র) সঞ্চালনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রাণী ও উদ্ভিদ বায়ু থেকে অক্সিজেন পাবে।

শখের জন্য অ্যাকোয়ারিয়ামে ছোট মাছ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র অমেরুদণ্ডী (দ্র) প্রাণী পোষা হলেও বর্তমানে অনেকে এর সাহায্যে প্রাণীর জাত, বংশবৃদ্ধি, আচরণ, জীবনেতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করছেন।

জলের তাপমাত্রা (দ্র), বায়ু সঞ্চালন, আলো (দ্র), মাছ ও উদ্ভিদের প্রজাতি নির্বাচন, সংখ্যা, বংশবৃদ্ধি, রোগ-ব্যাধি-চিকিৎসা, পানি বদলানো, অ্যাকোয়ারিয়ামের পোষ্যদের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে অ্যাকোয়ারিয়াম ব্যবহারকারীর পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ থাকা দরকার।

ত. চ.

অ্যাজ্‌মা হাঁপানি দ্র

অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি দ্র

অ্যান্টার্কটিকা (Antarctica)

দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত পৃথিবীর (দ্র) ৫ম বৃহত্তম মহাদেশ (দ্র)। এর বেশির ভাগ এলাকাই তিন কিলোমিটারেরও বেশি পুরু বরফে ঢাকা। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তুষারপাতের ফলে এই বরফের আস্তরণ সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এই বরফস্তর খণ্ড খণ্ড বিরাট তুষারস্তূপ তৈরি করে সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়। ফলে এখানে নৌকা, জাহাজ ইত্যাদির চলাচল দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এই অঞ্চলটিতে পাহাড়-পর্বতও বরফের নিচে ঢাকা পড়ে থাকে। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে শীতল মহাদেশ অ্যান্টার্কটিকা। অ্যান্টার্কটিকার ভস্তোক্-এ পৃথিবীর

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা — ৮৯·২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। গরমকাল বাদে মহাদেশটির চারদিকের সমুদ্র বরফে আচ্ছাদিত থাকে।

মহাদেশটির পাথুরে অঞ্চল বরফে আচ্ছাদিত নয়। ভূতত্ত্ববিদেরা সেখানে কয়লা, প্রাণী ও গাছপালার জীবাশ্ম (fossil) আবিষ্কার করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, অ্যান্টার্কটিকার আবহাওয়া (দ্র) এক সময় বেশ গরম ছিল। প্রায় ১৫ কোটি বছর থেকে এটি ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করে।

ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ কুক (দ্র), যিনি ১৭৭৩ সালে দক্ষিণে নোঙর ফেলেছিলেন, তাঁকেই অ্যান্টার্কটিকার প্রথম অনুসন্ধানকারী বলা যায়। ১৯১১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর নরওয়ের অনুসন্ধানকারী রোয়াল্ আমুণ্ডসেন (Roald Amundsen) প্রথম সার্থকভাবে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছানোর কৃতিত্ব লাভ করেন। মানুষের পদার্পণের পর বহু জাতি এই অঞ্চলের মালিকানা দাবি করে আসছে। ১৯৫৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র), সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্যসহ ১২টি দেশ আন্তর্জাতিকভাবে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে গবেষণার কাজে এই অঞ্চলটি ব্যবহারের চুক্তি স্বাক্ষর করে। অর্থাৎ কেউই অঞ্চলটির মালিকানা দাবি আর করবে না।

অ্যান্টার্কটিকার ঠাণ্ডা, রুক্ষ আবহাওয়ার জন্য কোনো

প্রাণী সেখানে বাস করতে পারে না। শুধু কিছু সামুদ্রিক জীব, সীল (দ্র) আর পেঙ্গুইন সেখানে বাস করে। খাবারের জন্য এরা সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল। সমুদ্র অথবা তার কিনারে এসব প্রাণী বাস করে।

সেখানে কেউ যেতে চাইলে তাকে খাবার দাবার, বিশেষ ধরনের গরম পোশাক, চলাচলের জন্য ট্রাক্টর, স্লেজ গাড়ি ইত্যাদির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে যেতে হয়। বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার কাজ গরমকালে পরিচালনা করেন।

অ্যান্টার্কটিকাকে কুমেরু বা দক্ষিণ মহাদেশও বলে।

সে. শা.

অ্যান্টিমনি (antimony)

মৌলিক ধাতব পদার্থ। সাদা ও ভঙ্গুর। আকার স্ফটিকের মতো। সাধারণত অক্সাইড (দ্র) ও সালফাইড অবস্থায় পাওয়া যায়। এটি খনিজ দ্রব্য। অ্যান্টিমনি সালফাইডের বাংলা নাম সুর্মা। চোখের ভ্রু ও পাতা কালো করার জন্য সুর্মা ব্যবহার করা হয়। ছাপার টাইপ তৈরির সময় সীসার সাথে অ্যান্টিমনি মেশানো হয়। এর রাসায়নিক সঙ্কেতচিহ্ন Sb (স্টিবিয়াম)। অ্যান্টিমনির ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জানা ছিল। প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে মানুষ অ্যান্টিমনি ব্যবহার করে আসছে বলে ধারণা করা হয়।

এর পারমাণবিক ওজন ১২১·৭৬।

সু. ব.

অ্যান্টেনা (antenna)

একটি পরিবাহীর (দ্র) মধ্য দিয়ে যখন পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তখন বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ওখান থেকে চারিদিকের স্থানের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই তরঙ্গ বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিবর্তনের ভঙ্গিটি বহন করে নিয়ে যায়। রেডিও (দ্র) বা টেলিভিশন (দ্র) সম্প্রচার এই নীতিতেই সম্ভব হয়। সম্প্রচারের সময় বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ছড়িয়ে দেবার জন্য সুবিধাজনক যে বিদ্যুৎপরিবাহী ব্যবহার করা হয়, সেটি সম্প্রচার অ্যান্টেনা। সম্প্রচারিত তরঙ্গ যখন আমরা রেডিও বা টেলিভিশন সেটে গ্রহণ করি তখন এমনি আর একটি অ্যান্টেনা ব্যবহার করি। এর উপর বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ

ডিশ অ্যান্টেনা

এসে পড়লে এতে আদি পরিবর্তনশীল প্রবাহের ভঙ্গিতে দুর্বল বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয়। এটি গ্রাহক অ্যান্টেনা। এই দু'রকম অ্যান্টেনার মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই।

বহু অ্যান্টেনায় একটি মূলনীতি অনুসরণ করা হয়। যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গটি এটি সম্প্রচার বা গ্রহণ করবে, তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অর্ধেকের সমান লম্বা একটি ধাতব দণ্ডই হয় অ্যান্টেনা। তবে এর ঠিক মাঝখানে একটু ফাঁক থাকে। ফাঁকের দুই পাশে দণ্ডের দুই অংশের সঙ্গে সংযুক্ত তার বেয়েই পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। টেলিভিশন গ্রাহকযন্ত্রে বাইরের অ্যান্টেনা বেশি জরুরি বলে টেলিভিশনের অ্যান্টেনা আমাদের চোখে পড়ে বেশি। টেলিভিশন সম্প্রচারে ব্যবহৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত ছোট বলে মাঝখানে বিভক্ত খাটো দৈর্ঘ্যের একটি ধাতুদণ্ডই অ্যান্টেনার কাজ করে। অবশ্য এর সঙ্গে এর সামনে আরো একটু খাটো এবং

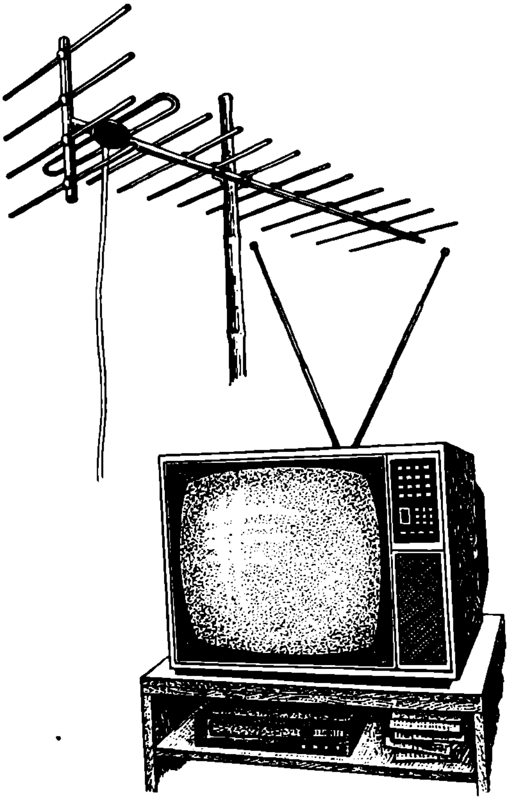

পেছনে একটু দীর্ঘতর দণ্ড দেওয়া থাকতে পারে, যা তার-সংযোগবিহীন। সামনেরটা তরঙ্গের পথনির্দেশক হিসাবে এবং পেছনেরটা এর প্রতিফলক হিসাবে কাজ করে। এতে টেলিভিশন টাওয়ারের (যার উপর সম্প্রচার অ্যান্টেনা থাকে) দিকে অভিমুখ করে সর্বোত্তমভাবে গ্রাহক অ্যান্টেনা ব্যবহার করা যায়। আজকাল সাধারণ রেডিওতে ভেতরেই একটি ফেরাইট দণ্ডের উপর কুণ্ডলী পাকানো তারের এক রকম অ্যান্টেনা থাকে। কুণ্ডলীর পাশটা (প্রান্ত নয়) যদি রেডিও সম্প্রচার অ্যান্টেনার দিকে থাকে, তা হলে সর্বোত্তম কাজ হয়।

মু. ই.

অ্যান্ড্রোমিডা (Andromeda)

পৃথিবী (দ্র) থেকে খালি চোখে যে গ্যালাক্সিগুলো দেখা যায় তার একটি হচ্ছে অ্যান্ড্রোমিডা। আমাদের পৃথিবী থেকে অ্যান্ড্রোমিডার দূরত্ব প্রায় ২৩ লক্ষ আলোকবর্ষ (দ্র)।

সু. ব.

অ্যাথ্‌লেটিক্স (athletics)

দৌড়ঝাঁপ ও নিক্ষেপের খেলাকে ব্রিটিশ মতে 'অ্যাথ্‌লেটিক্স' এবং আমেরিকান মতে 'ট্র্যাক অ্যাণ্ড ফিল্ড'(Track and field) বলে। এই খেলায় শারীরিক কসরত, কলাকৌশল, বেগ, শক্তি, স্থৈর্য ইত্যাদি লাভ হয়। হাঁটা, দৌড়ানো, লাফানো, বাধা অতিক্রম, নিক্ষেপ ইত্যাদি সব ধরনের খেলার সমন্বয়ে অ্যাথ্‌লেটিক্স গঠিত হয়েছে। বস্তুত এটি একটি একক প্রচেষ্টাযুক্ত খেলা। অবশ্য দলগত খেলা হিসাবে রিলে রেস রয়েছে। সব ধরনের দৈহিক আকার ও গুণসম্পন্ন লোকের জন্য এতে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা আছে।

দৌড়ঝাঁপ ও নিক্ষেপের খেলাগুলি ৭৭৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেম্‌সে (দ্র) অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। আধুনিক অলিম্পিক ১৮৯৬ সালে দৌড়ঝাঁপ ও নিক্ষেপের খেলাগুলিকে কেন্দ্র করেই পুনরায় আরম্ভ হয়েছে। সর্বপ্রথম ১৯০০ সালে প্যারিস অলিম্পিকে ৬ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক ফেডারেশন গঠিত হয়। ১৯৫১ সালে এশিয়ান গেম্‌সে প্রথম দৌড়ঝাঁপের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

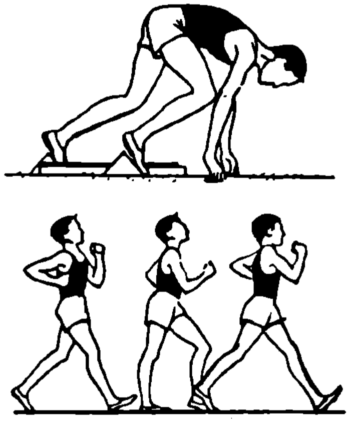

উপরে : দৌড় শুরু ও নিচে : হাঁটা

অলিম্পিকে ও অন্যান্য দৌড়ঝাঁপ নিক্ষেপের খেলায় পুরুষেরা যে সমস্ত বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে, তার মধ্যে পোল ভল্ট, হাতুড়ি নিক্ষেপ, ট্রিপ্‌ল্ চেইজ্ ছাড়া সবগুলি বিষয়ে মহিলারাও অংশগ্রহণ করে থাকে। পূর্বে অনেক বিষয়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে তিন-চারটি বিষয় ছাড়া সব বিষয়েই তারা অংশগ্রহণ করছে। যে

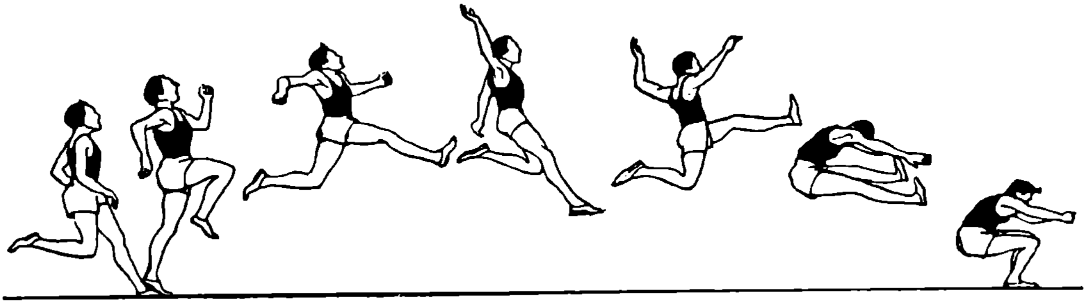

লং জাম্প

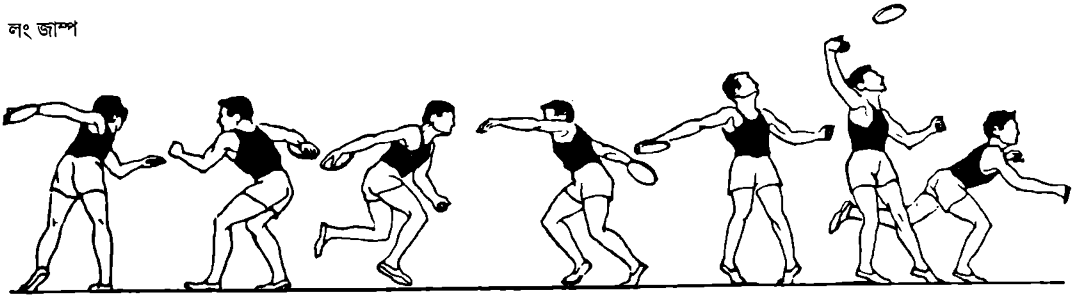

ডিস্কাস থ্রো

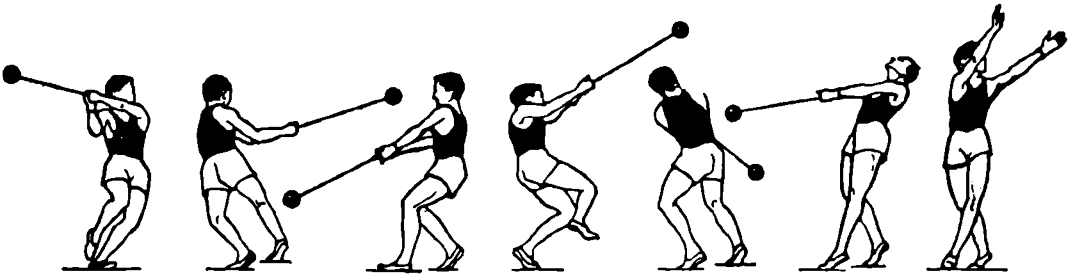

হ্যামার থ্রো ও নিচের ছবি বর্শা নিক্ষেপ

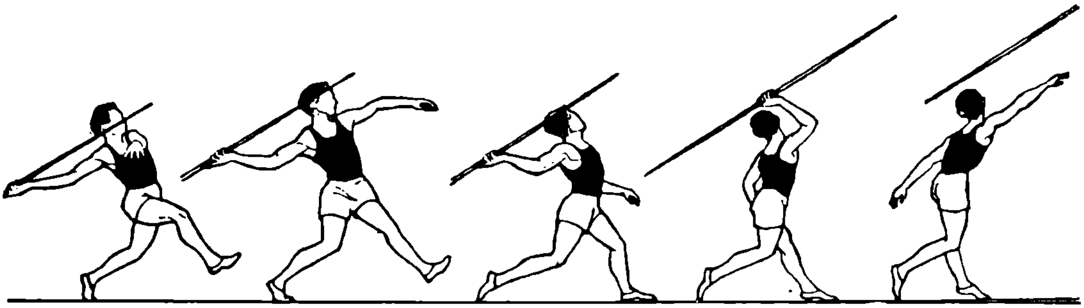

সব বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয় তা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল :

১. ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার, ৮০০ মিটার, ১৫০০ মিটার, ৫০০০ মিটার, ১০,০০০ মিটার, ১১০ মিটার হার্ড্‌ল্‌, ৪০০ মিটার হার্ড্‌ল্‌, ৩০০ মিটার ট্রিপ্‌ল্‌ চেইজ্‌ (শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য), ম্যারাথন রেস, ২০ ও ৫০ কিলোমিটার হাঁটা, ১০০x৪ ও ৪০০x৪ রিলে রেস।

২. পুরুষদের ডেকাথ্‌লন, মহিলাদের হেপ্টাথ্‌লন।

৩. উচ্চ, দীর্ঘ, ত্রিলম্ফ ও পোল ভল্ট (শুধু পুরুষদের জন্য)

৪. ডিস্কাস, শট, বর্শা ও হ্যামার (শুধু পুরুষদের জন্য)।

পূর্বে ৬ লেন্‌ বা সারি - ওয়ালা ট্র্যাকে প্রতিযোগিতা হত, এখন ৮ লেন-ওয়ালা ট্র্যাকে প্রতিযোগিতা হয়। ইলেক্ট্রনিক ঘড়ির সাহায্যে, ফটো ফিনিশের সাহায্যে চুলচেরা বিচারকার্যের দ্বারা প্রতিযোগীদের স্থান নির্দেশ করা হয়ে থাকে।

কা. আ. আ.

অ্যানিমিয়া রক্তাল্পতা দ্র

অ্যানেস্থেসিয়া অবেদন দ্র

অ্যানোড (anode)

তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যে ইলেক্ট্রোড বা তড়িৎদ্বার দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ ভোল্টামিটারে (দ্র) প্রবেশ করে বা যে তড়িৎদ্বার ক্যাথোডের (দ্র) তুলনায় ধনাত্মক বিভবে থাকে, তাকে অ্যানোড বলা হয়। তড়িৎ বিশ্লেষণ হল কোনো দ্রবণের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহিত করে এর অণুগুলিকে ধনাত্মক (পজিটিভ) ও ঋণাত্মক (নেগেটিভ) আয়নে (দ্র) বিভক্ত করার পদ্ধতি। সহজ ভাষায় অ্যানোড হল ধনাত্মক ইলেক্ট্রোড বা তড়িৎদ্বার। যে কোনো বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় যেমন ক্ষরণ নল অথবা অর্ধপরিবাহী ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র বা কৌশলে (device) যে প্রান্ত বা তড়িৎদ্বার থেকে ইলেক্ট্রন (দ্র) বের হয় বা নির্গত হয় তাকে বলা হয় অ্যানোড। শুষ্ক বিদ্যুৎকোষে (দ্র) অ্যানোড হল পজিটিভ টার্মিনাল বা ধনাত্মক প্রান্ত। অ্যানোডের বিপরীত তড়িৎদ্বার হল ক্যাথোড। এটি হল ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার। কোনো উষ্ণায়নিক (thermonic) ভাল্‌ভ্‌ বা টিউবের অ্যানোডে প্রবাহিত কারেন্ট বা তড়িৎপ্রবাহকে বলা হয় অ্যানোড কারেন্ট বা অ্যানোড প্রবাহ। অ্যানোড ভোল্টেজকে অ্যানোড প্রবাহ দিয়ে ভাগ করে পাওয়া যায় অ্যানোড রোধ এবং অ্যানোড প্রবাহ ও অ্যানোড ভোল্টেজের অনুপাতকে (দ্র) অ্যানোড বৈশিষ্ট্য বলে। কোনো ক্ষরণ নলে অ্যানোড থেকে যে ধনাত্মক আয়ন নিঃসৃত হয়, তাকে বলে অ্যানোড রশ্মি (anode ray)।

শা. ত.

অ্যানজাইনা পেক্টোরিস হৃদ্‌রোগ দ্র

অ্যাবাকাস (abacus)

অতি প্রাচীন কাল থেকে মানুষ গণনার কাজে নানা কৌশল ব্যবহার করে আসছে। হাতের আঙুল গুনে, পাথর বা কাঠ পর পর সাজিয়ে বা দড়িতে গিঁট দিয়ে তারা সংখ্যা গণনা করত। মনে করা হয়, পাঁচ হাজার বছর আগে ব্যাবিলনীয়রা (দ্র) প্রথম আবিষ্কার করে যে ধুলাবৃত কোনো বোর্ডের উপরে আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে গণনা করা, শুধু আঙুল ব্যবহার করে গণনা করার চেয়ে সুবিধাজনক। সংখ্যা গণনার এই কৌশলই পরে অ্যাবাকাস নামক প্রাচীন গণনা-যন্ত্রের জন্ম দেয়। এই গণনা-যন্ত্রটি সরল হলেও অত্যন্ত কার্যকর। ফলে আধুনিক কালেও এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এশিয়ার (দ্র) অনেক দেশে। চীনদেশেই (দ্র) সম্ভবত এর উন্নতি সাধিত হয়েছে, বর্তমানের রূপলাভ করার আগে।

অ্যাবাকাসে সারিবদ্ধভাবে সাজানো লম্বা কাঠির মধ্যে ছিদ্রযুক্ত গুটিকা বা পুঁতিকে চলাচল করানো হয়। একটি ফ্রেমের মধ্যে কাঠিগুলো লাগানো থাকে। একটি অনুভূমিক কাঠি এই ফ্রেমকে দুই ভাগে ভাগ করে। উপরের অংশে একটি করে গুটিকা প্রতি কাঠির মধ্যে চলাচল করানো যায়। ফ্রেমের নিচের অংশের প্রতিটি কাঠির মধ্যে চারটি করে গুটিকা চলাচল করানো যায়। অনেক অ্যাবাকাসে এই গুটিকার সংখ্যা অনেক বেশিও হতে পারে। কাঠির মধ্যে গুটিকা চলাচলের ব্যবস্থাও ভিন্ন হতে পারে। কোনো একটি গুটিকার মান কত তা নির্ধারিত হয় কোন স্তম্ভে এর অবস্থান তা থেকে।

আ. আ.

অ্যাভোমিটার

বর্তমানে মাল্টিমিটার নামে পরিচিত। বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ

অথবা কারেন্ট পরিমাপের যন্ত্র (দ্র)। এ যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ পাল্লার ভোল্টেজ বা কারেন্ট মাপা যায়। এর অভ্যন্তরে সাধারণত একটি শুষ্ক কোষ বা ব্যাটারি থাকে, যার সাহায্যে রেজিস্ট্যান্স বা রোধ পরিমাপ করা যায়। প্রায় সব মাল্টিমিটার মূলত একটি চলকুণ্ডলী যন্ত্র, যাতে থাকে একটি সুইচ। এই সুইচের সাহায্যে শ্রেণীবদ্ধ রোধক বা সমান্তরাল রোধক (resistor) সার্কিটে সংযুক্ত করা যায়। ভোল্টেজ মাপার বেলায় রোধককে শ্রেণী সংযোগে সংযুক্ত করতে হয়। কারেন্ট বা বিদ্যুৎপ্রবাহ মাপার সময় রোধ সংযুক্ত করতে হয় সমান্তরাল সংযোগে।

শা. ত.

অ্যামপ্লিফায়ার (amplifier)

অ্যামপ্লিফায়ার হল একটি ডিভাইস (সংযুক্তি) বা সার্কিট (বর্তনী), যা কোনো সঙ্কেত গ্রহণ করে; কোনোরূপ পরিবর্তন না করে একে বর্ধিত বা জোরালো করে এবং পুনরায় ত্যাগ বা প্রদান করে। অর্থাৎ, অ্যামপ্লিফায়ারের অন্তর্গামী বা প্রবেশপ্রান্তে যে সঙ্কেত প্রদান করা হয়, বহির্গামী প্রান্তে তা অপরিবর্তিত অথচ বর্ধিতরূপে ফিরে পাওয়া যায়। যেমন – অন্তর্গামী প্রান্তে যদি এ.সি. ভোল্টেজ দেওয়া হয়, তাহলে বহির্গামী প্রান্তেও বর্ধিতরূপে এ.সি. ভোল্টেজ পাওয়া যাবে। অ্যামপ্লিফায়ার বলতে আমরা সেই যন্ত্রকে বুঝি, যা দিয়ে সাধারণত কোনো ইলেক্ট্রনিক সঙ্কেতকে বিবর্ধন করা হয়। এটি রেডিও (দ্র), টেলিভিশন (দ্র), টেপ রেকর্ডার (দ্র), রেকর্ড প্লেয়ার এবং অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতিতে শব্দকে জোরালো করার কাজে ব্যবহার করা হয়। ইলেক্ট্রনিক অ্যামপ্লিফায়ার মূলত ইলেক্ট্রন টিউব অথবা অর্ধপরিবাহী ডিভাইসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। সবচেয়ে সরল যে ইলেক্ট্রন টিউবটি অ্যামপ্লিফায়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেটি হল ট্রায়োড (triode) (দ্র)। বর্তমানে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিতে ইলেক্ট্রন টিউবের পরিবর্তে ট্রানজিস্টারের (দ্র) মতো অর্ধপরিবাহী সার্কিট উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে।

একটি ট্রানজিস্টার অ্যামপ্লিফায়ারে ট্রানজিস্টার, কারেন্ট বা ভোল্টেজের উৎস হিসাবে কাজ করে। অ্যামপ্লিফায়ারে প্রাপ্ত সঙ্কেতের (কারেন্ট বা ভোল্টেজ) বর্ধনপ্রযুক্ত সঙ্কেতের অনুপাতকে অ্যামপ্লিফায়ায়ের লাভ বা গেইন (gain) বলে। এই লাভ বা গেইন সব সময় ১-এর বেশি হয়। ফ্রিকোয়েন্সি বা স্পন্দনহারের পরিসরের উপর ভিত্তি করে অ্যামপ্লিফায়ারকে অডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যামপ্লিফায়ার, ইন্টারমিডিয়েট-ফ্রিকোয়েন্সি অ্যামপ্লিফায়ার, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যামপ্লিফায়ার, আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যামপ্লিফায়ার ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। অ্যামপ্লিফায়ারকে ধাপে ধাপে সংযুক্ত করে শব্দ (দ্র) বা সঙ্কেতের বিবর্ধনকে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো করা যায়। এখানে এক ধাপের প্রাপ্ত সঙ্কেত পরবর্তী ধাপে প্রযুক্ত সঙ্কেত হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

শা. ত.

অ্যামিটার (ammeter)

তড়িৎপ্রবাহ পরিমাপের যন্ত্রকে (দ্র) বলা হয় অ্যামিটার। অ্যাম্পেয়ার মিটার (ampere meter)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে অ্যামিটার। এই যন্ত্রে অ্যাম্পেয়ার (দ্র) এককে তড়িৎপ্রবাহ পরিমাপ করা হয়। অত্যন্ত নিম্ন তড়িৎপ্রবাহ মাপা হয় মিলিঅ্যাম্পেয়ার ও মাইক্রোঅ্যাম্পেয়ার এককে। মিলিঅ্যামিটার মিলিঅ্যাম্পেয়ার এককে তড়িৎপ্রবাহ পরিমাপ করে। মাইক্রোঅ্যামিটার মাইক্রোঅ্যাম্পেয়ার এককে তড়িৎপ্রবাহ পরিমাপ করে। এক হাজার মিলিঅ্যাম্পেয়ারে হয় এক অ্যাম্পেয়ার এবং এক হাজার মাইক্রোঅ্যাম্পেয়ারে হয় এক মিলিঅ্যাম্পেয়ার। সুতরাং দশ লক্ষ মাইক্রোঅ্যাম্পেয়ারে হয় এক অ্যাম্পেয়ার। অ্যামিটারকে বর্তনীতে অনুক্রম বা সিরিজ সংযোগে যুক্ত করতে হয়। অ্যামিটারকে অনুক্রম সংযোগে যুক্ত করতে হয় বলে এর নিম্নরোধ থাকতে হয়। অ্যামিটার চলকুণ্ডলী (moving coil) ও চললৌহ (moving iron) ধরনের হতে পারে। তড়িৎপ্রবাহের পাল্লা বৃদ্ধির জন্য চলকুণ্ডলী অ্যামিটারকে শান্ট রোধসহ ব্যবহার করতে হয়। পরিবর্তী প্রবাহের জন্য রেক্টিফায়ারের ব্যবহার দরকার হয়। চললৌহ অ্যামিটার এ.সি. ও ডি.সি. উভয় ধরনের প্রবাহের জন্য ব্যবহার করা যায়।

উত্তপ্ততার যন্ত্র (অ্যামিটার)-এর সাহায্যে উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক মাপা হয়। এ.সি. ও ডি.সি. পরিমাপের জন্য থার্মোঅ্যামিটারও ব্যবহার করা যায়। এখানে তড়িৎকে একটি রোধক (resistor) দিয়ে প্রবাহিত করা হয়।

তড়িৎপ্রবাহ রোধককে উত্তপ্ত করে। রেক্টিফায়ারের সঙ্গে সংযুক্ত করে চলকুণ্ডলী অ্যামিটারকে খুব বেশি সংবেদী করা যায়। এরা তখন এ.সি. ও ডি.সি. উভয় ধরনের তড়িৎপ্রবাহ এবং তাদের সামান্য পরিবর্তনকে পরিমাপ করতে সক্ষম হয়।

শা. ত.

অ্যামিবিয়াসিস আমাশয় দ্র

অ্যামোনিয়া (ammonia)

অ্যামোনিয়া একটি বর্ণহীন, ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত গ্যাস (দ্র)। এটি বাতাসের চেয়ে হাল্কা এবং পানিতে খুবই দ্রবণীয়। এক আয়তনের গ্যাস ১৩০০ আয়তনের পানিতে দ্রবীভূত হয়। আণবিক সংকেত NH_3, আণবিক ওজন ১৭ এবং ঘনত্ব ৮˙৫। এর জলীয় দ্রবণ, যাকে বলা হয় অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড (NH_4OH), সেটি একটি ক্ষার জাতীয় পদার্থ।

বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে (দ্র) একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় অ্যামোনিয়ায় রূপান্তরিত করা যায়। কয়লা থেকে কোল গ্যাস তৈরি করার সময় উপজাত দ্রব্য হিসাবে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া-তরল (liquor ammonia) পাওয়া যায়। ইংরেজ বিজ্ঞানী জোসেফ প্রিস্টলি (Joseph Priestley : ১৭৩৩-১৮০৪) নিশাদল (NH_4Cl) ও চুন একত্রে মিশিয়ে উত্তপ্ত করে ১৭৭৫ সালে সর্বপ্রথম এই গ্যাস তৈরি করেন এবং এর নামকরণ করেন ক্ষারীয় বায়ু। আরবেরা মিশরীয় দেবতা 'অ্যামন'–এর নাম অনুসারে এর নামকরণ করেন 'অ্যামোনিয়া'।

প্রস্তুতি : সাধারণত যে কোনো অ্যামোনিয়া লবণ যে কোনো ক্ষারের সঙ্গে উত্তপ্ত করলে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। ল্যাবরেটরিতে প্রধানত নিশাদলের সঙ্গে চুন বা কলিচুন মিশিয়ে উত্তপ্ত করে অ্যামোনিয়া তৈরি করা যায়।

$2NH_4Cl + CaO = 2NH_3 + CaCl_2 + H_2O$

অথবা $2NH_4Cl + Ca(OH)_2 = 2NH_3 + CaCl_2 + 2H_2O$

শিল্পপদ্ধতি :

১. কয়লা থেকে কোল গ্যাস তৈরির সময় উপজাত দ্রব্য হিসাবে যে অ্যামোনিয়া-তরল (liquor ammonia) পাওয়া যায়, তার সঙ্গে চুন মিশিয়ে তাপ দিলে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়।

২. সংশ্লেষণপদ্ধতি বা হেবারপদ্ধতি (Haber's Process) : ১৯১৫ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় বিজ্ঞানী ফ্রিৎস্ হেবার (Fritz Haber : ১৮৬৮-১৯০৮) এই সংশ্লেষণপদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তখন জার্মানিতে বিস্ফোরক তৈরি করবার জন্য নাইট্রিক অ্যাসিডের তেমন সংস্থান ছিল না। বিজ্ঞানী হেবার বাতাস (দ্র) থেকে অ্যামোনিয়া তৈরি করায় তা থেকে নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করার এক পরম সুযোগ হল জার্মানির। বাতাসের ওপর কোনো দেশেরই আধিপত্য বা নিয়ন্ত্রণক্ষমতা না থাকায় নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করার কোনো বাধাই আর রইল না জার্মানির। হেবারের পদ্ধতি তাই একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও যুগান্তকারী আবিষ্কার। পরে হেবার নিজে ও অন্যান্য অনেকেই হেবারের পদ্ধতিটির উন্নতি সাধন করেছেন। এখানে মোটামুটিভাবে পদ্ধতিটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন ও বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন ১:৩ অনুপাতে (নাইট্রোজেন তরল বাতাস থেকে এবং হাইড্রোজেন পানি থেকে তৈরি করে নেওয়ার পর) মিশ্রিত করে ২০০ বায়ু চাপে সঙ্কুচিত করার পর ৫০০-৭০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপে উত্তপ্ত সূক্ষ্ম লোহার প্রভাবক (catalyst) এবং মলিব্‌ডেনাম্ (molybdenum) প্রভাবকসহায়ক (promoter)-এর মিশ্রণের ওপর দিয়ে চালিত করলে অ্যামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন হয়।

অ্যামোনিয়া জমির সার (দ্র) এবং নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি করার সূত্রে নানা বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরি করার জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। শীতল কক্ষ বা রেফ্রিজিরেটার (দ্র) তৈরি করতেও প্রচুর পরিমাণে তরলায়িত অ্যামোনিয়ার ব্যবহার রয়েছে।

আ. হ. খ.

অ্যাম্পেয়ার (ampere)

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে বিদ্যুৎপ্রবাহের একক। দু'টি অসীম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট অত্যন্ত পাতলা ও সোজাসুজি সমান্তরাল পরিবাহীর মধ্যে প্রবাহিত অবিচল বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাণ, যখন পরিবাহী দু'টি একটি অপরটি থেকে এক মিটার দূরত্বে শূন্যস্থানে রাখা থাকে এবং পরিবাহীদ্বয়ের মধ্যে এর ফলে ২×১০^{৭} নিউটন বল (দ্র) সৃষ্টি হয়। এই এককের নামকরণ করা হয়েছে আঁদ্রে মারি অঁপ্যার্ (André Marie Ampère : ১৭৭৫-১৮৩৬) নামে এক জন ফরাসি বিজ্ঞানীর নামানুসারে।

সু. ব.

অ্যারোসল (aerosol)

তরল কিংবা কঠিন পদার্থকণার গ্যাসীয় অবস্থা কিংবা বাতাসে (দ্র) মোটামুটি স্থিতিশীল সাসপেনশন (suspension) অ্যারোসল নামে পরিচিত।

ধোঁয়া ও কুয়াশা অ্যারোসলের উদাহরণ। তবে আজকাল বোতল কিংবা কৌটায় রাখা বিভিন্ন স্প্রে, ফেনা কিংবা ক্রিমকেও অ্যারোসল বলা হয়। সাধারণত ধাতু (দ্র), প্লাস্টিক (দ্র) কিংবা কাচের (দ্র) তৈরি পাত্রে অ্যারোসল অতিরিক্ত চাপযুক্ত অবস্থায় থাকে। ফলে একটি ভাল্ব খুলে দিলে পদার্থটি নজ্‌ল্ দিয়ে বের হয়ে আসে। দুর্গন্ধনাশক (deodorant), চুলের স্প্রে, রঙ, কীটনাশক (দ্র) ঔষধ, জুতোর কালি ইত্যাদি অনেক কিছুই আজকাল এভাবে প্রস্তুত করা হয়।

চাপসৃষ্টিকারী পদার্থ (propellants) কক্ষ-তাপমাত্রায় তরল কিংবা গ্যাসীয় হতে পারে। এরা পাত্রের পদার্থকে নির্গত হতে এবং সেটাকে স্প্রে কিংবা ফেনায় পরিণত হতে সাহায্য করে। আগে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFC) প্রোপেল্যান্ট হিসাবে প্রচুর ব্যবহৃত হত। কিন্তু এরা বায়ুমণ্ডলের ওজোন (দ্র) স্তর নষ্ট করে দেয়। এ জন্য অনেক দেশেই এর ব্যবহার আজকাল নিষিদ্ধ।

সা. এ.

অ্যালক্যালি (alkali)

অ্যালক্যালি হল ক্ষার জাতীয় জিনিস, যা পানিতে দ্রবীভূত হয়। ক্ষারের তীব্র জলীয় দ্রবণ যেমন তিক্ত তেমনি হাতে সাবানের (দ্র) মতো অনুভূত হয়। এর দ্রবণ (দ্র) অন্যান্য দ্রব্যকে ক্ষয় করে। এ জন্য একে সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা দরকার। একটি ক্ষার জাতীয় জিনিসকে সহজেই বোঝা যায় যখন এর পানীয় দ্রবণ লাল লিটমাস কাগজকে নীল লিটমাস কাগজে পরিণত করে। যখন অ্যাসিড (দ্র) এবং ক্ষার একত্রে পানিতে মেশে তখন লবণ (দ্র) তৈরি হয়। যখন শুষ্ক অ্যাসিড এবং শুষ্ক ক্ষার মেশানো হয়, তখন কোনো রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে না। যেমন- সাধারণ বেকিং পাউডারে শুষ্ক অ্যাসিড এবং শুষ্ক ক্ষার মেশানো থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে না। শক্তিশালী অ্যালক্যালি নানা প্রকার দ্রব্যকে পরিষ্কার করতে এবং সাবান (দ্র) তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। খুব ভাল জাতের অ্যালক্যালি হল সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH) ও পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড (KOH)। KOH নরম সাবান ও ঔষধ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয় এবং NaOH শক্ত সাবান ও ঔষধ তৈরির কাজে লাগে। তা ছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য যেমন রেয়ন, ছবি তোলার ফিল্ম প্রভৃতিও প্রস্তুত করা হয় NaOH-এর সাহায্যে।

আ. হ. খ.

অ্যালকোহল (alcohol)

অতি প্রাচীন কালেও অ্যালকোহল তৈরি করার পদ্ধতি জানা ছিল। গুড়, ফলের রস, ভাত ইত্যাদি পচিয়ে এবং গাঁজিয়ে অর্থাৎ খমিরণ (ferment) করে অ্যালকোহল তৈরি করা হত।

সাধারণ হাইড্রোকার্বনের (দ্র) এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু হাইড্রক্সিল মূলক (OH) দ্বারা প্রতিস্থাপিত করলে যে যৌগটি তৈরি হয় তাকেই বলা হয় অ্যালকোহল। হাইড্রোকার্বনের নাম অনুসারে এদের নামকরণ করা হয়। যেমন :

হাইড্রোকার্বন	*ফর্মূলা*	*অ্যালকোহল*
মিথেন CH_4	CH_3OH	মিথাইল অ্যালকোহল
ইথেন C_2H_6	C_2H_5OH	ইথাইল অ্যালকোহল
প্রপেন C_3H_8	C_3H_7OH	প্রপাইল অ্যালকোহল

ইত্যাদি।

তা ছাড়া হাইড্রক্সিল মূলকের সংখ্যা অনুসারে তিন ধরনের অ্যালকোহল হয়। যেমন—একটি হাইড্রক্সিল মূলক থাকলে মনোহাইড্রক্সিল, দু'টি থাকলে ডাইহাইড্রক্সিল এবং তিনটি মূলক থাকলে ট্রাইহাইড্রক্সিল অ্যালকোহল বলে। (সাধারণত একাধিক মূলক সংযুক্ত থাকলে তাকে পলিহাইড্রিক অ্যালকোহল বলে।)

অ্যালকোহলগুলিকে আরো একভাবে গ্রুপ হিসাবে শনাক্ত করা যায়, যেমন—একটি গ্রুপ (CH_2OH) থাকলে তাকে প্রাইমারি, দু'টি থাকলে তাকে সেকেণ্ডারি, তিনটি থাকলে তাকে টারশিয়ারি অ্যালকোহল বলা হয়।

অ্যালকোহল মাত্রই বর্ণহীন, প্রশম (neutral) পদার্থ। অল্প আণবিক ওজনের অ্যালকোহলগুলি তরল, কিন্তু বেশি ওজনেরগুলি হয় কঠিন। তরল অ্যালকোহলে বিশেষ এক রকমের গন্ধ থাকে। খেলে গলা জ্বালা করে। এরা পানিতে

মোটামুটি দ্রবণীয়। বেশি আণবিক ওজনের অ্যালকোহলগুলির স্বাদ, গন্ধ ও পানিতে দ্রবণীয়তা তুলনামূলকভাবে কম হয়।

মিথাইল অ্যালকোহল বা মিথানল একটি বর্ণহীন উদ্বায়ী, দাহ্য ও প্রশম পদার্থ। কাঠের টুকরাকে অন্তর্ধূম পাতনের (destructive distillation) সাহায্যে একে তৈরি করা হয়। অন্তর্ধূম পাতন হল আবদ্ধ পাত্রে প্রায় বায়ুশূন্য অবস্থায় কোনো পদার্থকে অত্যন্ত উচ্চতাপে উত্তপ্ত করে তার রাসায়নিক বিয়োজন ঘটানোর একটি প্রক্রিয়া, যার ফলে ঐ পদার্থের বিভিন্ন উপাদান পাতিত হয়ে পৃথক হয়ে পড়ে। মিথাইল অ্যালকোহল খুবই বিষাক্ত একটি পদার্থ। এটি খেলে লোক অন্ধ হয়ে যায়। তাই ইথাইল অ্যালকোহলকে পানের অযোগ্য করার জন্য অল্প পরিমাণে মিথাইল অ্যালকোহল মেশানো হয়। বাজারে মেথিলেটেড স্পিরিট নামে যে জিনিসটি পাওয়া যায় সেটিতে শুধু যে মিথাইল অ্যালকোহল মেশানো থাকে তা নয়, তার সঙ্গে আরো কিছু ভেজাল,.যেমন– পিরিডিন, বেগুনি রঙ ইত্যাদি মেশানো হয়।

ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি করতে হলে চিনিকে খমিরিত করে (ওয়াইন তৈরির ক্ষেত্রে) কিংবা শিল্প-পদ্ধতিতে শ্বেতসারযুক্ত জিনিস, যেমন– আলু, ভাত, ভুট্টা, কাউন প্রভৃতিতে ঈষ্ট (খমির)–এর সাহায্যে খমিরিত (ferment) করে তৈরি করা হয়। এতে কেবল পাতলা ইথাইল অ্যালকোহল তৈরি হয়, যাকে পুনঃপুনঃ আংশিক পাতন (fractional distillation) করে শতকরা ৯৫·৬ ভাগ অ্যালকোহলে পরিণত করা যায়,যাকে বলে রেক্টিফাইড স্পিরিট। এই স্পিরিট থেকে এভাবে আর অ্যাবসলিয়ুট অ্যালকোহল তৈরি করা যায় না। তৈরি করতে হলে ভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়।

ইথাইল অ্যালকোহল বর্ণহীন ও উদ্বায়ী, জ্বালালে নীল রঙ ও উচ্চ তাপের সৃষ্টি করে। মিথাইল অ্যালকোহলের চেয়ে এটি কিছুটা কম বিষাক্ত, তবে খেলে নেশা হয়। বিশুদ্ধ অ্যালকোহল অবশ্য খুবই বিষাক্ত। নেশার জন্য যে সব মদ খাওয়া হয় সেগুলোতে কমবেশি ইথাইল অ্যালকোহল থাকেই।

গ্লাইকল নামের অ্যালকোহলটি বর্ণহীন, মিষ্টি স্বাদের এবং সিরাপের মতো, যা ঠাণ্ডার দেশে অ্যান্টিফ্রিজ হিসাবে মোটর গাড়ির রেডিয়েটারে ব্যবহৃত হয়। গ্লিসারিন (দ্র) বা গ্লিসারোল, যা সাবান (দ্র) তৈরির কারখানায় উপজাত দ্রব্য হিসাবে পাওয়া যায়, সেটি গ্লাইকলের চেয়েও বেশি ঘন এবং মিষ্টি। অ্যান্টিফ্রিজ হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও এটি আরো অনেক রকমের কাজে লাগে, যেমন– নাইট্রোগ্লিসারিন ও ডিনামাইটের (দ্র) মতো বিস্ফোরক তৈরির কাজে।

আ. হ. খ.

অ্যালুমিনিয়াম (aluminium)

সঙ্কেত (Al)। পারমাণবিক গুরুত্ব ২৬·৯৭। ক্রমাঙ্ক ১৩। অ্যালুমিনিয়াম মৌলাবস্থায় প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু এটির বহু রকমের যৌগ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। বস্তুত সমস্ত ধাতুর মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণই ভূপৃষ্ঠে সবচেয়ে বেশি। এর অধিকাংশই মাটি–পাথরে সিলিকেট হিসাবে থাকে।

বর্তমানে অবশ্য প্রচুর পরিমাণে অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করা হয় এবং নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এর উৎপাদনপ্রণালী খুব বেশি দিনের নয়। পৃথিবীর (দ্র) অধিকাংশ অ্যালুমিনিয়ামই সিলিকেট হিসাবে থাকলেও এই সিলিকেট থেকে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করা খুবই কঠিন ও ব্যয়সাধ্য। ১৮৮৬ সালে চার্লস মার্টিন হল (Charles Martin Hall) নামে ২২ বছরের এক মার্কিন যুবক ও পল্ এরু (Paul Héroult) নামে এক ফরাসি রসায়নবিদ প্রায় একই সময়ে সস্তায় অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করার এক তড়িৎবিশ্লেষণপদ্ধতি আবিষ্কার করেন। বক্সাইট নামের আকরিক (দ্র) থেকে আমাদের প্রয়োজনের সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে। শিল্পক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করতে বক্সাইটের সঙ্গে ক্রাইয়োলাইট নামের অ্যালুমিনিয়ামের আরেকটি আকরিকও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অ্যালুমিনিয়াম ধাতুটি দেখতে সাদা ও এতে সামান্য নীলাভ দ্যুতি আছে। একে পিটিয়ে পাত তৈরি করা যায় বা তারের আকার দেওয়া যায়। এর তাপ ও বিদ্যুৎ-পরিবহণক্ষমতা খুবই বেশি। আর্দ্র বাতাসে অ্যালুমিনিয়ামের ওপর এর অক্সাইডের একটি পাতলা আবরণ পড়ে। এই অক্সাইডের জন্য ধাতুটির ঔজ্জ্বল্য ঠিকই থাকে এবং ভিতরের অ্যালুমিনিয়ামকে অক্সিজেনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

লজেন্স, চকোলেট, চুয়িংগাম মুড়বার পাত থেকে শুরু

করে উড়োজাহাজ তৈরি করতেও অ্যালুমিনিয়াম দরকার হয়। ধাতুসংকর তৈরি করতে অ্যালুমিনিয়ামের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। বাস, রিক্সা, মোটর গাড়ি, এমনকি সামুদ্রিক জাহাজ, সেতু, সিঁড়ি ইত্যাদি তৈরি করতে অ্যালুমিনিয়ামের ধাতুসংকরগুলির প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। বিশেষ তাপ ও বিদ্যুৎপরিবাহী বলে বিদ্যুতের তার, রান্নার বাসনকোসন ইত্যাদি তৈরি করতে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহারও প্রচুর। তিসির তেলের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়ামের গুঁড়ো মিশিয়ে যে বার্নিশ তৈরি করা হয় তা বেশ উজ্জ্বল এবং চকচকে। ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য লোহা (দ্র) ইত্যাদি ধাতুর ওপর এই রঙের প্রলেপ দেওয়া হয়। পালিশ করা অ্যালুমিনিয়াম দূরবীনের আয়নায় ব্যবহার করা হয়।

আ. হ. খ.

অ্যাসবেস্টস (asbestos)

যে বিশেষ গুণটির জন্য অ্যাসবেস্টস-এর কদর তা হল, ৫০০ ফারেনহাইট তাপমাত্রা (দ্র) পর্যন্ত এটিকে উত্তপ্ত করলেও এটি পোড়ে না, এমনকি আরো কিছু বেশি তাপমাত্রাতেও এটি পোড়ে না এবং নষ্ট হয় না। অতি প্রাচীন কাল থেকেই মিশর ও চীন দেশের লোকেরা এই জিনিসটির ব্যবহার জানত। তারা অ্যাসবেস্টস দিয়ে কাপড় এবং মাদুর বুনত আর এই সব কাপড় দিয়ে রাজ-রাজড়াদের মৃতদেহ ঢাকত তাঁদেরকে সমাধিস্থ করার জন্য। মার্কো পোলো (দ্র) নামের বিখ্যাত পর্যটক সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়ে ভ্রমণের সময় আকস্মিকভাবে অ্যাসবেস্টস- আকরিকের (দ্র) সন্ধান পেয়েছিলেন। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি আকরিক থেকে অ্যাসবেস্টস তৈরি করার পদ্ধতি এবং অ্যাসবেস্টসের আঁশ দিয়ে কাপড় বোনার কৌশলও আবিষ্কার করেছিলেন।

অ্যাসবেস্টসের আঁশ আকরিকের মধ্যে আড়াআড়ি, লম্বালম্বি এবং এলোমেলোভাবে জড়ানো থাকে। আঁশগুলিকে তাই অতি সাবধানে ছাড়াতে হয়, নইলে তা ভেঙে যায়। আকরিক থেকে ছাড়ানো আঁশ দেখতে অনেকটা পেঁজা তুলার মতো। অ্যাসবেস্টস একটি জটিল রাসায়নিক পদার্থ। এতে আছে ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম (দ্র) এবং কয়েকটি ধাতব সিলিকেট। আঁশের রঙ হতে পারে ধবধবে সাদা, ধূসর, সবুজ, হলুদ, লাল, এমনকি কালোও। আঁশের পরিমাণ কমবেশি হতে পারে। অগ্নিরোধক পোষাক তৈরি করার জন্য অ্যাসবেস্টস ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন আঁশযুক্ত জিনিসের সঙ্গে অ্যাসবেস্টস মিশিয়ে আজকাল নানা রকমের অ্যাসবেস্টস শিট তৈরি করা হচ্ছে। জাহাজের টার্বাইন ও জেট ইঞ্জিন (দ্র) এবং নানা ধরনের অগ্নিরোধক কাগজ, রঙ এবং প্লাস্টার তৈরি করতেও প্রচুর পরিমাণে অ্যাসবেস্টস ব্যবহৃত হয়।

আ. হ. খ.

অ্যাসিটাইলিন (acetylene)

অ্যাসিটাইলিন একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন, (CH≡CH). ইথিলিনের (দ্র) চেয়েও বেশি অসম্পৃক্ত যার দু'টি কার্বন পরমাণুর মধ্যে রয়েছে একটি ত্রিবন্ধন, যাকে অ্যালকাইন শ্রেণীভুক্ত করা হয় আর এই অ্যালকাইন শ্রেণীর প্রথম যৌগটির নাম হল অ্যাসিটাইলিন। আণবিক সঙ্কেত C_2H_2 এবং সংযুক্ত সঙ্কেত H-C≡C-H। প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় অ্যাসিটাইলিন পাওয়া যায় না। কোল গ্যাসে সামান্য পরিমাণ অ্যাসিটাইলিন থাকে। কয়লা (দ্র) ও পেট্রোলিয়াম (দ্র) খনিতে অন্যান্য গ্যাসের (দ্র) সঙ্গে এই গ্যাসটিও বের হয়ে আসে।

প্রস্তুতি : সাধারণ উষ্ণ পানির সঙ্গে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের বিক্রিয়ার ফলে অ্যাসিটাইলিন উৎপন্ন হয়। ল্যাবরেটরিতে একটি কনিকেল ফ্লাস্কে (conical flask) কিছু বালি নিয়ে তার উপর ক্যালসিয়াম কার্বাইডের কিছু টুকরো রাখা হয়। ফ্লাস্কের মুখে একটি ছিপি লাগানো হয় ও তার মধ্যে দিয়ে একটি বিন্দুপাতী (যা দিয়ে বিন্দু বিন্দু তরল যোগ করা যায়) ফানেল ও ফ্লাস্কের পার্শ্ববর্তী নলের সঙ্গে একটি নির্গম-নল যথারীতি সংযুক্ত করা হয়। ফানেলের সাহায্যে ফোঁটায় ফোঁটায় শীতল পানি ফ্লাস্কে ফেললে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের সঙ্গে পানির বিক্রিয়া ঘটে এবং অ্যাসিটাইলিন গ্যাস তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসে। এখন এই গ্যাস পানির অপসারণ দ্বারা গ্যাস-জারে যথারীতি সংগ্রহ করা হয়। (ক্যালসিয়াম কার্বাইডকে চুন এবং কোককে ইলেকট্রিক চুল্লীতে উত্তপ্ত করে তৈরি করা যেতে পারে।)

এভাবে উৎপন্ন অ্যাসিটাইলিন গ্যাসে সামান্য পরিমাণ ফস্ফিন (PH_3), আর্সাইন (AsH_3), অ্যামোনিয়া (NH_3) (দ্র), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) প্রভৃতি গ্যাস মিশে থাকে বলে তৈরি গ্যাসটি বিশুদ্ধ নয়। এ জন্য উৎপন্ন

গ্যাসটিকে অ্যাসিডমিশ্রিত কপার-সালফেট দ্রবণের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে অনেকটা বিশুদ্ধ অ্যাসিটাইলিন পাওয়া যায় :

$(C_aC_2+2H_2O= H\text{-}C{\equiv}C\text{-}H+Ca(OH)_2$

শিল্পপদ্ধতি : একটি শক্ত কাচের (দ্র) নলে দু'টি গ্যাস-কার্বন তড়িৎদ্বারের মধ্যে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন (দ্র) গ্যাস (দ্র) চালিত করলে তড়িৎদ্বারের কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে অ্যাসিটাইলিন তৈরি করে : $2C+H_2= H\text{-}C{\equiv}C\text{-}H$

ধর্ম ও ব্যবহার : অ্যাসিটাইলিন মিষ্টি গন্ধযুক্ত একটি বর্ণহীন গ্যাস। এটি ০° সে. তাপে ও সাধারণ চাপে সমপরিমাণ আয়তনের পানিতে দ্রবীভূত হয়। তবে অ্যাসিটোনে (দ্র) এটি আরো বেশি পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। চাপ প্রয়োগ করে এ গ্যাসটিকে অতি সহজেই তরল করা যায়। কিন্তু তরল অবস্থায় ঝাঁকুনিতে এটি সহজেই বিস্ফোরিত হয় বলে স্থানান্তরে পাঠানোর জন্য অ্যাসিটাইলিনকে অ্যাসিটোনে (দ্র) দ্রবীভূত করার পর উচ্চ চাপে লোহার সিলিণ্ডারে ভরা হয়। অক্সি-অ্যাসিটাইলিন টর্চে অক্সিজেনের সঙ্গে অ্যাসিটাইলিন গ্যাস মিশিয়ে জ্বালালে অতি উচ্চ তাপসম্পন্ন যে অক্সি-অ্যাসিটাইলিন- শিখা (প্রায় ৩০০০° সে. তাপমাত্রার) পাওয়া যায়, তা দিয়ে ধাতুর পাত কাটা কিংবা জোড়া দেওয়ার কাজ অতি সহজেই সুসম্পন্ন করা যায়। অ্যাসিটাইলিন খুবই সক্রিয় একটি গ্যাস বলে এর সহায়তায় নানা রাসায়নিক দ্রব্য ব্যাপকভাবে তৈরি করা যেতে পারে। যেমন– পানির সঙ্গে প্রভাবকের উপস্থিতিতে তৈরি হয় অ্যাসিট্যালডিহাইড, যাকে জারিত করে পাওয়া যেতে পারে অ্যাসেটিক অ্যাসিড। অ্যাসিটাইলিনের সাহায্যে ভিনাইল জাতীয় প্লাস্টিক তৈরি করা যেতে পারে, যাদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করা যেতে পারে পলিভিনাইল ক্লোরাইডের (P.V.C.)। এমনি বহু জাতের মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য অ্যাসিটাইলিনের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব, গ্যাসটির অধিক মাত্রায় সক্রিয় হওয়ার কারণে।

আ. হ. খ.

অ্যাসিটেট (acetate)

সকল স্বাভাবিক অ্যাসিটেট পানিতে দ্রবণীয়। কতগুলি ক্ষারকীয় অ্যাসিটেট পানিতে অদ্রবণীয়। সোডিয়াম অ্যাসিটেট কৃত্রিম উপায়ে ঠাণ্ডা করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং রাসায়নিক দ্রব্য হিসাবেও এর ব্যবহার রয়েছে। লেড অ্যাসিটেট বা সুগার অব লেড এবং বেসিক লেড অ্যাসিটেট ব্যবহৃত হয় সীসার (দ্র) বিভিন্ন দ্রব্য, যেমন 'সাদা সীসা' তৈরি করতে। পানিতে দ্রবীভূত লেড অ্যাসিটেট অনেক সময় 'লেড লোশন' হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বেসিক কপার অ্যাসিটেট, যার শিল্পে ব্যাবহারিক নাম ভার্ডিগ্রিস, এটি সবুজ রঙ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। অ্যালুমিনিয়াম (দ্র), ক্রোমিয়াম (দ্র), লোহা (দ্র) এবং তামার (দ্র) স্বাভাবিক অ্যাসিটেটসমূহ মর্ডাান্ট বা প্রতিরোধক হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

আ. হ. খ.

অ্যাসিটোন (acetone)

শিল্পক্ষেত্রে অ্যাসিটোন একটি মূল্যবান পদার্থ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং তিনটি পদ্ধতিতে একে প্রস্তুত করা যায়।

(১) ক. কাঠের পাতন প্রক্রিয়ার দ্বারা দু'ভাবে অ্যাসিটোন প্রস্তুত করা সম্ভব— সরাসরি পদ্ধতিতে এবং অ্যাসেটিক অ্যাসিডের ক্যালসিয়াম লবণের শুষ্ক পাতন প্রক্রিয়ার সাহায্যে। পাইরোলিগ্নিয়াস অ্যাসিডকে আংশিক পাতন করলে যে অবিশুদ্ধ অ্যাসিটোন ও মিথাইল অ্যালকোহল পাওয়া যায়, সেই দুই অংশকে সম্পৃক্ত সোডিয়াম বাইসালফাইট দ্রবণে ঝাঁকিয়ে সেন্ট্রিফিউজিং প্রক্রিয়ায় পৃথক করে গরম সোডিয়াম কার্বনেট দ্বারা বিশ্লিষ্ট করলে অ্যাসিটোন পৃথক হয়ে পড়ে। এই পৃথক হয়ে পড়া অ্যাসিটোনকে পাতিত করার পর ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দ্বারা শুষ্ক করে পুনরায় পাতিত করা হয়।

খ. ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেটকে (পাইরোলিগ্নিয়াস অ্যাসিড থেকে প্রাপ্ত পাতিত পদার্থকে) আংশিক পাতনের মাধ্যমে ৫০° থেকে ৬০° সে. আলাদাভাবে সংগৃহীত করা হয় এবং এই সংগৃহীত পদার্থকে সোডিয়াম বাইসালফাইটের তীব্র দ্রবণে মেশালে অ্যাসিটোনের স্ফটিকাকার বাইসালফাইটের স্ফটিক তৈরি হয়। এদেরকে আগের মতো পৃথক করে বিশ্লিষ্ট করা হয়।

(২) স্টার্চ থেকে : মাসেরে নামক জীবাণুর দ্বারা স্টার্চকে ফার্মেন্টেশন্ প্রক্রিয়া অবলম্বনের সূত্রে অ্যাসিটোন প্রস্তুত করা যায়।

(৩) অ্যাসেটিক অ্যাসিড থেকে : ৩০০° থেকে ৩৫০° সে. উত্তাপে অ্যালুমিনা বা থোরিয়ামের ওপর দিয়ে অ্যাসেটিক

অ্যাসিডের বাষ্প চালনা করলে অ্যাসিটোন উৎপন্ন হয় :

$$2CH_3COOH \rightarrow CH_3COCH_3 + H_2O + CO_2$$

অ্যাসিটোন একটি বর্ণহীন, দাহ্য, সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত তরল জৈব রাসায়নিক পদার্থ। এর স্ফুটনাঙ্ক ৫৬·৫° সে. এটি এক উৎকৃষ্ট দ্রাবক পদার্থ হিসাবে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কাজে লাগে। বিশেষত রেয়ন অর্থাৎ কৃত্রিম রেশম তৈরির জন্য সেলুলোজ অ্যাসিটেট-এর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। চর্বি ও রজন জাতীয় পদার্থ অ্যাসিটোনে গলে যায়। পানি, অ্যালকোহল (দ্র) এবং ইথারে এটি সর্বতোভাবে দ্রবণীয়। অ্যাসিটোন একটি মূল্যবান দ্রাবক এবং উচ্চ শ্রেণীর বার্নিশ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এটি কর্ডাইট এবং কলোডিয়ন তৈরিতে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় এবং অ্যাসিটাইলিন (দ্র) সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়। কাঠ থেকে রেজিন (দ্র), রঙ এবং বার্নিশ তোলার কাজে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। ক্লোরোফর্ম (দ্র), সালফোনাল, আইওডোফর্ম, আয়োনন এবং সংশ্লেষিত রাবার তৈরির কাজেও এর বিশেষ ব্যবহার রয়েছে।

আ. হ. খ.

অ্যাসিড (acid)

অম্ল বা টক জাতীয় স্বাদের জিনিসকেই বলা যেতে পারে অ্যাসিড। লেবুর রস টক, কেননা এতে থাকে সাইট্রিক অ্যাসিড, যার স্বাদ টক। তেমনই ভিনিগারের (দ্র) স্বাদ টক, কারণ এতেও থাকে অ্যাসেটিক অ্যাসিড, যার স্বাদ টক। লেবু এবং ভিনিগারের মধ্যে এত কম পরিমাণে অ্যাসিড থাকে যে এগুলো শরীরের কোনো ক্ষতি তো করতেই পারে না, অধিকন্তু উপকারই করে। অন্য দিকে হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিড (HF) এমন শক্তিশালী যে সেটি ধাতুকে (দ্র) যেমন ক্ষয় করতে পারে, তেমনি ধাতু এবং কাচকেও (দ্র) দ্রবীভূত করতে পারে।

অ্যাসিডকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, জৈব অ্যাসিড ও অজৈব অ্যাসিড। জৈব অ্যাসিডে থাকে কার্বনের পরমাণু, কিন্তু অজৈব অ্যাসিডে কোনো কার্বনের পরমাণু থাকে না। সকল অ্যাসিডের মধ্যে একটি মিল আছে। পানিতে দ্রবীভূত হলে তারা হাইড্রোজেন আয়নে বিশ্লেষিত হয়। হাইড্রোজেন আয়ন হল পজিটিভ বিদ্যুৎসম্পন্ন হাইড্রোজেন পরমাণু। যে সমস্ত বিদ্যুৎসম্পন্ন আয়ন পানিতে বেশি পরিমাণে বিশ্লেষিত হয়, সেগুলো শক্তিশালী অ্যাসিড। যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl), নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3), সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2So_4) ইত্যাদি। কিন্তু যে অ্যাসিড পানিতে খুব কম পরিমাণে বিশ্লেষিত হয় তারাই দুর্বল অ্যাসিড। যেমন—সাইট্রিক, অ্যাসেটিক, কার্বলিক অ্যাসিড ইত্যাদি। শক্তিশালী অ্যাসিডের (যেমন HCl) সব পরমাণু হাইড্রোজেন আয়নে বিশ্লিষ্ট হতে পারে। রসায়নবিদেরা মিশ্রণে হাইড্রোজেন আয়নের শক্তি নির্ণয় করতে পারেন, যাকে মিশ্রণের pH বলা হয়। অ্যাসিডের pH শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত হতে পারে। (pH যত কম হবে ততই শক্তিশালী অ্যাসিড বোঝাবে)। যে কোনো একটি নির্দেশক (indicator) দ্বারা জিনিসটি অ্যাসিড কিনা তা নির্ণয় করা যেতে পারে। নির্দেশক হল এমন একটি দ্রব্য, যা অ্যাসিডের সংস্পর্শে রঙের পরিবর্তন দেখাতে পারে। যেমন—অ্যাসিডের সংস্পর্শে নীল লিটমাস কাগজ লাল লিটমাস কাগজে পরিণত হতে পারে। কিন্তু জিনিসটি অ্যাসিড কিনা তা জানার জন্য জিভ দিয়ে তার স্বাদ যাচাই করা কখনো উচিত নয়। কোনো অ্যাসিড যেমন জিভকে পুড়িয়ে ফেলতে পারে, তেমনি হতে পারে বিষাক্ত, এমনকি কোনোটি গায়ের চামড়াকে পুড়িয়ে ফেলে ক্ষতেরও সৃষ্টি করতে পারে।

অনেক খাবারের জিনিস রেখে দিলে টক হয়ে নষ্ট হতে পারে। যেগুলোর মধ্যে শ্বেতসার এবং চিনি (দ্র) থাকে সেগুলো অ্যাসিডে পরিণত হয়ে নষ্ট হয়। যেমন দুধে ল্যাক্টোজ নামে যে চিনি থাকে তা ল্যাক্টিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই অ্যাসিডের সঙ্গে এনজাইম (দ্র) মিলিতভাবে কাজ করে। বেঁচে থাকার জন্য একান্ত প্রয়োজন সেই সব জরুরি আটটি অ্যামাইনো অ্যাসিড, যেগুলোর মধ্যে সব ক'টিরই উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য। ফলমূল ও শাক-সব্জি ভিটামিন-সি খাবারে থাকতেই হবে। নইলে এর অভাবে স্কার্ভি (দ্র) নামের রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। অন্যান্য দুর্বল অ্যাসিডগুলোও শারীরিক সুস্থতার জন্য জরুরি।

H_2SO_4 এর মতো শক্তিশালী অ্যাসিডও আমাদের প্রয়োজন শিল্পের জন্য। প্রতি বছর শত শত টন এই অ্যাসিডের প্রয়োজন হয়। লোহার (দ্র) মরিচা পরিষ্কার করার জন্য (যাকে বলা হয় 'পিকলিং') খুবই দরকার হয় এই অ্যাসিডের। তা ছাড়া জমির সার, নানা রকমের রঞ্জক (dye), প্লাস্টিক, সংশ্লেষিত নানা রকমের জিনিস তৈরিতে

নানা প্রকার অ্যাসিডের ব্যবহার খুবই প্রচলিত—এমনকি সোনা (দ্র), প্ল্যাটিনাম (দ্র) ধাতুকে দ্রবীভূত করার জন্য অ্যাকোয়া রিজিয়ার (দ্র) ব্যবহার বহুল প্রচলিত।

আ. হ. খ.

অ্যাসেরীয় সভ্যতা মেসোপটেমীয় সভ্যতা দ্র

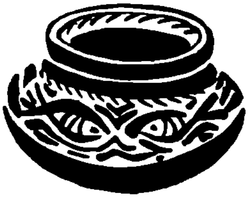

আ

আই এম এফ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল দ্র

আই এল ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা দ্র

আই. কিউ.

আই. কিউ. (I.Q.) শব্দটি ইংরেজি ইনটেলিজেন্স্ ক্যোউশন্ট্ (Intelligence Quotient) -এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর বাংলা প্রতিশব্দ বুদ্ধ্যঙ্ক। এটি আই. কিউ. হিসাবে অধিক পরিচিত। বুদ্ধ্যঙ্ক (বুদ্ধি+অঙ্ক) বা আই. কিউ. হচ্ছে বুদ্ধির পরিমাপ। আই. কিউ. একটি সূত্র দিয়ে প্রকাশ করা হয়। সূত্র অনুসারে কোনো ব্যক্তির আই. কিউ. হল—

$$\text{আই. কিউ.} = \frac{\text{ঐ ব্যক্তির মানসিক বয়স}}{\text{ঐ ব্যক্তির প্রকৃত বয়স}} \times ১০০$$

প্রকৃত বয়স হল জন্মগ্রহণের পর থেকে যে সময়ে কোনো ব্যক্তির আই. কিউ. হিসাব করা হচ্ছে সেই সময় পর্যন্ত তার বয়স। যেমন—কারো বয়স ১২ বৎসর; কারো ১২ বৎসর ৩ মাস; কারো ১২ বৎসর ৬ মাস ইত্যাদি হতে পারে।

মানসিক বয়সকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : সাত বৎসর বয়সের একটি শিশুর বুদ্ধি যদি ১০ বৎসরের একটি শিশুর মতো হয়, তা হলে ঐ শিশুটির মানসিক বয়স ১০ বৎসর, কিন্তু প্রকৃত বয়স ৭ বৎসর। ঐ শিশুটির আই. কিউ. হবে $\frac{১০}{৭} \times ১০০ = ১৪৩$। আই.কিউ. আসলে মানসিক বয়স ও প্রকৃত বয়সের অনুপাত (দ্র)। এই অনুপাতটি নির্ণয় করলে একটি ছোট ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। নির্ণীত ভগ্নাংশকে ১০০ দিয়ে গুণ করলে এটি পূর্ণ সংখ্যায় পরিণত হয়। এতে সুবিধা হয়। সব মানুষের বুদ্ধি সমান নয়, তাই বিভিন্ন মানুষের আই. কিউ.-ও বিভিন্ন হয়। তাত্ত্বিকভাবে মানুষের আই. কিউ. শূন্য থেকে ২০০ অথবা এর অধিক হতে পারে। তবে কোনো স্বাভাবিক মানুষের আই. কিউ. শূন্য হতে পারে না। কারো আই. কিউ. ১০০ হলে তাকে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন, ১০০-এর কম হলে নিম্নবুদ্ধিসম্পন্ন, ১০০-এর বেশি হলে উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন বলা যায়। ফরাসি মনোবিজ্ঞানী আল্‌ফ্রে বিনে (Alfred Binet) এবং তাঁর সহকর্মী ডা. সিমঁ (Simon) ১৯০৫ সালে বুদ্ধি পরিমাপের টেস্ট সর্বপ্রথম তৈরি করেন। এই টেস্ট থেকে ব্যক্তির মানসিক বয়স পরিমাপের ধারণা পাওয়া যায়। ১৯১২ সালে প্রথম জার্মান মনোবিজ্ঞানী ভিল্‌হেল্‌ম্ স্টার্ন (Wilhelm Stern) আই. কিউ.-এর ধারণা প্রকাশ করেন।

হো. আ.

আইন অমান্য আন্দোলন

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং ভারতের (দ্র) স্বাধীনতা লাভ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মহাত্মা গান্ধীর (দ্র) নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন। গান্ধীজি এই আন্দোলন শুরু করার জন্য উৎসাহিত হয়েছিলেন ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে (দ্র) হিন্দু-মুসলমানের অভূতপূর্ব ঐক্য লক্ষ্য করে।

আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত প্রথম ঘোষিত হয়েছিল ১৯২৯ সালে গান্ধীর নেতৃত্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস (দ্র) অধিবেশনে। এই আন্দোলনের অংশ হিসাবে কংগ্রেসের সকল সদস্য ও জাতীয়তাবাদীদের আইনসভা, সরকারি সভা-সমিতি প্রভৃতি থেকে পদত্যাগ এবং নির্বাচন বর্জন করতে আহ্বান জানানো হয়।

১৯২০ সালের ১২ই মার্চ গান্ধীজি লবণ (দ্র) আইন ভঙ্গ করার জন্য সবরমতী আশ্রম থেকে গুজরাটের

ধরসানা লবণ গোলা আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্বে সরোজিনী নাইডু

উপরের ছবিতে আদিবাসী নারীদের এবং নিচের ছবিতে মহিষ বাথানে লবণ আইন অমান্য আন্দোলন

সমুদ্রতীরে অবস্থিত ডাণ্ডি নামক গ্রামের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা শুরু করেন। সবরমতী আশ্রম থেকে ডাণ্ডির দূরত্ব প্রায় দু' শ' মাইল। গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামী সত্যাগ্রহীরা এই দীর্ঘ পথ প্রায় ২৫ দিন ধরে ধীরে ধীরে অতিক্রম করেন। এই ঘটনা সারা ভারতে নজিরবিহীন গণজাগরণ সৃষ্টি করে। গান্ধীজি ৬ই এপ্রিল ডাণ্ডিতে লবণ আইন অমান্য করলে সারা দেশ জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। বিদেশী দ্রব্য বর্জন, করদান বন্ধ করা, ধর্মঘট (দ্র) প্রভৃতি ছিল এই আন্দোলনের কর্মসূচি।

১৯৩০ সালের শেষ দিকে সত্যাগ্রহীরা ধরসানা ও ওয়াডালা নামক স্থানের সরকারি লবণগোলা দখল করে সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এতে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফ্ফার খান (দ্র)তাঁর 'খুদাই খিদ্‌মতগার' নামক সংগঠন পরিচালনার মধ্য দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯৩০ সালের শেষ পর্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের পাইকারিভাবে গ্রেফতার ও নির্যাতন করা সত্ত্বেও আন্দোলনের তীব্রতা এতটুকু হ্রাস পায় নি।

উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনার জন্য লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক আহূত হয়। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান করে নি।

১৯৩১ সালের ৫ই মার্চ ভাইসরয় আরউইন এবং গান্ধীজির মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে এবং দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে গান্ধীজি কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। কিন্তু এ বৈঠকে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হয় নি।

গোলটেবিল বৈঠকের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করে গান্ধীজি লক্ষ করেন যে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে সরকারের দমননীতি পুনরায় শুরু হয়েছে। নতুন ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন গান্ধীকে সাক্ষাৎকার প্রদান করতেও অস্বীকার করেন। এই অবস্থায় আইন অমান্য আন্দোলন আবার শুরু হয়, গান্ধীজি কারারুদ্ধ হন এবং কংগ্রেস (দ্র) সংগঠন বেআইনি ঘোষিত হয়।

কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর গান্ধীজি হরিজনদের সেবা ও অস্পৃশ্যতা (দ্র) দূর করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ধীরে ধীরে আইন অমান্য আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মো. ই.

আইনস্টাইন, আলবার্ট [১৮৭৯-১৯৫৫]

বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী। আইনস্টাইন (Albert Einstein)-এর জন্ম জার্মানির উল্‌ম্‌ শহরে, ১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ। ছেলেবেলায় লেখাপড়া করেন মিউনিক শহরে। ষোল বছর বয়সে চলে যান মিলান। কয়েক মাস সেখানে থাকার পর ভর্তি হন সুইজারল্যাণ্ডে জুরিখের পলিটেকনিক স্কুলে। গণিতে তাঁর ছিল অসাধারণ প্রতিভা। কিন্তু ক্লাসের বাঁধাধরা লেখাপড়ায় আইনস্টাইন তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি ঠিকই, তবে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা পড়তে থাকেন গভীর আগ্রহের সঙ্গে।

জুরিখের পলিটেকনিক স্কুল থেকে পাশ করে বেরুনোর পর চাকুরি পেলেন বার্ন-এর পেটেন্ট অফিসে। কেরানির চাকুরি। অবসর সময়ে পড়াশুনা করতেন গতিবিদ্যা, তাপবিজ্ঞান এবং মহাকর্ষ শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হল তাঁর যুগান্তকারী তত্ত্ব 'আপেক্ষিকতাবাদ'। সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর খ্যাতি। ১৯০৯ সালে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার

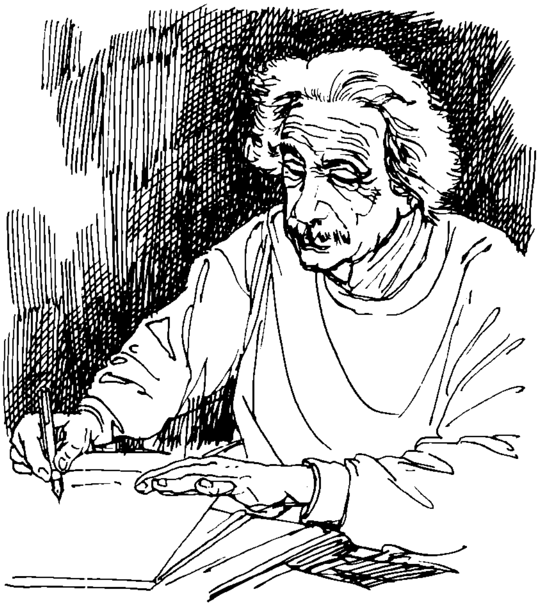

অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন আইনস্টাইন। ১৯১৩ সালে নিযুক্ত হলেন বার্লিনের 'কাইজার ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ফিজিক্যাল ইনস্টিটিউট'-এর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক। ১৯২১ সালে ফটোইলেকট্রিসিটি বিষয়ে গবেষণার জন্য লাভ করেন পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার (দ্র)।

উন্নত বিজ্ঞান চর্চা ইনস্টিটিউট : প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিচ্ছেন আইনস্টাইন

জার্মানিতে ইহুদিদের উপর অত্যাচার শুরু হবার পর ১৯৩৩ সালে গোপনে জার্মানি ছেড়ে চলে যান। তিনি নিজে ছিলেন ইহুদি। তারপর বিভিন্ন দেশ ঘুরে আমেরিকায় আসেন। অধ্যাপনা শুরু করেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৫৫ সালে ৭৬ বছর বয়সে মারা যান।

আইনস্টাইনের অন্যতম যুগান্তকারী আবিষ্কার হচ্ছে ভর-শক্তি সমীকরণ $E= mc^2$। এখানে E= শক্তি, m= ভর এবং c = আলোর গতিবেগ।

সু. ব.

আইবুড়ো ভাত

গায়ে-হলুদ অনুষ্ঠানের পরে এবং বিবাহানুষ্ঠানের আগে পাত্র-পাত্রীর অবিবাহিত অবস্থায় শেষ অন্নগ্রহণের অনুষ্ঠান। আসলে এটি সংস্কারমূলক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে পঞ্চ ব্যঞ্জন ছাড়াও পরমান্ন পিঠে-পুলিসহ বিভিন্ন খাদ্য-উপকরণ স্ব-স্ব পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে পাত্র-পাত্রীকে খাওয়ানো হয়। তবে পাত্রীকে পাত্রের বাড়ি থেকে প্রেরিত জলযোগের উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদিও ভোজন করানো হয়।

ভাই-বোন, ভ্রাতৃবধূ ও ভগ্নিপতি সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনেরা সাধারণত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকে। তবে কন্যার আইবুড়ো ভাতে বিশেষভাবে কুমারী মেয়েরাই অংশ নেয়। কারণ আইবুড়ো ভাতে অংশগ্রহণ করলে তাদের তাড়াতাড়ি বিবাহ হবে—এরকম একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে পাত্র-পাত্রীকে নতুন কাপড় পরিধান করতে হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী আত্মীয়স্বজনদেরও সাধ্য মতো নতুন কাপড় উপহার দেওয়ার নিয়ম আছে। এই শুভ লোকাচারমূলক অনুষ্ঠানটি বাংলার সর্বত্র একভাবে পালিত হয় না। আইবুড়ো ভাতকে থুবড়ো খাওয়ানোও বলে। এর সংস্কৃত নাম অব্যূঢ়ান্ন।

সুজ. ব.

আইয়ুব খান, ফিল্ড মার্শাল [১৯০৮—১৯৭৪]

সামরিক শাসক ও রাজনীতিবিদ। জন্ম সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অ্যাবোটাবাদে, ১৯০৮ সালে।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংল্যাণ্ডের স্যাণ্ডহার্স্ট রয়েল মিলিটারি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৮ সালে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে যোগ দান করেন। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে মেজর জেনারেল পদে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান ডিভিশনের জি. ও. সি. (General Officer Commanding) নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের দেশরক্ষামন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার সঙ্গে যোগসাজশে তিনি পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি ও ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করেন। এবং একই বছরের ২৭শে অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে আইয়ুব খান নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করেন।

১৯৬২ সালের ১লা মার্চ তিনি প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির শাসনতন্ত্র জারি করে বিপুল রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হন। ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে পাকিস্তানের উভয় অংশে অনুষ্ঠিত হয় মৌলিক গণতন্ত্রীদের (গ্রামস্তরে জনপ্রতিনিধি) নির্বাচন। এবং ১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় পরোক্ষ পদ্ধতিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। উভয় পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর ভোটের ভিত্তিতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আইয়ুব খান বিরোধী দল কর্তৃক সমর্থিত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে পরাজিত করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৫ সালের ২৪শে মার্চ মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ভারতের (দ্র) সঙ্গে পাকিস্তানের (দ্র) যুদ্ধ বাধে। এই সময় আইয়ুব খান নিজেকে ফিল্ড মার্শালের (Field Marshal) মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। ১৯৬৬ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার সম্বলিত ৬-দফা (দ্র) পেশ করা হলে এই দাবির উত্থাপক দল আওয়ামী লীগের (দ্র) ওপর তিনি নিপীড়নের পথ বেছে নেন। গ্রেফতার করেন শেখ মুজিবুর রহমান (দ্র) সহ দলীয় নেতৃবৃন্দকে। ১৯৬৬ সালের মধ্যভাগে ও ১৯৬৮ সালে প্রবল আইয়ুববিরোধী গণ-

আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিণ্ডিতে উভয় পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। বৈঠকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে তিনি ২৪শে মার্চ (১৯৬৯) পাকিস্তানের সেনাবাহিনীপ্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের (দ্র) হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে রাজনীতি থেকে অবসর নেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৭৪ সালের ২০শে এপ্রিল।

আ. হু.

আইসক্রিম (ice cream)

সব বয়সের মানুষের নিকট আইসক্রিম একটি প্রিয় খাবার। দুধ (দ্র) এবং অন্যান্য উপাদানে তরল মিশ্রণকে জমিয়ে আইসক্রিম বানানো হয়। আইসক্রিমের মধ্যে দুধ ছাড়া ক্রিম, চিনি (দ্র), কর্ন সিরাপ, ডিম (দ্র), সুগন্ধি দ্রব্য এবং আরো অনেক উপাদান থাকে। জমানোর সময় এর মধ্যে আটকে পড়া বাতাসের পরিমাণ আইসক্রিমের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আইসক্রিম তৈরি করার জন্য বিভিন্ন উপাদান এক সঙ্গে মিশিয়ে ব্লেণ্ড্ করা হয়। পরে এই তরল মিশ্রণকে পাস্তুরিত (দ্র) করা হয় এবং মিশ্রণকে শীতল করে জমানো হয়। সুগন্ধি সাধারণত শীতল করার আগে যোগ করা হয়। আইসক্রিমের ওপর ফল, ক্যাণ্ডি, বাদাম, চকলেট ইত্যাদি জমানোর পরে যোগ করা হয়। আইসক্রিমে যেন বড় মোটা বরফকণা না জমে এ জন্য স্ট্যাবিলাইজার (stabilizer) এবং এর দানা মিহি-কোমল রাখার জন্য ইমাল্‌সিফাইয়ার (emulsifier) ব্যবহার করা হয়।

১২৯৫ সালে মার্কো পোলো (দ্র) দূরপ্রাচ্য থেকে ইতালিতে ফিরে প্রথম ইউরোপে আইসক্রিম খাওয়ার অভ্যাস চালু করেন। আইসক্রিমের জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে ইতালির অবদান। ১৮৫১ সালে আইসক্রিম তৈরি করা একটি পুরোপুরি শিল্পে পরিণত হয়। এ সময় জ্যাকব ফাসেল (Jacob Fussell) নামে বাল্টিমোরের এক জন দুধ-ব্যবসায়ীর উৎপাদন ও সরবরাহ এমন বেড়ে যায় যে তিনি বাধ্য হয়ে প্রচুর আইসক্রিম বানাতে শুরু করেন। এখন শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই (দ্র) প্রতি বছর ৮০ কোটি গ্যালন আইসক্রিম বিক্রি হয়। এখন আইসক্রিমের সমঝদার দুনিয়াজোড়া।

সা. এ.

আইসোটোপ (isotope)

একই মৌলিক পদার্থের সকল পরমাণুতে সাধারণত সমান সংখ্যক প্রোটন (দ্র) ও নিউট্রন (দ্র) থাকে। অর্থাৎ এদের ভরসংখ্যা সমান হয়। ভরসংখ্যা হল পরমাণুর প্রোটনসংখ্যা ও নিউট্রনসংখ্যার যোগফল; পরমাণুর প্রোটনসংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলে। যে সকল পরমাণুর প্রোটনসংখ্যা সমান কিন্তু ভরসংখ্যা অসমান তাদের বলা হয় আইসোটোপ।

আইসোটোপগুলোর পারমাণবিক সংখ্যা সমান, কিন্তু পারমাণবিক ভর পৃথক হয়। নিউট্রনসংখ্যার পার্থক্যের কারণে পারমাণবিক ভরে পার্থক্য হয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কোনো কোনো মৌলিক পদার্থের বেলায় পরমাণুর ভরের এই পার্থক্য দেখা যায়। এ ধরনের একই মৌলিক পদার্থের পৃথক পারমাণবিক ভরবিশিষ্ট পরমাণু দিয়ে গঠিত পদার্থকে বলা হয় ঐ মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ। যেমন কার্বন-১২ ($_6C^{12}$) এবং কার্বন-১৪ ($_6C^{14}$) উভয়ই

কার্বন। উভয়ের পারমাণবিক সংখ্যা ৬ অর্থাৎ এদের প্রত্যেকের পরমাণুতে ৬টি করে প্রোটন রয়েছে। কিন্তু কার্বন-১২-এর ভরসংখ্যা ১২ এবং কার্বন-১৪-এর ভরসংখ্যা ১৪। গ্রিক ভাষায় আইসো (iso) অর্থ 'সম' এবং টোপ (tope) অর্থ 'স্থান' বা 'ঘর'। সুতরাং আইসোটোপ বলতে বোঝায় 'সমস্থানিক' বা 'সমঘর'। পর্যায় সারণীতে (periodic table) মৌলিক পদার্থের তালিকায় এদের স্থান একই ঘরে; তাই এদের রাসায়নিক ধর্ম প্রায় একই রকম। কোনো মৌলিক পদার্থের আইসোটোপের রাসায়নিক ধর্ম ঐ মৌলিক পদার্থেরই অনুরূপ। কিন্তু এদের ভৌত ধর্মে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো মৌলিক পদার্থের একাধিক আইসোটোপ থাকতে পারে; যেমন— হাইড্রোজেনের (দ্র) রয়েছে তিনটি আইসোটোপ— এরা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। এগুলো হল প্রোটিয়াম (ভরসংখ্যা ১), ডয়টেরিয়াম (ভরসংখ্যা ২) এবং ট্রিটিয়াম (ভরসংখ্যা ৩)। এরকম অক্সিজেনেরও (দ্র) আছে তিনটি আইসোটোপ : অক্সিজেন-১৬, অক্সিজেন-১৭ ও অক্সিজেন-১৮, এবং ইউরেনিয়ামেরও আছে তিনটি আইসোটোপ : ইউরেনিয়াম-২৩৪, ইউরেনিয়াম-২৩৫ ও ইউরেনিয়াম-২৩৮। অনেক স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থে তাদের বিভিন্ন আইসোটোপ মেশানো থাকে। যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম আইসোটোপ তৈরিও করা যায়। কোনো কোনো আইসোটোপ আবার তেজস্ক্রিয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের বিভিন্ন প্রয়োগ রয়েছে।

শা. ত.

আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ

আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা ঘটে ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন। তখন এর নাম ছিল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'। এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (দ্র)।

পরবর্তী পর্যায়ে অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি (দ্র) এ দলে অন্যতম প্রধান নেতা হিসাবে যোগ দেন। দলটির সাংগঠনিক কাঠামো ও জনপ্রিয়তা গড়ে তুলতে মওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বে শেখ মুজিবুর রহমান (দ্র) প্রমুখ তরুণ রাজনীতিক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য ১৯৫৫ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর দলটির নতুন নামকরণ হয় 'আওয়ামী লীগ'। পাকিস্তানের উভয় অংশে এই দলের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আওয়ামী লীগ পাকিস্তান আমলে পূর্ববঙ্গের অধিকার আদায়ের গণতান্ত্রিক আন্দালনসমূহে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক বিধানসভার যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, সে নির্বাচনে কৃষক-শ্রমিক পার্টি, আওয়ামী লীগ এবং নেজামে ইসলাম পার্টির সম্মিলিত যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে আওয়ামী লীগের ছিল বিশিষ্ট ভূমিকা।

পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতেও এই দল ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত করেছে। সেই উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি দলটির তরফ থেকে ৬ দফা (দ্র) দাবি পেশ করা হয়। এর ফলে পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের পক্ষ থেকে এর নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান (দ্র) ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করলে এ দলের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের জনগণের ওপর নির্বিচার আক্রমণ চালায়। ফলে ২৬শে মার্চ থেকে শুরু হয়ে যায় দেশকে মুক্ত করার জন্য ঐতিহাসিক সশস্ত্র স্বাধীনতাযুদ্ধ (দ্র)। ২৫শে মার্চ রাতে তাঁর বাসভবন থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্য দিকে পাক বাহিনীর ব্যাপক বর্বর গণহত্যা চলতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দিন আহমদকে (দ্র) প্রধানমন্ত্রী করে মুজিবনগরে (দ্র) অস্থায়ী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। প্রধানত এই সরকারের নেতৃত্বেই দীর্ঘ নয় মাস ধরে পরিচালিত হয় মুক্তিযুদ্ধ (দ্র)।

স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে বাংলাদেশের (দ্র) অভ্যুদয় ঘটলে আওয়ামী লীগ দেশের শাসনভার গ্রহণ করে এবং দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠন করে। এই সময়ে দলের প্রণীত সংবিধানের ভিত্তি ছিল 'জাতীয়তাবাদ'

মুজিবনগরে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার : ডান দিক থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, খন্দকার মুশতাক আহমদ, এম. মনসুর আলী, এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান ও মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক এম. এ. জি. ওসমানী

(দ্র), 'সমাজতন্ত্র' (দ্র), 'গণতন্ত্র' (দ্র) ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ২৪শে জানুয়ারি সংবিধান সংশোধন করে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রপতিশাসিত একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, নিজ দলসহ দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটিয়ে গঠন করা হয় একক রাজনৈতিক দল 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ', সংক্ষেপে 'বাকশাল' (দ্র)।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এক চক্রান্তে আওয়ামী লীগ প্রধান ও রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। খোন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে নতুনভাবে সরকার গঠিত হয়। পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থানে এই সরকারেরও পতন ঘটে। এরপর বাকশালের নীতিমালা বর্জন করে সত্তর দশকের শেষ দিক থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নতুন করে তার সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করে।

১৯৮৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে আবির্ভূত হয়। ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে বি এন পি (দ্র) দেশে সরকার গঠন করে। এবারেও দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আওয়ামী লীগ সংসদে প্রধান বিরোধী দলের অবস্থান গ্রহণ করে। বর্তমানে এই দলের সভানেত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠা কন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদ।

দলটি ১৯৯২ সালে তার পূর্বতন গঠনতন্ত্র সংশোধন করেছে। বর্তমানে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতির ভিত্তি রচনার জন্য ব্যক্তিখাতকে উৎসাহ প্রদান ও মুক্তবাজার-অর্থনীতি চালু করা।

আ. হ.

আওরঙ্গজেব [১৬১৮—১৭০৭]

মোগল সম্রাট শাহজাহানের (দ্র) চার পুত্রের মধ্যে আওরঙ্গজেব ছিলেন তৃতীয়। জীবিতকালে শাহজাহান তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। শাহজাহানের চার পুত্রের নাম দারা (দ্র), সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ। পিতার এই মনোনয়নে সিংহাসনের দাবি নিয়ে ভাইদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। আওরঙ্গজেব সুকৌশলে সবাইকে পরাজিত করে ১৬৫৮ সালে নিজেকে দিল্লির সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। পিতা শাহজাহানকে তিনি আগ্রা দুর্গে বন্দি করে রাখেন। ১৬৫৯ সালে তিনি অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে "আবুল মুজাফ্‌ফর মহীউদ্দীন মুহম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশা গাজী" উপাধি ধারণ করে অভিষেক উৎসব সম্পন্ন করেন।

আওরঙ্গজেব দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে তাঁকে বেশির ভাগ সময় যুদ্ধবিগ্রহে কাটাতে হয়েছে। তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য জয় করেন। সেনাপতি মীর জুমলার (দ্র) সাহায্যে আসাম ও কুচবিহার জয় করেন এবং শায়েস্তা খানের (দ্র) সাহায্যে চট্টগ্রাম ও সন্দীপ দখল করেন।

আওরঙ্গজেবের সময়ে শিবাজীর (দ্র) নেতৃত্বে মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান ঘটে। শিবাজী গেরিলা পদ্ধতিতে হামলা চালিয়ে মোগল সম্রাটকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। শিবাজীকে

দমন করতে আওরঙ্গজেবের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যের সীমানা দক্ষিণে ভারত মহাসাগর (দ্র) থেকে উত্তরে হিমালয় (দ্র) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আওরঙ্গজেব অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। তার জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধা। হিন্দুদের উপর থেকে আকবর (দ্র) যে জিজিয়া কর প্রত্যাহার করেছিলেন আওরঙ্গজেব তা পুনরায় আরোপ করেন। সরকার কর্তৃক অমুসলিমদের হেফাযতের ব্যয় সংকুলানের উদ্দেশ্যে জিজিয়া কর আরোপ করা হত। এর ফলে তিনি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুসম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হন। তবে তাঁর রাজত্বকালে সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের বহু হিন্দু বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা যশোবন্ত সিংহ তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আওরঙ্গজেবের সময়ে মোগল রাজত্ব সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। সুযোগ্য উত্তরাধিকারী না থাকার ফলে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ দমনকালে আহমদনগরে তিনি পরলোক গমন করেন।

খু. জা.

আঁদ্রে জিদ্ জিদ্, অঁদ্রে দ্র

আকবর [১৫৪২—১৬০৫]

পিতা হুমায়ুনের (দ্র) পলাতক জীবনে ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে (দ্র) সিন্ধু প্রদেশের অমরকোট নামক স্থানে মোগল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবরের জন্ম। মাত্র ১৩ বছর বয়সে ১৫৫৬ সালে আকবর সিংহাসনে বসেন। বিশ্বস্ত সেনাপতি বৈরাম খাঁ তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। আকবরের পুরো নাম জালালুদ্দীন মুহম্মদ আকবর।

আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। হুমায়ুন মৃত্যুর পূর্বে কেবল পাঞ্জাব, আগ্রা ও দিল্লি উদ্ধার করে গিয়েছিলেন, কিন্তু সাম্রাজ্য সুসংহত করে যেতে পারেন নি। অভিভাবক বৈরাম খানের সহযোগিতায় আকবর সব বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন।

আফগান নেতা আদিল শাহের সেনাপতি হিমু ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি আক্রমণ করলে সেনাপতি বৈরাম খানের

নেতৃত্বে মোগল সৈন্যেরা পানিপথ প্রান্তরে হিমুকে পরাজিত ও নিহত করেন। ইতিহাসে এই যুদ্ধ দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ (দ্র) নামে পরিচিত।

আঠারো বছর বয়সে আকবর নিজের হাতে রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করেন। বৈরাম খাঁ বিদ্রোহী হলে তাঁকে পরাজিত করে মক্কায় হজ্ব (দ্র) পালনের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন।

সমস্ত বিশৃঙ্খলা দমন করে আকবর রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। গুজরাট, বাংলা, বিহার, কাশ্মীর ও কাবুল জয় করার পর তিনি দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন। তাঁর রাজ্য উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে কান্দাহার, দক্ষিণে বেরার এবং পূর্বে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সম্রাট আকবর প্রায় ৫০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। এর বেশির ভাগ সময় তাঁকে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হয়েছে।

আকবর এক জন সুশাসক ছিলেন। শাসনকার্যের সুব্যবস্থার জন্য তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে ১৫টি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। তিনি জায়গির প্রথা বিলোপ করেন এবং সকল জমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

শাসনব্যবস্থায় ও সামাজিক ক্ষেত্রে আকবর অনেক সংস্কার সাধন করে গেছেন। তিনি যুদ্ধবন্দিদের দাস করার প্রথা বিলোপ করেন। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুদের উপর থেকে জিজিয়া কর তুলে নেন।

আকবর সতীদাহ প্রথার (দ্র) বিরোধী ছিলেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো নারীকে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা যাবে না—এই মর্মে তিনি এক আদেশ জারি করে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি বাল্যবিবাহ বন্ধ ও বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন।

আকবর সকল ধর্মের সার সমন্বয়ে 'দীন-এলাহী' নামক একটা ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। কিন্তু এই ধর্মমত বিশেষ কেউ গ্রহণ করেন নি। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্যই তিনি এই ধর্মমত প্রচার করেন। রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আকবর হিন্দুদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন। রাজস্বসচিব রাজা তোডরমল এবং সেনাপতি রাজা মানসিংহ তাঁদের অন্যতম।

আকবর সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী ছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত আবুল ফজল এবং সঙ্গীতজ্ঞ মিঞা তানসেন (দ্র) তাঁর সভাসদ ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেই বিখ্যাত হিন্দি কবি তুলসীদাস হিন্দি ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন। তাঁর সভাসদ ও বন্ধু আবুল ফজল রচিত 'আকবরনামা' ও 'আইন-ই-আকবরী' আকবরের জীবন ও শাসন সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসকবর্গের মধ্যে আকবর অন্যতম হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। আগ্রার অদূরে সেকেন্দ্রা নামক স্থানে আকবরের সমাধি রয়েছে।

খু. জা.

আকরম খাঁ, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ দ্র

আকরাম, ওয়াসিম [১৯৬৬—]

পাকিস্তানের কৃতী ক্রিকেটার। মূলত ফাস্ট বোলার। তবে দলের বিপর্যয়ের মুহূর্তে ব্যাটিং-এও অনেক বার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান ক্রিকেট (দ্র)- বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার।

জন্ম ১৯৬৬ সালে, পাকিস্তানের লাহোরে। ১৯ বছর বয়সে জাতীয় দলে প্রথম সুযোগ পান। জীবনের প্রথম টেস্টে খেলতে নেমেই ওয়াসিম আকরাম সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পাকিস্তানের হয়ে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে (১৯৮৫ সালে নিউজিল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত) জীবনের প্রথম তিন টেস্টেই তিনি দখল করেন ২২টি উইকেট। ওয়াসিম আকরামের এই সাফল্য ভবিষ্যতের এক দুর্ধর্ষ বোলারের আগমনী বার্তা দিয়েছিল।

পাকিস্তানের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার ইমরান খানের (দ্র) যোগ্য উত্তরসূরি হিসাবে ওয়াসিম আকরাম অচিরেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য আকরামের সাফল্যের পিছনে ইমরান খানের অবদান অনস্বীকার্য। নিজের ছাত্রের মতো ইমরান খান তাঁকে হাতে-কলমে শিক্ষাদান করেছেন। তাঁর সাহচর্যে ওয়াসিম আকরাম পরিণত ক্রিকেটারে রূপান্তরিত হন।

১৯৯৪ সালে এক দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ওয়াসিম আকরাম বিশ্বরেকর্ড করেন। শ্রীলঙ্কায় (দ্র) অনুষ্ঠিত পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার পাঁচটি ওয়ান-ডে সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ ম্যাচে তিনি এই রেকর্ড করেন। চতুর্থ ম্যাচেই তিনি ভারতের কপিল দেবের (দ্র) সর্বোচ্চ ২৫১টি উইকেট দখলের রেকর্ড স্পর্শ করেন। শেষ ম্যাচে আকরাম আরো তিনটি উইকেট দখল করে ওয়ান-ডে ম্যাচে তাঁর উইকেটসংখ্যা ২৫৪-তে উন্নীত করেন। কপিল দেব ২২০ ম্যাচ খেলে পেয়েছিলেন ২৫১টি উইকেট। কিন্তু আকরাম তাঁর চেয়ে ৪৬টি ম্যাচ কম খেলে ২৫৪টি উইকেট পেয়েছেন। পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার ওয়ান-ডে সিরিজের পর শ্রীলঙ্কায় একটি চার জাতির ক্রিকেট টুর্নামেণ্ট হয়। সেই টুর্নামেণ্টে ওয়াসিম আকরাম আরো ৩টি উইকেট লাভ করেন।

ওয়ান-ডে ম্যাচে রেকর্ড সংখ্যক ২৫৭টি উইকেট ছাড়া টেস্ট ক্রিকেটে তিনি আরো ২২২টি ইউকেট পেয়েছেন।

ওয়াসিম আকরামের ওয়ান-ডে ম্যাচ এবং টেস্ট পরিসংখ্যান :

ওয়ান-ডে

ম্যাচ	বল	রান	সেরা নৈপুণ্য	উইকেট
১৭৫	৮৯৩৭	৫৬৩৮	৫/১৫	২৫৭

টেস্ট

টেস্ট	বল	রান	সেরা নৈপুণ্য	উইকেট
৫৩	১২০৩৩২	৫২০৩	৭/১১৯	২২২

টি. কি.

আকরিক

যে খনিজ পদার্থ থেকে কম খরচে ধাতু (দ্র) নিষ্কাশন করা যায় তাই আকরিক। চুনাপাথর (দ্র), বক্সাইট, হেমাটাইট প্রভৃতি আকরিকের উদাহরণ। সকল আকরিকই খনিজ পদার্থ, কিন্তু সকল খনিজ পদার্থ আকরিক নয়।

মৌল আকরিক (Native ore) : কোনো আকরিকে মুক্ত বা মৌল অবস্থায় ধাতু অবস্থান করলে ঐ আকরিককে মৌল আকরিক বলা হয়। প্রকৃতিতে সোনা (দ্র), রূপা (দ্র), প্ল্যাটিনাম (দ্র), তামা (দ্র) প্রভৃতি ধাতু অল্প পরিমাণে মৌল (দ্র) অবস্থায় পাওয়া যায়।

আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন প্রধানত আকরিকের প্রকৃতি, আকরিকস্থিত ধাতুর বৈশিষ্ট্য এবং আকরিকে অবস্থিত অপদ্রব্যের প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। আকরিকের এ সকল বৈশিষ্ট্যের দিক লক্ষ রেখে আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশনের প্রণালীকে নিম্নে বর্ণিত কতকগুলি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

গাঢ়ীকরণ (concentration) পদ্ধতিতে আকরিককে সর্বপ্রথম যন্ত্রের সাহায্যে ভাল করে গুঁড়ো করা হয়। এখানে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ছাড়াই আংশিক বা পুরোপুরিভাবে শুধু খনিজ মল দূর করা হয়। আকরিকের প্রকৃতি অনুযায়ী নিম্নে বর্ণিত তিনটি উপায়ে গাঢ়ীকরণ করা হয় :

ক. পানি দ্বারা ধৌতকরণ (Washing with Water)

খ. তেল ভাসমান পদ্ধতি (Oil Floatation Process)

গ. বৈদ্যুতিক চুম্বক প্রণালী (Electro-magnetic Process)

ঘ. তাপজারণ প্রক্রিয়া (Roasting)

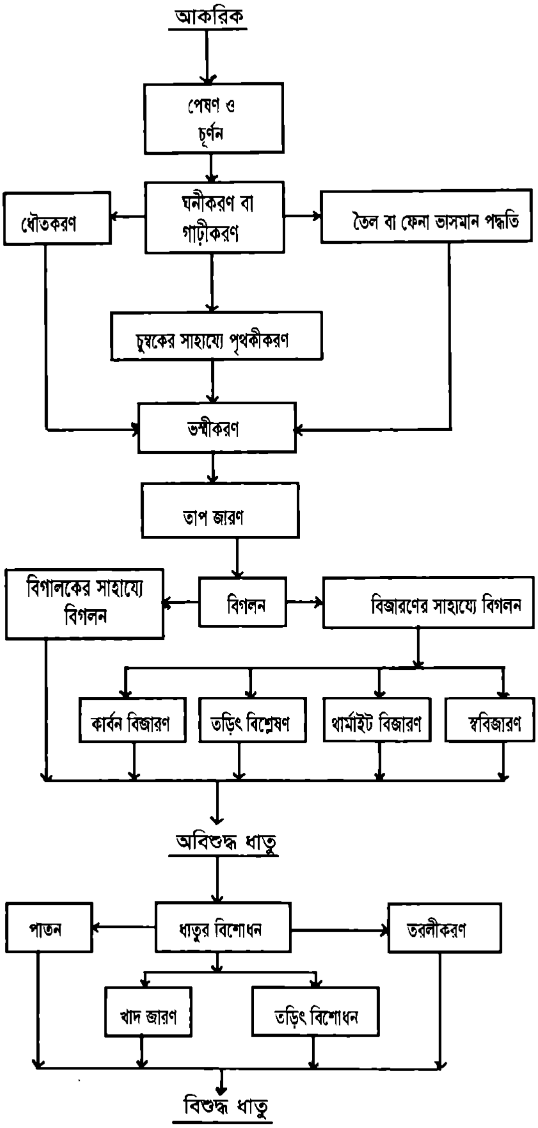

ঙ. বিগলন বা বিজারণ (Smelting or Reduction)

চ. খোদ বিজারণ বা স্ববিজারণ (Self-reduction)

ছ. অ্যালুমিনো থার্মিট পদ্ধতি

জ. শোষণ বা বিশুদ্ধীকরণ (Refining)

ঝ. তরলীকরণ

ঞ. খাদ্যজারণ

ট. তড়িৎ-বিশোধন প্রক্রিয়া (Electrolytic Refining)

ঠ. তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Electrolytic Process)

আ. হ. খ.

আকাশ

খোলা জায়গায় মাথার ওপরে দিন-রাত আমরা আকাশ দেখতে পাই। গাছপালা, নদীনালা দুনিয়ায় কোথাও আছে, কোথাও নেই। এমনকি ঘরবাড়ি, জীবজন্তু, মানুষও সব জায়গায় না থাকতে পারে। কিন্তু আকাশ নেই ভূপৃষ্ঠে এমন জায়গা কল্পনা করা শক্ত।

দিনের বেলা সোনার থালার মতো সূর্য (দ্র) তার কিরণ ছড়ায় চারপাশে। এমনি সময়ে সচরাচর আকাশ নীল। কখনো সাদা বা কালো মেঘে ঢেকে যায় আকাশ। ভোরে বা সন্ধ্যায় আকাশের কোনো কোনো অংশে নামে রঙের বন্যা। কখনো বা সারা আকাশ ভেসে যায় লাল আলোতে। রাতের আকাশ সচরাচর কালো, কিন্তু সেই কালো চাঁদোয়ার গায়ে জ্বলতে থাকে সোনালি চাঁদ (দ্র) আর অসংখ্য ঝকঝকে তারা আর গ্রহ (দ্র)।

আগেকার দিনে লোকে ভাবত, আকাশটা বুঝি পৃথিবীর (দ্র) উপর একটা কিছু কঠিন জিনিসের ঢাকনা। কখনো তারা ভাবত, আকাশটা পরতে পরতে ভাগ করা।

আজ আমরা জানি, আকাশের নীল চাঁদোয়াটা সত্যি সত্যি কঠিন কোনো জিনিসের তৈরি নয়। আসলে এ নিতান্তই গ্যাস (দ্র) ভরতি ফাঁকা জায়গা। হরহামেশা আমরা যে আকাশ দেখি তা হল আসলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঢাকনা। এই বায়ুমণ্ডলে রয়েছে নাইট্রোজেন (দ্র), অক্সিজেন (দ্র), কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র) প্রভৃতি গোটা কুড়ি বর্ণহীন গ্যাসের মিশেল। আর আছে পানির বাষ্প আর ধুলোর কণা।

আকাশ যদি বর্ণহীন গ্যাসের মিশেল, তবে তা নীল দেখায় কেন? মাঝে মাঝে সাদা আর লাল রঙের খেলাই বা দেখি কী করে? আসলে সাদা মেঘে রয়েছে জলীয় বাষ্প জমে তৈরি অতি ছোট ছোট অসংখ্য পানির কণা। কখনো মেঘে এসব কণার গায়ে বাষ্প জমার ফলে ভারি হয়ে বড়

পানির কণা তৈরি হয়। তখন সূর্যের আলো তার ভেতর দিয়ে আসতে পারে না, আর তাই সে মেঘের রঙ হয় কালো।

কিন্তু সারাটা আকাশ সচরাচর নীল রঙের হয় কী করে? আকাশ নীল দেখায় বায়ুমণ্ডলে নানা গ্যাসের অণু ছড়িয়ে আছে বলে। এই সব গ্যাসের কণা খুব ছোট মাপের আলোর ঢেউ সহজে ঠিক্‌রে ছিটিয়ে দিতে পারে। এই ছোট মাপের আলোর ঢেউগুলোই আমরা দেখি নীল রঙ হিসাবে। অর্থাৎ পৃথিবীর ওপর হাওয়ার স্তর আছে বলেই পৃথিবীতে আকাশকে নীল দেখায়।

সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় আকাশের রঙ হুবহু এক রকম থাকে না। এরও কারণ হল পৃথিবীর ওপরকার বায়ুমণ্ডল। সূর্য থেকে যে আলো আমাদের চোখে পড়ে, তাকে পৃথিবীর ওপরকার বিশাল হাওয়ার স্তর পেরিয়ে আসতে হয়। দুপুর বেলা এই আলো আসে সরাসরি অর্থাৎ প্রায় লম্বভাবে হাওয়ার স্তর ফুঁড়ে। কিন্তু সকালে বা সন্ধ্যায় এই আলো আসে তেরচাভাবে হাওয়ার স্তর পেরিয়ে। তাতে আলোকে হাওয়ার কণা ডিঙাতে হয় দুপুরের তুলনায় অনেক বেশি।

সকালে বা সন্ধ্যায় মেঘ আর হাওয়ার ধুলোর কণার ভেতর দিয়ে লম্বা পথ পেরিয়ে আসতে পারে শুধু সূর্যের লাল

আলোর ঢেউগুলো, সে মেঘকে তখন দেখায় লাল। ঘন বৃষ্টি-মেঘের বড় বড় কণারা যখন আকাশ ছেয়ে ফেলে, তখন তার ভেতর দিয়ে আলো পেরিয়ে আসতে পারে না, তাই সে মেঘকে দেখায় কালো।

আগের দিনে আমাদের ওপরকার আকাশ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করতেন শূন্যে বেলুন পাঠিয়ে বা যন্ত্রপাতিসুদ্ধ রকেট পাঠিয়ে। আজ মানুষ নিজেই মহাকাশযানে চেপে সফর করছে পৃথিবীর ওপরে বহু দূর পর্যন্ত। পৃথিবী ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে চাঁদে। পৃথিবীর ওপর দেড় শ'/ দু' শ' মাইল বা তারও অনেক বেশি ওপর দিয়ে ঘুরছে অসংখ্য মহাকাশযান। যেখান দিয়ে ঘুরছে সেখানে হাওয়া নেই বললেই চলে।

মহাকাশযান থেকে দিনরাত তোলা হচ্ছে পৃথিবীর ছবি। জানা যাচ্ছে কোথায় কখন আবহাওয়া (দ্র) কেমন হবে, কোন দেশে কেমন ফসল হচ্ছে। মহাকাশযান থেকে ঠিকরে দেওয়া হচ্ছে টেলিফোন (দ্র) আর টেলিভিশনের (দ্র) সংকেত। তাই দূরদেশের সঙ্গে যোগাযোগ আজ অনেক সহজ হয়ে উঠেছে।

আ. আ. মু.

আকাশপ্রদীপ

প্রাচীন কাল থেকে গ্রামে গ্রামে আশ্বিনের শেষ দিনের সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে সারা কার্তিক মাস সন্ধ্যায় আকাশপ্রদীপ জ্বালানো হয়। হিন্দুরা লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে এই প্রদীপ জ্বালেন। এই প্রদীপে তিলের তেল বা ঘি ব্যবহার করা হয়। আকাশে বা বিষ্ণুমন্দিরে এই দীপদানের ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে কোথাও কোথাও স্তম্ভ বা বাঁশ পুঁতে তার আগায় বৈদ্যুতিক বাতি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আবার এ সময় তুলসীতলায় দীপ দেওয়ার ব্যবস্থা দেখা যায়।

বৌদ্ধেরা আষাঢ়ী পূর্ণিমা (দ্র) থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাস আকাশপ্রদীপ তোলেন। তিন মাস প্রতিদিন সন্ধ্যায় আকাশপ্রদীপ জ্বেলে পরবর্তী মাসের যে কোনো দিন তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিশেষত পরবর্তী মাসে কঠিন চীবর (দ্র) দানোৎসব যে দিন শেষ হয় সে দিন শেষ আকাশপ্রদীপ জ্বেলে সমাপ্তি টানেন। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ ২৯ বছর বয়সে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় গৃহত্যাগ করেন। গৃহত্যাগ করে অনোমা নদীর তীরে পৌঁছে তিনি স্বীয় তরবারি দিয়ে মাথার চুল কেটে আকাশে উড়িয়ে দেন। কথিত আছে দেবতারা সেই চুল স্বর্গে নিয়ে গিয়ে একটি চৈত্যে রেখে দেন। কারণ তিনি আর গৃহে ফিরে যাবেন না, সন্ন্যাসী হয়ে মুক্তির পথ খুঁজবেন, এ জন্য সুন্দর চুল রাখা তাঁর শোভা পায় না। সেই স্মৃতিকে স্মরণ করে বৌদ্ধেরা এখনো আকাশপ্রদীপ তোলেন।

রবীন্দ্রনাথের (দ্র) একটি চমৎকার কাব্যগ্রন্থ আছে 'আকাশপ্রদীপ' (১৯৩৯) নামে।

বি. ব.

আকাশবাণী

'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র ভারতীয় নাম। রবীন্দ্রনাথের (দ্র) 'আকাশবাণী' শিরোনামের একটি কবিতা থেকে এই নামটি গ্রহণ করা হয়েছে। কবিতার একটি পঙ্ক্তি ছিল 'ধরার আঙিনা হতে উঠিল আকাশবাণী'। 'আকাশবাণী' কবিতাটি প্রথম 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা 'বেতার জগৎ'-এর কোনো এক বিশেষ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। ভারত (দ্র) স্বাধীন হওয়ার পর বেতারমন্ত্রী বি. ভি. কেশকার 'বেতার জগৎ' পত্রিকায় কবিতাটির সন্ধান পেয়ে 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' নামের পরিবর্তে 'আকাশবাণী' নামকরণের সিদ্ধান্ত নেন। এর আগে আরো বেশ কয়েক বার এই প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল।

১৯২৭ সালের ২৩শে জুলাই বোম্বাইয়ে ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি নামে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বেতার-অনুষ্ঠান প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এটি ছিল সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক উদ্যোগ। বোম্বাইয়ের এফ. এম. চিনয় নামে একটি পার্সি প্রতিষ্ঠানের আরেকটি সহযোগী সংগঠন ছিল ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি। এর মাসখানেক পরে অর্থাৎ ১৯২৭ সালের ২৬শে আগস্ট কলিকাতায় ১ নং গার্স্টিন প্লেসে এর অন্য একটি স্টেশন খোলা হয়।

বেতারযন্ত্র ব্যবহারের জন্য লাইসেন্সব্যবস্থা তখন থেকেই প্রবর্তিত হয়। আগ্রহী ব্যক্তিকে লাইসেন্স দেওয়ার ভার ছিল পোস্ট অফিসের ওপর। প্রতিটি লাইসেন্সের মূল্য ধার্য করা হয়েছিল দশ টাকা। সরকার দু' টাকা রেখে বাকি আট টাকা কোম্পানিকে দিত। কিন্তু সে সময় সারা ভারতবর্ষে

লাইসেন্সের সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারেরও কম ছিল। অনেকেই আবার বিনা লাইসেন্সে বেতারযন্ত্র ব্যবহার করত। এ জন্য শাস্তির কোনো বিধান ছিল না। ফলে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতে ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে দেউলিয়া হয়ে যায়। তখন বড়লাটের মন্ত্রণাপরিষদের সদস্য স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রচেষ্টায় সরকার এক বছরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে বেতার প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির পূর্বনামও পরিবর্তন করা হয়। নাম রাখা হয় 'ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস'। এক বছর পর আর্থিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটলে ১৯৩১ সালে সরকার 'ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস' বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু জনসাধারণের আন্দোলনের মুখে সরকারকে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। তখন লাইসেন্সের ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ এবং বেতার ও কয়েকটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ওপর কর ধার্য করে আয়বৃদ্ধি নিশ্চিত করা হয়।

এর কিছু দিন পর ১৯৩৪ সালে লায়নেল ফিল্ডেন নামে ব্রিটিশ বেতারের এক দায়িত্বশীল কর্মীকে এনে ভারতীয় বেতারব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৩৬ সালের ৮ই জুন ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের নাম বদল করে 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' রাখা হয়।

১৯৬৩ সাল পর্যন্ত দিল্লি (দ্র), বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা (দ্র) ছাড়াও প্রায় প্রতিটি প্রদেশে মাঝারি ও ছোটখাটো বহু স্টেশন স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে সারা ভারতে 'আকাশবাণী'র ৭১টি কেন্দ্র রয়েছে। এ ছাড়া তিনটি উপকেন্দ্রও (অক্সিলিয়ারি স্টেশন) আছে। ভারতবর্ষে ভৌগোলিক এলাকার শতকরা ৮১ ভাগ বেতার প্রচারের ব্যবস্থার আওতায় এসেছে।

আকাশবাণীর একটি নিজস্ব মহাফেজখানা (আর্কাইভ) আছে। সেখানে মহাত্মা গান্ধী (দ্র), জওহরলাল নেহরু (দ্র) সহ বিখ্যাত মনীষী, কবি আর শিল্পীদের কণ্ঠে অসংখ্য মূল্যবান ভাষণ, আবৃত্তি, সঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীত সংরক্ষিত আছে।

বিভিন্ন ভাষায় আকাশবাণীর অনুষ্ঠানসূচি সংবলিত আটটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে। বাংলা পত্রিকাটির নাম 'বেতার জগৎ'।

সুজ. ব.

আকুপাংচার (acupuncture)

ব্যথা ও রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত চীন দেশীয় প্রাচীন এক ধরনের চিকিৎসাপদ্ধতির নাম আকুপাংচার। এ পদ্ধতিতে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় সরু, লম্বা সুঁই ফুটিয়ে চিকিৎসা করা হয়। বিজ্ঞানীদের মতে আকুপাংচারের ফলে মস্তিষ্ক থেকে 'এণ্ডোরফিন' (endorphin) নামক রাসায়নিক উপাদানের নিঃসরণ বৃদ্ধি পায় বলে ব্যথার উপশম ঘটে।

চীনা দার্শনিকদের মতে, শরীরে প্রাকৃতিক উপাদানের ভারসাম্যহীনতার ফলে রোগ ও ব্যথা সৃষ্টি হয়। আকুপাংচার এই প্রাকৃতিক ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে রাখে। অধিকাংশ চীনদেশীয়ের ধারণা—শরীরে মোট বারোটি মধ্যরেখা (meridian) দিয়ে জীবনীশক্তি প্রবাহিত হয়। এই মধ্যরেখাস্থিত বিভিন্ন বিন্দুতে আকুপাংচারের সুঁই ফুটিয়ে রোগ সারানো সম্ভব।

ব্যথানিরাময়সহ অস্থিসন্ধি প্রদাহ, মিগ্রেন (migraine) নামক আধকপালে তীব্র মাথাধরা (দ্র), দৃষ্টিক্ষীণতা, হাঁপানি (দ্র), ক্ষত এবং কোনো কোনো মানসিক অসুস্থতা সারানোর জন্য আকুপাংচার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বড় ধরনের অস্ত্রোপচারের আগে রোগীর চেতনানাশের জন্য চীনা চিকিৎসকেরা ১৯৬০ সাল থেকে আকুপাংচার পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। দূরপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ দেশে আকুপাংচার প্রচলিত রয়েছে। আমেরিকা এবং বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশেও বর্তমানে আকুপাংচার চিকিৎসার প্রচলন শুরু হয়েছে।

সি. না. হ.

আখ

বহু বর্ষজীবী তৃণ। ভাল বাংলা 'ইক্ষু'। উষ্ণ ও অনতিউষ্ণ অঞ্চলে আখ জন্মে। বৈজ্ঞানিক নাম *সক্কারাম অফিসিনারাম (Saccharum Officinarum)*, গোত্র গ্রামিনী (Graminae)। আখের রস থেকে চিনি (দ্র), গুড়, 'রাম' নামে মদ, সুরাসার, এবং ইক্ষুদণ্ড থেকে পশুখাদ্য, শক্ত বোর্ড ও কাগজ উৎপন্ন হয়। মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে আখ এশিয়া মাইনরে (দ্র) যায়, সেখান থেকে যায় ইউরোপে (দ্র)। স্পেনীয় ও পর্তুগিজ পর্যটকগণ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে আখ চাষের প্রচলন করে।

আখের চিনির এক-তৃতীয়াংশ শুধু ভারতীয় উপমহাদেশে ও কিউবায় উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া পুয়ের্তো রিকো, বাহামা, মরিশাস, জাভা, হাওয়াই, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আখ প্রচুর জন্মে।

আখের প্রতি পর্বে (গাঁটে) শেকড় বের হয়। ওই পর্বগুলোসহ আগার অংশ চৈত্র-বৈশাখ মাসে ক্ষেতে রোপণ করা হয়। গাঁটের 'চোখ' থেকে গাছ হয়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে চিনি বা গুড় তৈরি শুরু হয় এবং গরমের শুরুতে তা শেষ হয়। কারণ গরমে আখে শর্করার পরিমাণ কমতে আরম্ভ করে। আখ কাটবার উপযোগী হয়েছে কিনা তা যন্ত্রের (দ্র) দ্বারা পরীক্ষা করা যায় অথবা আখের গায়ে আঘাত করলে যদি ভারি আওয়াজ হয় এবং রং যদি ফিকে হলুদ হয় তবে কাটার সময় হয়েছে বুঝতে হবে।

চিনিশিল্পের সঙ্গে যেসব সহযোগী শিল্প গড়ে উঠতে পারে তা হল—গুড়, মদ্য, সুরাসার, এবং ছিবড়া থেকে কাগজ (দ্র) ও বোর্ড শিল্প। বাংলাদেশে (দ্র) আখ থেকে চিনির পাশাপাশি প্রচুর গুড়ও তৈরি হয়।

বি. ব.

আখড়া

আখড়া শব্দের মূল অর্থ মল্লভূমি বা ক্রীড়াভূমি অর্থাৎ শরীরচর্চার স্থান। কিন্তু বর্তমানে এর অর্থ আরো বিস্তৃত হয়েছে। এখন অনেকে মিলে কোনো বৃত্তি অনুশীলনের আড্ডাকে আখড়া বলা হয়। যেমন—যাত্রার আখড়া, কুস্তির আখড়া, বৈষ্ণবের আখড়া ইত্যাদি। বাংলা ও ওড়িশা থেকে পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্র পর্যন্ত আখড়া শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিহার এবং উত্তর প্রদেশে ছোট ছোট ধর্মসম্প্রদায়ের মোহন্তদের বা সন্ন্যাসীদের বাসস্থানকেও আখড়া বলা হয়। আখড়া শব্দটি সংস্কৃত 'অক্ষবাট' শব্দ থেকে উদ্ভূত।

সুজ. ব.

আখেরাত

আরবি শব্দ, প্রকৃত উচ্চারণ আখিরাত। আভিধানিক অর্থ দেরি, বিলম্ব, সকলের পর, সর্বশেষ। ইসলামী পরিভাষায় আখেরাত অর্থ পরকালের চিরস্থায়ী আবাসস্থল বা পারলৌকিক জীবন।

ইসলামী বিশ্বাসমতে সীমিত সময়ের এই পার্থিব জীবনের সমাপ্তিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পর এক সময় মানুষের পুনরুত্থান অর্থাৎ কিয়ামত (দ্র) ঘটবে। পুনরুত্থানদিবসে বিচারের মাধ্যমে স্রষ্টা পুণ্যবানকে পুরস্কার হিসাবে বেহেশ্‌ত্‌ (দ্র) দান করবেন আর পাপীকে শাস্তিস্বরূপ দোজখে (দ্র) নিক্ষেপ করবেন। এই জীবন হবে অনন্তকালের। এই অনন্ত জীবনই আখেরাত অর্থাৎ শেষ আবাসস্থল।

মু. মা.

আখেরী চাহার শম্বা

আখেরী চাহার শম্বা আরবি সফর মাসের শেষ বুধবার। মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর জীবনের অন্তিম মুহূর্তের সঙ্গে বিজড়িত হওয়ায় ইসলামের ইতিহাসে এই দিনটি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কথিত আছে, হযরত মুহম্মদ (স.) অসুস্থ থাকাকালে এই বুধবারে কিছুটা সুস্থ হয়েছিলেন এবং গোসল করেছিলেন। এরপর তাঁর রোগ আবার বৃদ্ধি পায় এবং তিনি আর আরোগ্যলাভ করেন নি। এই রোগেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

মু. মা.

আগম

আগম বলতে সাধারণভাবে 'বেদ'কে বোঝায়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমান করা যায় না এমন জ্ঞান যে শাস্ত্রে আছে, সেই শাস্ত্র। কিন্তু বিশেষ অর্থে আগম বলতে বোঝায় কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের ধ্যানধারণা, কর্ম ও সাধনপদ্ধতির বিশদ বিবরণ নিয়ে রচিত গ্রন্থ।

আগম আসলে তন্ত্রশাস্ত্রেরই একটি শাখা। একটি সম্পূর্ণ আগমে সাধারণত চারটি অংশ থাকে। যেমন—

১. জ্ঞান : দার্শনিক মতবাদের গূঢ় সূত্রসমূহের আলোচনা;

২. যোগ : ধ্যানধারণা, মনোনিবেশ ইত্যাদির আলোচনা;

৩. ক্রিয়া : মূর্তি, মন্দির ইত্যাদি নির্মাণের নিয়মাবলি; এবং

৪. চর্যা : সম্প্রদায়ের জীবনযাপন প্রণালীবিধি।

সাধারণত আগম ও তন্ত্র পরস্পরতুলনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুপ্রাচীন কাল থেকে আগমশাস্ত্রের ইতিহাস পাওয়া যায়।

সুজ. ব.

আগমনী

গিরিরাজ হিমালয় ও তাঁর স্ত্রী মেনকার কন্যা উমা (বা পার্বতী বা দুর্গা) বিবাহের পর স্বামী শিবের ঘরে গিয়েছিলেন। শরৎকালে দেবী দুর্গা পিতৃগৃহে আসেন। তাঁকে বাপের বাড়িতে আনবার জন্য এই বিষয় নিয়ে অনেক বাঙালি কবি গীত রচনা করেছেন। প্রতি বছর দুর্গাপূজার সময় এই আগমনী গান গেয়ে লোকের মনে উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলা হয়।

দেবী দুর্গার বাপের বাড়ি আগমনের মধ্যে কন্যার সমাদর লাভের আভাস আছে। গানগুলোতে বাৎসল্য ও করুণরসের অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। এর মধ্যে বাঙালির ঘরের কথা, পরিবারের কন্যার কথা আছে। আবার জামাতার পরিবারের সঙ্গে কন্যার পরিবারের বিরোধের কথা সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। এ সমস্ত গান-রচনাকারীদের মধ্যে রামপ্রসাদ সেন (দ্র), কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, দাশরথি রায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আগমনী বাংলার একটি বিশিষ্ট গান।

বি. ব.

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

পূর্ববাংলায় জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত আন্দোলনে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি হয় ১৯৬৬ সালের শুরুতে শেখ মুজিবুর রহমানের (দ্র) ছয় দফা (দ্র) কর্মসূচি ঘোষণার পর থেকে। বিকাশমান এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য পাকিস্তানের আইয়ুব সরকার নানা পীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ঐ বছরের মে মাস থেকে শেখ মুজিবকে কারারুদ্ধ রাখা হয়। তাতেও আন্দোলন বানচাল করা সম্ভব না হলে ১৯৬৮ সালে জেলে থাকাকালেই তথাকথিত দেশদ্রোহিতা মামলায় তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। এর আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও প্রশাসনের বেশ কিছু পদস্থ বাঙালি অফিসারকে। লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ মামলার ৩৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে তাঁরা ভারতের যোগসাজশে পূর্ববাংলার স্বাধীনতা ঘোষণার

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগার থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

চক্রান্তে লিপ্ত। এই মামলা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিতি অর্জন করেছে এবং সরকারের ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ হিসাবেই তা জনগণের দৃষ্টিতে চিহ্নিত হয়েছে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে বিশেষ ট্রাইবুনালে মামলার শুনানির ব্যবস্থা হয়।

আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে প্রবল গণ-

আন্দোলন। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি থেকে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মামলা প্রত্যাহার আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। ১৪ই ফেব্রুয়ারি বন্দি অবস্থায় প্রহরীর গুলিতে অভিযুক্ত আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হকের (দ্র) মৃত্যু ঘটলে মানুষ রাজপথে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। অবশেষে ২২শে ফেব্রুয়ারি মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকল অভিযুক্তকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সরকার এবং ক্ষমতা থেকে বিদায় নেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান (দ্র)।

সার্জেন্ট জহুরুল হক

ম. হ.

আগস্ট আন্দোলন

ভারতে ১৯৪২ সালে ক্রিপ্স্ মিশনের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে এক দিকে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়া ছিল 'নতুন করে দেবার মতো কিছু নেই'; অন্য দিকে জাতীয় রাজনীতিতে আশাভঙ্গের প্রতিক্রিয়া এক তীব্র শাসকবিরোধী আন্দোলনের সম্ভাবনা তৈরি করে। দাবি ওঠে : 'অবিলম্বে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান চাই।'

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (দ্র) ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ১৪ই জুলাই (১৯৪২) ইংরেজের বিরুদ্ধে 'কুইট ইণ্ডিয়া' (Quit India) বা 'ভারত ছাড়ো'র প্রস্তাব সুস্পষ্টভাবে ৮ই আগস্টে (১৯৪২) গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরদিন জাতীয় নেতাদের ব্যাপক সংখ্যায় গ্রেফতার দেশের সর্বত্র এক চরমপন্থী আন্দোলনের জন্ম দেয়। প্রতিবাদ, মিছিল, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, থানা আক্রমণ, হত্যা ইত্যাদি ঘটনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটতে থাকে। সেই সঙ্গে চলে শাসকদের তরফে চরম নির্যাতন। দেখা যায়, আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে অন্তত ৬০ হাজার লোককে গ্রেফতার এবং ১৮ হাজার লোককে ভারতরক্ষা আইনে আটক করা হয়েছিল। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহতের সংখ্যা ছিল ৯৪০, আহত ১৬৩০ জন।

আন্দোলন তখন আর কংগ্রেসের হাতে ছিল না। স্বতঃস্ফূর্ত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে চরমপন্থার এই গণ-আন্দোলন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' বা 'আগস্ট আন্দোলন' বা 'আগস্ট বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। অবশ্য এই সহিংস আন্দোলন কংগ্রেস-নেতৃত্বের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায় নি।

আ. র.

আগা খান

আগা খান কোনো ব্যক্তির নাম নয়, ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের (দ্র) ধর্মীয় নেতার সম্মানসূচক উপাধি।

এ পর্যন্ত তিন জন আগা খান ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতার দায়িত্ব পালন করেছেন। এঁদের নাম : প্রথম আগা খান হাসান আলী শাহ (জন্ম ১৮০০, মৃত্যু ১৮৮১)। দ্বিতীয় আগা খান প্রথম আগা খানের পুত্র আলী শাহ ১৮৮১ সালে পিতার মৃত্যুর পর আগা খান রূপে অধিষ্ঠিত হন। মৃত্যু ১৮৮৫ সালে। তৃতীয় আগা খান স্যার সুলতান মুহম্মদ শাহ্। তিনি নেতৃত্বে আসীন হন ১৮৮৫ সালে ১৭ই আগস্ট

চতুর্থ আগা খান—প্রিন্স করিম

তারিখে। মৃত্যু ১৯৫৭ সালের। চতুর্থ আগা খান প্রিন্স শাহ্ করিম আল-হুসাইনী বর্তমানে নেতৃত্বে আসীন। তাঁর জন্ম ১৯৩৬ সালে। ইনি তৃতীয় আগা খানের দৌহিত্র।

প্রথম আগা খান ইরানের অধিবাসী এবং কিরমান প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। পরে এক ষড়্যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ১৮৪১ সালে সিন্ধু প্রদেশে আসেন। সেই থেকেই আগা খান পরিবার ভারতীয় উপমহাদেশের বাসিন্দা।

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি, শিক্ষা ও জনহিতকর কাজে আগা খান পরিবার নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তৃতীয় আগা খান স্যার সুলতান মুহম্মদ শাহ নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। চতুর্থ আগা খান প্রিন্স করিমও পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যচিহ্নিত পথেই চলেছেন।

মু. মা.

আগুন

বিজ্ঞানীরা বলেন আগুন একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধারণত এতে বাতাসের অক্সিজেন (দ্র) এবং জ্বালানির কার্বন (দ্র) ও হাইড্রোজেন (দ্র) মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে। তাপ (দ্র) এবং আলোর (দ্র) মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়া শক্তিকে প্রকাশ বা মুক্ত করে। আগুন জ্বলার জন্য তিনটি জিনিস দরকার—জ্বালানি, অক্সিজেন এবং উত্তাপ। শুধু জ্বালানি (দ্র) এবং অক্সিজেন আগুন জ্বালতে পারে না। যখন জ্বালানি অক্সিজেনের সঙ্গে ধীরে-ধীরে সংযুক্ত হয় তখন শুধু তাপই সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে সংযুক্তি এত ধীরে-ধীরে সম্পন্ন হয় যে তখন তাপ আর তেমন বোধগম্য হয় না, যদিও তাপ-সৃষ্টি বন্ধ থাকে না কখনো। এই ব্যাপারটাই ঘটে যখন লোহায় মরচে (দ্র) ধরে। এ ক্ষেত্রে লোহার পরমাণু অক্সিজেনের পরমাণুর সঙ্গে খুব ধীরে-ধীরে সংযুক্ত হয়। লোহায় মরচে ধরা এক ধরনের মৃদু জ্বলন বা দহন। যখন জ্বলন খুব দ্রুত সম্পন্ন হয় তখন অনেক ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ ঘটে। এটা তখনই ঘটে যখন বেশির ভাগ জ্বালানি এক সঙ্গে জ্বলে ওঠে। জ্বালানির সমস্ত শক্তি তখন একই সময়ে মুক্ত হয়।

কখনো-কখনো মৃদু দহন দ্রুত সম্পন্ন হয়ে জ্বলনকে ত্বরান্বিত করে, ফলে আগুন জ্বলে ওঠে। স্বতঃস্ফূর্ত দহন অনেক সময় ভেজা খড়ের গাদায় কিংবা কিছুটা তৈলাক্ত শুকনো ছালার গাদায় ঘটতে দেখা যায়। মৃদু দহনের তাপ ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয় এবং এই সঞ্চিত তাপকে যদি কোনো বায়ুপ্রবাহ ঐ গাদা থেকে সরিয়ে ফেলতে সক্ষম না হয় তবে ঐ সঞ্চিত তাপ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে গাদার প্রজ্জ্বলন তাপে (ignition temperature) পৌঁছে যাবে, ফলে হঠাৎ করে ঐ গাদায় তখন আগুন জ্বলে উঠবে। ১৯০৬ সালে সান ফ্রান্সিসকোতে ভয়াবহ ভূমিকম্পের কারণে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তখন সারা শহরে বেশ কিছু স্থানে আগুন ধরে যায়।

মানুষ কবে থেকে আগুন ব্যবহার করে আসছে তা সঠিক জানা যায় না। তবে দু' লক্ষ বছর থেকে মানুষ যে আগুন ব্যবহার করছে তা জানা গেছে। চীন দেশের পিকিং মানুষেরা (দ্র) আগুন ব্যবহার করত। আগুনের ব্যবহার মানুষকে নানাভাবে নানাদিকে প্রভাবিত করেছিল। আগুনে মাংস সেঁকে মানুষ বুঝেছিল এভাবে সেঁকে খেলে খাবার বেশ উপাদেয় হয়—সহজে তা হজম হয়, স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী হওয়া যায়। রোগ-ব্যাধিও হয় কম। নিজেকে সে বেশ নিরাপদ ভাবতে শিখেছিল—হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা চমৎকার উপায় সে বের করেছিল। নানা জীব-জন্তু, পশু-পাখি শিকার করার জন্য নানা যন্ত্রপাতি তৈরি করা সে শিখেছিল। রান্না করা খাবার বেশি দিন ভাল থাকে জেনেছিল বলে কোথাও যাওয়ার পথে খাবার জন্য এই রান্না করা খাবারই বয়ে নিয়ে যেত সঙ্গে করে।

মাটির তৈরি জিনিসপত্র আগুনে পোড়ালে সেগুলি যে শক্ত ও টেকসই হয় তা এক দিন জানার পর মৃৎশিল্পের প্রসার ঘটল নানাস্থানে, যার সূচনা ধরা যায় অনেকটা সাত হাজার বছর আগে।

আগুন সম্পর্কে একটা সুন্দর কথা বলা হয়ে থাকে : দাস হিসেবে আগুন খুবই ভাল, কিন্তু প্রভু হিসাবে নয়। অর্থাৎ আগুন আমাদের জন্য ততক্ষণই বেশ কাজের যতক্ষণ তা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে—নিয়ন্ত্রণে না থাকলে সমূহ বিপদ—দাবানলে পরিণত হয়ে নিমেষে সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার করে ছাইভস্মে পরিণত করবে।

আ. হ. খ.

আগ্নেয়গিরি

ভূপৃষ্ঠের ভিতর থেকে নির্গত লাভার (দ্র) পাহাড়কে আগ্নেয়গিরি বলে। মাঝে মাঝে ভূপৃষ্ঠের কোনো কোনো ফাটল বা ছিদ্রপথ দিয়ে ভূ-গর্ভস্থ গরম বাতাস, জলীয় বাষ্প, উত্তপ্ত পাথরখণ্ড, গলিত শিলা, কাদা, ছাই, গ্যাস (দ্র), প্রভৃতি পদার্থ প্রবল বেগে উপরের দিকে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভূপৃষ্ঠের ফাটল দিয়ে নির্গত এসব পদার্থ ভূপৃষ্ঠ বা সমুদ্রতলের ওপর শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে খুব তাড়াতাড়ি শীতল ও কঠিন হয়। এসব পদার্থের কিছুটা ফাটল বা ছিদ্রপথের মুখের চারপাশে স্তূপের আকারে জমা হয় ও ধীরে ধীরে জমাট বাঁধে। ফলে ঐ জায়গাটি শঙ্কু বা মোচাকৃতি (conical) লাভ করে। তখন একে আগ্নেয়গিরি বলে। আগ্নেয়গিরি থেকে ভূগর্ভস্থ পদার্থের নির্গমনকে বলে অগ্ন্যুৎপাত।

আগ্নেয়গিরির বাইরের দিকের যে মুখটি দিয়ে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে তাকে জ্বালামুখ বলে। ভূ-ত্বকের কোনো ফাটল, দুর্বল জায়গা বা ছিদ্রপথ, ভূ-গর্ভের তরল শিলা ও চাপের বৃদ্ধির জন্য অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত শান্ত ও তীব্র হতে পারে। আগ্নেয়গিরি হতে পারে জীবন্ত বা সক্রিয়, হতে পারে সুপ্ত; এবং হতে পারে মৃত বা নির্বাপিত। এ ছাড়াও লাভার প্রকৃতি, গ্যাসের পরিমাণ ও চাপ অনুসারে আগ্নেয়গিরিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৫০০ সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে। কিছু কিছু আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুপাতের ফলে ছাই ও গ্যাসের মেঘ তৈরি হয়। কোনো কোনো আগ্নেয়গিরি থেকে লাল তপ্ত লাভার বাষ্প বেরিয়ে নিচের দিকে আগ্নেয়গিরির ধার ধরে স্রোতের মতো নেমে যায়। আগ্নেয়গিরি সমভূমিতে অথবা সমুদ্রসমতলে গঠিত হতে পারে।

সে. শা.

আঙ্কল্ টম্স্ কেবিন (Uncle Tom's Cabin)

হ্যারিয়েট বীচার স্টৌ (Harriet Beecher Stowe : ১৮১১—১৮৯৬) লিখিত কালজয়ী উপন্যাস। উপন্যাসটি ইংরেজি ভাষায় প্রথমে ১৮৫২ সালে ধারাবাহিকভাবে ছাপা শুরু হয় দাসপ্রথাবিরোধী সাপ্তাহিক 'ন্যাশনাল এরা' পত্রিকায়। পত্রিকায় ছাপা শেষ হওয়ার আগে ১৮৫২ সালের মার্চ মাসে দু' খণ্ডে বোস্টনের জুয়েট অ্যাণ্ড কোম্পানি এটি প্রকাশ করে।

আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বইটি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর খ্যাতি অতি দ্রুত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) পার হয়ে সারা পৃথিবীতে (দ্র) ছড়িয়ে পড়ে। অচিরেই এই বইয়ের নাট্যরূপ, গীতিনাট্য হয়ে মঞ্চস্থ হতে থাকে। এর বিভিন্ন ঘটনাবলি নিয়ে পালাগান রচিত হয়। শিল্পীরা ক্যানভাসে এর দৃশ্য অঙ্কন করতে থাকেন। এ বই পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষাতেও (দ্র) একাধিক সংক্ষিপ্ত অনুবাদ (দ্র) পাওয়া যায়।

এ বইয়ের মূল বিষয় আমেরিকার নিগ্রো ও দাসপ্রথা। সে সময় আমেরিকায় দাসব্যবসার প্রচলন ছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে এই ব্যবসা ছিল জমজমাট। বিশাল যুক্তরাষ্ট্রের খামারগুলোতে কাজ করার জন্য আফ্রিকা (দ্র) থেকে নিগ্রোদের জোর করে ধরে আনা হত। নিগ্রো আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই বিভিন্ন কাজে পশুর মতো খাটানো হত। শ্বেতাঙ্গ ধনীরা নিগ্রোদের কিনে নিত। বাজারের গরু-ছাগলের মতো নিগ্রোদের কেনাবেচা করা হত। নিগ্রোদের পায়ে থাকত লোহার শেকল। এমনকি শেকল পরেই তারা মাঠে ও বাড়ির ভিতরে কাজ করত।

কাজে সামান্য ভুলচুক হলেই তাদের ওপর নেমে আসত চরম অত্যাচার, কখনো কখনো মৃত্যুদণ্ড হত বিনা বিচারে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের রাজ্যগুলোর দাসব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মিসেস স্টো এই উপন্যাসটি রচনা করেন। এ বই সে সময় দাসব্যবসার এক প্রামাণ্য দলিলের মর্যাদা লাভ করে। মিসেস স্টোকে এর ফলে বহু যাতনা সহ্য করতে হয়, এমনকি তাঁকে তাঁর উপন্যাসের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অনেক দলিল উপস্থাপন করতে হয়। আজ পর্যন্ত এ বই সারা বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয়। নিগ্রোদের জীবনের প্রামাণ্য দলিলরূপেও সারা বিশ্বে তা সমাদৃত।

মিসেস স্টো ১৮১১ সালের ১৪ই জুন যুক্তরাষ্ট্রের কানেক্টিকাট রাজ্যের লিচফিল্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মযাজক। মানুষের প্রতি ভালবাসা তাঁকে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের জন্য সহানুভূতিশীল করে তোলে। ফলে উপন্যাসটি হয়ে ওঠে মানবতার এক অসামান্য দলিল। তিনি ১৮৯৬ সালের ১লা জুলাই ফ্লোরিডায় মৃত্যুবরণ করেন।

বি. ব.

আঙুর

রসাল সুস্বাদু আঙুরের বৈজ্ঞানিক নাম *ভিটিস ভিনিফেরা (Vitis vinifera)*, গোত্র ভিটাসি (Vitaceae)। লতানে উদ্ভিদ। লতা থেকে পাকানো আঁকশি পেরিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে অন্য গাছে বা মাচায় উঠে পড়ে। লতা বেশ শক্ত। পাতার ওপরটা লোমশ, দেখতে অনেকটা উচ্ছের পাতার মতো, তবে গোড়ার দিকটা হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পাঁচ ভাগে বিভক্ত এবং কিনারা করাতের মতো। ফুল সবুজ ও সুগন্ধ, ফোটে লতার আগায়। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত গুচ্ছবদ্ধ ফল হয়। শীতপ্রধান দেশে আরো পরে ফুল ও ফল হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ইদানীং মিষ্টি আঙুর ফলানো সম্ভব হয়েছে। আঙুরের অন্য নাম দ্রাক্ষা।

ছোট আকারের আঙুর শুকিয়ে কিসমিস হয়। আকারে বড় ও ২-৩টি বীজ থাকে যে আঙুরে তা শুকালে হয় মনাক্কা। ঘন বেগুনি রঙের বড় ও ছোট আঙুরও আছে। এই তিন রকম আঙুর মোটামুটি আমাদের দেশে আমদানি হয়।

বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের দিক থেকে আঙুরকে ভাগ

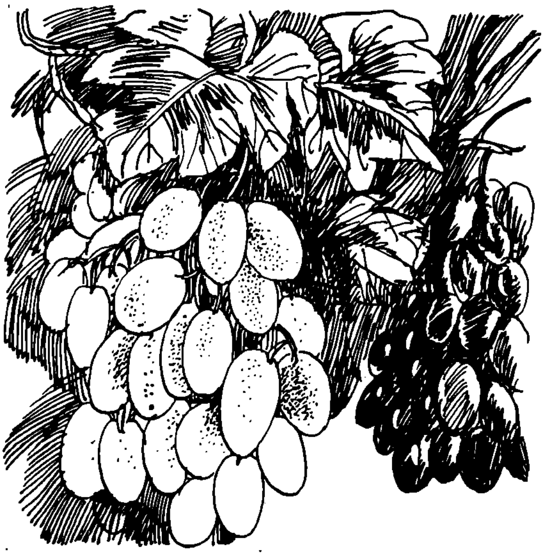

করা হয় এভাবে—মদ তৈরির আঙুর, কিসমিস আঙুর, টেবিল আঙুর, রস তৈরির আঙুর এবং টিনজাত করার আঙুর। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সুপ্রাচীন কাল থেকে কয়েক রকম আঙুরের চাষ হয়ে আসছে। এ ছাড়া আলজিরিয়া, মরক্কো, আফগানিস্তান, পাকিস্তান (দ্র), ভারত (দ্র), দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ব্যাপকভাবে আঙুরচাষ হচ্ছে। গ্রিক উপকথায় দিওনিসুস্ আঙুর জন্মানোর বিদ্যার প্রবর্তক। আঙুর থেকে উৎপন্ন মদের দেবতার নাম বাক্খোস্ (ইংরেজিতে লেখে Bacchus)। প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত সর্বত্র আঙুর আনন্দ ও উৎসবের প্রতীক।

বি. ব.

আঙ্গুরবালা [১৯০০—১৯৮৪]

প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী এবং অভিনেত্রী। তিনি ১৯০০ সালে কলিকাতার (দ্র) কাশীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম প্রভাবতী দেবী। পিতার নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার ইন্দাস গ্রামে।

আঙ্গুরবালা খুবই মেধাবী ছিলেন। তিনি ছাত্রীবৃত্তি লাভ করেন। শৈশব থেকেই তিনি সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। একাধিক ওস্তাদের কাছে তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন। খেয়াল (দ্র), ঠুম্‌রি (দ্র), দাদ্‌রা ও গজল (দ্র) গেয়ে সুখ্যাতি পেলেও

তিনি নজরুলসঙ্গীতে (দ্র) সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। বিভিন্ন ভাষায় তিনি গান গেয়েছেন। বাংলা, হিন্দি এবং উর্দুতে গাওয়া তাঁর রেকর্ডের পরিমাণ চার শ'রও বেশি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের (দ্র) রেকর্ডও আছে তাঁর। ষোলো বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড বের হয়।

আঙ্গুরবালা বাংলা, হিন্দি এবং উর্দু ভাষার বহু ছায়াছবি ও নাটকে(দ্র) অভিনয় করেন। কাজী নজরুল ইসলাম পরিচালিত একটি ছায়াছবিতে তিনি কেন্দ্রীয় চরিত্রে রূপদান করেছিলেন। ১৯৬০ সালে তিনি ভারতের কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট উপাধি প্রাপ্ত হন। এ ছাড়া সঙ্গীতে ও নাটকে অবদানের জন্য তিনি আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৮৪ সালের ৭ই জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

র. শা.

আচার্যবাদ থেরবাদ দ্র

আজটেক সভ্যতা

মেহিকো (Mexico) উপত্যকার উত্তর দিকে অবস্থিত 'আজ্‌তলন' নামক স্থান থেকে আজটেকেরা খ্রিস্টীয় বারো শতকের দিকে বর্তমান মেহিকো অঞ্চলে এসে বসতি গড়ে তোলে। আজ্‌তলন থেকে এদের নাম হয়েছে আজটেক (Aztec) বা আজতেক্‌। প্রথম দিকে তারা স্থানীয় অধিবাসীদের অধীন ছিল, পরে তেরো শতকের দিকে তারা সুবিখ্যাত 'তেনোচ্‌তিৎলন' নগরী প্রতিষ্ঠিত করে। মধ্য-পনেরো শতকের দিকে আজটেকেরা এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়। ১৫১৯ সালে স্পেনদেশী হেরনান্দো কোর্তেজ (Hernando Cortez) এটি আক্রমণ করলে করভারে জর্জরিত প্রজারা তাদের সহায়তা করে। ১৫২০ সালে আজটেকেরা বিদ্রোহ করে, কিন্তু কোরতেজ তা কঠোরহস্তে দমন করেন। স্পেনীয়রা তাদের মন্দির ও ভবনাদিসহ তেনোচ্‌তিৎলন শহর ধবংস করে এর নিকটেই তৈরি করে আধুনিক মেহিকো নগর। নহুঅতল নামক ভাষায় আজটেকেরা কথা বলত। এদের লিখনপদ্ধতি ছিল চিত্রলিপি

আজটেক সভ্যতার নিদর্শন ও
নিচে তেনোচ্‌তিৎলন শহরের ধ্বংসাবশেষ

(দ্র)। অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক, তবে ব্যবসা-বাণিজ্যেও এরা পারঙ্গম ছিল। এরা ছিল যুদ্ধপ্রিয় জাতি।

সৈ. আ. ই.

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব ক্রীড়াসংগঠন, বাংলাদেশের দ্র

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাপানি আক্রমণের মুখে সিঙ্গাপুরের পতন হলে মিত্রবাহিনীর পক্ষাবলম্বী প্রায় ৩২ হাজার ভারতীয় সেনা-সদস্যকে ইংরেজেরা পেছনে ফেলে চলে যায়। কিন্তু জাপানিরা এই সব ভারতীয় সৈন্যকে বন্দি কিংবা হত্যা করে নি। পরে এদের নিয়ে দলনায়ক মোহন সিং ভারত দখল করার মানসে নতুন করে যে বাহিনী গঠন করেন, তা-ই 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আই এন এ) নামে অভিহিত।

সুভাষচন্দ্র বসু (দ্র) তখন অন্তরীণাবস্থা থেকে পলাতক (১৯৪১)। নানা পথ ঘুরে তিনি চলে যান বার্লিনে। জাপানিদের হাতে সিঙ্গাপুরের পতন ও ভারতীয় সেনা-সদস্যদের সেখানে অবস্থানের খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করে গঠন করেন ভারতের অস্থায়ী সরকার। এই সময় সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে এই বাহিনী গঠনে কাজ করেন আরেক বাঙালি বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু (দ্র)। তিনি জাপান থেকে এই সংবাদ পেয়ে চলে আসেন সিঙ্গাপুরে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু

সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ্ ফৌজ নিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে আসেন বার্মার (বর্তমানে মায়ান্‌মার) আরাকানে। জাপানিদের হাতে এই সময় আন্দামানের পতন ঘটলে জাপান সরকার আন্দামানের ভার তুলে দেন সুভাষচন্দ্রের হাতে। এখানে তোলা হয় স্বাধীন ভারতের (দ্র) বিজয়পতাকা। ১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি 'নেতাজি' সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দেন ভারত আক্রমণ করার। নির্দেশ মতো আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বার্মার সীমান্ত পার হয়ে ১৮ই মার্চ (১৯৪৪) ভারতের মণিপুরে প্রবেশ করে এবং ইম্ফল ও কোহিমার কিছুটা অংশ দখলও করে নেয়।

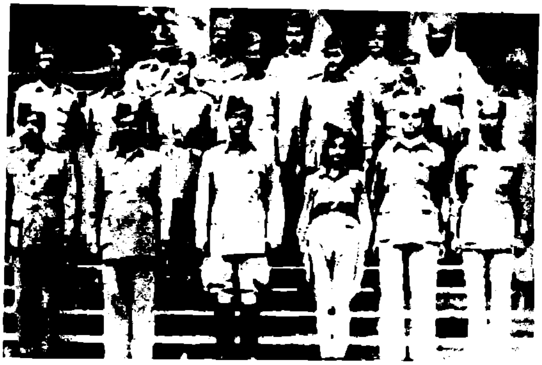

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সরকার

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) মোড় ফেরা এবং আরো নানা কারণে জাপান নেতাজি বসুকে প্রয়োজনীয় সাহায্য, সমর্থন ও সহযোগিতা না দেওয়ায় আজান্দ হিন্দ্ ফৌজ চরম দুর্দশার শিকার হয়। অবশেষে সুভাষ বসুর নির্দেশেই তারা মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এতৎসত্ত্বেও এই বাহিনীর দেশপ্রেম ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছে।

আ. হু.

আটলান্টিক মহাসাগর

পৃথিবীর (দ্র) দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর। এই মহাসাগরের দখলে আছে পৃথিবীর ২০ শতাংশ জায়গা। এর আয়তন ৮,১৬,৬২,৭০০ বর্গকিলোমিটার বা ৩,১৫,২৯,৯৬৮ বর্গমাইল এবং গড় গভীরতা ১,৮৩০ মিটারেরও বেশি। পুয়েের্তো রিকোর অদূরে ন্যায়ার্স (Nares)-এর ৮,৬৪৮ মিটার বা ২৮,৩৭৩ ফুট গভীরতাই আটলান্টিকের সর্বাধিক গভীরতা।

আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্বদিকে ইউরোপ (দ্র), এশিয়া (দ্র) আর আফ্রিকা (দ্র) মহাদেশ (দ্র) এবং পশ্চিম দিকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ। এর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে রয়েছে আর্কটিক ও অ্যান্টার্কটিক সাগর।

আটলাণ্টিক মহাসাগর দেখতে অনেকটা ইংরেজি S-এর মতো। মধ্য আমেরিকার পানামা খাল একে প্রশান্ত মহাসাগরের(দ্র) সঙ্গে এবং ভূমধ্যসাগর দিয়ে সুয়েজ খাল (দ্র), লোহিত সাগর ও আরব সাগর একে ভারত মহাসাগরের (দ্র) সঙ্গে যুক্ত করেছে। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এই বিশাল মহাসাগরটি বিষুবরেখার (দ্র) দ্বারা বিভক্ত হয়েছে। বিষুবরেখার উত্তরের অংশ উত্তর আটলাণ্টিক মহাসাগর এবং দক্ষিণের অংশ দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগর নামে পরিচিত। এই দুই আটলাণ্টিকের বৈশিষ্ট্য আলাদা।

উত্তর আটলাণ্টিকে দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি এবং এর উপকূলেও প্রচুর খাড়ি রয়েছে। এখানকার দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জগুলো হল— আইসল্যাণ্ড, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, বাহামা, কিউবা, হাইতি, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, বার্বাডোস, টোবাগো, মার্গারিটা, উইলেমস্টাড। দক্ষিণ আটলাণ্টিকের উপকূল তুলনামূলকভাবে মসৃণ। এখানে এসসেনশন, সেন্ট হেলেনা, ত্রিস্তান দা কুন্‌হা, দক্ষিণ জর্জিয়া, ফক্‌ল্যাণ্ড, দক্ষিণ স্যাণ্ডউইচ ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে।

আটলাণ্টিকের উপরিভাগের জলরাশির গড় তাপমাত্রা ক্রান্তীয় অঞ্চলে ২৭° সেলসিয়াস (৮০° ফা.) এবং উত্তর আর দক্ষিণ মহাসাগরের সীমারেখায় ২° সেলসিয়াস (৩৬° ফা.)। তলদেশে জলের তাপ সর্বদা হিমাঙ্কের কাছে থাকে।

আটলাণ্টিক মহাসাগরের বিভিন্ন অংশে উষ্ণ এবং শীতল স্রোতের প্রভাব লক্ষণীয়। উত্তর আটলাণ্টিকের গ্রিনল্যাণ্ড শীতল স্রোত ও লাব্রাডর শীতল স্রোতের সঙ্গে মেহিকোর (Mexico) উপসাগর থেকে আগত উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের মিলনের ফলে নরওয়ে ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড উপকূলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। পৃথিবীর বৃহৎ মৎস্যশিকার-ক্ষেত্র ডগার ব্যাংক (Dogger Bank) এখানেই অবস্থিত। বিভিন্ন মাছের মধ্যে হেরিং, কড, ম্যাকারেল, ট্রাউট, স্যামন, চিংড়ি, হ্যাভক আর হ্যালিবাট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন কালে রোমানেরা সম্ভবত আটলাস পর্বতের নামানুসারে এই মহাসাগরের নাম দেন আটলাণ্টিক। আবার অনেকেই মনে করেন রূপকথার হারানো রাজ্য আটলাণ্টিস দ্বীপপুঞ্জ থেকে আটলাণ্টিক মহাসাগরের নামকরণ হয়েছে।

সুজ. ব.

আতশবাজি

আগ্নেয় বাজিবিশেষ, যেমন—তারাবাজি, তুবড়ি, চরকিবাজি, কদমঝাড়, ফুলঝুরি, উড়নতুবড়ি এবং বিচিত্র রঙের দৃশ্যসৃষ্টিকারী হাউই ইত্যাদি। ধর্মীয় ও নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে আতশবাজি ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন কালে বিভিন্ন জাতির বিজয়োৎসব ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নানা ধরনের অগ্নিক্রিয়া প্রদর্শনের রীতি প্রচলিত ছিল। সম্ভবত সেই অগ্নি-প্রজ্বলন থেকেই কালক্রমে আতশবাজি প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবিত হয়। তবে কে কোথায় কবে প্রথম আতশবাজি তৈরি করেন তার সঠিক বিবরণ জানা যায় না। সতেরো শতকে সেনাবাহিনীর শান্তি ও বিজয়োৎসবে আতশবাজির নানা প্রকার দৃশ্য দেখানো হত। কিন্তু সেগুলো ঠিক আতশবাজির পর্যায়ভুক্ত ছিল না। আঠারো শতকের

মাঝামাঝি সময়ে আতশবাজিতে রঙিন আলোক সৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যেই আতশবাজিতে পটাসিয়াম ক্লোরেট ব্যবহারের ফলে রঙিন আলোর দৃশ্য উৎপাদন সম্ভব হয়। এর পর ধীরে-ধীরে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে আতশবাজি তৈরির কলাকৌশল আরো উৎকর্ষ লাভ করে। এখন বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম আতশবাজি তৈরি হয় এবং বিভিন্ন আতশবাজির মশলাও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, যেমন—গতিবেগ ও স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টিকারী আতশবাজির প্রধান উপাদান হল পটাসিয়াম (দ্র), নাইট্রেট, গন্ধক (দ্র), লৌহচূর্ণ এবং কাঠকয়লার মিহি গুঁড়ো। বিস্ফোরণের তীব্রতার জন্য প্রয়োজন মতো বন্দুকের বারুদের মিহি গুঁড়োও ব্যবহার করা হয়। আবার আলোর

ঔজ্জ্বল্যের জন্য নাইট্রেট অব লেড এবং বেরিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের (দ্র) সূক্ষ্ম চূর্ণ মশলার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। আর রঙিন তারকা, ঘূর্ণ্যমান বা স্থির দৃশ্য সৃষ্টির জন্য পটাসিয়াম ক্লোরেট বা পারক্লোরেটের সঙ্গে নানারকম ধাতব লবণ (দ্র) মেশানো হয়। সাধারণত কাগজের মোড়ক বা খোলের মধ্যে প্রয়োজনীয় মশলা ঢুকিয়ে আতশবাজি তৈরি করা হয়।

সুজ. ব.

আতা

আমেরিকার(দ্র) উত্তর অঞ্চল থেকে আমাদের দেশে এসেছে বহু কাল আগে। বৈজ্ঞানিক নাম *আনোনা স্কোয়ামোসা (Anona squamosa)*, গোত্র আনোনাসি (Anonaceae)। বহু শাখাময় মাঝারি গাছ। ১০-১৫ ফুট উঁচু হয়। ছাল ধূসর রঙের, কাঠ তেমন শক্ত নয়। পাতা ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, এক-দেড় ইঞ্চি চওড়া, আগা ক্রমশ সরু। কচি কাণ্ড ও পাতার সংযোগস্থলে এক-একটি অথবা জোড়া-জোড়া খুব হালকা সবুজ রঙের বাঁকা ফুল হয়, লম্বায় এক ইঞ্চি এবং তিনটি পাপড়িযুক্ত। আর ফল দেখতে সুন্দর, গোলাকার কিন্তু বৈশিষ্ট্যময় এবড়ো-খেবড়ো, গায়ের রং সবুজ। পাকলে সুগন্ধি বের হয়, ফেটেও যায়, স্বাদ মধুর। ফলের ভেতর মাংসল নরম কোয়া আছে। প্রত্যেক কোয়ায় একটি করে বীজ থাকে। বীজ ঈষৎ ডিম্বাকৃতি ও চ্যাপ্টা, রং কালো। চৈত্র মাসে ফুল আসে, পাকে জ্যৈষ্ঠে। আতার পাতা, বীজ ও কাঁচা ফলের মিহি গুঁড়ো পতঙ্গনাশক। উকুন, ছারপোকা মারা যায়। এ ছাড়া আমাশয়ে (দ্র), রক্তবৃদ্ধিতে, অপুষ্টিতে আতা খুব উপকারী। আতাকে গাণ্ডপাত্র, সীতাফল ও শরিফা বলে। বাংলাদেশের (দ্র) সর্বত্র কম-বেশি আতা জন্মে।

আর এক রকম আতা আছে, তার নাম নোনা আতা বা নোনা। যশোর-খুলনা অঞ্চলে এটি প্রচুর জন্মে। বৈজ্ঞানিক নাম *আনোনা রেটিকুলাটা (Anona Reticulata)*, গোত্র ঐ আনোনাসি। এই গাছ ৩০-৩৫ ফুট উঁচু হয়, পাতা ৮-১০ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ২-৩ ইঞ্চি। ফল মসৃণ, ধূসর, পাকা অবস্থায় বাদামি। আকার অনেকটা আপেলের মতো, কখনো-কখনো লম্বাটে। বোঁটা বেশ মোটা। পাকা নোনা অম্ল-মধুর

নোনা ও আতা

স্বাদে ভরা। মিহি দানাদার, আতার মতো একেবারে মিহি ও মিষ্টি নয়। কাঁচা অবস্থায় কষায়। গাছও অনেক বেশি ঝাঁকড়া। বাংলাদেশ জুড়ে জন্মে।

বি. ব.

আতাউর রহমান খান [১৯০৭—১৯৯১]

রাজনীতিবিদ, আইনজীবী ও সাবেক পূর্ববঙ্গের এককালীন মুখ্যমন্ত্রী। জন্ম ঢাকা (দ্র) জেলার কালিয়া গ্রামে, ১৯০৭ সালে।

প্রথমে মুসলিম লীগের (দ্র) রাজনীতির অনুসারী হলেও ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৫৩ সালে তিনি এই দলের সহ-সভাপতি হন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে প্রাদেশিক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রীপদে যোগ দেন।

আতাউর রহমান খান ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে আওয়ামী লীগ গঠিত প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি আরো দু' বার (প্রথমে ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে এবং পরে ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাসে মাত্র দু' মাসের জন্য) সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানব্যাপী সামরিক শাসন জারি হলে তিনি বরখাস্ত হন।

১৯৭০ সালে আতাউর রহমান খান 'পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং তার সভাপতি হন। দলের পক্ষ থেকে সে বছর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে দাঁড়ালেও শেষ পর্যন্ত নিজের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেন।

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি সাংসদ নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের অংশ হিসাবে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বা বাকশাল) (দ্র) গঠিত হলে তিনি তাতে যোগ দেন।

১৯৭৭ সালে তিনি তাঁর পূর্বের রাজনৈতিক দলটিকে 'জাতীয় লীগ' নামে পুনরুজ্জীবিত করেন।

১৯৮৪ সালে জেনারেল এরশাদ গঠিত জাতীয় পার্টিতে (দ্র) যোগ দেন এবং ৯ মাস কাল প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

আতিকুল ইসলাম [১৯৩৬—১৯৭৫]

বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত (দ্র) শিল্পী, রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিক্ষক ও সঙ্গীতসংগঠক। কুমিল্লায় জন্ম। পিতা মুহম্মদ জুলফিকার আলী। তিনি প্রাথমিক সঙ্গীতশিক্ষা লাভ করেন ঢাকায় (দ্র)। বিশ্বভারতীতে (দ্র) রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিক্ষা লাভ করেন। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তিনি সঙ্গীতশিক্ষা লাভ করেছিলেন। ৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের (দ্র) সময় থেকে বর্তমান বাংলাদেশে (দ্র) যে প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে আতিকুল ইসলাম তাতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা-আন্দোলনের প্রথম বার্ষিকীতে ঢাকা ইডেন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে শহীদ মিনার (দ্র) নির্মাণে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং সেই উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি গাওয়ার জন্য ঢাকা কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। পরবর্তী কালে বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিক্ষালাভ করে ঢাকায় বুলবুল ললিতকলা একাডেমীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিভাগে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ষাটের দশকে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী পালন ও রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করার জন্য পাকিস্তানের সরকারি প্রয়াসের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, আতিকুল ইসলাম তাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও নির্ভয়

সংস্কৃতিকর্মী হিসাবে তাঁর ভূমিকা ছিল। রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য পরিকল্পনায় ও প্রযোজনায় তিনি বিশেষ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন।

ক. গো.

আত্মজীবনী

যে রচনায় লেখক নিজেই নিজের জীবনের কথা লিপিবদ্ধ করেন তাকে আত্মজীবনী বলা হয়। আত্মজীবনী স্মৃতিকথা নয়। স্মৃতিকথায় লেখকের আপন বিকাশের চাইতে বেশি গুরুত্ব পায় সেই সব ঘটনা লেখক যা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সেই সব মানুষের কথা লেখক যাদের সংস্পর্শে এসেছেন। আত্মজীবনী ব্যক্তিগত ডায়েরি বা জার্নালও নয়। ডায়েরি বা জার্নালে লেখক তাঁর জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা ও অভিজ্ঞতার কথা দিনপঞ্জির আকারে লিপিবদ্ধ করেন। তবে আত্মজীবনীতে লেখক সাধারণত তাঁর নিজের জীবনের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক পরিবেশের পরিচয়ও তুলে ধরেন। পৃথিবীর প্রায় (দ্র) সব ভাষাতেই এবং সর্বযুগেই আত্মজীবনী রচিত হয়েছে। প্রথম পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী হল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে রচিত সন্ত অগাস্টিনের (St. Augustine) 'কনফেশান্স' বা স্বীকারোক্তিসমূহ। পাশ্চাত্য সাহিত্যে অন্যান্য শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনীগুলির মধ্যে রয়েছে মার্কিন লেখক বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের 'আত্মজীবনী' (Autobiography : ১৭৭৬), ফরাসি লেখক রুসোর (দ্র) 'লে কঁফেসিওঁ' (Les Confessions : ১৭৮১ ও ১৭৮৮) এবং রুশ লেখক মাক্সিম গোর্কির (দ্র) 'শৈশব' (১৯১৩), 'জনতার

মধ্যে' (১৯১৫) ও 'আমার বিশ্ববিদ্যালয়' (১৯২৩)—বাংলা অনুবাদে যা 'পৃথিবীর পথে' ও 'পৃথিবীর পাঠশালায়' নামে পরিচিত। বাংলা সাহিত্যে (দ্র) রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' (১৯০১), নবীনচন্দ্র (দ্র) সেনের পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত 'আমার জীবন' (১৯০৭), শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' (১৯১৮), রবীন্দ্রনাথের (দ্র) 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২) ও 'ছেলেবেলা' (১৯৪০) এবং প্রমথ চৌধুরীর (দ্র) 'আত্মকথা' (১৯৪৬) উল্লেখযোগ্য আত্মজীবনী।

ক. চৌ.

আত্মীয় সভা

রাজা রামমোহন রায় (দ্র) প্রতিষ্ঠিত ধর্মসংস্কার-কেন্দ্র। রামমোহন রায় একেশ্বরবাদী ধর্ম আলোচনার জন্য ১৮১৫ সালে 'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অনুবাদ ও ভাষ্য সংবলিত বেদান্তসূত্রসহ সমজাতীয় উপনিষদগুলো প্রকাশিত হয়। পরে এই একেশ্বরবাদী ধর্ম তথা ব্রাহ্মধর্ম (দ্র) ব্যাপ্তি লাভ করলে আত্মীয়সভাই ১৮২৮ সালে 'ব্রাহ্মসমাজ' হিসাবে পরিচিত হয়। 'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠাকালে তিনি বলেন, "হিন্দুধর্মে নিরাকারব্রহ্মোপাসনাই সর্বোৎকৃষ্ট"। তাঁর এই বক্তব্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তিনি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে বিরাগ ও বিরোধিতার শিকার হন। কিন্তু পরে উদারপন্থী, সংস্কৃতমনা ব্যক্তিরা তাঁর ব্যাখ্যা ও বক্তব্যে আকৃষ্ট হন। ফলে সমমনা ব্যক্তিদের ধর্মালোচনার জন্য নির্দিষ্ট স্থানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নতুন ব্যাখ্যাত ধর্মমত আলোচনার জন্যই 'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ব্যাপক পরিচিতি ঘটে 'ব্রাহ্মসমাজ' হিসাবে। পরে ব্রাহ্মসমাজ তিনটি শাখায় বিভিক্ত হয়ে যায় : আদি ব্রাহ্মসমাজ (দ্র), নববিধান, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

মে. খা.

আদম (আ.), হযরত

'আদম' শব্দের আভিধানিক অর্থ মানব। ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী আদম মানবজাতির আদি পিতা। পবিত্র বাইবেলেও (দ্র) আদমের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। তিনি আদি মানব এবং প্রথম নবী।

কথিত আছে যে আদমের বাম পাঁজরের হাড় থেকে তাঁর জীবনসঙ্গিনী হাওয়া (আ.) (দ্র)-কে সৃষ্টি করা হয় এবং তাঁরা বেহেশতে (দ্র) বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু শয়তানের (দ্র) প্ররোচনায় তাঁরা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেন। ফলে স্রষ্টার বিরাগভাজন হয়ে তাঁরা পৃথিবীতে (দ্র) প্রেরিত হন। বহু বছর আরাধনার পর হযরত আদম (আ.) আল্লাহ্‌র (দ্র) সন্তুষ্টি অর্জন করেন এবং বিবি হাওয়ার সঙ্গে পুনর্মিলিত হন। ক্রমান্বয়ে তাঁদের বংশবিস্তার হতে থাকে।

মু. মা.

আদি ব্রাহ্মসমাজ

উপনিষদের ব্রহ্ম থেকে ব্রাহ্মধর্ম (দ্র) ও ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি হয়। রাজা রামমোহন রায় (দ্র) এই ধর্ম ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্ম বলতে বোঝায় পরম স্রষ্টা ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন সত্যধর্মের পূজারী। ১৮২৮ সালের ২০শে আগস্ট রাজা রামমোহন রায় উত্তর কলিকাতার আপার চিৎপুর রোডের একটি গৃহে 'ব্রহ্মসভা' বা 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৬ সালের ১১ই নভেম্বর ব্রাহ্মসমাজে প্রথম মতভেদ ও বিচ্ছেদ হয়। ঐ দিন কেশবচন্দ্র সেন (দ্র) ও তাঁর অনুসারীগণ রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে নতুন প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন। তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) ও তাঁর অনুসারীগণ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ নিয়ন্ত্রণ করতেন। এই কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ঐ নতুন ব্রাহ্মসমাজ থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার নিমিত্ত 'আদিব্রাহ্মসমাজ' নামগ্রহণ করেছিল।

ব্রাহ্ম সমাজের তিনটি শাখা—আদি, নববিধান ও সাধারণ। আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত মূল ব্রাহ্মসমাজের ভাবগত ঐক্য সর্বাধিক। আদিব্রাহ্মসমাজ উদার ও সার্বজনীন একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। রামমোহন রায় বৃহত্তর হিন্দুসমাজের সঙ্গে নিজের বা ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান নি। তাই আদি ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্মের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেও ব্রাহ্ম একশ্বরবাদকে হিন্দুধর্মের (দ্র) শ্রেষ্ঠ বিকাশ মনে করে এবং ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের অঙ্গস্বরূপ জ্ঞান করে।

সামাজিক মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিতে উদার হলেও আদি ব্রাহ্মসমাজ অপর দুই শাখার তুলনায় রক্ষণশীল। ভেতর থেকে আস্তে-আস্তে পরিবর্তন করে সমগ্র হিন্দুসমাজকে কালে ব্রাহ্মসমাজে রূপান্তরিত করাই ছিল আদিব্রাহ্মসমাজের

আদিনা মসজিদ ও নিচের ছবি : মসজিদের কেন্দ্রীয় মেহরাব

লক্ষ্য। প্রতি বুধবার ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) বেদ, উপনিষদ, গীতা (দ্র), মনুসংহিতা, মহাভারত (দ্র) প্রভৃতি শাস্ত্র থেকে সার সঙ্কলন করে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ রচনা করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) প্রমুখ শ্রদ্ধেয় ও কীর্তিমান পুরুষগণ বিভিন্ন সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের কাজ পরিচালনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও (দ্র) এর একজন সম্পাদক ছিলেন। উপাসনার জন্য তিনি অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। শান্তিনিকেতনে আদি ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম অনুযায়ী উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়।

বি. ব.

আদিনা মসজিদ

আদিনা মসজিদ সুলতানী আমলের এক স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন। ইলিয়াস শাহের পুত্র সুলতান সিকান্দর শাহ পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া নামক স্থানে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে সংস্থাপিত একটি ফলক-লিপি থেকে জানা যায়, এর নির্মাণকাল ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দ, ৭৭৬ হিজরির রজব মাস।

সুলতানী আমলের প্রথম দিকে বাংলায় তৈরি মসজিদগুলোর মধ্যে আদিনা মসজিদ বৃহত্তম। এর বিশাল চত্বরের সঙ্গে দামেস্কের আল-ওয়ালিদ জামে মসজিদের চত্বরের তুলনা করা হয়। খোলা চত্বরটির আয়তন ৪০০′ × ১৫০′। চারপাশে সর্বমোট স্তম্ভের সংখ্যা ২৬০ টি। চত্বরসহ মূল মসজিদের আয়তন ৫০৭′ × ২৮৫′। বাইরের দেয়াল ইটের তৈরি হলেও পাথর দ্বারা তা আবৃত। ৮৮টি খিলান মাটি থেকে ২২ ফুট উঁচু এবং সেগুলো একটি অনুভূমিক

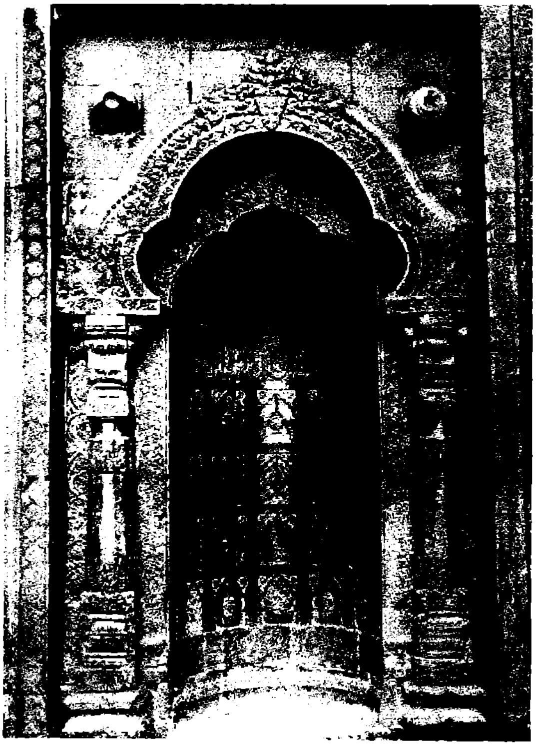

পাঁচিলকে ধরে রেখেছে। এর ওপরেই ছাদ, যেখানে গম্বুজের সংখ্যা ৩০৬।

এত বড় একটি মসজিদে মাত্র ছোট ছোট তিনটি দরজা, যা সহজে চোখে পড়ে না। পশ্চিম দিকে প্রধান নামায (দ্র)-ঘর, এখানে দুটি মেহরাব। উত্তর কোণায় দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ি। এখানে মহিলা-নামাযকক্ষ। এর নাম 'বাদশা কা তখ্‌ত' বা বাদশার আসন।

মু. মা.

আদিবাসী

আদিবাসী বলতে সাধাণত মানবগোষ্ঠীর ছোট-বড় অনগ্রসর আদিম বা প্রাচীন সংস্কৃতিবিশিষ্ট গোষ্ঠী বোঝায়। পৃথিবীর (দ্র) বিভিন্ন দেশে অপেক্ষাকৃত প্রাকৃতিক পরিবেশে ও গভীর অরণ্যে এরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বর্তমান সভ্যতার অন্তরালে ও কাছে-পিঠে এরা ছোট সমাজ বা গোষ্ঠী গঠন করে বাস করে। এদের জীবনযাত্রা সহজ-সরল, জীবনধারণের চাহিদা কম এবং জীবনযাত্রাও সভ্য মানুষের তুলনায় অনেকখানি মন্থর। তবে আধুনিক সমাজের এবং নতুন নতুন অবস্থা ও সমস্যার চাপে এদের জীবনযাত্রায় আলোড়ন দেখা দিয়েছে। সে জন্য আদিবাসী সমাজেও দেখা দিয়েছে জীবন ও জীবিকার সমস্যা, সাংস্কৃতিক জীবনেও দেখা দিয়েছে আলোড়ন। তারাও লেখাপড়া শিখে সভ্য মানুষের জীবিকা অবলম্বন করে শহরে বাস করার দিকে ঝুঁকেছে। আবার গভীর অরণ্যে বসবাসকারী আদিবাসীদের মধ্যে প্রবলভাবে নিজেদের সংস্কৃতি ও জীবিকাকে আঁকড়ে ধরে রাখার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এই অর্থে আদিবাসীদের পৃথিবীর 'আদিম বাসিন্দা' বোঝায়। কলম্বাসের (দ্র) আমেরিকা আবিষ্কারের পর সেই মহাদেশে যারা বসতি করেছে তাদের পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী বলে। অস্ট্রেলিয়ায় (দ্র) শ্বেতাঙ্গ জাতির অভিবাসনের আগে থেকে যারা বসতি করে আসছে তাদের আদিবাসী বলা হয়। বর্তমান বিশ্বের উন্নতিশীল মানবগোষ্ঠী আদিবাসীদের উত্তরপুরুষ। আর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আদিম বাসিন্দাদের অনগ্রসর গোষ্ঠীগুলোকে কখনো কখনো 'উপজাতি' (অর্থাৎ খণ্ডজাতি) বলে অভিহিত করা হয়।

আদিবাসীদের মধ্যে গোষ্ঠীপ্রীতি ও গোষ্ঠী-সচেতনতা খুব বেশি। বিশেষত আত্মরক্ষার জন্য দলবদ্ধভাবে আক্রমণ বা অভিযান চালানো এদের আর এক বৈশিষ্ট্য। নিজেদের সংস্কৃতি ও সমাজকাঠামো বজায় রাখার ব্যাপারে এরা খুব সচেতন। সামাজিক বিধি-নিষেধ রক্ষার জন্যও নিজেদের অভ্যন্তরীণ সরকার-ব্যবস্থা আছে। চেহারা ও সমাজের ধাঁচ, বিশ্বাস ও শিক্ষা, ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্য, দৃঢ় অনড় বন্ধন লক্ষ করে এদের সহজে চেনা যায়।

আদিবাসীদের সামাজিক কাঠামো নানা রকম হয়ে থাকে। জনসংখ্যা অনুযায়ী একেকটি সমাজ কয়েকটি দলে বিভক্ত থাকে। দলের সবচেয়ে ছোট সংস্থা হল পরিবার। প্রত্যেকটি দল নিজেদের দলের নিরাপত্তা রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকে। কোনো কোনো আদিবাসী সমাজে যাযাবর দল রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার কুকিরা অনেকটা যাযাবর। কোনো কোনো আদিবাসী দুই দলে বিভক্ত। দু'টি দল সামাজিক মর্যদায় সমান নয়। এক দল আর এক দলের সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করে। আবার দলগুলো কতগুলো গোত্র বা কুলে (clan) বিভক্ত থাকে। কুকি ও ওরাঁও (দ্র) এরকম আদিবাসী।

আদিবাসীদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিজস্ব সরকার-ব্যবস্থা রয়েছে। অনেক সময় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বা মাতব্বর অথবা বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিমণ্ডলীর হাতে এই দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। এরা সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উৎসব ও বিবাহ এদের নির্দেশে অনুষ্ঠিত হয়। সমাজের প্রতিটি শিশু বা কিশোর-কিশোরীর শিক্ষার জন্য আদিবাসী বা উপজাতির মধ্যে নিজস্ব ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আবার বৃহত্তর সমাজের ভাষা ও শিক্ষাদীক্ষাও তারা গ্রহণ করে। এ জন্য আদিবাসী সমাজের নিজস্ব ভাষার সঙ্গে-সঙ্গে এরা বৃহত্তর সমাজ ও দেশের ভাষাও আয়ত্ত করে। বৃহত্তর সমাজের লেখাপড়া-পদ্ধতি আয়ত্ত করে চাকরিবাকরিও গ্রহণ করে।

আদিবাসী সমাজে বিবাহ-পদ্ধতি নিজস্ব নিয়মে চলে। এদের কোনো কোনো সমাজ মাতৃকেন্দ্রিক। পিতৃকেন্দ্রিক সমাজে বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে চলে যায় আর মাতৃকেন্দ্রিক সমাজে (যেমন গারো) স্বামীই স্ত্রীর পিত্রালয়ে

উপরে : খাসিয়া পরিবার, মাঝের ছবি : চাকমা পুরুষ বাঁশের হুঁকো মুখে, ও নিচে : পাকিস্তানে খাইবার অঞ্চলের আদিবাসী শিশু

বামে উপরে : তঞ্চঙ্গ্যা আদিবাসী
মাঝে : মনিপুরী মেয়ে তাঁতে কাপড় বুনছে
নিচে : ভারতের দু'টি নাগা মেয়ে সূতা কাটছে
ডানে উপরে : সাঁওতাল মেয়ে ধান শুকাচ্ছে, ও
নিচে : দু'টি পাঙ্খো মেয়ে

গিয়ে বসবাস করে। মাতৃকেন্দ্রিক সমাজের সন্তান-সন্ততিরা মাতামহীর কুল, বংশমর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়।

আদি মানুষের প্রধান উপজীবিকা হল খাদ্য আহরণ ও সংরক্ষণ। পশুপালন ও কৃষিকাজ তাই প্রায় সব আদিবাসীর জীবিকা। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনুর্বর বা পাহাড় ও জংলা অঞ্চলে এখনো বন্যপ্রথায় চাষবাস হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাকমা (দ্র), মার্‌মা (দ্র), ত্রিপুরা (দ্র) উপজাতীয়রা 'জুম' (দ্র) চাষ করে। সিলেট জেলার পাহাড়ী অঞ্চলেও জুম চাষ আছে। সাঁওতাল (দ্র), ওরাঁও, মুণ্ডা (দ্র), হো বা মণিপুরীরা কিন্তু জুম চাষ করে না, কারণ তারা সমতলভূমিতে থাকে বলে লাঙল দিয়ে চাষ করতে পারে।

আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসকে 'জড়োপাসনা' বলে। আদিম মানুষ প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে শক্তি বা প্রাণের কল্পনা করত। জীবনযাত্রার সফলতার জন্য নানা অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি দিয়ে তারা তাই অশরীরী বা অতিপ্রাকৃত শক্তির তুষ্টিবিধানে ধর্মকর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান করে। জাদুমন্ত্র, জড়পূজা ইত্যাদি তাই তাদের সমাজ-জীবনে বড় স্থান দখল করে আছে। আবার কোনো কোনো আদিবাসী দীর্ঘ দিন ধরে প্রধান কোনো ধর্ম পালন করলেও নানা রকম প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান করে থাকে। আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসে হিন্দু ধর্মের প্রায় অনেক কিছুই আছে। চাকমা, মার্‌মা, তঞ্চঙ্গ্যারা বৌদ্ধ। মণিপুরী ও ত্রিপুরারা হিন্দু। আবার নাগা, কুকি, পাংখো, বনযোগী, ম্রো-দের মধ্যে হিন্দুধর্মের (দ্র) অনেক প্রভাব আছে। আবার বহু আদিবাসী খ্রিস্টধর্ম (দ্র) গ্রহণ করেছে। চাকমাদের নামের ক্ষেত্রে দেখা যায় বাঙালি প্রভাব। তাদের রাজপরিবারের উপাধি 'রায়'। এই উপাধি ব্রিটিশেরা প্রদান করেছে। আজকাল কোনো কোনো আদিবাসী এরকম রায় বা চৌধুরী উপাধি গ্রহণ করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন আদিবাসী এবং গারো (দ্র), মণিপুরীদের মধ্যে মঙ্গোল ও ভোটবর্মী জাতির রক্ত (দ্র) ও প্রভাব রয়েছে। এদের মঙ্গোল জাতি থেকে উদ্ভূত আদিবাসী বলে গণ্য করা হয়।

বাংলাদেশের (দ্র) আদিবাসীদের মোটামুটি দুটি অঞ্চলে ভাগ করা যায় : ১. পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহ ও পটুয়াখালি-বরিশাল অঞ্চল। এখানে আছে চাকমা, মার্‌মা,

উপরে : একটি হাজং মেয়ে এবং

নিচে : এক দল খাসিয়া শিশু

ত্রিপুরা, মুরং, ম্রো, কুকি, লুসাই, খুমি, বনযোগী, তঞ্চঙ্গ্যা, পাংখো আদিবাসীবৃন্দ; ২. বাংলাদেশের বাকি অঞ্চল। এখানে আছে গারো, মণিপুরী, হাজং, খাসিয়া (দ্র), ওরাঁও, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি বাসিন্দারা।

বাংলাদেশের আদিবাসী বা উপজাতিদের মধ্যে চাকমা, মার্‌মা, মণিপুরী ও রাখাইনেরা (দ্র) শিক্ষাদীক্ষায় অনেক অগ্রসর। এই প্রবণতা গারোদের মধ্যেও লক্ষ করা যাচ্ছে। তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রেখেও এই পরিবর্তন সবার মধ্যে এলে দেশের মঙ্গল হবে।

বি. ব.

আদিবুদ্ধ

আদিবুদ্ধ ঈশ্বরের মতো একটি ধারণা। বৌদ্ধধর্মের (দ্র) মহাযানপন্থীরা (দ্র) এই ধারণা প্রবর্তন করেন। নেপালে (দ্র) প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে মহাযান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

আদিবুদ্ধ মানে সর্বপ্রধান বুদ্ধ বা মূল বুদ্ধ বা অনাদি বুদ্ধ বা পরমাদিবুদ্ধ। তাঁর কোনো আকার নেই, তাঁর কোনো আধার নেই। নিজের অস্তিত্ব ছাড়া তাঁর সত্তা অন্য কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করে না। আদিবুদ্ধ বা মহাবুদ্ধ তাঁর ধ্যানপ্রভাবে পাঁচটি বুদ্ধ সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের ধ্যানীবুদ্ধ বলা হয়। ধ্যানীবুদ্ধেরা হলেন বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভার, অমিতাভ (দ্র) এবং অমোঘসিদ্ধি। এই ধ্যানীবুদ্ধেরা আবার পাঁচ জন ধ্যানীবোধিসত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন : সমন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, অবলোকিত (বা পদ্মপাণি) এবং বিশ্বপাণি। আসলে এই পাঁচ জন ধ্যানীবোধিসত্ত্বের 'প্রতিবিম্ব' হিসাবে পাঁচ যুগে পাঁচ জন মানুষীবুদ্ধের বা মানবরূপী বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে। ধ্যানী বোধিসত্ত্বরাই এই বিশ্বপ্রকৃতির স্রষ্টা। তাঁদের সৃষ্ট জগতের প্রলয় ও পুনঃসৃষ্টি ঘটে চলেছে। মহাযানীদের মতে বর্তমান কাল ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভের কাল। তাঁর বোধিসত্ত্ব (দ্র) হচ্ছে অবলোকিতেশ্বর (দ্র) লোকনাথ এবং তাঁর মানুষীবুদ্ধ হচ্ছেন গৌতম বুদ্ধ। তাঁর মুখ দিয়েই চতুর্থ সৃষ্টিতে আদিবুদ্ধের বাণী প্রচারিত হয়। এর আগে তিন ধ্যানীবোধিসত্ত্বের সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় ঘটে গেছে।

কেউ কেউ অনুমান করেন—হিন্দুধর্মের প্রভাবেই মহাযানপন্থীদের মধ্যে আদিবুদ্ধের ধারণাটি প্রসার লাভ করে।

সুজ. ব.

আদিম সঙ্গীত

সভ্যতার উন্মেষের পূর্বে আদিম জীবনে মানুষ যে সঙ্গীত রচনা করত তার নাম আদিম সঙ্গীত। এখানে সঙ্গীত বলতে গান, বাজনা ও নাচ এই তিনকেই বোঝানো হচ্ছে। আদিম মানুষেরা সরু হাড়ের বা চিকন বাঁশের টুকরো ছিদ্র করে বাঁশি তৈরি করতে পারত। পশুর চামড়া শুকিয়ে তা দ্বারা ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বানাতে পারত। পশুর অন্ত্র শুকিয়ে ধনুকের মতো এক প্রকার সুরযন্ত্র বানাত, আবার শুকনো অন্ত্র দিয়ে ছোট্ট ধনুক বানিয়ে তা দিয়ে বড় ধনুকটি ঘষে বাজাত। আদিম মানুষ গানও গাইত। গানের সুর ও তাল (দ্র) ছিল

নিতান্তই সরল। দু'টি বা তিনটি স্বর নিয়ে আদিম গান রচিত হত। সুরে বৈচিত্র্য থাকত না। একই ধরনের সুর উঁচু থেকে নিচুর দিকে বার বার ফিরে-ফিরে আসত। গানের সঙ্গে বাজত বাঁশি (দ্র), ধনুকের মতো সুরযন্ত্র, ঢাকের মতো তালবাদ্য ইত্যাদি। সেই সঙ্গে চলত নাচ। আদিম মানুষের নাচ ছিল দলবদ্ধ ও সরল। বাজনার সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে-পিছিয়ে তারা নাচত। নাচে অঙ্গভঙ্গি ছিল অতি সামান্য। শরীরের দুলুনিই ছিল প্রধান। সেই নাচের গতি ছিল উদ্দাম। শিকার করতে যাওয়া বা শিকার করে আনা, ফসল বোনা, ফসল কাটা, শিশুর জন্ম প্রভৃতি উপলক্ষে আদিম সমাজে নৃত্য-গীতের আয়োজন করা হত। আদিম সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধন করেই পরবর্তী কালে নিয়মসঙ্গত ও স্বরবহুল সঙ্গীতের বিকাশ ঘটে। ভারতবর্ষ, মিশর, গ্রিস, চীন, ইরান, আরব প্রভৃতি স্থানে অতি প্রাচীন কাল থেকেই সঙ্গীতের বিকাশ ঘটতে দেখি।

ক. গো.

নাগা নৃত্য ও সঙ্গীত

আদ্যশ্রাদ্ধ

মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তির মঙ্গলার্থে প্রথম যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় তাকে আদ্যশ্রাদ্ধ বলে। অশৌচ (দ্র) কাল বা অশুদ্ধিকাল শেষ হবার পরদিন এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের ১১ দিনে, ক্ষত্রিয়ের ১৩ দিনে, বৈশ্যের ১৬ দিনে এবং শূদ্রের ৩১ দিনে আদ্যশ্রাদ্ধ করার বিধান আছে। বর্তমানে ব্রাহ্মণ ছাড়া অনেকেই ১৩ দিনের মাথায় আদ্যশ্রাদ্ধ করেন। এই দিন সকালে চার প্রকার শান্তিমন্ত্র পাঠ, অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত বা স্বর্ণদান, তিলাদি দান এবং সামর্থ্য অনুসারে ষোড়শ দান (ভূমি আসন জল বস্ত্র প্রদীপ অন্ন তাম্বুল ছত্র গন্ধ মাল্য ফল শয্যা পাদুকা গাভী স্বর্ণ রৌপ্য), ছয় দান (ভূমি আসন জল বস্ত্র প্রদীপ অন্ন) বা তিন দান (অন্ন জল বস্ত্র)–এর নিয়ম আছে। এই উপলক্ষে বৃষোৎসর্গ, চন্দনধেনু দান, দানসাগর, মহাশয্যাদান ইত্যাদিও অনুষ্ঠিত হয়। আদ্যশ্রাদ্ধের বড় বৈশিষ্ট্য হল অন্নের সঙ্গে আমিষযুক্ত খাদ্য প্রদান। পুরুষ বা সধবা নারীর ক্ষেত্রে পোড়া বা রান্না করা মাছ এবং বিধবার ক্ষেত্রে পোড়া কাঁচকলা পরিবেশিত হয়। আদ্যশ্রাদ্ধের পর এক বছর পর্যন্ত প্রতি মাসে মৃতের মৃত্যুদিনে মাসিক, ছয় মাস হলে প্রথম ষান্মাসিক, এক বছর পূর্ণ হলে দ্বিতীয় ষান্মাসিক, একোদ্দিষ্ট (অর্থাৎ এক জন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ) ও সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করতে হয়। যে নারীর স্বামী বা ছেলে নেই তার সপিণ্ডীকরণের বিধানও শাস্ত্রে নেই।

সুজ. ব.

আধান

শব্দটি ইংরেজি charge (চার্জ) শব্দের বাংলা পরিভাষা, আধান হল কিছু প্রাথমিক কণিকার ধর্ম যার ফলে এরা পরস্পরের ওপর বল প্রয়োগ করে। আধান দু' রকমের—ঋণাত্মক ও ধনাত্মক। ঋণাত্মক আধানের সর্বনিম্ন একক একটি ইলেক্ট্রনের (দ্র) আধানের সমান। প্রোটনে (দ্র) থাকে সমপরিমাণ ধনাত্মক আধান। পরস্পরের ওপর বলপ্রয়োগের প্রকৃতি দ্বারা ঋণাত্মক ও ধনাত্মক আধানের পার্থক্য নিরূপণ করা হয়। সমধর্মী আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। এর অর্থ একটি ধনাত্মক আধান অপর ধনাত্মক আধানকে এবং একটি ঋণাত্মক আধান অপর ঋণাত্মক আধানকে বিকর্ষণ করে। বিপরীতধর্মী আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এর অর্থ হল, ধনাত্মক আধান ঋণাত্মক আধানকে এবং ঋণাত্মক আধান ধনাত্মক আধানকে আকর্ষণ করে। কোনো বস্তু বা অঞ্চলের আধান বোঝা যায় ঐ বস্তু বা অঞ্চলে প্রোটনের তুলনায় ইলেক্ট্রনের ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত দ্বারা। কোনো বস্তু বা অঞ্চলে প্রোটনের তুলনায় ইলেক্ট্রনের ঘাটতি থাকলে ঐ বস্তু বা অঞ্চলকে ধনাত্মকভাবে আহিত (positively charged) বলা হয়। এবং প্রোটনের

তুলনায় ইলেক্ট্রন বেশি থাকলে বলা হয় ঋণাত্মকভাবে আহিত (negatively charged)। আধান পরিমাপের একক কুলম্‌। (কুলম্‌ শব্দটি বিজ্ঞানী শার্ল্‌ ওগুস্ত্যাঁ দ্য কুলঁ (দ্র) -র নাম থেকে এসেছে)। ইলেক্ট্রনের আধানের পরিমাণ 1.602192×10^{-19} কুলম্‌। কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে ইলেক্ট্রনের প্রবাহকে বলা হয় তড়িৎপ্রবাহ $= \frac{\text{আধান}}{\text{সময়}}$ ।

শা. ত.

আধুনিক কবিতা কাব্য দ্র

আনন্দ

গৌতম বুদ্ধের (দ্র) প্রিয়তম শিষ্য। তিনি ছিলেন বুদ্ধের পিতৃব্য অমিতোদনের জ্যেষ্ঠপুত্র। বুদ্ধের জন্মদিনেই তাঁর জন্ম হয়। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের দু' বছর পর তিনি বৌদ্ধ সংঘে যোগ দেন। এর তিন বছর পর তিনি বুদ্ধের উপস্থায়ক (পরিচর্যাকারী) নিযুক্ত হন। বুদ্ধের পরিনির্বাণ (দ্র) পর্যন্ত আনন্দ তাঁর সেবা করে যোগ্যতার সঙ্গে উপস্থায়কের দায়িত্ব পালন করেন। এই দায়িত্ব পালনের জন্য বুদ্ধের জীবৎকালে তিনি অর্হৎ (দ্র) হতে পারেন নি, অর্হত্ব লাভ করেছিলেন বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর। তিনি ছিলেন অপূর্ব শ্রুতিধর। একাগ্রচিত্তে বুদ্ধের বাণী শ্রবণ করে অত্যন্ত মধুরভাবে তা অন্যদের বুঝিয়ে দিতে পারতেন। বুদ্ধের সমস্ত উপদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে স্মরণ রাখতেন। এ জন্য তিনি 'ধর্মভাণ্ডাগারিক' বলে অভিহিত হন।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর রাজগৃহের সপ্তপর্ণীগুহায় যে প্রথম সঙ্গীতি (মহাসম্মেলন) হয়, তাতে সুত্তপিটক সঙ্কলন তৈরির ক্ষেত্রে আনন্দ ছিলেন মূল সহায়ক। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ভিক্ষুণীরূপে স্ত্রীলোকদের বৌদ্ধ সংঘে যোগদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সুজ. ব.

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন [১৮৩০—১৮৫৯]

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন গৌহাটিতে ১৮৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক জন প্রখ্যাত অহমিয়া (অর্থাৎ আসাম রাজ্যের ভাষার) সাহিত্যিক। তাঁর পিতার নাম হালিরাম। তাঁর পিতা সুপণ্ডিত ছিলেন। পিতার মতো আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনও সুপণ্ডিত। তিনি ইংরেজি, বাংলা ও অহমিয়া ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি পড়াশুনো করেন কলিকাতার (দ্র) হিন্দু কলেজে (দ্র)। তিনি ডেপুটি কমিশনারের পদ পেয়ে আসামে কর্মজীবন শুরু করেন। আসামে বাংলার পরিবর্তে অহমিয়া ভাষার স্থান

করে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর দান অবিস্মরণীয়। বাংলা ভাষায় (দ্র) তাঁর একটি বই আছে; বইটির নাম 'আইন ও ব্যবস্থা'। ১৮৫৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হা.

আনসার

শাব্দিক অর্থ সাহায্যকারী। ইসলামের (দ্র) ইতিহাসে শব্দটির গুরুত্ব অত্যধিক। মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র) মক্কা থেকে মদিনায় (দ্র) হিজরত (দ্র) করলে যে সকল মদিনাবাসী তাঁকে এবং তাঁর সাথীদের সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেন, তাঁরা 'আনসার' নামে খ্যাত। বস্তুত এই সব মদিনাবাসী স্বার্থত্যাগী, উদারহৃদয় 'আনসার'দের মহানুভবতা, সহযোগিতা এবং আতিথেয়তার কারণেই মহানবী (স.) মদিনায় ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ লাভ করেন এবং তাঁর প্রচার-কাজ ত্বরান্বিত হয়। তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (স.) (দ্র)-কে বিভিন্ন যুদ্ধেও গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করেছিলেন।

মু. মা.

আনাতোলিয়া এশিয়া মাইনর দ্র

আনারস

আনারসের আদি নিবাস দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল। পর্তুগিজেরা ষোড়শ শতাব্দীতে এটি এ দেশে নিয়ে আসে। এর বৈজ্ঞানিক নাম *আনানাস কোমোসাস (Ananas comosus Merr.)*, গোত্র ব্রোমেলিয়াসি (Bromeleaceae)। আনারসের পাতা ২-৩ ফুট পর্যন্ত লম্বা ও ২-৩ ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া হয়। দু' দিকের কিনারায়

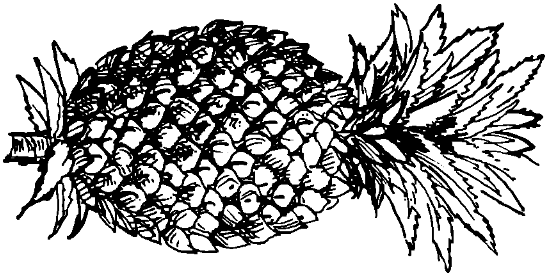

করাতের মতো কাঁটা। পাতা দেখতে অনেকটা তলোয়ারের মতো। এর পাতাময় কাণ্ডের আগায় পুষ্পদণ্ড বের হয় এবং ঐ দণ্ডে একটি মাত্র ফল হয়। ফলের গায়ে চোখের মতো অনেক চিহ্ন থাকে। এ জন্য বলা হয় আনারসের সারা গায়ে চোখ। ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ থাকে, পাকলে হলদে হয় এবং সুগন্ধে ভরে যায়। কাঁচা ফল টক, পাকলে অম্ল-মধুর। আনারসের মাথায় একটি ও বোঁটার চারদিকে কয়েকটি চারাগাছ বের হয়। এগুলো লাগালে নতুন গাছ হয় এবং তাতে ফল হয়। আনারসেও বীজ হয়, কিন্তু তা থেকে গাছ জন্মে না। গ্রীষ্ম-বর্ষায় ফুল ও ফল হয়ে থাকে। আষাঢ়-শ্রাবণ থেকে পাকতে শুরু করে।

পৃথিবীর (দ্র) শতকরা ৯০ ভাগ আনারসের চাষ হয় হাওয়াই দ্বীপে। সেখানকার প্রায় সব আনারস টিনবন্দি হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। আনারসের প্রধান জাত কিউ বা জায়েন্ট কিউ। এদের পাতায় কাঁটা থাকে না। আমাদের দেশে এই জাতের ক্যালেণ্ডার আনারস জন্মে সিলেটে (দ্র) ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলোতে। এ ছাড়া জলঢুবি আনারস জন্মে এই জেলাগুলোতে। জলঢুবি আনারস কুইন জাতের অন্তর্গত। এদের পাতার কিনারায় কাঁটা আছে এবং এরা কিউ অপেক্ষা আকারে ছোট হলেও অনেক বেশি মিষ্টি। এ ছাড়া দেশী জাতের আনারস ভিটের আনাচে-কানাচে জন্মে থাকে। এই আনারস বেশি মিষ্টি হয় না।

বি. ব.

আনোয়ার পাশা [১৯২৮—১৯৭১]

কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, গবেষক ও শিক্ষাবিদ। জন্ম ১৯২৮ সালের ১৫ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায়।

তাঁর শিক্ষা-জীবন সমাপ্ত হয় কলিকাতায় (দ্র)। তিনি বাংলায় এম. এ. পাশ করেন। মৃত্যুর পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) বাংলা বিভাগের অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম– কবিতা: 'নদী নিঃশেষিত হলে' (১৯৬৩); উপন্যাস : 'নীড় সন্ধানী' (১৯৬৯), 'নিশুতি রাতের গাথা' (১৯৬৯), প্রবন্ধ ও গবেষণাগ্রন্থ : 'ইসলামের ইতিকথা' (১৯৫৫), 'সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল' (১৯৬৭), 'রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা' (১৯৬৯); গল্পগ্রন্থ : 'নিরুপায় হরিণী' (১৯৭০)।

বাংলাদেশ (দ্র) স্বাধীন হওয়ার মাত্র দু' দিন আগে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর পাক-বাহিনীর সহযোগী আল-বদর (দ্র) ও আল-শাম্‌স্ (দ্র) বাহিনীর সদস্যরা এই মুক্তবুদ্ধির অধ্যাপক বুদ্ধিজীবীকে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসভবন থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় তাঁর উপন্যাস 'রাইফেল রোটি আওরাত' (১৯৭৩)। গবেষণাকর্মে অবদানের জন্য তিনি ১৯৭১ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

আ. হু.

আনোয়ারুল হক [১৯১৮—১৯৮১]

শিল্পী আনোয়ারুল হক বাংলাদেশের (দ্র) প্রথম সারির অন্তত চার জন শিল্পীর অন্যতম। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ঢাকায় (দ্র) শিল্পকলা চর্চার আন্দোলন শুরু করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (দ্র), কামরুল হাসান (দ্র), আনোয়ারুল হক, খাজা

শফিক আহমেদ (দ্র), শফিকুল আমিন প্রমুখ।

আজীবন তিনি শিল্পশিক্ষকতা ও দেশে শিল্পকলাবিস্তার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস কাজ করে গেছেন।

তাঁর জন্ম আফ্রিকার (দ্র) উগাণ্ডায়, ১৮ই জুলাই ১৯১৮। ছেলেবেলা কাটে বাবা-মায়ের সঙ্গে উগাণ্ডায়। আট বছর বয়সে চলে আসেন কলিকাতায় (দ্র)। তারপর কলিকাতাতেই স্কুলজীবন কাটে। ১৯৩৫ সালে ভর্তি হন কলিকাতা আর্ট স্কুলে। সে সময়ে কুসংস্কারের কারণে মনে করা হত, মুসলমানদের ছবি আঁকা পাপ। অনেকেই তাঁর ছবি আঁকা শেখা পছন্দ করে নি। অদম্য উৎসাহে কোনো বাধা না মেনে আর্ট স্কুলের ছয় বছরের কোর্স শেষ করেন। ষাট জনের মধ্যে তাঁরা মাত্র এগারো জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এর পর আর্ট কলেজে শিক্ষকতার কোর্স শেষ করে কিছু দিন স্বাধীনভাবে চিত্রকলা চর্চা করেন। ১৯৪৩ থেকে ড্রইংশিক্ষক হিসাবে ফরিদপুর জেলা স্কুল ও হাওড়া জেলা স্কুলে কিছু দিন চাকুরি করার পর কলিকাতা আর্ট কলেজে বাণিজ্যিক শিল্পকলা বিভাগে শিক্ষকতায় যোগ দেন। ১৯৪৫ সালে সর্বভারতীয় শিল্পকলা প্রতিযোগিতায় জলরং চিত্রে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সম্মান লাভ করেন।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হয়ে গেলে তিনি ১৯৪৮ সালে ঢাকায় এসে গড়ে তোলেন শিল্পশিক্ষার কেন্দ্র গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট। তার পর ১৯৭৭ পর্যন্ত এই শিল্পশিক্ষায়তনে দীর্ঘ ৩০ বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতার এই দীর্ঘ জীবনে আদর্শ শিল্পী তৈরিতে, চারুকলার পাঠ্যসূচি প্রণয়নে এবং আর্ট ইনস্টিটিউটের সব রকম উন্নয়নের কাজে তিনি নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবেও তিনি বেশ কিছু সময় দায়িত্ব পালন করেন। তাই চিত্রশিল্পের এক জন আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয়। কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম তিনি উপহার দিয়েছেন। জলরং ও তেলরং উভয় মাধ্যমেই ছবি এঁকেছেন তিনি। প্রথম দিকে বাস্তবধর্মী (বিশেষ করে জলরঙে) এবং ষাটের দশকের পর প্রকৃতিনির্ভর বিষয়ে তেলরং-এ নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিত্র নির্মাণ করেন। পরাবাস্তববাদী (দ্র) ছবি আঁকায় তাঁর আগ্রহ লক্ষ করা যায়। তাঁর শিল্পকর্মের কিছু সংগ্রহ রয়েছে জাতীয় যাদুঘর (দ্র), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী (দ্র), বঙ্গভবন, দিল্লি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, পাকিস্তান

'নির্জনে' : তেলরঙ ছবি; শিল্পী—আনোয়ারুল হক

আর্ট কাউন্সিল প্রভৃতি জায়গায় ও দেশে-বিদেশে অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে। বাংলাদেশের সমকালীন বেশির ভাগ প্রথিতযশা শিল্পীই তাঁর ছাত্র। ১৯৮১ সালের ১৮ই নভেম্বর দীর্ঘ দিন রোগভোগের পর এই নিবেদিত শিল্পী-শিক্ষক পি জি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

হা. খা.

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র

ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূপৃষ্ঠের লক্ষ্যমাত্রায় নিক্ষেপের এক ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র। ইংরেজিতে এর নাম Intercontinental Ballistic Missile বা সংক্ষেপে ICBM। হাইড্রোজেন বোমা (দ্র) আবিষ্কারের সঙ্গে এই ক্ষেপণাস্ত্রের বিকাশের অনেক সম্পর্ক রয়েছে। একে হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কারের প্রত্যক্ষ ফল বলা যেতে পারে। হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কারের পর আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। এই ক্ষেপণাস্ত্র আবিষ্কারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) এবং তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেক গবেষণা চালায় এবং

গবেষণার ফলাফল তারা তাদের মহাকাশ অভিযানের কাজে লাগায়। এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসক্ষমতা প্রচুর ও ভয়াবহ। পৃথিবীর (দ্র) যে কোনো শহরকে ধ্বংস করার ক্ষমতা পশ্চিমী দেশগুলোর ক্ষেপণাস্ত্রের রয়েছে। মিনিটম্যান নামে এক ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে, পৃথিবীর যে কোনো স্থানের যে কোনো লক্ষ্যে তা নিক্ষেপ করা যায়। এদের রেঞ্জ বা পাল্লা বিশ্বব্যাপী। আবার কোনো কোনো ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা সীমাবদ্ধ। এসব ক্ষেপণাস্ত্র সাধারণত কোনো-না-কোনো যুদ্ধাস্ত্র বহন করে থাকে। যাতে রেডার (দ্র) বা অন্য কোনো যন্ত্রে ক্ষেপণাস্ত্রের উপস্থিতি ধরা না পড়ে সে জন্য এরা ওড়ে খুব নিচু দিয়ে। ক্ষেপণাস্ত্র কখনো বাতাস থেকে বাতাসে, বিমান থেকে শত্রুবিমানে, ভূমি থেকে আকাশে, বায়ু থেকে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়। ভূমি থেকে বায়ুতে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্র শত্রুবিমান বা অন্য কোনো ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত হয়। আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র সবচেয়ে উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র। আমেরিকা 'পোলারিস' নামে এক শ্রেণীর ক্ষেপণাস্ত্র আবিষ্কার করেছে, যা জাহাজ থেকে সমুদ্রতীরে নিক্ষেপ করা যায়। গত উপসাগরীয় যুদ্ধে এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র 'স্কাড' ও 'প্যাট্রিয়ট' নিক্ষেপ করা হয়েছিল; এই যুদ্ধ হয়েছিল ইরাক ও সৌদি আরবের মধ্যে।

শা. ত.

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল

জাতিসংঘ (দ্র) কর্তৃক অনুমোদিত একটি স্বায়ত্তশাসিত অর্থ-প্রতিষ্ঠান। ইংরেজিতে International Monetary Fund বা সংক্ষেপে I M F। বিভিন্ন দেশের মুদ্রামানের হ্রাস-বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করাই এর অন্যতম প্রধান কাজ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (দ্র)পর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও তার সুষম উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো, বিনিময়-হারের স্থায়িত্ব বিধান ও প্রতিযোগিতামূলক মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস রোধ করা, সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সব ধরনের লেনদেনে সহযোগিতা করা ও ঋণদান করাসহ আয়-ব্যয়ের ভারসাম্যহীনতার তীব্রতা রোধ করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল গঠিত হয়। এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৪৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) ওয়াশিংটন ডি সি শহরে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। এর বর্তমান সদস্যসংখ্যা ১২৮।

সুজ. ব.

আন্তর্জাতিক পরিমাপ

যে কোনো ভৌতরাশি পরিমাপের জন্য একক দরকার হয়। একক ব্যতীত ভৌত পরিমাপের কোনো তাৎপর্য নেই। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী সম্প্রদায় পরিমাপের এককের জন্য একটি আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ঠিক করে নিয়েছেন। এর নাম এস.আই. (S.I.) পদ্ধতি। পারমাণবিক স্ট্যাণ্ডার্ড বা মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে মিটার কিলোগ্রাম সেকেণ্ড (এম.কে.এস.) পদ্ধতির আধুনিকায়ন হল আন্তর্জাতিক পদ্ধতি। ফরাসি শব্দবন্ধ 'সিস্ত্যাম্ অ্যাঁতার্নাসিওনাল্ দুনিতে'— Syste`me International d'Unités — (International System of Units) থেকে এসেছে এস.আই. (S.I.) বা আন্তর্জাতিক পরিমাপপদ্ধতি। এম.কে.এস. এককে মৌলিক এককগুলো হল দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের একক। এগুলো যথাক্রমে মিটার, কিলোগ্রাম ও সেকেণ্ড। এগুলোর সঙ্গে আরো চারটি মৌলিক একক যোগ করে তৈরি হয়েছে এস.আই. বা আন্তর্জাতিক পরিমাপপদ্ধতি। নতুন এককগুলো হল তড়িৎবিদ্যায় অ্যাম্পেয়ার (দ্র), তাপীয় গতিবিদ্যায় কেল্ভিন্, দীপ্তিমিতিতে ক্যাণ্ডেলা এবং পদার্থের পরিমাণ পরিমাপে মোল। নিচে আন্তর্জাতিক পরিমাপপদ্ধতির বিভিন্ন একক এবং এদের সঙ্কেত দেওয়া হল—

ভৌতরাশি	একক	সঙ্কেত
দৈর্ঘ্য	মিটার	m
ভর	কিলোগ্রাম	kg
সময়	সেকেণ্ড	s
তাপমাত্রা	কেলভিন	k
তড়িৎপ্রবাহ	অ্যাম্পেয়ার	A
উজ্জ্বলন তীব্রতা	ক্যাণ্ডেলা	cd
পদার্থের পরিমাণ	mole	mol.

আন্তর্জাতিক পরিমাপপদ্ধতি প্রবর্তনের পূর্বে বিভিন্ন দেশ তাদের নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করত। যেমন আমাদের দেশে দৈর্ঘ্য পরিমাপে গজ, ফুট, ইঞ্চি; দূরত্ব পরিমাপে

ভর পরিমাপে সের, মণ ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। বর্তমানে পৃথিবীর শতকরা ৫০ ভাগ দেশে আন্তর্জাতিক পরিমাপপদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্রমে-ক্রমে এই সংখ্যা বাড়ছে।

শা. ত.

আন্তর্জাতিক মোর্স কোড

টেলিগ্রাফের (দ্র) সাহায্যে সঙ্কেতায়নের জন্য বা সংবাদ পাঠাবার জন্য এই কোড ব্যবহৃত হয়। সংবাদের মোর্স কোড (Morse code) তৈরির জন্য ডট ও ড্যাশ এই দুই ধরনের সঙ্কেত (signal) ব্যবহার করা হয়। ডট সঙ্কেতের চেয়ে ড্যাশ সঙ্কেত তিন গুণ সময় বেশি স্থায়ী হয়। বিভিন্ন বর্ণ, সংখ্যা বা বিরামচিহ্নের জন্য ডট ও ড্যাশ সঙ্কেত এবং শূন্যস্থানের বিভিন্ন দল বা সমন্বয় সৃষ্টি করে তৈরি হয় এই মোর্স কোড। প্রথম দিকের ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফে সংবাদের প্রতিটি বর্ণ পাঠাবার জন্য আদালা-আলাদা তার ব্যবহার করার দরকার হত। আমেরিকার স্যামুয়েল মোর্স (Samuel F. B. Morse) ১৮৩৮ সালে কোড ব্যবহার করে একটি তারের মধ্য দিয়ে সংবাদ পাঠানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। মোর্স বিদ্যুতের সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ গুচ্ছ বা স্পন্দ (short and long bursts of current) ব্যবহার করেন। তিনি বিভিন্ন বর্ণের জন্য সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ গুচ্ছগুলোর বিভিন্ন সমন্বয় তৈরি করে একটির পর আরেকটি পাঠান। বিদ্যুৎগুচ্ছের এই সমন্বয়গুলো তারের শেষ প্রান্তের তড়িৎচুম্বকের (electromagnet) মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। পরে একটি কলমের মাধ্যমে কাগজের টেপের (paper tape) উপর ডট ও ড্যাশ হিসাবে সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ বিদ্যুৎগুচ্ছগুলোর বিভিন্ন সমন্বয়ের ছাপ পড়ে। এভাবে ডট ও ড্যাশের সমন্বয়ে তৈরি কোডকে স্যামুয়েল মোর্সের নামানুসারে মোর্স কোড বলে। বিভিন্ন বর্ণ, সংখ্যা ও বিরামচিহ্নের নির্দিষ্ট কোড থেকে মূল সংবাদ জানা যায়। নিচে বিভিন্ন বর্ণ ও সংখ্যার মোর্স কোর্ড দেওয়া হল :

A ·–	J ·–––	S ···	2 ··–––
B –···	K –·–	T –	3 ···––
C ·–·–	L ·–··	U ··–	4 ····–
D –··	M ––	V ···–	5 ·····
E ·	N –·	W ·–––	6 –····
F ··–·	O –––	X –··–	7 ––···
G ––·	P ·––·	Y –·––	8 –––··
H ····	Q ––·–	Z ––··	9 ––––·
I ··	R ·–·	1 ·––––	0 –––––

১৯০০ সালে সমুদ্রগামী জাহাজে মোর্স কোড ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। আধুনিক কালে জরুরি সংবাদ পাঠাবার কাজে মোর্স কোড ব্যবহৃত হয়। এই মোর্স কোড রেডিও স্পিকারের ব্লিপ অথবা ল্যাম্প / টর্চের আলোর ঝলকানির (flash) সাহায্যেও সৃষ্টি করা যায়।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের মোর্স কোড—

Distress signal (SOS) ···–––···
Attention signal –·–·–
Understood ···–·
Received ·–·

হো. আ.

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা

শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্ম-পরিস্থিতির উন্নতি ও সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধানের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। ইংরেজিতে একে বলা হয় International Labour Organisation (ILO)। এই সংস্থার প্রধান কাজ হল—শ্রমিক-কর্মচারীদের দৈনিক কাজের সময়, পরিমাণ ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা আর কার্যকালে দৈহিক আঘাতসহ যে কোনো ক্ষতি থেকে তাদের রক্ষা করে শ্রম-অবস্থার উন্নতি সাধন করা, দেশের বাইরে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষায় সমর্থন যোগানো এবং শ্রমিক, পরিচালক ও সরকারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা। উন্নয়নশীল দেশগুলোর পারস্পরিক কারিগরি সহযোগিতা লাভে সাহায্য করাও এর অন্যতম কাজ।

১৯১৯ সালের ১১ই এপ্রিল ভার্সাই চুক্তি (দ্র) অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় । পরে ১৯৪৬ সালে

এটি জাতিসংঘের (দ্র) এজেন্সি হিসাবে স্বীকৃতি পায়। এর সদস্য দেশের সংখ্যা ১৭১ (১৯৯৪)। সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে এর সদর দপ্তর অবস্থিত।

সুজ. ব.

আন্দামান সেলুলার জেল

ইংরেজ আমলে ভারতে বিশেষত বাংলার ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবীদের আটক রাখার জন্য যে ক'টি কুখ্যাত বন্দি-শিবির ছিল এটি সে সবের অন্যতম। কলিকাতা (দ্র) ও মাদ্রাজ থেকে যথাক্রমে ১২৫৫ এবং ১১৫১ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরের (দ্র) বুকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এটি অবস্থিত।

১৮৮৯ সালের ১২ই জুন ভারতবর্ষের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এই কয়েদখানা সংবলিত উপনিবেশটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অবশেষে ১৮৯৩ সালে সেই উপনিবেশের অংশ হিসাবে সেলুলার জেল নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হয়। মাত্র ৩ বছরের মধ্যে প্রায় ছ'শ কয়েদির দিন-রাতের শ্রমে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

এখানে যাঁদেরকে বিভিন্ন অভিযোগ ও রাজদ্রোহের অপরাধে নিয়ে আসা হত তাঁদের ওপর চালানো হত অমানুষিক নির্যাতন। সেই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে কেউ উন্মাদ হয়ে যেতেন, কেউ অকালে প্রাণ হারাতেন। এখানে বন্দিরা বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহও করেছেন, অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যা করতেও দ্বিধা করেন নি।

আন্দামান সেলুলার জেলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়াদে যে সব বিখ্যাত বিপ্লবী বন্দিজীবন যাপন করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, উল্লাসকর দত্ত ও মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (দ্র) প্রমুখ।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু (দ্র) তাঁর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ (দ্র) নিয়ে ১৯৪৩ সালের ৭ই নভেম্বর এই দ্বীপটি দখল পূর্বক স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নাম দেন শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ। অবশ্য এই ঘটনার দু' বছর পর অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ সরকার এই দ্বীপমালা পুনরায় দখল করে নেয়। তবে তত দিনে ভারতে ইংরেজ শাসনের সূর্য অস্তমিত। তাই তারা আন্দামান সেলুলার জেলের সব বন্দিকে মুক্তি দিয়ে উপনিবেশটিও চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেয়।

সেলুলার জেলের দীর্ঘ অলিন্দ। দেয়ালে শহীদ রাজবন্দিদের ছবি

বর্তমান সেলুলার জেল অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের বহু স্মৃতি-বিজড়িত জাদুঘরে পরিণত হয়েছে।

আ. হু.

আপেক্ষিক তাপ

বিভিন্ন বস্তুর তাপধারণের ক্ষমতা বা উত্তপ্ত হওয়ার ক্ষমতা বিভিন্ন। বস্তুর ভর (দ্র), উপাদান ও তাপমাত্রার (দ্র) উপর তার তাপধারণের বা উত্তপ্ত হওয়ার ক্ষমতা নির্ভর করে। কোনো বস্তুর একক ভরের তাপমাত্রা একক পরিমাণে বাড়াতে যে পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন তাকে ঐ বস্তুর উপাদানের আপেক্ষিক তাপধারণ-ক্ষমতা বা সংক্ষেপে আপেক্ষিক তাপ বলে।

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে এক কেজি ভরের কোনো বস্তুর তাপমাত্রা এক ডিগ্রি কেল্‌ভিন্ (সেলসিয়াস) বৃদ্ধির জন্য যত জুল (দ্র) তাপশক্তি প্রয়োজন সেটাই ঐ বস্তুর আপেক্ষিক তাপ। আপেক্ষিক তাপের একক জুল প্রতি কিলোগ্রাম ডিগ্রি কেল্‌ভিন্ (J/Kg°k)। নিচে কয়েকটি পদার্থের আপেক্ষিক তাপ উল্লেখ করা হল :

আপেক্ষিক তাপের সারণি (J/Kg'k)

অ্যালুমিনিয়াম	৯০০	পারদ	১৪০
তামা	৪০০	দস্তা	৩৮০
পিতল	৩৮০	বরফ	২১০০
কাচ	৬৭০	লোহা	৪৬০
সীসা	১৩০	পানি	৪২০০
মেথিলেটেড স্পিরিট	২৪০০	সমুদ্রের পানি	৩৯০০

স. রা

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব

গ্রিক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক আরিস্টোটল (দ্র) মনে করতেন, পৃথিবী স্থির এবং তা মহাবিশ্বের (দ্র) কেন্দ্র। গালিলেও (দ্র) প্রথম আপেক্ষিক গতির ধারণা উপস্থিত করে দেখালেন যে কোনো বস্তুর পরম স্থির অবস্থান বা পরম গতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। নিউটনের (দ্র) বলবিদ্যার সূত্রেও এটা স্পষ্ট হয় যে কোনো পরীক্ষার মাধ্যমে পরম গতি আমরা নির্ধারণ করতে পারি না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মনে একটি পরম ও অবিচল স্থানের ধারণা বদ্ধমূল ছিল। সময় সম্পর্কেও ধারণা ছিল যে কোনো কিছুর উপর নির্ভর না করে সময় আপন গতিতে প্রবাহিত। পরম স্থানের প্রতিনিধি রূপে তাঁরা আলোর (দ্র) তরঙ্গ প্রবাহিত হবার কাল্পনিক মাধ্যম হিসাবে ইথারকে ধারণা করলেন। ১৮৮৭ সালে মাইকেলসন্ (Albert A. Michelson : ১৮৫২–১৯৩১) ও মর্লি (Edwin W. Morley : ১৮৩৮–১৯২৩) পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন কাল্পনিক ইথারের মধ্যে পৃথিবীর (দ্র) গতির (দ্র) জন্য আলোর গতির কোনো পার্থক্য হয় কিনা। কিন্তু পৃথিবীর গতির জন্য আলোর গতির কোনো পার্থক্য পাওয়া গেল না। এই পটভূমিতে আইনস্টাইন (দ্র) ১৯০৫ সালে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এই তত্ত্ব প্রচলিত স্থান ও কালের ধারণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়। এই তত্ত্বের ভিত্তিরূপে আইনস্টাইন দু'টি স্বীকার্য গ্রহণ করেন। প্রথমটি হল—যেসব পর্যবেক্ষকের মধ্যে সুষম আপেক্ষিক গতি আছে পদার্থবিজ্ঞানের সব সূত্রই তাদের ক্ষেত্রে অভিন্ন হবে ! দ্বিতীয়টি হল—শূন্যের মধ্যে আলোর গতি অপরিবর্তী এবং তা পর্যবেক্ষক অথবা আলোর উৎসের গতির উপর

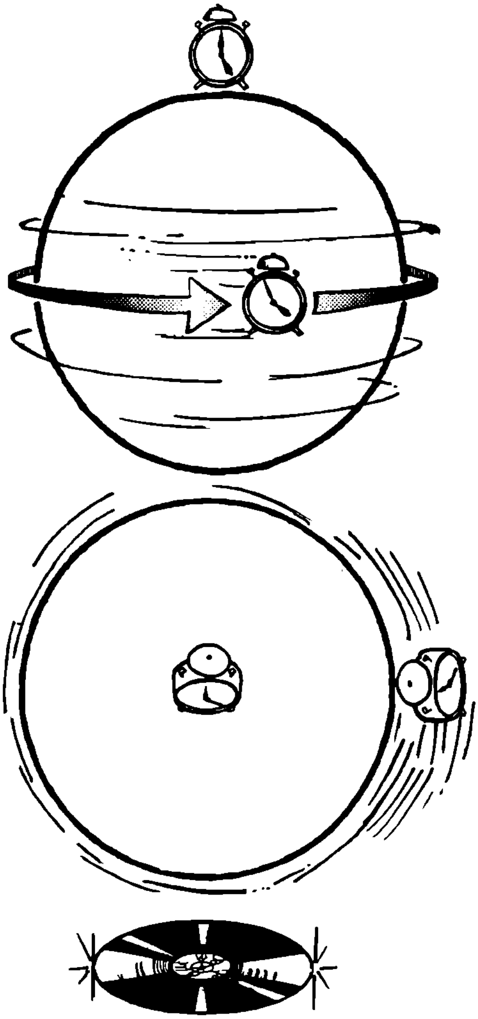

আপেক্ষিক তত্ত্বের একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত হল, চলন্ত ঘড়ির চেয়ে স্থির ঘড়ি তাড়াতাড়ি চলবে। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন লিখেছিলেন, "হুবহু একই রকম দুটো ঘড়ির একটা যদি থাকে পৃথিবীর বিষুবরেখায় আরেকটা পৃথিবীর কোনো মেরুবিন্দুতে তা হলে বিষুবরেখারটি সামান্য একটু হলেও ধীরে চলবে।" এটা পরে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এইচ. জে. হে (H.J.Hay) পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন। পৃথিবীটা যেন একটা পাতলা চাকতি; তার কেন্দ্রে রয়েছে উত্তর মেরু আর কিনারে বিষুবরেখা। এর পর এমনি এক ঘুরন্ত চাকতির মাঝখানে আর কিনারে রাখা হল দু'টি অতি নিখুঁত তেজস্ক্রিয়তাচালিত ঘড়ি। তাতে দেখা গেল মাঝখানের ঘড়িটির চেয়ে কিনারের ঘড়িটি চলছে সামান্য ধীরগতিতে। একটি রেকর্ড প্লেয়ারে যখন কোনো লং-প্লেয়িং রেকর্ড বাজছে তখন তার কিনারের চেয়ে কেন্দ্রের বয়স তাড়াতাড়ি বাড়ছে

নির্ভর করে না। এই তত্ত্ব অনুসারে এক জন পর্যবেক্ষকের তুলনায় কোনো বস্তু যদি v গতিতে চলে, পর্যবেক্ষকের কাছে তা সঙ্কুচিত মনে হবে ও এর দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে $L = L_0\sqrt{1-v^2/c^2}$ যেখানে L হচ্ছে স্থির অবস্থায় বস্তুর দৈর্ঘ্য এবং C হচ্ছে আলোর গতি। পর্যবেক্ষকের কাছে চলন্ত ঘড়ির সময়ও ধীর গতিতে চলবে। ফলে পর্যবেক্ষকের তুলনায় স্থির কোনো ঘড়িতে t_0 যদি সময়ের ব্যবধান হয় দুটো ঘটনার মধ্যে চলন্ত ঘড়িতে সেই দুই ঘটনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ধরা পড়বে $t=\frac{t_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ রূপে। এই দৈর্ঘ্যের সঙ্কোচন ও কালের প্রসারণ পারস্পরিক। অর্থাৎ একটি চলন্ত ট্রেন থেকে প্লাটফর্মকে সঙ্কুচিত মনে হবে এবং প্লাটফর্মে ঘড়ি মন্থর গতিতে চলছে বলে ধরা পড়বে। আবার প্লাটফর্ম থেকে চলন্ত ট্রেনের দৈর্ঘ্য সঙ্কুচিত এবং এর ঘড়ির গতি মন্থররূপে ধরা পড়বে। এই দৈর্ঘ্য সঙ্কোচন ও কালের প্রসারণ শুধু গাণিতিক ব্যাপার নয়। পরীক্ষাগতভাবেও এগুলো ধরা পড়েছে। আপেক্ষিকতার তত্ত্বের আর একটি ফল হল–পর্যবেক্ষকের তুলনায় কোনো বস্তু v গতিতে চললে এর আপেক্ষিক ভর বৃদ্ধি পেয়ে হবে $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ এখানে m_0 হচ্ছে স্থির অবস্থায় বস্তুর ভর। নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞানে বস্তু ও শক্তির নিত্যতার নীতি পৃথকভাবে কাজ করে। কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বে শক্তি বস্তুতে এবং বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। ভর (দ্র) ও শক্তির (দ্র) মধ্যে পারস্পরিক রূপান্তরের যে সূত্র তা হল $E = mc^2$; এখানে E হচ্ছে নির্গত শক্তি, m হচ্ছে আপেক্ষিক ভর এবং C আলোর গতি। এখান থেকে আমরা দেখতে পাই যে সামান্য ভরকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হয়। পারমাণবিক বোমায় এই শক্তি নির্গমন স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। সাধারণভাবে কোনো বস্তুর গতি যখন আলোর গতির তুলনায় খুব কম হয় তখন আপেক্ষিক তত্ত্বের গুরুত্ব ধরা পড়ে না। কিন্তু যখন কোনো কণিকার গতি আলোর গতির কাছাকাছি যায় তখন এর গুরুত্ব ধরা পড়ে।

আ. আ.

আফিম (opium)

পপি ফুলের (পপি গাছের বৈজ্ঞানিক নাম *প্যাপাভের সোম্‌নিফেরাম*—*Papaver somniferum*) বীজাধার বা ক্যাপসুল থেকে নিঃসৃত সাদা আঠাজাতীয় পদার্থের নাম আফিম। শব্দটি বাংলায় আফিং বা অহিফেন এবং ইংরেজিতে ওপিয়াম নামেও পরিচিত। অশোধিত আফিম পরিশোধন করে তা থেকে চিকিৎসাকার্যে ব্যবহার্য ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। ১৮০৬ সালে জার্মান বিজ্ঞানী জার্টুর্নার (F.W.A. Serturner) আফিম থেকে ব্যথানাশক ঔষধ মরফিন আবিষ্কার করেন। আফিম থেকে একাধিক অ্যাল্‌কালয়েড জাতীয় উপাদান যেমন—মরফিন, কোডিন, প্যাপাভেরিন ইত্যাদি পাওয়া যায়। এ উপাদানগুলো চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

দীর্ঘদিন আফিম ব্যবহারে মানুষ এতে আসক্ত হয়ে পড়ে। ফলে আফিমের অবৈধ উৎপাদন ও বিক্রয় আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রায় ৬০০০ বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যে সর্বপ্রথম আফিম ব্যবহার শুরু হয়। চিকিৎসাক্ষেত্রে আফিমের ব্যবহার অনেক পুরানো। খ্রিস্টের জন্মের পূর্ব থেকেই গ্রিক ও রোমান চিকিৎসকগণ রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে আফিম ব্যবহার করতেন বলে জানা গেছে।

সি. না. হ.

আফিম যুদ্ধ

১৮৩৯ থেকে ১৮৪২ সাল পর্যন্ত তিন বছর ব্যাপী ব্রিটেন ও চীনের (দ্র) মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ।

উনিশ শতকের প্রথম তিন দশক চীনের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল ক্যান্টন। এই বাণিজ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে আফিম, সুতীবস্ত্র, রেশম (দ্র), চা (দ্র) ইত্যাদি পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি হত। আমদানিযোগ্য পণ্যগুলোর মধ্যে আফিম ছিল প্রধান। ইংরেজ বণিকদের স্বার্থবাদী নীতির কারণে চীনা ব্যবসায়ীদের প্রচুর পরিমাণে আফিম আমদানি করতে হত। ইংরেজদের এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল চীনে আফিমের আমদানি বাড়ানো যাতে বাণিজ্য–উদ্বৃত্ত সব সময়ই ইংরেজদের অনুকূলে থাকে আর যাতে ব্যাপক মাদকাসক্তি চীনাজাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়।

স্বভাবতই সচেতন চীনবাসী এই আফিম আমদানি নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ১৮৩৯ সালের প্রথম দিকে ক্যান্টনের চীনা কমিশনার লিন শে-শু আফিম ব্যবসা নিষিদ্ধ করেন। ইংরেজ বণিক তাঁর নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করলে তিনি ৬ লক্ষ ডলার মূল্যের ২০,০০০ বাক্স আফিম বাজেয়াপ্ত করেন। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে নভেম্বর মাসে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৮৪২ সালে নান্‌কিং-এর সন্ধির মধ্য দিয়ে চীনে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক আধিপত্যই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাজেয়াপ্ত আফিমের মূল্য চীন সরকারকে পরিশোধ করতে হয়।

সুজ. ব.

আফ্রিকা

আফ্রিকা পৃথিবীর (দ্র) দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশ (দ্র)। আফ্রিজি বা আফ্রিদি (Afrigi or Afridi) নামের উপজাতির নাম থেকে আফ্রিকা নামের উৎপত্তি। এই মহাদেশটি জিব্রাল্টার-প্রণালী দ্বারা ইউরোপ (দ্র) থেকে এবং সুয়েজ খাল (দ্র) দ্বারা এশিয়া (দ্র) থেকে আলাদা হয়েছে। এর আয়তন ৩,০৩,৩৪,৫৯২ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনের দিক থেকে এর সবচেয়ে বড় দেশ সুদান (আয়তন : ২৫,০৫,৮১৩ বর্গ কিমি) এবং জনসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বড় দেশ নাইজেরিয়া (১৯৯০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী লোকসংখ্যা সাড়ে দশ কোটি)। এই মহাদেশের সর্বোচ্চ চূড়াবিশিষ্ট পর্বতের নাম কিলিমাঞ্জারো এবং সবচেয়ে বড় হ্রদের নাম ভিক্টোরিয়া।

আফ্রিকার প্রায় সর্বত্রই আবহাওয়া উত্তপ্ত। বিষুবরেখা (দ্র) অঞ্চলের আবহাওয়া সারা বছর ধরে আর্দ্র থাকে। জুলাই মাসে এর উত্তরাঞ্চলের আবহাওয়া আর্দ্র থাকে; আর জানুয়ারি মাসে মহাদেশটির বাকি অংশের আবহাওয়া আর্দ্র থাকে। সাহারা (দ্র), নামিব (Namib) এবং কালাহারি মরুভূমি আফ্রিকার সবচেয়ে শুষ্ক অঞ্চল। সাহারা পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি হিসাবে খ্যাত। পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চল, নীল নদের উপত্যকা এবং ভিক্টোরিয়া লেকের কাছাকাছি অঞ্চলগুলো ঘন বসতিপূর্ণ। এসব অঞ্চল মরুভূমি ও বনাঞ্চল (যেখানে খুব কম সংখ্যক লোক বাস করে) থেকে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

আফ্রিকাবাসীরা বহুভাষী। এর অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের লোকজন সতেরো শ'রও অধিক ভাষা ব্যবহার করে থাকে। অধিকাংশ লোকই মাতৃভাষা ছাড়া আরো ছ' রকমের অন্যান্য ভাষা ব্যবহার করতে পারে।

উত্তর আফ্রিকায় অধিকাংশ লোকের ভাষা আরবি (দ্র)। পশ্চিম আফ্রিকার প্রধান প্রধান ভাষা হল হাউসা (Hausa), ইওরুবা (Yoruba), আকান (Akan), এবং মেলিন্‌কি (Malinke)। আর পূর্ব আফ্রিকায় সোয়াহিলি। আফ্রিকা মহাদেশে অর্ধেকেরও বেশি লোক মুসলমান এবং প্রধান ধর্ম (দ্র) ইসলাম (দ্র), এর পরেই খ্রিস্টানধর্মের (দ্র) স্থান।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম আফ্রিকার কিছু নাগরিককে (দ্র) যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) ক্রীতদাস হিসাবে নিয়ে যায়। এদের বংশোদ্ভূতদের বলে নিগ্রো। বর্তমানে 'নিগ্রো' শব্দটির পরিবর্তে 'আফ্রো-আমেরিকান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আফ্রিকার সাভানা (savannah) অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে লম্বা ঘাস জন্মায়। আফ্রিকার বৃহৎ প্রাণিকুলের অধিকাংশই (যেমন—হাতি (দ্র), জিরাফ (দ্র), গণ্ডার, সিংহ (দ্র) ইত্যাদি) বাস করে সাভানা অঞ্চলে। নীল, কঙ্গো বা জায়ারে, নাইজার ও জাম্বেজি—বিশ্বের এই চারটি বিখ্যাত নদীই আফ্রিকায় প্রবাহিত।

সে. শা.

আবদুর রশিদ সিদ্দিকী, মোহাম্মদ [১৩০১—১৩৫৭ ব.]

সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সমাজকর্মী ও রাজনীতিজ্ঞ। ১৩০১ বঙ্গাব্দে চট্টগ্রামে চকরিয়া থানার শাহ ওমরাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

দারিদ্র্য ও প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে আপন কর্মপ্রচেষ্টা, অনমনীয় মনোবল, দৃঢ় সংকল্প ও অফুরন্ত প্রাণস্পৃহার জোরে স্বল্প লেখাপড়ার পুঁজি নিয়েও তিনি সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি নিজ গ্রাম থেকে উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষা পাশ করে কক্সবাজারের (দ্র) মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে কিছু দিন পড়েছিলেন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর এটুকুই। তবে উচ্চ প্রাইমারি বৃত্তি লাভ করায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত

'হিতবাদী' পত্রিকায় নাম প্রকাশিত হওয়ায় তিনি সে সময় থেকে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী' ইত্যাদি পত্রিকা এবং বিভিন্ন বটতলার পুঁথি (দ্র) তাঁর মধ্যে সাহিত্যচিন্তার জন্ম দেয়। তাঁর জীবন খুবই বৈচিত্র্যময়। কবি শশাঙ্কমোহন সেন, কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রমুখের উৎসাহ পেয়ে তিনি ১৩২৬ সনের বৈশাখ মাসে চট্টগ্রাম থেকে সাহিত্যপত্রিকা মাসিক 'সাধনা' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। 'সাধনা'র কয়েকটি সংখ্যায় যুগ্মসম্পাদক হিসাবে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের (দ্র) নামও মুদ্রিত হয়েছিল। সিদ্দিকীর সম্পাদিত 'সাধনা' ৩য় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে কলিকাতায় (দ্র) প্রকাশিত হতে থাকে। এ পত্রিকা পর পর চার বছর বেরিয়েছিল। 'সাধনা' প্রকাশের দু'বছর পর ১৩২৮ সনের বৈশাখ মাসে কলিকাতা থেকে তিনি 'আন্নেসা' নামে বাংলা ভাষায় (দ্র) প্রথম মুসলিম মহিলা মাসিক সাময়িকপত্র প্রকাশ করেন। সম্পাদিকা হিসাবে তাঁর স্ত্রী সফিয়া খাতুনের নাম মুদ্রিত হত। 'আন্নেসা' এক বছর প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। ১৩২৯ সনের ১৬ই শ্রাবণ (১৫ই আগস্ট, ১৯২২) 'জাতীয় জাগরণের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র' 'মোসলেম জগৎ' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকায় 'সময় থাকিতে সাবধান, বুঝে চল বৃটিশ' শীর্ষক সম্পাদকীয় লেখার জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন। কবি খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন (দ্র) ও প্রখ্যাত সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের (দ্র) সাংবাদিকজীবন শুরু হয় 'মোসলেম জগৎ' পত্রিকাতেই। ১৯২৪ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ পত্রিকা চালু ছিল। ১৩৩৩ সনের আশ্বিন মাসে কলিকাতা থেকে 'রক্তকেতু' নামে আরেকটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদনা করেন আবদুর রশিদ সিদ্দিকী। পত্রিকাটি জনপ্রিয় হয়েছিল বলে জানা যায়। এছাড়াও সিদ্দিকী তাঁর গ্রাম থেকে ১৯৪৬ সালে 'কক্সবাজার হিতৈষী' নামে হাতে-লেখা একটি পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য ও কাব্য রচনা করেন, চট্টগ্রামী আঞ্চলিক ভাষা বিষয়েও তাঁর প্রবল কৌতূহল ছিল। তাঁর লেখা উপন্যাস : 'জরিনা' (১৩৩৩ ব.), 'উপেন্দ্রনন্দিনী' (১৯১৯), 'প্রণয়-প্রদীপ', 'নুরুন্নেহার', 'মেছেরুন্নেছা'; কাব্য : 'রোস্তম সোহরাব' (১৯১৬), 'যবনবধ কাব্য' (১৩৫১ ব.), 'পাকিস্তান বিজয় কাব্য' (১৩৫৫ ব.); অনুবাদমূলক গ্রন্থ : 'মহাকোরাণ কাব্য' (আমপারা খণ্ড–১৯২৭); আলোচনা : 'চট্টগ্রামী ভাষাতত্ত্ব' (১৩৫৩ ব.), 'চট্টগ্রামের ভাষাতত্ত্ব', 'চট্টগ্রামী ও রোমাই তত্ত্ব'; অপ্রকাশিত রচনা : 'সংক্ষিপ্ত জীবনী' (রচনাকাল ১৩৩০ ব.)।

সিদ্দিকী ১৯৩৮ সালে চকরিয়া থানা মুসলিম লীগের (দ্র) সেক্রেটারি ও মহকুমা মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি এবং দীর্ঘ দিন কাকারা ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ লাভের জন্য তিনি দু'বার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে দু'বারই ব্যর্থ হন। তিনি 'বেগম খোশ' নামে একটি পেটেন্ট ঔষধ বের করে প্রচুর অর্থের মালিক হন। ১৯৩৮ সালে তিনি 'মোসলেম জগৎ পঞ্জিকা' নামে একটি মুসলমানী পঞ্জিকা প্রকাশ করেও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। আবদুর রশিদ সিদ্দিকী শেষ জীবনে প্রচুর খ্যাতি, বিত্ত ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়েছিলেন।

১৯৫১ সালের ২৬শে মার্চ (১২ই চৈত্র, ১৩৫৭) সোমবার ৫৭ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শ. আ.

আবদুর রহিম, স্যার [১৮৬৭-১৯৫২]

আবদুর রহিম ১৮৬৭ সালে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুর রব। মেদিনীপুরের সরকারি হাইস্কুলে তিনি লেখাপড়া করেন। স্কুলের শিক্ষাজীবন শেষ হলে তিনি কলিকাতায় (দ্র) যান এবং কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এর পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) হতে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর বিষয় ছিল ইংরেজি।

১৮৯০ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি বিলেত গমন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল ব্যারিস্টারি পাশ করা। তিনি ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে এসে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। মাত্র চার বছরের মধ্যে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ১৯০০-১৯০৩ এই তিন বছর কলিকাতার 'প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট' ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখান। ১৯০৭ সাল তাঁর জীবনের একটি গৌরবময় বছর। এই বছর তিনি 'Tagore Law Professor' হন। ঠাকুর অধ্যাপক রূপে মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা তাঁর মনীষা প্রমাণ করে। বক্তৃতাটি পরে বই আকারে

প্রকাশিত হয়। তাঁর এই গ্রন্থটির নাম 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অব্‌ মহামেডান্‌ জুরিসপ্রুডেন্স অ্যাকর্ডিং টু দি সুন্নী স্কুল অব ল'।

১৯০৮ সালে তিনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতির দায়িত্ব নিয়ে মাদ্রাজ গমন করেন। তিনি ১৯১০ সালে এক বার এবং ১৯২০ সালে আরেক বার—মোট দু' বার 'প্রধান বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন ১৯২১ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত। ১৯২৬ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য এবং ১৯৩০ সালে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য হন। ১৯৩৩–৩৪ সালে তিনি বিরোধী দলের নেতা হন। ১৯৩৫–৩৬ সালে তিনি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সভাপতি হন। ১৯৩৫ সালে বিলেতে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কনফারেন্স বা যৌথ সংসদীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দান করেন।

ভারতে মুসলিম লীগ নামে (দ্র) যে সংগঠন সৃষ্ট হয় তিনি তার সক্রিয় সদস্য ছিলেন না সত্য, কিন্তু মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন ও আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন, হিন্দু–মুসলমানের যৌথ নির্বাচনে মুসলমানদের ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না। মুসলিম লীগ যে গঠনতন্ত্র রচনা করেন তাতে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। প্রদেশে প্রদেশে ব্যবধান সৃষ্টি না করে সকল প্রদেশের (তদানীন্তন ভারতবর্ষের) মুসলমানদের ভাষা উর্দু (দ্র) হোক—এ তার অভিলাষ ছিল এবং তিনি এ-মত প্রচারও করেন। ভারত সরকার তাঁকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি ১৫ই আগস্ট ১৯৫২ সালে করাচিতে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হা.

আবদুল আলীম [১৯৩১—১৯৭৪]

জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী। তিনি ১৯৩১ সালের ২৭শে জুলাই মুর্শিদাবাদের তালিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি গানের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিভিন্ন গানের অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত যেতেন এবং বিভিন্ন শিল্পীর গান শুনে শুনে নিজে চর্চা করতেন। তিনি একবার শুনেই কোনো গান হুবহু গাইতে পারতেন। বিভিন্ন পালা-পার্বণে গান পরিবেশন

করে তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

গানে আবদুল আলীমের এই প্রতিভা দেখে কলিকাতা সিটি কর্পোরেশনের তৎকালীন মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজা তাঁকে কলিকাতায় (দ্র) নিয়ে গিয়ে বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী সৈয়দ গোলাম ওলির কাছে তালিম নেওয়ার সুযোগ করেন দেন। আবদুল আলীম অচিরেই সঙ্গীতজগতে সুনাম অর্জন করেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (দ্র) এবং শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের (দ্র) ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন। ঐ সময়েই তিনি বিখ্যাত দোতারাবাদক কানাইলাল শীলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম রেকর্ড বেরয় ১৯৪২ সালে।

পরবর্তী সময়ে আব্বাসউদ্দিন আহমদ (দ্র), আবদুল লতিফ, মমতাজ আলী খান, আবদুল হালিম চৌধুরী, বেদারউদ্দিন আহমদ প্রমুখ অনেক খ্যাতনামা শিল্পীর কাছে আবদুল আলীম তালিম গ্রহণ করেন। পাক-ভারত উপমহাদেশ জুড়ে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। কলম্বিয়া, হিজ মাস্টার্স ভয়েস, গ্রামোফোন কোম্পানি অব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ গ্রামোফোন কোম্পানি তাঁর অসংখ্য গানের রেকর্ড প্রকাশ করে।

আবদুল আলীম ঢাকার সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের পল্লীগীতি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে একুশে পদকে ভূষিত করে। এই কণ্ঠশিল্পী ১৯৭৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ইহজগৎ ত্যাগ করেন।

র. শা.

সুর তুলছেন আবদুল আহাদ তন্ময় হয়ে শুনছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

আবদুল আহাদ [১৯২০—১৯৯৪]

রবীন্দ্রসঙ্গীতবিশেষজ্ঞ। সুরকার, গায়ক, সঙ্গীতপ্রশিক্ষক ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ফরিদপুরের ফুকুরহাটি গ্রামে জন্ম। পিতা আবদুস সামাদ খাঁ, মাতা জামিলা খাতুন। শৈশব থেকে মাতামহ খান বাহাদুর মোহাম্মদ সোলায়মানের সঙ্গে পাবনায় বসবাস করেন।

বাল্যকালেই গানের দিকে আবদুল আহাদের গভীর ঝোঁক প্রকাশ পায়। পরিণত সঙ্গীতশিক্ষা লাভ করেন কলিকাতায় (দ্র) ও শান্তিনিকেতনে। ওস্তাদ বালি ও ওস্তাদ মঞ্জু সাহেবের কাছে কলিকাতায় রাগসঙ্গীতের পাঠ গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালে কলিকাতায় আয়োজিত অল বেঙ্গল মিউজিক কমপিটিশনে ঠুংরি (দ্র) ও গজল (দ্র) গানে প্রথম স্থান অধিকার করে আবদুল আহাদ সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। সে সময় তিনি কলিকাতা বেতারকেন্দ্র থেকেও গান গাওয়ার জন্য মনোনয়ন লাভ করেন। ১৯৩৮ সালে সরকারি বৃত্তি নিয়ে আবদুল আহাদ শান্তিনিকেতনে

রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাঠ গ্রহণ করতে যান ও সেখানে চার বছর শিক্ষাগ্রহণ করে স্নাতক হন। এ দেশের মুসলমান সমাজে সঙ্গীতশিক্ষা তখন তেমন প্রচলিত ছিল না। আবদুল আহাদই প্রথম মুসলমান শিল্পী যিনি রবীন্দ্রনাথের (দ্র) জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতশিক্ষা লাভ করেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতাচার্য শান্তিদেব ঘোষ ও শৈলজারঞ্জন মজুমদার তাঁর সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন। ১৯৪১ সালে আবদুল আহাদ প্রশিক্ষক হিসাবে এইচ এম ভি (হিজ মাস্টার্স ভয়েস) রেকর্ড কোম্পানিতে যোগদান করেন। পঙ্কজকুমার মল্লিক (দ্র) ও হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের (দ্র) মতো শিল্পীরা তাঁর প্রশিক্ষণে রবীন্দ্রসঙ্গীত (দ্র) রেকর্ড করেছেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা (দ্র) চলে আসেন ও ঢাকা বেতারে সুরকার ও প্রযোজক হিসাবে যোগ দেন। সুরকার, প্রশিক্ষক ও সংগঠক হিসাবে আবদুল আহাদ উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশে আধুনিক ও দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গীতভিত্তিটি তাঁর হাতেই রচিত হয়।

আবদুল আহাদ সঙ্গীতদল নিয়ে বহু দেশ ভ্রমণ করেন। স্পেন সরকারের বৃত্তিতে তিনি মাদ্রিদে এক বছর থেকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতচর্চা করেন। সঙ্গীতে অনন্য অবদানের জন্য আবদুল আহাদ নানা পুরস্কার ও ফেলোশিপে ভূষিত হন। তাঁর সুর করা গানের সংখ্যা কয়েক হাজার।

ক. গো.

আবদুল ওদুদ, কাজী কাজী আবদুল ওদুদ দ্র

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ [১৮৬১—১৯৫৩]

আবদুল করিম ১৮৬১ সালের ১১ই অক্টোবর চট্টগ্রামের (দ্র) সুচক্রদণ্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৮৯৫ সাল অবধি ঐ অঞ্চলের একমাত্র এফ. এ (ফার্স্ট আর্টস্, এখনকার এইচ.এস.সি.-র সমতুল্য) পড়ুয়া ছাত্র ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মুনসী নুরউদ্দীন।

তিনি সীতাকুণ্ড মধ্য ইংরেজি স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন ১৮৯৫-৯৬ সালে। ১৮৯৬-৯৭ সালে জজ আদালতে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে এবং ১৮৯৮ সালে কমিশনার অফিসে ক্লার্ক হিসাবে কাজ করেন। ১৮৯৯–১৯০৫ সাল পর্যন্ত তিনি আনোয়ারা মধ্য ইংরেজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এর পর ১৯০৬-৩৪ সাল পর্যন্ত বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর অফিসে কর্মচারি ছিলেন। সার্টিফিকেট অনুসারে ৫৬ বছর বয়সে কিন্তু বাস্তবে ৬৫ বছর বয়সে তিনি অবসর নেন।

আবদুল করিম চারটি পত্রিকার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সাহিত্য-খ্যাতিই তাঁর এই সম্মান লাভের কারণ। সৈয়দ এমদাদ আলি প্রকাশিত ও সম্পাদিত 'নবনূর' (১৯০৩), মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (দ্র) প্রকাশিত ও সম্পাদিত 'সওগাত' (১৯১৮), এয়াকুব আলি চৌধুরী প্রকাশিত ও সম্পাদিত 'কোহিনূর' (১৩০৯), মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী (দ্র) প্রকাশিত ও সম্পাদিত 'সাধনা' (১৩২৭) এবং 'পূজারী' নামের একটি পত্রিকারও প্রধান সম্পাদক ছিলেন তিনি।

তিনি মধ্যযুগের হিন্দু–মুসলমান সাহিত্য-সাধকদের পাণ্ডুলিপি (দ্র) সংগ্রহ করে বাংলার ইতিহাসের এক অনালোচিত অধ্যায়কে কালের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন। তাঁর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলো তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) পাণ্ডুলিপি শাখায় দান করেন। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগ্রহ না করলে মধ্যযুগের সাহিত্যে মসুলমানদের অবদান সম্বন্ধে সামান্যই জানা যেত।

আবদুল করিম সম্পাদিত ও রচিত গ্রন্থাবলি : 'রাধিকার মানভঙ্গ', 'সত্যনারায়ণের পুঁথি', 'মৃগলুব্ধ', 'গোরক্ষবিজয়', 'পদ্মাবতী' (খণ্ডাংশ) ও অন্যান্য। তাঁর সঙ্কলিত ও রচিত গ্রন্থ : 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা (১৩২১ ব.); 'পুথি পরিচিতি' (আহমদ শরীফ সম্পাদিত ও বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত : ১৯৫৮); 'ইসলামাবাদ' (সৈয়দ মুর্তাজা আলী সম্পাদিত : ১৯৬৪) ও 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' (মুহম্মদ এনামুল হকের [দ্র] সহযোগিতায় রচিত)।

১৯৫৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হা.

আবদুল কাদির [১৯০৬—১৯৮৪]

কবি, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক ও ছান্দসিক। তিনি ১৯০৬ সালের ১লা জুন কুমিল্লা জেলার আড়াইসিদ্ধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

আবদুল কাদির ১৯২৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা মডেল হাইস্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিক ও ১৯২৫ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই. এসসি. পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) বি. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন করলেও চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন নি। ১৯২৬ সালে কলিকাতায় (দ্র) 'সওগাত' পত্রিকা সম্পাদনার (দ্র) দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনস্থ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩০ সালেই তিনি 'জয়তী' নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। ১৯৩৭ সালে সাপ্তাহিক 'নবশক্তি', ১৯৩৮ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকা এবং ১৯৪২ সালে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের (দ্র) 'নবযুগ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের(দ্র) শেষের দিকে ভারত সরকারের ফিল্ড পাবলিসিটি বিভাগে বাংলা অনুবাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

আবদুল কাদির ১৯৪৬ সালে সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' (দ্র) ও অর্ধ-সাপ্তাহিক 'পয়গাম' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে চলে আসেন। ১৯৫২ সালে ঢাকায় (দ্র) 'মাহে-নও' (দ্র) পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন কালেই ১৯৬৪ সালে তিনি কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে প্রকাশনা অফিসার হিসাবে যোগদান করেন। মাসিক 'মাহে-নও' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি এ দেশের বহু কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ ও তাঁদের প্রতিভার বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে (দ্র) তাঁর চাকুরিজীবনও ছিল বর্ণাঢ্যতায় উজ্জ্বল। ১৯৭০ সালের ১লা জুন তিনি সরকারি চাকুরিজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

এ দেশের পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে নবজাগরণের লক্ষ্য থেকে ১৯২৬ সালে ঢাকায় 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' (দ্র) নামে যে সাহিত্যিক আন্দোলনের সূচনা করা হয়, উদার মানবতাবাদী চিন্তার অধিকারী আবদুল কাদির তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে শুধু জড়িতই ছিলেন না, ছিলেন এর উদ্যোক্তাদের অন্যতম এবং এই আন্দোলনের মুখপত্র 'শিখা'র ছিলেন প্রকাশক ও নিয়মিত লেখকবৃন্দের অন্যতম।

আবদুল কাদির রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কবিতা : 'দিলরুবা' (১৯৩৩) ও 'উত্তরবসন্ত' (১৯৬৭); প্রবন্ধ : 'কবি নজরুল' (১৯৭০), 'ছন্দ সমীক্ষণ' (১৯৭৯) ও 'লোকায়ত সাহিত্য' (১৯৮৫); সম্পাদিত গ্রন্থ : 'কাব্য মালঞ্চ', 'সনেট শতক' (১৩৮০ ব.), 'নজরুল রচনাবলী' (প্রথম থেকে পঞ্চম খণ্ড), 'রোকেয়া-রচনাবলী' (১৯৭৩), 'শিরাজী রচনাবলী' (১৯৬৭), 'লুতফর রহমান রচনাবলী' (১৯৭২), 'এয়াকুব আলী চৌধুরীর রচনাবলী' (১৯৬৩) ইত্যাদি।

সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য যেসব পুরস্কার তিনি লাভ করেন, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কবিতায় 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' (১৯৬৩), 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার' (১৯৬৭), 'একুশে পদক' (১৯৭৬), 'নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক' (১৯৭৭), 'কুমিল্লা ফাউণ্ডেশন স্বর্ণপদক' ও 'মুক্তধারা পুরস্কার'।

সম্পাদক হিসাবে আবদুল কাদির সমধিক খ্যাত হলেও তাঁর কবিত্বশক্তি কোনোক্রমেই গৌণ নয়। সনেট রচনায় তাঁর সিদ্ধি উল্লেখ করবার মতো। ছন্দবিশেষজ্ঞ হিসাবেও তাঁর পরিচিতি সুবিদিত।

আবদুল কাদির ১৯৮৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

আবদুল কাদির জিলানী [১০৭৭-১১৬৬]

আবদুল কাদির জিলানী বিখ্যাত সুফি সাধক ও ইসলাম ধর্মশাস্ত্রবিদ। তাঁর জন্ম ইরাকের জিলান জেলার নীফ গ্রামে, ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে (দ্র)। নিজ জেলার নাম অনুসারে তাঁর নামের শেষে 'জিলানী' ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে তিনি 'বড়পীর' নামেই সমধিক পরিচিত।

অল্প বয়সেই তিনি ইসলাম ধর্ম (দ্র) সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন শুরু করেন এবং এ বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি এই পথেই সুফিবাদ (দ্র) বা গভীর তত্ত্বজ্ঞানে সাফল্য লাভ করেন।

ইসলাম প্রচারে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। তিনি অক্লান্তভাবে এই প্রচারকাজে আত্মনিয়োগ করেন। ধর্ম (দ্র) সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান এবং অসাধারণ বাগ্মিতার কারণে শত শত লোক মুগ্ধ হয়ে তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করত।

হযরত আবদুল কাদির জিলানীকে ঘিরে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনি হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর দৌহিত্র হযরত হাসান (রা.) (দ্র)-র অধস্তন বংশধর বলেও দাবি করা হয়।

ইসলাম ও সুফিবাদ সম্পর্কে তাঁর যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, তার প্রতিফলন রয়েছে তাঁর রচিত বিভিন্ন পুস্তকে। এগুলো অধিকাংশই ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতার সঙ্কলন। তাঁর রচিত নয়টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

'বড়পীর' হযরত আবদুল কাদির জিলানী ১১৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তাঁর স্মরণে অদ্যাবধি ফাতেহা-ই-ইয়াজ্‌দাহাম (দ্র) পালিত হয়ে থাকে।

মু. মা.

আবদুল গনি হাজারী [১৯২১—১৯৭৬]

আবদুল গনি হাজারীর জন্ম ১২ই জানুয়ারি ১৯২১ (২৮শে পৌষ ১৩২৮ ব.) গ্রাম–নয়াগ্রাম, থানা–সুজানগর, জেলা পাবনা। পিতা ইজ্জতুল্লাহ হাজারী, মা জাগিরণ বিবি।

আবদুল গনি হাজারী ছিলেন একাধারে কবি, সাংবাদিক, সংবাদপত্রশিল্প-ব্যবস্থাপক ও মুদ্রণশিল্পী-বিশেষজ্ঞ। উদয়পুর প্রাইমারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর তিনি খলিলপুর হাই স্কুলে পড়াশোনা করেন। ফরিদপুরের হাবাশপুর হাই স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। অতঃপর তিনি ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে (দ্র) ভর্তি হন এবং সেখান থেকে দর্শনশাস্ত্রে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে কিছু দিন এম. এ. পড়লেও শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দেন নি। তিনি সমাজবিজ্ঞান বিষয়েও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু দিন পড়াশোনা ও গবেষণা করেন।

আবদুল গনি হাজারী ছাত্রজীবন থেকেই নিজের দেশ, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে সচেতন ছিলেন। কলিকাতা থেকেই তিনি প্রথম সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আলোড়ন' সম্পাদনা করেন। পরবর্তী কালে তিনি ঢাকা (দ্র) থেকে 'চন্দ্রবিন্দু', ১৯৫০ সালে মাসিক 'মুক্তি' ও ইংরেজি ত্রৈমাসিক 'The Republic', ১৯৬৫-৬৮ সালে পাকিস্তান লেখকসংঘের পত্রিকা 'পরিক্রম' সম্পাদনা করেন।

ভারতবর্ষ বিভাগের পর ১৯৪৭ সাল থেকেই তিনি ঢাকার সাহিত্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫৪ সালে ঢাকায় যে পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্যসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তিনি ছিলেন তার অভ্যর্থনা কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক।

আবদুল গনি হাজারী ঢাকায় কর্মজীবন শুরু করেন জুবিলি প্রেসের সহকারী ম্যানেজার হিসাবে, ১৯৪৮ সালে। তিনি ১৯৪৯ সালে দৈনিক 'দ্য পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকার সহকারী বিজ্ঞাপন-ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৯৫০-৫১ সালে হন এ পত্রিকার প্রেস ম্যানেজার। ১৯৫১ সালে তিনি দৈনিক 'সংবাদ'-এর সহকারী জেনারেল ম্যানেজার ও সাহিত্য সাময়িকী বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিছু দিন পর তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কর্মস্থল 'দ্য পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকায় ফিরে যান। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি এ পত্রিকাগোষ্ঠীর (অবজারভার, সাপ্তাহিক পূর্বদেশ ও চিত্রালী) ব্যবস্থাপনাসম্পাদক হিসাবে

কাজ করেন। 'দৈনিক পূর্বদেশ' পত্রিকায় তিনি 'বকলম' ছদ্মনামে 'কালপেঁচার ডায়েরী' উপসম্পাদকীয় লিখে সুনাম অর্জন করেন।

বাংলাদেশ (দ্র) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সংবাদপত্রশিল্পে বিরাট অভিজ্ঞতার অধিকারী হাজারীর দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। তিনি ১৯৭২ সালে 'দৈনিক আজাদ'-এর এবং অবজারভার গ্রুপের পত্রিকাসমূহের প্রশাসক নিযুক্ত হন। ১৯৭৪ সালে তিনি সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনাবোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৭৬ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই বহাল ছিলেন। সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রশিল্পের জগতের বাইরেও তিনি নানান সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। ঢাকায় চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউট (দ্র) ও ডায়াবেটিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কাজে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তিনি জাতীয় যক্ষ্মাসমিতির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

আবদুল গনি হাজারীর বড় পরিচয় এক জন সমাজমনস্ক, তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কবি হিসাবে। সমাজের ক্ষয়িষ্ণুতা ও দিন দিন মানুষের স্খলন তিনি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল— কবিতা : 'সামান্য ধন' (আনু. ১৯৫৯), 'সূর্যের সিঁড়ি (১৯৬৫), 'জাগ্রত প্রদীপে' (১৯৭০); রম্য রচনা : 'কালপেঁচার ডায়েরী' (১৯৭৬); অনুবাদ : 'স্বর্ণগর্দভ' (১৯৬৪), 'মনঃসমীক্ষা' (১৯৭৫)। তিনি 'কতিপয় আমলার স্ত্রী' নামক দীর্ঘ কবিতার জন্য বিশেষভাবে প্রশংসিত হন। ১৯৬৪ সালে এ কবিতা ইউনেস্কোর পি.ই.এন. পুরস্কার লাভ করে। তিনি ১৯৭২ সালে কবিতা রচনায় বিশেষ অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী (দ্র) পুরস্কার পান। সৃজনশীল সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি তিনি প্রচুর অনুবাদও করেছেন।

আবদুল গনি হাজারী ১৯৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় মারা যান।

শ. আ.

আবদুল জব্বার (শহীদ) [? —১৯৫২]

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের (দ্র) অন্যতম শহীদ। জন্ম বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও থানাধীন পাঁচুয়া গ্রামে। পিতার নাম আবদুল কাদের। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স আনুমানিক ২৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ছিল; পেশা গৃহস্থালি (সরকারি ভাষ্যমতে পেশায় দর্জি)।

কৃষক যুবা আবদুল জব্বার মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের বিশ নম্বর শেডের আট নম্বর কক্ষের গফরগাঁও নিবাসী এক ছাত্রের পরিচয়সূত্রে হাসপাতালে রোগী দেখাশোনা করতে সেখানে আসেন। একুশে ফেব্রুয়ারি দুপুরে ছাত্র–পুলিশের সংঘর্ষের সময় ঐ কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার পর পুলিশের গুলিতে আহত হন। হাসপাতালে নেবার পর কোনো চিকিৎসা দেবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর লাশ সম্ভবত আজিমপুর গোরস্থানেই দাফন করা হয়, কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য জানা যায় না।

আ. র.

আবদুল জব্বার খাঁ [১৯১৬—১৯৯৩]

বাংলাদেশের (দ্র) চলচ্চিত্রশিল্পের জনক। ১৯১৬ সালে বৃহত্তর ঢাকায় (দ্র) বিক্রমপুরের লৌহজং থানার মসদগাঁও গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

আবদুল জব্বার খাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনকালের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁর ব্যবসায়ী পিতার কর্মস্থল আসামের ধুবড়িতে অতিবাহিত হয়। এখানকার এক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪১ সালে ঢাকার আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল থেকে তিনি ডিপ্লোমা নিয়ে চাকুরিজীবনে প্রবেশ করেন।

আসামের ধুবড়িতে অবস্থানকালেই আবদুল জব্বার খাঁ চলচ্চিত্র (দ্র) ও নাট্যাভিনয় এবং নাটক (দ্র) পরিচালনার প্রতি আকৃষ্ট হন। বিখ্যাত বাঙালি চলচ্চিত্রাভিনেতা ও পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার (দ্র) অন্তরঙ্গ সাহচর্যও লাভ করেন তিনি। ধুবড়িতে 'সতী তীর্থ' ও 'মাটির ঘর' নামের দু'টি নাটকে অভিনয় করে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং অহমিয়া ভাষাতে নাটকও পরিচালনা করেন।

১৯৪৮ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ (দ্র) প্রথম বারের

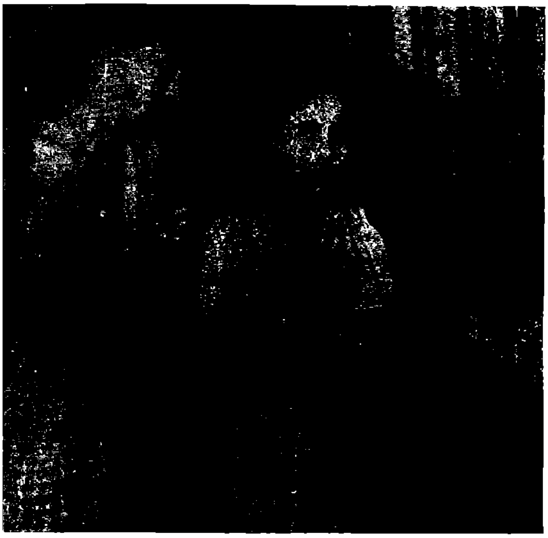

'মুখ ও মুখোশ' চিত্রের দু'টি দৃশ্য।
উপরে : সাইফুদ্দিন ও বিলকিস্ বারী।
নিচে : ভবেশ মুখার্জী, নূরুল আনাম খান ও আলী মনসুর

মতো ঢাকায় আসেন। সেই সময় আসাম সরকার প্রেরিত প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হিসাবে তিনিও সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসামে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের অনুপ্রবেশ রোধের প্রস্তাব নিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন। কিন্তু প্রতিনিধিত্ব শেষে আসামে ফিরে যাওয়ার পর স্থানীয় সরকার তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তান আন্দোলনকে (দ্র) সমর্থন করাসহ ১৪টি অভিযোগে মামলা দায়ের করলে তিনি ঢাকায়

ইংরেজি দৈনিকে 'মুখ ও মুখোশ'
ছবির বিজ্ঞাপন—২ আগস্ট ১৯৫৬

চলে আসেন।

এখানে এসে তিনি নাটক রচনা ও পরিচালনায় মনোনিবেশ করেন এবং গড়ে তোলেন 'কমলাপুর ড্রামাটিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি নাট্যসংস্থা। তাঁর রচিত ও পরিচালিত নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ঈশা খাঁ' (১৯৫৩), 'জাগলো দেশ' (১৯৫১), 'প্রতিজ্ঞা' (১৯৫১) এবং 'ডাকাত' (১৯৫৩)।

সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্ভব নয়—তৎকালীন পাকিস্তানের উর্ধ্বতন সরকারি কর্তৃপক্ষের এই ধরনের প্রতিকূল মনোভাবের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে আবদুল জব্বার খাঁ সম্পূর্ণ এ দেশীয় শিল্পী, কলাকুশলী ও সীমিত সুযোগ-সুবিধা সম্বল করে তাঁর রচিত 'ডাকাত' নাটকের কাহিনী অবলম্বনে এ দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র 'মুখ ও মুখোশ' নির্মাণ করেন, যা মুক্তি পায় ১৯৫৬ সালে। (কাহিনীটি পরে উপন্যাস আকারেও ছাপা হয়েছিল)। এই চলচ্চিত্র নির্মাণকৃতিত্বের সুবাদেই তিনি দেশের চলচ্চিত্রের

জনকের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। এর পর তিনি বেশ কয়েকটি বাংলা ও উর্দু চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম 'জোয়ার এলো' '(১৯৬২), 'বাঁশরী' (১৯৬২). 'নাচঘর' (১৯৬৩), 'কাচকাটা হীরে' (১৯৭০) ও 'খেলাঘর' (১৯৭৩)। তিনি দেশের প্রথম চলচ্চিত্র স্টুডিও এফ ডি সি (FDC = Film Development Corporation). (দ্র) সহ বেশ ক'টি বেসরকারি চলচ্চিত্র স্টুডিও নির্মাণেও গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন।

আবদুল জব্বার খাঁ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি মুজিবনগর (দ্র) সরকারের চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। দেশের বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের (দ্র) 'স্টপ জেনোসাইড' (Stop Genocide) চলচ্চিত্র তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তাঁর অধীনস্থ দফতরের প্রযোজনাতেই নির্মিত হয়।

তিনি চলচ্চিত্র ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু দেশ সফর করেন। তাঁর উদ্যোগে ও মালিকানায় দেশে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র প্রেক্ষাগৃহও গড়ে ওঠে। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে তিনি এফ ডি সি-র উপদেষ্টা কমিটি, চলচ্চিত্র জুরি ও ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের এপিলেট বোর্ডসহ জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা সংক্রান্ত কমিটির মতো সংস্থারও শীর্ষপদে অধিষ্ঠিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন।

আবদুল জব্বার খাঁ বহু জনহিতকর ও সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানেরও শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা ছিলেন। এ দেশে প্রথম লিও ক্লাব প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব তাঁরই।

চলচ্চিত্রে সার্বিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৮৩ সালে এফ ডি সি রজতজয়ন্তী পুরস্কারসহ আরো কিছু পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর সম্মানার্থে এফ ডি সি-তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'আবদুল জব্বার খান পাঠাগার' নামে একটি গ্রন্থাগার।

১৯৯৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

আবদুল লতিফ, নওয়াব [১৮২৮—১৮৯৩]

আবদুল লতিফের জন্ম ১৮২৮ সালে কলিকাতায় (দ্র)। তাঁর পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার বারোখাদিয়া গ্রামে, সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে।

ব্রিটিশ ভারতে যে ক'জন মুসলিম নেতা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে ইংরেজ শাসকমহলের কাছাকাছি আসেন এবং মুসলমানদের কল্যাণে নানা অবদান রাখতে সক্ষম হন, নওয়াব আবদুল লতিফ তাঁদের অন্যতম। তিনি উপলব্ধি করেন, ইংরেজি ও ইংরেজ বর্জন তথা ব্রিটিশদের সঙ্গে অসহযোগিতামূলক মনোভাবে কোনো কল্যাণ হবে না। এই মনোভাবই আবদুল লতিফের ইংরেজি শিক্ষা ও ব্রিটিশের অধীনে চাকুরি গ্রহণের মূল কারণ।

তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। সেখানে তিনি আরবি (দ্র), ফার্সি ও ইংরেজি ভাষায় (দ্র) প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

শিক্ষা-শেষে কর্মজীবনের প্রথমে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। এর পর নিজ বিদ্যাপীঠ কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৪৯ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে যোগদান করেন। এর পর তিনি একাদিক্রমে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার 'শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা হাকিম', সাতক্ষীরার মহকুমা হাকিম, জাহানাবাদের মহকুমা হাকিম, আলিপুর পুলিশ কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, শিয়ালদহ পুলিশ কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি পদে অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

নওয়াব আবদুল লতিফ প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এ ছাড়া মুসলিম বিবাহ রেজিস্টার আইন তাঁরই চেষ্টা ও উদ্যোগের ফলে পাস হয়। তিনি নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অনীহা দূর

করার উদ্দেশ্যে তাঁরই একক প্রচেষ্টায় গঠিত হয় 'মহামেডান লিটারারি সোসাইটি' বা মুসলমান সাহিত্য সমিতি।

ইংরেজ শাসকমহল আবদুল লতিফকে একাধিক খেতাবে ভূষিত করে। এর মধ্যে আছে—নওয়াব (১৮৮০), সি. আই. ই. (Companion of the Order of the Indian Empire : ১৮৮৩) ও নওয়াব বাহাদুর (১৮৮৭)।

তিনি অমুসলমানদের জন্যও নানা হিতকর কাজ করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির (দ্র) সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৯৩ সালের ১০ই জুলাই কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

মু. মা.

আবদুল হাই, মুহম্মদ [১৯১৯—১৯৬৯]

মুহম্মদ আবদুল হাই একজন ধ্বনিবিজ্ঞানী, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও উচ্চমানের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর পুরো নাম আবুল বশার মুহম্মদ আবদুল হাই। ১৯১৯ সালের ২৬শে নভেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার রানীনগর থানার মরিচা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আবদুল গনি, মায়ের নাম ময়মুন্নিসা। তিনি ছিলেন পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তান।

বাল্যকাল থেকেই মুহম্মদ আবদুল হাই ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ বাড়িতেই সমাপ্ত করেন। তারপর গ্রামের নিকটবর্তী বর্ধনপুর জুনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯৩২ সালে রাজশাহী হাই মাদ্রাসায় পড়তে যান। এই মাদ্রাসায় ছিলেন এক জন সাহিত্যগতপ্রাণ শিক্ষক। তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে মুহম্মদ আবদুল হাই সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন। ১৯৩৬ সালে উচ্চ মাদ্রাসা পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ইংরেজিতে অনার্স পড়ার ইচ্ছে থাকলেও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহই বাংলা সাহিত্যে (দ্র) অনার্স পড়ার জন্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন। ১৯৪১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে অনার্স পাশ করেন। এম. এ. পরীক্ষায় (১৯৪২) আরো ভাল করেন, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ছাত্রজীবনে বিতর্ক, বক্তৃতা ও অভিনয় করতেন।

মুহম্মদ আবদুল হাই শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ঢাকা সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজ তাঁর প্রাথমিক কর্মক্ষেত্র ছিল। দেশবিভাগ হলে ১৯৪৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তিনি রাজশাহী সরকারি কলেজে বাংলার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালের ২রা মার্চ সরকারি চাকুরি ইস্তফা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন। আজীবন তিনি এই বিভাগে কর্মরত ছিলেন। ১৯৫০ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বর তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইংল্যাণ্ডে যান। লণ্ডনের (দ্র) স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্ট্যাডিজ (SOAS)-এ তিনি ভাষাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। তাঁর এম.এ.র থিসিসের নাম ছিল 'A Phonetic and Phonological Study of Nasals ad Nasalization in Bengali'. এটা ধ্বনিবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম স্তরের কাজ। ১৯৫৩ সালে তিনি ভাষাবিজ্ঞানে সম্মানের সঙ্গে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

তিনি বিলাতে অবস্থানকালে তাঁর অভিজ্ঞতা লিখে রেখেছেন। 'বিলেতে সাড়ে সাত শ দিন' (১৯৫৮) বইতে সরস ভঙ্গিতে তিনি তাঁর জ্ঞান অর্জনের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। বইটি বহুল পরিচিত।

বিদেশ থেকে ফিরে এসে মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা ভাষার (দ্র) গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা বিভাগকে আধুনিকীকরণের উদ্যোগও গ্রহণ করেন। তিনি 'সাহিত্যপত্রিকা' নামের উন্নতমানের গবেষণাপত্রিকার সম্পাদনার (দ্র) দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলা বিভাগে পড়াশোনার মান বৃদ্ধি করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক অনুসন্ধান করে তিনি বাংলা বিভাগে তাঁদের চাকুরির ব্যবস্থা করেন। তাঁর অধ্যক্ষতায় বাংলা বিভাগ একটি প্রধান বিভাগ হিসাবে গড়ে ওঠে। তাঁর সংগঠনশক্তি ছিল অপরিমিত। তাঁর গুণের স্বীকৃতি হিসাবে তাঁর মৃত্যুর

পর তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা যে স্মরণিকা প্রকাশ করেন তার নাম দেওয়া হয় 'প্রথম দিনের সূর্য'। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রথম দিনের সূর্যের মতো অন্ধকার দূর করে আলো আনার সাধনা করেছেন।

মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা ভাষার প্রচলিত বিশ্লেষণ থেকে সরে এসে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে মনোযোগ দেন। তাঁর 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' (১৯৬৪) বইটি বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের সূচনা করেছে এ দেশে। এ ছাড়াও 'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা', (১৯৫৯) 'ভাষা ও সাহিত্য' (১৯৬০) শীর্ষক তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থ আছে। সাহিত্যসমালোচক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল।

মুহম্মদ আবদুল হাই ইসলাম ধর্মের (দ্র) আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা পছন্দ করতেন। সে জন্য মানবেন্দ্রনাথ রায় (দ্র) রচিত "The Historical Role of Islam' তিনি বাংলা ভাষায় 'ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান' (১৯৪৯) নামে অনুবাদ করেন।

মুহম্মদ আবদুল হাই রবীন্দ্রসাহিত্য পড়াতেন, রবীন্দ্রনাথকে (দ্র) শ্রদ্ধা করতেন মনেপ্রাণে। তাঁর 'ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ' একটি মূল্যবান প্রবন্ধ।

বাংলা বিভাগের প্রধান হিসাবে, ভাষাবিজ্ঞানী হিসাবে তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি ইংরেজিতেও প্রবন্ধ লিখেছেন। বিদেশের পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত 'Bengali Language Handbook' (১৯৬৬) গ্রন্থের তিনি অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের উপভাষা, ঢাকার উপভাষা সম্বন্ধে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন।

তিনি সহকর্মী ও পণ্ডিত জনের সঙ্গে মিলেমিশে অনেক গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় জন বলের সঙ্গে তিনি একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বইটির নাম' 'The Sound Structures of English and Bengali' (১৯৬০)। কবি-অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছেন 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১৯৫৬)। আনোয়ার পাশার (দ্র) সঙ্গে প্রকাশ করেছেন 'কালকেতু'সহ আরো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ।

মুহম্মদ আবুদল হাই বিদ্বান হিসাবে যেমন ছিলেন উঁচুদরের, তেমনি মানুষ হিসাবেও ছিলেন অমায়িক। তাঁর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগুলো ভাষা, সাহিত্য ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লেখা। জ্ঞানের উন্নয়ন ও প্রসারে তিনি ছিলেন অক্লান্ত। বাংলা বানান সংস্কারের বিপক্ষে ছিলেন তিনি, বিপক্ষে ছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্য বর্জনের সরকারি প্রচেষ্টার। এ ধরনের কাজকে তিনি অবিবেচকের কাজ মনে করতেন। তিনি গবেষণার জন্য ১৯৬১ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

এই কর্মনিষ্ঠ রাশভারি মানুষটির মৃত্যু ঘটে আকস্মিকভাবে। ১৯৬৯ সালের ৩রা জুন মঙ্গলবার তিনি ঢাকার খিলগাঁয়ে ট্রেনের তলায় পিষ্ট হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন।

ম. মু.

আবদুল হাকিম [আনু. ১৬২০—আনু. ১৬৯০]

জন্মের কাল আনুমানিক ১৬২০ খ্রিস্টাব্দ। জন্ম সন্দ্বীপের সুধারামে। তাঁর পিতার নাম শাহ্ আবদুর রাজ্জাক। আবদুল হাকিমের অনেকগুলো কাব্যগ্রন্থ আছে। যেমন— 'ইউসুফ জলিখা', 'লালমতী–সয়ফুল্‌মুলক্', 'শিহাবুদ্দীন নামা', 'নূর-নামা', 'নসীহৎ-নামা' প্রভৃতি। এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে লালমতী-সয়ফুল্‌মুলক্ কাব্যখানি উনিশ শতকের শেষভাগে কলিকাতা (দ্র) থেকে বটতলার পুঁথি (দ্র) হিসাবে ছাপা হয়েছিল এবং বেশ প্রচার লাভ করেছিল। তিনি আনুমানিক ১৬৯০ সালে মারা যান।

আ. হা.

আবদুল্লাহ ইব্‌নে আবদুল মুত্তালিব [৫৪৫–৫৭০]

মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)–এর পিতা। মক্কার (দ্র) কুরাইশ বংশের অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ২৪ বছর বয়সে যুহরি গোত্রের সরদার ওহাবের কন্যা আমিনার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে (মহানবীর জন্মের তিন মাস পূর্বে) ইয়াস্‌রিব

(মদিনা) শহরে খেজুর ক্রয় করতে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর।

মো. ই.

আবদুস সালাম [১৯১০—১৯৭৭]

জন্ম ১৯১০ সালে ফেনীর অন্তর্গত ছাগলনাইয়ার ধর্মপুর গ্রামে। নির্ভীক ও আপসহীন সাংবাদিক হিসাবে তিনি আমাদের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। মেধাবী ছাত্র আবদুস সালাম ১৯২৬ সালে ফেনী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯২৮ সালে আই.এসসি. পাশ করেন চট্টগ্রাম কলেজ থেকে। ১৯৩১ সালে কলিকাতার (দ্র) প্রেসিডেন্সি কলেজ (দ্র) থেকে ইংরেজিতে বি.এ. (অনার্স) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে ১৯৩২ সালে ইংরেজিতে এম.এ. ডিগ্রি পান প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

আবদুস সালাম তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন নিজের এলাকাতেই। তিনি শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পরপরই ফেনী কলেজের ইংরেজির প্রভাষক হিসাবে যোগ দেন। কিন্তু

শিশুদের এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আবদুস সালাম ;
কবি সুফিয়া কামালকেও এই অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে

বেশি দিন অধ্যাপনায় না থেকে তিনি সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেন। আবদুস সালাম আয়কর বিভাগ, সিভিল সাপ্লাই দফতর এবং অডিট অ্যাণ্ড একাউন্ট্স্ সার্ভিসে কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু সরকারি চাকুরিও তাঁর বেশি দিন ভাল লাগে নি।

তিনি ১৯৪৯ সালে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে যোগদান করেন হামিদুল হক চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত দৈনিক Pakistan Observer-এর সম্পাদকীয় বিভাগে। ১৯৫০ সালের ৩রা জুন তিনি এই দৈনিকের সম্পাদক হন। কিন্তু দু' বছরের মধ্যেই ঘটল মহা অঘটন। ১৯৫২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার সমর্থনে এবং ভাষার প্রশ্নে সরকারি নীতির বিরোধিতা করে অবজারভারে জোরালো ভাষায় প্রকাশিত হয় এক সম্পাদকীয়। বাংলা ভাষা (দ্র) -বিদ্বেষী পাকিস্তান সরকার এই কঠিন মন্তব্যের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ঐ দিনই পাকিস্তান অবজারভারের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে দেয়। উপরন্তু পরের দিন ১৩ই ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার করা হয় আবদুস সালামকে। কারামুক্তির পর তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের মার্চে যুক্তফ্রন্টের (দ্র) মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে পাকিস্তান অবজারভার পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দিলে রাজনৈতিক মঞ্চ ছেড়ে তিনি আবার প্রবেশ করেন একই দৈনিকের সম্পাদকের বিভাগে।

আবদুস সালাম ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সংবাদপত্র-সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ছিলেন। এ সময় দেশে আইয়ুব সরকারের কুখ্যাত 'প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স অ্যাক্ট' স্বাধীন সাংবাদিকতার কণ্ঠরোধ করে রেখেছিল। আবদুস সালাম এই কালাকানুন বাতিলের দাবিতে পরিচালিত আন্দোলনে সক্রিয় ও সাহসী ভূমিকা নেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে তিনি পাকিস্তান অবজারভার সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। এই পদত্যাগের কারণ তখনকার সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ। এর পর প্রধানত বাংলাদেশ টাইমস পত্রিকায় নিয়মিত লেখার মাধ্যমেই সংবাদপত্রের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র বজায় থাকে। আবদুস সালাম বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের

(দ্র) প্রথম মহাপরিচালক। তিনি অবজারভারের সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করেন দীর্ঘ ২২ বছর। ষাটের দশকে আইয়ুব খানের (দ্র) লেখা বই 'প্রভু নয়, বন্ধু' প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে তখনকার পূর্ব-পাকিস্তানের অবস্থার প্রকৃত প্রতিফলন না ঘটায় আবদুস সালাম জোরালো ভাষায় এর প্রতিবাদ জানান। কেবল সাংবাদিকতাই নয়, সাহিত্যের প্রতিও তিনি বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন। সাংবাদিকতায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৬ সালে আবদুস সালামকে 'একুশে পদক' প্রদান করা হয়।

১৯৭৭ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকায় শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আ. কা.

আবদুস সালাম (শহীদ) [১৯২৫—১৯৫২]

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের (দ্র) অন্যতম শহীদ। জন্ম বর্তমান ফেনী জেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামে, ১৯২৫ সালে। পিতা মোহাম্মদ ফাজিল মিয়া। আবদুস সালাম ছিলেন পূর্ববঙ্গ সরকারের শিল্প-অধিদপ্তরের একজন পিওন। কর্মস্থান সেক্রেটারিয়েট (সেকালে বলা হত ইডেন বিল্ডিংস); বাসস্থান ঢাকায় ৩৬-বি নীলক্ষেত ব্যারাক।

তিনি একুশে ফেব্রুয়ারি দুপুরে মেডিক্যাল কলেজের সামনে পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ৭ই এপ্রিল (১৯৫২) ঐ হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তাঁকে কোথায় দাফন করা হয়েছিল সে সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায় না।

আ. র.

আবদুস সালাম [১৯২৬—   ]

পদার্থবিজ্ঞানী। জন্ম ১৯২৬ সালের ২৯শে জানুয়ারি পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের ঝাং শহরে। পাঞ্জাবে পড়াশোনা শেষে বৃত্তি নিয়ে কেম্ব্রিজে পড়তে যান। সেখানে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। পরে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। দুই অংশ বিশিষ্ট নিউট্রিনো তত্ত্ব এবং ক্ষীণ বিক্রিয়ায় প্যারিটি-লঙ্ঘন; ক্ষীণ ও বিদ্যুৎ-চৌম্বক পরিমাপ একত্রীকরণ; ক্ষীণ আধানহীন প্রবাহ এবং 'ডব্লিউ' ও 'জেড' কণার ভবিষ্যদ্বাণী; মৌলিক কণার প্রতিসাম্য; পুনঃ সাধারণীকরণ তত্ত্ব; অভিকর্ষ তত্ত্ব প্রভৃতির জন্য পদার্থবিজ্ঞানে আবদুস সালামের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বস্তুজগতে চারটি বলের (দ্র) মিথস্ক্রিয়া লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে ক্ষীণ বল ও বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল যে একই ক্ষীণ-

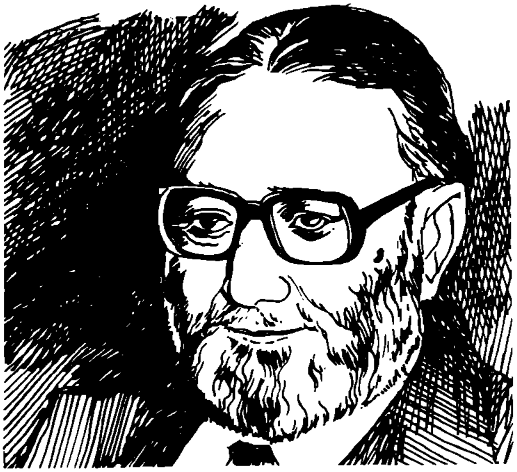

বিদ্যুৎ বলের দুটো প্রকাশ তা প্রথম জানা যায় সালাম-ভাইনবার্গের যৌথ গবেষণা ও গ্লাসহাউ-এর গবেষণা থেকে। এই অবদানের জন্য আবদুস সালাম, স্টিফেন্ ভাইন্‌বার্গ (Steven Weinberg) ও গ্লাসহাউ (Sheldon L. Glashow) ১৯৭৯ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

১৯৬৪ সালে ইতালির ত্রিয়েস্তে (Trieste)তে সালাম 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিয়োরেটিকাল ফিজিক্স' স্থাপন করেন। উন্নয়নশীল দেশ থেকে বিজ্ঞানীরা সেখানে সাম্প্রতিকতম বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন যা পূর্বে মোটেই সম্ভব ছিল না।

১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) প্রফেসর আবদুস সালামকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে।

মু. হা.

আবহবিদ্যা

পৃথিবীর (দ্র) বায়ুমণ্ডল এবং আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণকারী বায়ুমণ্ডলীর অবস্থার বিভিন্নতা নিয়ে যে বিজ্ঞান তার নাম আবহবিদ্যা। আবহবিদ্‌গণ বায়ুর বেগ, তাপমাত্রা (দ্র), চাপ, বৃষ্টি, শিলাবর্ষণ, শিশির, কুয়াশা (দ্র), তুষারপাত, বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক পদার্থ (যেমন—কার্বন ডাই-অক্সাইড (দ্র), জলীয় বাষ্প, অক্সিজেন (দ্র), নাইট্রোজেন (দ্র)) ইত্যাদির পরিমাণ পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করেন, আবহাওয়া (দ্র) সম্পর্কে অনুমান করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন।

আবহবিদ্‌দের মধ্যে কেউ পর্যবেক্ষক, কেউ পূর্বাভাসদাতা, কেউ গবেষক। পর্যবেক্ষকগণ নিয়ামকগুলির তথ্য সংগ্রহ করে আবহাওয়া-মানচিত্র প্রস্তুত করেন। আবহাওয়া-মানচিত্র বা কম্পিউটার-তথ্য থেকে পূর্বাভাসদাতাগণ ভবিষ্যৎ-আবহাওয়া অনুমান করেন এবং তা ঘোষণা করেন। গবেষকগণ তথ্য সংগ্রহের জন্য উন্নতমানের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে নিয়োজিত থাকেন। আবহাওয়ার তথ্য পরিমাপের জন্য চাপমানযন্ত্র হাইগ্রোমিটার (আর্দ্রতামাপক যন্ত্র) (দ্র) এবং তাপমান যন্ত্র (দ্র) ব্যবহৃত হয়। আগে বেলুন, ঘুড়ি, উড়োজাহাজের সাহায্যে ঊর্ধ্ববায়ুমণ্ডল থেকে এসব যন্ত্র ব্যবহার করে আবহাওয়ার তথ্য আনা হত। ১৯৫০-এর মধ্যে রেডার (দ্র) উদ্ভাবন এবং ১৯৬০-এর মধ্যে কৃত্রিম উপগ্রহ (দ্র) স্থাপনের ফলে এসব তথ্য-সংগ্রহ সহজ ও নির্ভুল হতে থাকে। এখন কম্পিউটার পদ্ধতির ব্যবহার আবহাওয়ার তথ্যসংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং পূর্বাভাস প্রদানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

স. রা.

উপগ্রহ থেকে তোলা গভীর সমুদ্রে নিম্ন-চাপের দৃশ্য

ভূ-সম্পদ জরিপের কাজে ব্যবহৃত ল্যাণ্ডস্যাট উপগ্রহ

আবহাওয়া

'আব' অর্থ পানি (দ্র), 'হাওয়া' অর্থ বাতাস (দ্র)। বায়ুমণ্ডলের বাতাস ও জলীয় বাষ্পের দৈনন্দিন অবস্থাকে বলে আবহাওয়া। কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের অবস্থা অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহের গতি, উষ্ণতা, আর্দ্রতা বা শুষ্কতা, আকাশের মেঘাচ্ছন্নতা, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত নিয়ত পরিবর্তনশীল। কোনো নির্দিষ্ট স্থানের কোনো নির্দিষ্ট সময়ের বায়ুমণ্ডলে এসব উপাদানের অবস্থা থেকে ঐ স্থানের ঐ সময়ের

আবহাওয়া জানা যায়। কোনো স্থান বা অঞ্চলের ২৫ বা ৩০ বছরের আবহাওয়ার গড়কে বলা হয় ঐ স্থানের জলবায়ু (দ্র)। তাই আবহাওয়ার উপাদানগুলিই জলবায়ুর উপাদান। এগুলো হল বায়ুর উষ্ণতা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর আর্দ্রতা, মেঘ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি।

কোনো স্থানের আবহাওয়া ঐ স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে। জলবায়ু পৃথিবীর (দ্র) শস্য উৎপাদন, মাটি (দ্র), পানির (দ্র) উৎসকে প্রভাবিত করে। এ ছাড়াও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের উদ্যম ও কর্মপ্রবণতাও আবহাওয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যোগাযোগ, পরিবহণ ইত্যাদি আবহাওয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের জ্ঞান থেকে আমরা বরফযুগ, সমুদ্রতলের উচ্চতার পরিবর্তন, দুর্ভিক্ষ, মানুষের দেশান্তর, খরা, বন্যা (দ্র) ইত্যাদির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারি।

স. রা.

আবাহনী ক্রীড়াচক্র ক্রীড়াসংগঠন, বাংলাদেশের (দ্র)

আবু জাফর শামসুদ্দীন [১৯১১—১৯৮৮]

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক। তিনি ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ২৮শে ফাল্গুন তারিখে (ইংরেজি ১৯১১ সালের ১২ই মার্চ) বর্তমান গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার দক্ষিণবাগ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

আবু জাফর শামসুদ্দীনের প্রাথমিক শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় পিতৃগৃহে। শিক্ষিত পিতার তত্ত্বাবধানে ঘরে বসেই তিনি বাংলা (দ্র), উর্দু (দ্র) ও ফার্সি ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। পরে একাধিক মাদ্রাসা ও সাধারণ বিদ্যালয় পরিবর্তন শেষে ১৯২৫ সালে ঢাকা (দ্র) শহরের ইসলামী ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই তিনি ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তিলাভ করেন। এর পর তিনি ভর্তি হন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। কিন্তু পড়াশোনায় মন না বসায় তিনি কলিকাতায় (দ্র) চলে যান এবং তাঁর শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটে।

কলিকাতায় এসে তিনি যেমন জীবিকার স্বার্থে চাকুরি গ্রহণ করেন, তেমনি সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত হবার পাশাপাশি রাজনৈতিক জীবনেও সক্রিয় হন। দৈনিক 'ছোলতান' পত্রিকায় সাব-এডিটর পদে কিছু কাল চাকুরি করার পর সরকারের সেচ বিভাগে কেরানির পদে যোগ দেন। ১৯৩৯ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়ে জীবনের প্রথম বাংলা রচনা 'মানবজীবনে রোমান্টিসিজম' নামক একটি প্রবন্ধ পড়েন। এ বছর নাগাদই তাঁর জীবনের প্রথম দু'টি ছোটগল্প মাসিক 'মোহাম্মদী' (দ্র)-তে প্রকাশিত হয়। কলিকাতার জীবনে তিনি কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজফ্ফর আহমদ (দ্র) ও এম. এন. রায়ের (দ্র) ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন। অনতিকালের মধ্যেই তিনি এম. এন. রায়ের 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট' আদর্শ দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। এই সময় তিনি রায় সম্পাদিত ইংরেজি পত্রিকাতে অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখেন।

১৯৪২ সালের জুন মাসের দিকে সরকারি চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪৫ সালে তিনি দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকায় যোগ দেন এবং ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পত্রিকাটির দফতর তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হলে এর সহকারী সম্পাদক হন। তবে ১৯৫০ সালে তাঁকে এর চাকুরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হলে তিনি প্রকাশনা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। 'কিতাবিস্তান' নামে একটি প্রকাশনাসংস্থার গোড়াপত্তন করে অসংখ্য ছাত্রপাঠ্য বই ও বেশ কিছু সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন।

আবু জাফর শামসুদ্দীন নীরব সাহিত্যসাধক ছিলেন না। এ দেশের বিভিন্ন পর্বে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-আন্দোলনেরও কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষ সংগঠক ছিলেন তিনি। ১৯৪৮ সালে তাঁর সম্পাদনায় (দ্র) বের হয়েছিল একটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যপত্র 'নয়া সড়ক'। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত 'পূর্বপাকিস্তান সাহিত্যসম্মেলন-এর অভ্যর্থনা কমিটির

যুগ্মসম্পাদক ছিলেন তিনি। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টাঙ্গাইলে ঐতিহাসিক 'কাগমারি সাংস্কৃতিক সম্মেলন' (দ্র) অনুষ্ঠানে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি এর সাংস্কৃতিক বিভাগের আহ্বায়ক ছিলেন। ১৯৬১ সালে তিনি বাংলা একাডেমীর (দ্র) অনুবাদ (দ্র) বিভাগে সহকারী অনুবাদক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৭২ সালে এখান থেকেই অবসর গ্রহণ করে তৎকালীন 'দৈনিক পূর্বদেশ' পত্রিকায় যোগ দেন। পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেলে তিনি কলাম্‌লেখক হিসাবে দৈনিক 'সংবাদ'-এ যোগদান করেন। এর পাতায় তিনি 'অল্পদর্শী' ছদ্মনামে 'বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা' শীর্ষক কলাম্‌ লিখে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

আবু জাফর শামসুদ্দীন বিভিন্ন সময়ে 'বাংলাদেশ শান্তি পরিষদ'-এর সভাপতি, 'বাংলাদেশ হিউম্যানিস্ট সোসাইটি'র সভাপতি, 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, 'বাংলাদেশ আফ্রো-এশীয় লেখক ইউনিয়ন'-এর সহ-সভাপতি ও 'বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি'র সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম—উপন্যাস : 'পরিত্যক্ত স্বামী', 'মুক্তি', 'ভাওয়ালগড়ের উপাখ্যান', 'পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'সংকর সংকীর্তন', 'প্রপঞ্চ' ও 'দেয়াল'; ছোটগল্প : 'জীবন', 'আবু জাফর শামসুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ গল্প', 'এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য'; প্রবন্ধ : 'চিন্তার বিবর্তন ও পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য', 'সোচ্চার উচ্চারণ', 'লোকায়ত সমাজ ও বাঙালী সংস্কৃতি'; স্মৃতিচারণ : 'আত্মস্মৃতি' [২ খণ্ডে]; অনুবাদ : 'শিল্পীর সাধনা', 'পার্ল এস. বাকের (দ্র) সেরা গল্প' ইত্যাদি।

সাহিত্য ও সাংবাদিক জীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি একাধিক পুরস্কার লাভ করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাঙলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (দ্র) (১৯৬৮), একুশে পদক (১৯৮৩), মরণোত্তর ফিলিপ্‌স্‌ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬) এবং জহুর হোসেন চৌধুরী- স্মৃতি স্বর্ণপদক ইত্যাদি। চিন্তায় উদার, গভীর মানবিকতাবোধ ও সমাজপ্রগতির ভাবনায় সতত উদ্বুদ্ধ আবু জাফর শামসুদ্দীন ১৯৮৮ সালের ২৪শে আগস্ট ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

আবু সাঈদ চৌধুরী [১৯২১—১৯৮৭]

স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের (দ্র) দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি। জন্ম বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার (বর্তমানে জেলা) নাগবাড়িগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে, ১৯২১ সালের ৩১শে জানুয়ারি।

আবু সাঈদ চৌধুরী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথমে ইতিহাসে এম.এ. এবং পরে আইনশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। লণ্ডনে আইনশাস্ত্র অধ্যয়নকালে ১৯৪৬ সালে তিনি নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ব্রিটেন শাখার সভাপতি হন। লণ্ডনের লিঙ্কন্‌স্‌ ইন্‌ থেকে বার-অ্যাট-ল ডিগ্রি লাভ করার পর হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দির (দ্র) সহকারী হিসাবে তাঁর পেশাগত আইনজীবীর জীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৬০ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের অ্যাডভোকেট জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬১ সালে তিনি ঢাকা হাই কোর্টের বিচারপতির পদে যোগ দেন।

বিচারপতি চৌধুরী ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) উপাচার্য নিযুক্ত হন। এ পদে সমাসীন থাকা অবস্থায় ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি জাতিসংঘ (দ্র) মানবাধিকার কমিশনের এক অধিবেশনে যোগ দিতে জেনেভায় যান। সেখানে অবস্থানকালে তিনি পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক স্বদেশের নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার ওপর হামলা চালানোর এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের খবর পান। এর প্রতিবাদে ১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ জেনেভা থেকে তিনি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষাসচিবের কাছে লিখিত এক পত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে ইস্তফা দেন। এর পর তিনি লণ্ডনে গিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বহির্বিশ্বের জনগণ ও বিভিন্ন দেশের সরকারের সাহায্য ও সমর্থন আদায়ের জন্য সক্রিয় প্রচারে

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী—বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালে প্রথম বিজয় দিবস অনুষ্ঠানে শহীদ পরিবারের সদস্য-সদস্যাদের শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছেন

আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে (দ্র) বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে প্রবাসে অবস্থানরত বিচারপতি চৌধুরীকে এই সরকারের বিশেষ দূত নিয়োগ করা হয়। ২৭শে আগস্ট (১৯৭১) তিনি লণ্ডনে বাংলাদেশের দূতাবাস স্থাপন করেন। একাত্তরের নয় মাস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) পক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নৈতিক সমর্থন আদায়ে তাঁর বিশেষ ভূমিকার কথা সুবিদিত।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ পাক হানাদার বাহিনীর কবলমুক্ত হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি বিচারপতি চৌধুরী স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হন। ঐ একই বছর বিশ্বভারতী (দ্র) বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দেশিকোত্তম' এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক 'ডক্টর অব ল' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৭৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তিনি রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেন। ১৯৭৫ সালে তিনি বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯৮৭ সালের ২রা আগস্ট লণ্ডনে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়।

আ. হু.

আবু হানিফা (রা.), হযরত ইমাম [৭০০—৭৬৭]

হযরত ইমাম আবু হানিফা ছিলেন বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ। যুক্তি ও বুদ্ধির মাপকাঠিতে ইসলামী শরীয়তের বিচার-বিশ্লেষণ এবং সেই অনুযায়ী বিধান দেওয়ার জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

ইরাকের কুফায় ৭০০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম ছাবিত ইবনে মূতা। আবু হানিফা (রা.)-র প্রকৃত নাম নুমান ইবনে ছাবিত।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কাপড়ের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সেই সঙ্গে তিনি ইসলামের (দ্র) যুক্তিবাদী চর্চা ও অনুশীলনে কঠোরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইসলামী শরীয়তের আলোচনা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদিসের আলোকে নিজস্ব যুক্তি প্রয়োগ ও মতামত প্রকাশ করেন, যা তাঁর অনুসারীরা চালু করেন। তাঁর অনুসারীরা 'হানাফী' নামে পরিচিত।

আবু হানিফা ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মু. মা.

আবু হুরায়রা (রা.), হযরত [৫৯৯—৬৭৭]

হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর প্রিয় সাহাবী (দ্র) বা সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সহযোগী। রসূল (স.) (দ্র)-এর আদর্শ, শিক্ষা এবং কর্মসূচি প্রচার ও প্রসারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তাঁর জন্মের সঠিক সন-তারিখ জানা যায় না; তবে অনুমান করা হয়, তিনি ৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আরবের আয্‌দ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম আবদুর রহমান ইবনে সাখ্‌র। ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইসলাম (দ্র) গ্রহণ করেন।

রসূল (স.) (দ্র)-এর সর্বাধিক হাদিস (বাণী) বর্ণনাকারী হিসাবে তিনি বিখ্যাত। এই হাদিসের সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি ছিলেন নম্র, বিনয়ী ও কর্মোদ্যোগী। ইসলামী শরীয়তের ওপর তাঁর গভীর দখল ছিল। সর্বোপরি তিনি ছিলেন ইসলামের এক জন খাঁটি অনুসারী। প্রায় ৭৮ বছর বয়সে ৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে মদিনার (দ্র) অদূরবর্তী কাসবায় হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ইন্তেকাল করেন।

মু. মা.

আবু হোসেন সরকার [১৮৯৪—১৯৬৯]

আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের এককালীন মুখ্যমন্ত্রী। জন্ম ১৮৯৪ সালে, রংপুরে।

১৯১৫ সালে ম্যাট্রিক এবং পরে বি. এল. পাশ করে স্থায়ীভাবে ওকালতি শুরু করেন। পরবর্তী কালে তিনি জাতীয় কংগ্রেসে (দ্র) যোগ দেন। বেশ কয়েক বার কারাবরণও করেন। কিন্তু পরে মতবিরোধের কারণে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি যোগ দেন এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টিতে (দ্র)। ১৯৩৬ সালে এই পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসাবে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের (দ্র) প্রার্থী হিসাবে আবু হোসেন সরকার মনোনয়ন পান এবং মন্ত্রীপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫৫ সালে মাত্র অল্প কিছু কালের জন্য পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হন। ১৯৫৫ সালের জুন মাস থেকে ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত তিনি ছিলেন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এ সময়ে 'বাংলা একাডেমী' (দ্র) প্রতিষ্ঠায় (৩রা ডিসেম্বর ১৯৫৫) তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৬৯ সালে, ঢাকায়।

আ. হু.

আবুজর গিফারী (রা.) [? —৬৫২]

হযরত আবুজর গিফারী (রা.) ছিলেন রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাহাবী (দ্র) বা সাহচর্য লাভকারীদের মধ্যে অন্যতম। দৃঢ়চরিত্র, সত্যভাষী, ইসলামী অনুশাসনের নিষ্ঠাবান অনুশীলনকারী এবং স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

আবুজর গিফারীর প্রকৃত নাম জুনদুব। তিনি মক্কায় (দ্র) বনুগিফার গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সঠিক সন-তারিখ জানা যায় না। গিফার গোত্রে জন্ম বলে তাঁর নামের শেষে 'গিফারী' যুক্ত হয়েছে।

জানা যায়, গিফার গোত্রের লোকেরা ছিল অসম সাহসী ও দুর্ধর্ষ বেদুইন। পশুচারণের পাশাপাশি বাণিজ্য-কাফেলা লুণ্ঠন ছিল তাদের পেশার অন্তর্গত। কারণ তারা ছিল খুবই দরিদ্র।

এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করে প্রথম জীবনে তরুণ আবুজরও বাণিজ্য-কাফেলা লুণ্ঠনে অংশ নিতেন। তাঁর সাহস আর ক্ষিপ্রতার কারণে দুর্ধর্ষ লুণ্ঠনকারী হিসাবে অচিরেই তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বেশি দিন তিনি এই হীন বৃত্তিতে নিয়োজিত থাকেন নি। ইসলামের বাণী তাঁকে নতুন পথ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি রসূলুল্লাহ (স.) (দ্র)–এর সান্নিধ্যে এসে ইসলাম (দ্র) গ্রহণ করেন। প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তাঁর স্থান পঞ্চম। ইসলাম প্রচারেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

হযরত আবুজর গিফারী (রা.) প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত করার বিরোধী এবং উদ্বৃত্ত সম্পদ জনকল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। এ কারণে নব্য ভোগবিলাসীদের সঙ্গে, এমনকি উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার সঙ্গেও তাঁর মতবিরোধ ঘটেছিল বলে জানা যায়।

তাঁর স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টি, জ্ঞান, বুদ্ধি, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বের কারণে রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। অন্যান্য সাহাবীরাও তাঁকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন।

আবুজর মদিনার (দ্র) নিকটস্থ রাবাযা নামক মরুপল্লীতে ৬৫২ (মতান্তরে ৬৫৩) খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

মু. মা.

আবুবকর সিদ্দিক (রা.) [৫৭৩—৬৩৪]

হযরত আবুবকর (রা.) ইসলামী খিলাফতের প্রথম খলিফা। তিনি 'সিদ্দিক' বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

আবুবকর মক্কায় কাব পরিবারে ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর চেয়ে তিন বছরের ছোট ছিলেন।

ইসলামের (দ্র) ইতিহাসে হযরত আবুবকর (রা.)-এর নাম অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে লিখিত হয়েছে। বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন; মক্কার (দ্র) অবিশ্বাসীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (স.) যখন মদিনায় (দ্র) হিজরত (দ্র) করেন তখন সেই কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রায় আবুবকর (রা.) ছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী।

রসূলুল্লাহ্ (স.)-র ইন্তেকালের পর খিলাফতের আসন্ন সঙ্কটকালেও তিনি এগিয়ে আসেন এবং খলিফার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নবসৃষ্ট মুসলিম সমাজকে সুশৃঙ্খল ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি যেমন বিদ্রোহ দমন করেন তেমনি মুসলমান সাম্রাজ্যের বিস্তারও ঘটান।

তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, সদালাপী, সরল অথচ দৃঢ়-চরিত্রের অধিকারী, দানশীল এবং ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপসহীন ছিলেন। খলিফা অর্থাৎ মুসলিম জগতের শাসক হওয়ার পরও তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন।

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের (১৪ হিজরি) ১৪ই আগস্ট হযরত আবুবকর (রা.) ইন্তেকাল করেন।

মু. মা.

আবুল কালাম আজাদ, মওলানা [১৮৮৮—১৯৫৮]

আবুল কালাম আজাদ উপ-মহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ইসলামের (দ্র) বিভিন্ন দিকের ওপর লেখা তাঁর মুক্ত চিন্তাসমৃদ্ধ গ্রন্থসমূহের জন্যও তিনি সমানভাবে খ্যাত। 'India Wins Freedom' তাঁর লেখা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নিরপেক্ষ দলিল।

আজাদের কর্মজীবন শুরু হয় পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে। তিনি অল্প বয়স থেকেই কবিতা (দ্র) লিখতে শুরু করেন এবং তাঁর কবিতা ও গদ্যরচনা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি আরবি-ফার্সি-উর্দুতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় (দ্র) প্রকাশিত 'আল-হিলাল' পত্রিকাটি ছিল অত্যন্ত উন্নতমানের, সংস্কারমুক্ত ও আধুনিক চিন্তায় সমৃদ্ধ। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের স্বাধীনতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। ফলে পত্রিকাটি ইংরেজ সরকারের রোষানলে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। তিনি নিজেও নির্যাতনের শিকার হন।

১৯২০-র দশকেই মূলত তিনি রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হন। অসহযোগ আন্দোলনে (দ্র) অংশগ্রহণের অপরাধে তিনি ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর কারারুদ্ধ হন এবং এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন।

মওলানা আজাদ ধর্মীয় স্থবিরতার অবসান ঘটিয়ে মুসলমানদের রাজনীতিসচেতন করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান বিরোধ পরিহার করে এই দুই সম্প্রদায়ের শক্তিকে এক মোহনায় মেলাবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর সংস্কারমুক্ত, উদার, অসাম্প্রদায়িক মন তাঁকে এ কাজে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

তিনি দুই বার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (দ্র) সভাপতি নির্বাচিত হন। রাজনৈতিক জীবনের সর্বমোট প্রায় এগারো বছর তিনি কারাগারে কাটান। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তিনি কংগ্রেস দলীয় কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হন। আমৃত্যু তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৫৮ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

মু. মা.

আবুল কালাম শামসুদ্দীন [১৮৯৭—১৯৭৮]

কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক-সম্পাদক। জন্ম বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার ধানীখোলা গ্রামে, ১৮৯৭ সালে। শিক্ষা-জীবন ঢাকা কলেজ ও কলিকাতার রিপন কলেজে।

১৯২১ সালে ছাত্রাবস্থায় ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে (দ্র) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, পরে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি 'মোহাম্মদী' (দ্র) পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দেন।

পরবর্তী কালে একাদিক্রমে সাপ্তাহিক 'মোসলেম জগৎ', সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী', দৈনিক 'ছোলতান' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন করেন। কলিকাতা (দ্র) এবং ঢাকাতেও (১৯৪৮) দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকায় একই বিভাগের সঙ্গে বহু কাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন তিনি। পরে 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকা প্রকাশিত হলে তাতে তিনি সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন তৎকালীন পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে (দ্র) রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ও ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে তিনি প্রথমে পরিষদের চলমান অধিবেশন বর্জন, পরে পার্লামেন্টারি দল ও পরিষদের সদস্যপদ থেকেও পদত্যাগ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম—অনুবাদ-উপন্যাস : ইভান্ তুর্গিয়েনেফের (দ্র) উপন্যাসের রূপান্তর 'অনাবাদী জমি' (১৯৪৩), 'খরতরঙ্গ' (১৯৫৭); ছোটগল্প : 'ত্রিস্রোতা' (১৯৪০); প্রবন্ধ : 'দৃষ্টিকোণ' (১৯৫৯); ভ্রমণকাহিনী : 'নতুন চীন নতুন দেশ' (১৯৬৫); স্মৃতিকথা : 'অতীত দিনের স্মৃতি' (১৯৬৮)।

১৯৭০ সালে তিনি অনুবাদে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

১৯৭৮ সালের ৪ঠা মার্চ তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

আবুল ফজল [১৯০৩—১৯৮৩]

১৯০৩ সালের ১লা জুলাই আবুল ফজল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান চট্টগ্রাম (দ্র) জেলার সাতকানিয়া থানার কেঁওচিয়া গ্রাম। তাঁর বাবার নাম মৌলবী ফজলর রহমান এবং মায়ের নাম গুলশান আরা।

আবুল ফজল ১৯২৩ সালে নিউ স্কিম মাদ্রাসা থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। তার পর ঢাকার (দ্র) ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৫ সালে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯২৮ সালে তিনি বি.এ. পাশ করেন। এই সময় তাঁর প্রথম উপন্যাস চৌচির (১৯২৭) প্রকাশিত হয়। আবুল ফজল বি.এ. পাশ করে কলিকাতায় (দ্র) আসেন। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের (দ্র) সম্পাদনায় (দ্র) প্রকাশিত 'সওগাত' পত্রিকায় তিনি চাকুরি নেন। ১৯২৯ সালে বি. টি. পড়ার জন্য তিনি ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩১ সালে তিনি বি. টি. পাশ করে ১৯৩৩ সালে খুলনা জিলা স্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। এর পর ১৯৪০ সালে তিনি অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে এম. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এর পর তিনি ১৯৪১ সালে কৃষ্ণনগর কলেজে লেকচারার পদে যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি চট্টগ্রাম কলেজে চাকুরি পান। অতঃপর সাহিত্যের অধ্যাপনায় তাঁর বাকি জীবন অতিবাহিত হয়। তিনি ১৯৫৯ সালে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর-জীবনে সাহিত্য রচনা ও সাংস্কৃতিক-সামাজিক নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে (দ্র) তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি তিনি লাভ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদ গ্রহণের (১৯শে এপ্রিল ১৯৭৩) আমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে। যোগ্যতা ও সম্মানের সঙ্গে উপাচার্যের দায়িত্ব পালনের পর তিনি বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য অর্থাৎ কার্যত শিক্ষামন্ত্রী (১৯৭৫-৭৭) নিযুক্ত হন।

আবুল ফজল বহুমুখী সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কবিতা ব্যতীত সাহিত্যের সকল শাখায় তাঁর অবদান আছে। তাঁর কতিপয় বিখ্যাত রচনা—উপন্যাস : 'জীবনপথের যাত্রী', 'রাঙ্গাপ্রভাত'; ছোট গল্প : 'মৃতের আত্মহত্যা'; নাটক : 'স্বয়ম্বরা'; আত্মকথা: 'রেখাচিত্র', 'দুর্দিনের দিনলিপি' ইত্যাদি।

আবুল ফজল বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান ১৯৬২ সালে। পরের বছর প্রেসিডেন্টের রাষ্ট্রীয় সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ১৯৭৮ সালে তিনি 'সমকাল পুরস্কার' পান। এই কৃতী পুরুষ ১৯৮৩ সালের ৪ঠা মে বুধবার আশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হা.

আবুল বরকত (শহীদ) [১৯২৭—১৯৫২]

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের (দ্র) অন্যতম শহীদ। জন্ম পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বাবলা গ্রামে, ১৯২৭ সালে। পিতা জনাব শামসুদ্দিন, মাতা হাসিনা বেগম।

দেশবিভাগের পর আবুল বরকত ঢাকায় (দ্র) চলে আসেন। থাকেন তার মামা আবদুল মালেকের পুরানা পল্টনস্থ বাসা 'বিষ্ণুপ্রিয়া' ভবনে। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স কোর্সে ভর্তি হন এবং ১৯৫১ সালে অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫২ সালে তিনি ছিলেন এম. এ. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে অনুষ্ঠিত ছাত্র-বিক্ষোভের সময় আবুল বরকত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের ১২ নম্বর শেডের বারান্দায় দাঁড়ানো অবস্থায় পুলিশের গুলিতে আহত হন এবং ঐ দিনই সন্ধ্যার পর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। কড়া পুলিশ পাহারায় গভীর রাতে তাঁর লাশ আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর আত্মীয়দের চেষ্টায় কবরটি পাকা করা হয়। তার কবরের ফলকে লেখা রয়েছে :

২১শে ফেব্রুয়ারী
ভাষা আন্দোলনের শহীদ
আবুল বরকত (এম. এ. ক্লাশ)
বাবলা, মুর্শিদাবাদ
জন্ম ১৬-৬-২৭ইং

আ. র.

আবুল মনসুর আহমদ [১৮৯৮—১৯৭৯]

কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক, সম্পাদক ও রাজনীতিবিদ। জন্ম ১৮৯৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তৎকালীন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার ধানীখোলা গ্রামে।

১৯২১ সালে বি. এ. পাশ করেন। ১৯২৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে বি. এল. পাশ করার পর ময়মনসিংহ জজকোর্টে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত হন। পরবর্তী কালে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং কলিকাতা (দ্র) থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকার সম্পাদক (১৯৪৭) হন। সাংবাদিকতাসূত্রেই তিনি উদ্বুদ্ধ হন সাহিত্যচর্চায়। পাশাপাশি কৃষক-প্রজা আন্দোলনে অংশগ্রহণের ভেতর দিয়ে রাজনীতিক্ষেত্রেও সক্রিয় হন। তিনি ১৯৫৪ সালে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন, পরে ১৯৫৭-৫৮ সালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভারও সদস্য হন।

রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে বিদ্যমান দুর্নীতি অসঙ্গতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্র কষাঘাত হানাই ছিল আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্যকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম— ছোটগল্প : 'আয়না' (১৯৩৫), 'ফুড কনফারেন্স' (১৯৪৪), 'আসমানী পর্দা' (১৯৫৭) ও 'গালিভারের সফরনামা' (১৯৫৯); উপন্যাস : 'সত্যমিথ্যা' (১৯৫৩), 'জীবনক্ষুধা' (১৯৫৫) ও 'আবেহায়াত' (১৯৬৮); প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা : 'পাক বাংলার কালচার' (১৯৬৬), 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' (১৯৬৮), 'শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু' (১৯৭৩) ও 'আত্মকথা' (১৯৭৮)।

১৯৬০ সালে ছোটগল্পে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

১৯৭৯ সালের ১৮ই মার্চ আবুল মনসুর আহমদ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

আবুল হাশিম [১৯০৫—১৯৭৪]

আবুল হাশিম ব্রিটিশ বঙ্গের রাজনীতিতে এক বিশিষ্ট নাম। রাজনীতির পাশাপাশি ইসলামের (দ্র) সংস্কারমুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর মেধা ও শ্রম নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি সমস্ত গোঁড়ামি পরিহার করে জীবন,

জগৎ ও ধর্ম (দ্র) সম্পর্কিত বিষয়াদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন।

১৯০৫ সালের ২৭শে জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় এক খ্যাতিমান মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। আবুল হাশিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে বি. এ. ও বি. এল. ডিগ্রি লাভ করেন। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইসলাম ধর্ম (দ্র) সম্পর্কেও ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন। ফলে তাঁর মধ্যে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি প্রভৃতির পাশাপাশি গভীর ধর্মীয় জ্ঞানের সমাবেশ ঘটে। এ কারণেই তিনি স্বচ্ছ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামের মৌলিক ব্যাখ্যায় উৎসাহী ছিলেন। তাঁর লেখা 'The Creed of Islam', 'As I see it', 'রব্বানী দৃষ্টিতে', 'অর্থনৈতিক সমস্যা ও ইসলাম' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর এই সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারার স্বাক্ষর মেলে। ১৯৩৬ সালে তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হন। ১৯৫২ সালে তিনি ভাষা-আন্দোলনে (দ্র) অংশগ্রহণ করে কারারুদ্ধ হন। তিনি ইসলামিক একাডেমীর (প্রতিষ্ঠা ১৯৬০) প্রথম পরিচালক ছিলেন।

১৯৭৪ সালে আবুল হাশিম পরলোক গমন করেন।

মু. মা.

আবেস্তা অবেস্তা দ্র

আব্বাসউদ্দিন আহমদ [১৯০১—১৯৫৯]

বাংলা লোকসঙ্গীতের (দ্র) স্বনামধন্য শিল্পী। ১৯০১ সালে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার বলরামপুর গ্রামে জন্ম। পিতা জাফর আলী আহমদ, মাতা হীরামননেসা। শৈশব থেকেই গানের দিকে আব্বাসউদ্দিনের নেশা। কুচবিহার ভাওয়াইয়া (দ্র) গানের অঞ্চল। বালক আব্বাস লোকমুখে যে গান শোনেন তা-ই শিখে ফেলেন। গ্রামের স্কুল শেষ করে আসেন কুচবিহারে, সেখান থেকে তুফানগঞ্জে। সেখানকার সরকারি ডাক্তার মোবারক হোসেন সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীত (দ্র) গাইতেন। স্কুল ছুটির পর আব্বাস তাঁর কাছে গিয়ে গান শেখেন। আই.এ. পাশ করার পর আব্বাসউদ্দিন রাজ-শাহী কলেজে ভর্তি হন। সে সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (দ্র) রাজশাহী (দ্র) এলে তাঁর সম্মানে আয়োজিত সভায় নজরুল ইসলামের (দ্র) 'ঘোর ঘোররে ঘোররে আমার সাধের চরকা ঘোর' গানটি গেয়ে আব্বাসউদ্দিন যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং তাঁর প্রশংসা করেন। কিন্তু রাজশাহীতে স্বাস্থ্য টিকল না বলে আব্বাসউদ্দিনকে কুচবিহারে ফিরে যেতে হল। ততদিনে তিনি অত্যন্ত চমৎকার গান গাইছেন। সে সময় কাজী নজরুল ইসলাম (দ্র) কুচবিহার যান। সেই তাঁর সঙ্গে আব্বাসউদ্দিনের প্রথম যোগাযোগ। এর পর নজরুলেরই আমন্ত্রণে দার্জিলিং-এর এক সভায় আব্বাসউদ্দিন গান গাইতে যান। কলিকাতায় (দ্র) বেড়াতে গিয়ে বিমল দাসগুপ্তের মাধ্যমে আব্বাসউদ্দিন গ্রামোফোন (দ্র) কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে রেকর্ডে গান গাইবার সুযোগ পেলেন। শৈলেন রায়ের লেখা 'স্মরণপারের ওগো প্রিয়' এবং 'কোন বিরহীর নয়ন জলে' গান দু'টি তিনি প্রথম রেকর্ড করেন। দু'টি গানই জনপ্রিয় হয়। এই সাফল্যে গান গাওয়াকেই জীবনের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করে তিনি কুচবিহার থেকে কলিকাতায় চলে আসেন। এবারও দু'খানা গান তিনি রেকর্ড করলেন এবং দু'টি গানই জনপ্রিয়তা পেল। কাজী নজরুল ইসলাম তখন গ্রামোফোন কোম্পানির গীতিকার, সুরকার ও প্রশিক্ষক। নজরুলের বেশ কয়েকটি গান আব্বাসউদ্দিন এর মধ্যেই রেকর্ডে গেয়েছেন। নজরুল আব্বাসউদ্দিনকে গভীরভাবে স্নেহ করেন। আব্বাসউদ্দিন এক দিন নজরুলকে ইসলামী গান রচনা করতে বলেন এবং এ শ্রেণীর গান রেকর্ড করার জন্য গ্রামোফোন কোম্পানির

সমর্থন আদায় করেন। 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে' ও 'ইসলামের ঐ সওদা লয়ে' নজরুল ইসলামের প্রথম রচিত দু'টি ইসলামী গান আব্বাসউদ্দিন রেকর্ড করেন। গান দু'টি বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। এর পর নজরুলও রচনা করে চললেন একের পর এক ইসলামী গান, আব্বাসউদ্দিন নিজে রেকর্ড করলেন অনেক, অন্যদের দিয়েও রেকর্ড করালেন। নজরুল ইসলামের ইসলামী গান রচনার পেছনে ও সেসব রচনাকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে আব্বাসউদ্দিনের এই ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে।

গানের নানা ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করলেও আব্বাসউদ্দিনের প্রধান ক্ষেত্র ছিল লোকসঙ্গীত। কলিকাতাতেই পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের (দ্র) সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। এঁরা উভয়ে মিলে কলিকাতা শহরে লোকসঙ্গীত প্রচারে ব্রতী হন। এঁদের প্রচেষ্টা সফল হয় ও লোকসঙ্গীত সম্পর্কে কলিকাতা তথা নগরবাসী মানুষের মনে গভীর উৎসাহ জাগে। লোকসঙ্গীতের মধ্যে প্রথম দিকে আব্বাসউদ্দিন কিছু ভাটিয়ালি (দ্র) গান রেকর্ড করেন। এর পরই আসে তাঁর ভাওয়াইয়া গান রেকর্ড করার পালা। ভাওয়াইয়া তো তাঁর এলাকার গান। শৈশব থেকেই এ গান তিনি গাইছেন। মাঝে মাঝে সুর ভেঙে যাওয়া সুরে তাঁর আশ্চর্য দখল। ভাওয়াইয়া গানে আব্বাসউদ্দিন অসামান্য সাফল্য অর্জন করলেন। তাঁদের আঞ্চলিক ভাষায় ছোট ভাই আবদুল করিমের লেখা কয়েকটি পালাও রেকর্ড করেন। বিখ্যাত দোতারাবাদক কানাইলাল শীলের সঙ্গে আব্বাসউদ্দিনের যোগাযোগ অত্যন্ত ফলদায়ক হয়েছিল। কানাইলাল লোকসঙ্গীতের সংগ্রাহক ছিলেন। তাঁর সঙ্গীতসংগ্রহ যেমন আব্বাসউদ্দিন ব্যবহার করতে সমর্থ হন, তেমনি তাঁর গানের সঙ্গে কানাইলালের দোতারা বাদন অভাবনীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করে।

পাকিস্তান হবার সঙ্গে সঙ্গে আব্বাসউদ্দিন ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট রাত ১২টার পর ঢাকা বেতার থেকে প্রথম সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ঢাকায় নতুন করে তাঁর জীবন শুরু হল। ১৯৫৫ সালে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় আয়োজিত এশীয় সঙ্গীত সম্মেলনে বাংলা

সপরিবারে আব্বাসউদ্দিন, সামনে স্ত্রী লুৎফুন্নেসা আব্বাস, পেছনে বামদিক থেকে—বড়ছেলে মোস্তফা কামাল, কন্যা ফেরদৌসী রহমান, ছেলে মোস্তফা জামান আব্বাসী ও আত্মীয় কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী।

লোকসঙ্গীত সম্পর্কে ভাষণ দেন। সেখান থেকে ফেরার পথে রেঙ্গুনে কয়েকটি সভায় যোগ দেন ও গান গেয়ে শোনান। ১৯৫৬ সালে তিনি জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে আয়োজিত আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত সম্মেলনে যোগ দেন। বাংলা লোকসঙ্গীত সম্পর্কে বিশ্বসভায় প্রদত্ত তাঁর ভাষণ ও তাঁর গান শ্রোতৃমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। আব্বাসউদ্দিন দীর্ঘ জীবন লাভ করেন নি। ১৯৫৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

ক. গো.

আভোগ

গানের বা গতের অংশবিশেষের নাম। ধ্রুপদীয় (দ্র) ধারার গানে বা গতে চারটি অংশ, তুক্ বা ধাতু থাকে। আভোগ সর্বশেষ অংশ বা তুক্। এই তুকে ধ্রুপদীয় গায়ন বা বাদন সমাপ্ত হয়। অপর তিনটি তুক্ হচ্ছে স্থায়ী (দ্র), অন্তরা (দ্র) ও সঞ্চারী (দ্র)।

ক. গো.

ভারতীয় উপমহাদেশ আমের জন্মস্থান। ভাল জাতের পাকা আমের স্বাদের তুলনা নেই। আবার টক ও পোকায় ধরা আমও কম নেই। আমাদের দেশে খাওয়ার উপযোগী উন্নত শ্রেণীতে পড়ে রাজশাহী (দ্র) ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের কিছু আম। এই সুস্বাদু জাতের আমের বৈজ্ঞানিক নাম *ম্যাঙ্গিফেরা ইণ্ডিকা (Mangifera indica Rom.)*, গোত্র আনাকার্ডিয়াসি (Anacardiaceae)। রাজশাহী থেকে পুব দিকে আম ক্রমশ টক হতে থাকে। নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আম আরো টক আর পোকাধরা। এই জাতের আমকে বলা হয় খাওয়ার অনুপযুক্ত এবং এর বৈজ্ঞানিক নাম *ম্যাঙ্গিফেরা সিলভাটিকা (Mangifera Sylvatica Roxba)*। লতানে আমও এই পর্যায়ে পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম, আসাম, ত্রিপুরা এই আমের অঞ্চল। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের বৌদ্ধ জাতক (দ্র) গ্রন্থে আমের কাহিনী পাওয়া যায়।

এঙ্গলার ও প্র্যান্টস নামের দুই উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ১৮৯৭ সালে ৩২ প্রকারের রসালো আমের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। ১৮৯৫ সালে হুকার ও জ্যাকস করেছিলেন ৬৫ প্রকারের সুস্বাদু আমের তালিকা। ১৯৪৯ সালে ভারতীয় আম্রতত্ত্ববিদ মুখার্জি ৪১ রকমের সুখাদ্য আমের শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। এখন আমেরিকার ফ্লোরিডা ও ক্যালিফোর্নিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (দ্র), মাল্টা, আফ্রিকার নাটাল ও মিশরে এবং অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডে আম উৎপন্ন হচ্ছে। একমাত্র বাংলাদেশ (দ্র) ও ভারতে (দ্র) অন্তত ৫০০ রকমের আমের বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এসবের মধ্যে অনেক আমের একটি থেকে আরেকটির তফাৎ করা খুব মুশকিল।

জামালপুরে ১৩০০ থেকে ১৩২৯ সন পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহের একটি নার্সারি ছিল। সেই নার্সারিতে ১২৮ রকম আমের চারা পাওয়া যেত। তার মধ্যে উৎকৃষ্ট জাতের আমের তালিকায় *বোম্বাই আলফানসো* বা *(আলফানজো)* ছিল। এই আম ঘরে অনেকদিন রাখা যেত, পাকত জুলাই মাসে। তখন ঐ আমের একটি চারার দাম ছিল ·৫০ পয়সা। সারা বছর ফলদায়ী বা বারোমেসে আমের প্রতিটি চারার দাম ছিল ১০ টাকা। সে সময়কার বিখ্যাত আম ছিল—বৃন্দাবনী, দুধিয়া, গোপালভোগ, ফজলী, খীর্সপাতি, কোহিতুর, মোহনভোগ, শ্রীধন, পিয়ারী, ল্যাংড়া, ফার্নাণ্ডিয়ান, আগা সাহেব, বাদানী, জালীবান্দা, বেগম-পসন্দ, কাঁচামিঠা বেনারস, কাঁচামিঠা–ঈশ্বর গুহ, কালাপাহাড়, মালদহ-সিঙ্গাপুর, মুলতানী। এর মধ্যে কয়েকটি আম ছিল বারোমেসে। এখন আমাদের দেশে মাদ্রাজ অঞ্চল থেকে মাঘ-ফাল্গুন মাসে আম আসে আমদানি হয়ে।

চাষ করা আমের মধ্যে বোম্বাইয়ের *আলফানসো* উৎকৃষ্ট আমের তালিকার শীর্ষে রয়েছে। বিশ্বের বাজারে এই আমের খুব চাহিদা। বাংলাদেশে গুলাব্খাস্, বোম্বাই ও ল্যাংড়াকে উৎকৃষ্ট আম বলা হয়। কেউ–কেউ ফজলীকে

এই শ্রেণীভুক্ত করেন। এ ছাড়া মাদ্রাজসহ দক্ষিণ ভারতে *নীলাম* ও *বাঙ্গানপল্লী;* অন্ধ্রে *মালগোয়া* ও *সুবর্ণরেখা;* যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে *চৌসা, দশেরী* ও *ল্যাংড়া* প্রসিদ্ধ। আকারের দিক থেকে বাংলাদেশে *ফজলী* সবচেয়ে বড়, ওজনে কোনো-কোনোটি ১.৫ কেজি। ভারতের অন্ধ্রের *টেনের* লম্বায় ২০ সেমি ও ওজন ১.৬ কেজি, তবে সেই আম সুস্বাদু নয়।

কবিরাজী ভাষায় কচি আম রক্তপিত্তকর, ডাঁসা আম পিত্তকর এবং পাকা আম শরীরের রং, মাংস ও বলবর্ধক।

হজম শক্তি দুর্বল হলে বেশি আম খেতে নেই, তাতে উপকারের চেয়ে অপকার বেশি। পাকা আমের মধ্যেও তফাৎ আছে। শহরে যে আম বিক্রি করা হয়, তা আসলে গাছপাকা নয়, এঁচড়ে পাকা। কাজেই এই আম কাঁচা আমের দোষ থেকে মুক্ত নয়; এ জন্য বলে—আম খেলে ফোঁড়া হয়। আমাদের দেশে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও উত্তরবঙ্গ ছাড়া কোথাও তেমন আমবাগান নেই। আমবাগানে ফাগুন মাসে বোলের পাগল-করা ঘ্রাণ পাওয়া যায়।

আমের মঞ্জরি হলদেটে-সবুজ ও এতে গোলাপি-বেগুনির ছোপ থাকে। কোনো-কোনো মঞ্জরি সাদাটে ধরনের, আবার কোনোটি হাল্কা বেগুনি জাতের। বোলের গন্ধ শুঁকে বলা যায় কোন আম গুণে অতুলনীয় হবে। এই গুণ নির্ভর করে শাঁসের সুগন্ধ ও আঁশহীনতার ওপর। আমের সাধারণ আকৃতি হৃৎপিণ্ডের মতো।

ভাল জাতের আম থেকে বংশ বাড়াতে চাইলে কলম করাই উত্তম। সর্বোৎকৃষ্ট জাতের আমের বীজ পুঁতলেও যে চারা হয় তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হয়ে যায়। এজন্য কৃষি-ফার্ম থেকে ভাল জাতের ভাল কলম সংগ্রহ করা উচিত। এ ছাড়া আমের রোগও আছে। আমগাছে পরগাছা হয় খুব। এ জন্য পরজীবীর রোগ যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ক্ষতিকর পরজীবীর হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সব সময় সযত্নে অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছেঁটে ফেলা উচিত।

আমের পাতা চিবিয়ে তাই দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত নড়ে না, পড়েও না। আমের কুশি (কচি আমের আঁটির শাঁস) থেঁতো করে পানিতে ভিজিয়ে ছেঁকে ঐ পানি শুকনো চুলের গোড়ায় লাগালে চুল পড়া বন্ধ হয়। আমের কুশি ও হরীতকী এক সঙ্গে দুধে বেঁটে ছেঁকে মাথায় লাগালে খুশ্‌কি কমে যায়। আরো অনেক রোগে আমের কুশি, পাতা ও ছাল ঔষধের (দ্র) কাজ করে।

আমের থেকে চাটনি, আচার ও অম্বল তৈরি করে খাওয়া যায়। পাকা আমেরও চমৎকার চাটনি হয়, আমসত্ত্ব হয়। পাকা আমে দুধ-চিনি মিশিয়ে সুস্বাদু পানীয় হয়, এই পানীয় সারা বছর রাখা যায়। আমের রস টিনজাত করে, রসের পানীয় তৈরি করে সারা বছর ব্যবহৃত হচ্ছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে আমের রসের গুণগান পাওয়া যায় সাহিত্যে ও ধর্মগ্রন্থে।

বৌদ্ধ ও হিন্দুরা আমগাছকে বিশেষ পবিত্র মনে করে। বিবাহ, মঙ্গল-উৎসব অথবা দেবদেবীর পুজোয় আমের পল্লব অপরিহার্য। বৌদ্ধেরা কাঁচা আমকাঠ দিয়ে মৃতদেহ পোড়ায়। পুরানো আমগাছের কাঠ দিয়ে দরজা, কপাট, ছাদের তক্তা ও আসবাবপত্র তৈরি হয়। এরকম উপকারী গাছ, ফলদায়ী বৃক্ষ, ছায়াময় চিরসবুজ তরু, ঔষধিগুণে ভরা এমন কল্পতরু আর দু'টি নেই।

বি. ব.

আমাজন নদী

আমাজন (Amazon) নদী দক্ষিণ আমেরিকার (দ্র) প্রধান নদী এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। এই নদী বেশির ভাগ স্থানে ২.৫ থেকে ১০ কিমি পর্যন্ত প্রশস্ত। কিন্তু মোহনায় এই নদী প্রায় ১৪০ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। এর গভীরতার গড় প্রায় ১২ মিটার; কিন্তু কোনো কোনো স্থানে এর গভীরতা প্রায় ৯০ মিটার।

আমাজন নদীর প্রায় ৬২,২০,০০০ বর্গ কিমি অববাহিকা জুড়ে রেইন-ফরেস্ট (rain-forest) বিদ্যমান। আন্দিজ পর্বতের কাছে এই নদীতে প্রায় ৩০৫ সেমি বৃষ্টিপাত হয়, যদিও নিচু অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ১৩০ সেমি। তাপমাত্রা ২৯° সেলসিয়াস এবং সমগ্র অববাহিকা জুড়ে বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে।

বড় বড় জাহাজ বহু দূর (প্রায় ৩৭০০ কিমি) পর্যন্ত আমাজন নদীতে প্রবেশ করতে পারে। সাধারণত খাদ্য, কাপড়চোপড়, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্য জাহাজে আনীত হয় এবং ব্রাজিলের বাদাম, পশুর চামড়া, রাবার, বিভিন্ন ধরনের পাখি, মাছ ও পশু জাহাজে করে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়।

পেরুর আন্দিজ পর্বত থেকে উৎপন্ন আমাজন নদী উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে উকাইয়ালি (Ucayali) নদীর সঙ্গে মিশে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়েছে। পরে তা ম্যারানন নদীর সঙ্গে মিশেছে এবং এটাই আমাজন নদীর প্রধান প্রবাহ। এর পর আমাজন নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে ব্রাজিলের মধ্য দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে (দ্র) গিয়ে

পড়েছে। এই নদীতে স্রোত আছে, তবে তার বেগ শুষ্ক মওসুম থেকে বর্ষা মওসুমে ঘণ্টায় ২.৫ কিমি থেকে ৫ কিমি পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। দু' শ'র বেশি উপনদী এই নদীতে এসে মিশে এর প্রবাহকে শক্তিশালী করেছে।

আমাজন নদীতে বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যায়। তা ছাড়া এই অঞ্চলে কুমির, বানর, টিয়াপাখি ও অন্যান্য নানা ধরনের পশু–পাখি পাওয়া যায়। আমাজন নদীর অববাহিকার রেইন-ফরেস্টে তিন হাজারেরও বেশি জাতের গাছগাছড়ার সন্ধান পাওয়া গেছে। এই বনের গাছগুলো প্রায় ৬১ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয় এবং গাছের ডালপালা এত ঘন হয় যে সেখানে মাটিতে কদাচিৎ সূর্যের আলো গিয়ে পৌঁছায়।

মু. এ.

আমানত শাহ/শাহ আমানত

হযরত আমানত শাহ (রা.) এ দেশের শ্রেষ্ঠ কামেল দরবেশ ও ওলিদের অন্যতম।

তাঁর জন্ম-তারিখ জানা যায় নি। অনুমান করা হয়, প্রায় তিন শতাধিক বৎসর পূর্বে তিনি ভারতবর্ষে (এখন পাকিস্তানে) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পারিবারিক পরিচয় সম্পর্কেও কিছু জানা যায় নি।

শাহ আমানত (রা.) যৌবনে সুফিতত্ত্ব ও মা'রেফাতের গূঢ় জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে কাশ্মীর, দিল্লি ও মুর্শিদাবাদ সফর করেন। তিনি মুর্শিদাবাদের সুফিসাধক হযরত শাহ আবদুর রহিমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন।

পীর সাহেবের উপদেশ মোতাবেক শাহ আমানত চট্টগ্রামে (দ্র) আসেন এবং জীবিকা অর্জনের লক্ষ্যে জজকোর্টে একটি ছোট চাকুরিতে নিযুক্ত হন। অতঃপর সেখানে তিনি বিবাহ করেন। চাকুরি, সংসার এবং সেই সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার কাজও চলতে থাকে। অল্প দিনের মধ্যে তাঁর নানা অলৌকিক ক্ষমতার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা ও আসামের বহু মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে থাকে। তাঁর সম্পর্কে বহু অলৌকিক কাহিনী এখনো লোকমুখে শোনা যায়।

এই মহান সাধক ১১৮৭ হিজরি (দ্র) সালে চট্টগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। সেখানেই তাঁর মাজার অবস্থিত। প্রতি বছর ১লা জিলহজ্ব তারিখে তাঁর ওরস (দ্র) উপলক্ষে সেখানে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়।

মু. মা.

আমাশয় (dysentery)

আমাশয় বৃহদন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ। এ রোগের লক্ষণ প্রধানত ডায়রিয়া (দ্র), মলের সঙ্গে শ্লেষ্মা, রক্ত (দ্র) ও পুঁজ নির্গমন। জীবাণু (দ্র), ভাইরাস (দ্র), পরজীবী (দ্র), কৃমি (দ্র), রাসায়নিক পদার্থের বিষক্রিয়া ইত্যাদি কারণে আমাশয় রোগ দেখা দেয়। দূষিত খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার ঘটে।

'*এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা*' (*Entamoeba histolytica*) জাতীয় পরজীবী সংক্রমণের ফলে অ্যামিবীয় আমাশয় (amoebic dysentery) দেখা দেয়। অ্যামিবীয় আমাশয়ের প্রধান লক্ষণ—দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়, মলের সঙ্গে শ্লেষ্মা, এমনকি রক্ত নির্গমন এবং সেইসঙ্গে কখনো সামান্য জ্বর। মেট্রোনিডাজোল (metronidazole) জাতীয় ঔষধ (দ্র) এ জাতীয় আমাশয় নিরাময় করে।

'*শিগেলা*' (*Shigella*) জাতীয় জীবাণু সংক্রমণের ফলে ব্যাসিলারি আমাশয় (bacillary dysentery) দেখা দেয়। এ জাতীয় আমাশয়ে মলের তুলনায় শ্লেষ্মা, রক্ত, পুঁজ নির্গমন বেশি হয় এবং তলপেটে তীব্র খিঁচুনিসহ ব্যথা, উদাভাব (dehydration), জ্বর (দ্র) প্রভৃতি প্রধান লক্ষণ হিসাবে দেখা দেয়। শিশুরাই এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। তবে এ রোগ যে কোনো বয়সেই দেখা দিতে পারে। ব্যাসিলারি আমাশয় নিরাময়ের জন্য এণ্টিবায়োটিক (দ্র) জাতীয় ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ধরনের আমাশয়ের চিকিৎসাও কারণভিত্তিক।

সি. না. হ.

আমিনা

ইসলাম ধর্মের (দ্র) প্রবর্তক মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর জননী। তাঁর পিতার নাম ওহাব ইবনে আব্দ মানাফ, মাতার নাম াররা বিনতে আব্দ আল উয্যা। তাঁর চাচা উহায়ব ইবনে আব্দ মানাফ তাঁর অভিভাবক ছিলেন।

আমিনা এক জন বিদূষী মহিলা হিসাবে সমাজে মর্যাদা

লাভ করেছিলেন। তাঁরই গোত্রের (কুরাইশ গোত্র) আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহ্‌র (দ্র) সাথে তাঁর বিয়ে হয়। আমিনা গর্ভবতী থাকা অবস্থায় আবদুল্লাহ্ সিরিয়া থেকে ফেরার পথে ইন্তেকাল করেন। এর পর হযরত মুহম্মদ (স.) জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর শিশু মুহম্মদ (স.)-কে হালিমা নামে এক বেদুঈন ধাত্রীর হাতে তুলে দেন আমিনা। মুহম্মদ(স.) হালিমার গৃহে চার বছর লালিতপালিত হন। এর পর আমিনা মুহম্মদ (স.)-কে মক্কায় নিয়ে আসেন এবং সেখানে অবস্থান করেন। এক দিন আমিনা ছয় বছর বয়স্ক মুহম্মদ (স.)-কে নিয়ে মদিনায় (দ্র) তাঁর স্বামীর সমাধি দর্শন এবং আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। মদিনা থেকে মক্কায় (দ্র) ফেরার পথে 'আবুওয়া' নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন উম্মু আয়মান নামক পরিচারিকা। উম্মু আয়মান বালক মুহম্মদকে (স.) মক্কায় তাঁর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের নিকট পৌঁছে দেন।

মো. ই.

আমির আলী, সৈয়দ [১৮৪৯—১৯২৮]

সৈয়দ আমির আলী ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি, আইনশাস্ত্র এবং ইসলামী ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট নাম।

তাঁর জন্ম ৬ই এপ্রিল ১৮৪৯ সালে, পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার চুঁচুড়া শহরে। জানা যায়, তাঁর পূর্বপুরুষ ইরান থেকে সম্রাট নাদির শাহের আমলে ভারতে (দ্র) আসেন এবং পরে এ দেশেরই স্থায়ী বাসিন্দা হন।

সৈয়দ আমির আলী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন (১৮৬৮)। এর পর তিনি আইনশাস্ত্রে স্নাতক এবং লণ্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। এই হাইকোর্টে তিনিই ছিলেন প্রথম মুসলিম ব্যারিস্টার। এরপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, প্রেসিডেন্সি কলেজের মুসলিম আইন-অধ্যাপক, চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন-এর সম্পাদক, বেঙ্গল লেজিসলেটিভ্ কাউ-

ন্সিল-এর সদস্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Tagore Law Professor', কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

তাঁর লেখা বিখ্যাত 'A Short History of the Saracens' বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। আইনশাস্ত্র বিষয়েও তাঁর একাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ৩রা আগস্ট তিনি লণ্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

মু. মা.

আমীর খসরু [১২৫১—১৩২৫]

ভারতীয় সঙ্গীত ও সাহিত্যের ইতিহাসে আমীর খসরু এক চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর পিতা সাইফুদ্দিন লাচিন খোরাসান থেকে ভারতে (দ্র) চলে আসেন ও দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিসের দরবারে নিযুক্ত হন। খসরুর জন্ম পাতিয়ালায়। শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে অসামান্য প্রতিভার বিকাশ লক্ষ করা যায়। খুব অল্প বয়সে তিনি তুর্কি (দ্র), ফার্সি, আরবি (দ্র), হিন্দি, ব্রজভাষা প্রভৃতি ভাষা আয়ত্ত করেন। বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রতিও তাঁর ঝোঁক দেখা যায়। তবে আমীর খসরুর গভীরতম অনুরাগ ছিল কাব্যের (দ্র) প্রতি। মাত্র ১২ বছর বয়স থেকে তিনি কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। দিল্লির দরবারের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে সঙ্গীতচর্চার উচ্চ পরিবেশের সংস্পর্শে আসাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। অন্যান্য বিদ্যা আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে খসরু সঙ্গীতাভ্যাস ও সঙ্গীত রচনার প্রতিও মনোনিবেশ করেন। রাজদরবারের প্রভাবে আমীর খসরুকে রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে আগ্রহ পোষণ করতে হয়। শুধু তাই নয়, একাধিক সুলতানের অধীনে তিনি উচ্চ রাজপদে নিযুক্তও থাকেন। প্রায় পঁচিশ

বছর বয়সে আমীর খসরু মালিক ছর্জুর দরবারে প্রথম উচ্চ পদে নিযুক্তি লাভ করেন এবং সর্বশেষে গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের দরবারে সগৌরবে অধিষ্ঠিত থাকেন।

আমীর খসরুর জীবন নানা রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। ফলে অব্যাহতভাবে কোনো বিদ্যার সাধনাই তিনি দীর্ঘকাল চালিয়ে যেতে পারেন নি। এর ভিতর দিয়েই তাঁর যে কীর্তি, তাকে অসাধ্যসাধন বলা হয়ে থাকে। অল্প বয়সেই আমীর খসরু মরমী সাধক নিজামউদ্দিন আউলিয়ার (দ্র) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। গুরুর প্রভাব তাঁর প্রেরণার উৎস হিসাবে বিরাজিত ছিল।

আমীর খসরু ছিলেন কবি, প্রাবন্ধিক, রাজনীতিক, ইতিহাসবিদ, সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতরচয়িতা, দার্শনিক, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, ভাষাবিদ ও গবেষণাব্রতী। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে প্রামাণ্য বিবরণ রয়েছে। আমীর খসরু ৯৯টি গ্রন্থের রচয়িতা বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৩০টি বই নানা সংগ্রহে আজো রক্ষিত আছে। কাব্য, অলঙ্কারশাস্ত্র, অভিধান (দ্র), ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় ছাড়াও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য খসরু স্মরণীয় হয়ে আছেন।

তিনিই প্রথম যিনি কার্যকরভাবে ভারতীয় সঙ্গীতপদ্ধতির সঙ্গে ইরানি ও তুর্কি সঙ্গীতপদ্ধতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তিনি নতুন রাগ সৃষ্টি করেন, নতুন সঙ্গীতপদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, নতুন তাল ও বাদ্যযন্ত্র রচনা করেন; ভারতে প্রচলিত সুরের সঙ্গে ইরানি সুরের মিশ্রণ ঘটিয়ে আমীর খসরু ইমন, জিলফ্, সাজগিরি প্রভৃতি ১২ রাগ সৃষ্টি করেন বলে জানা যায়। মিশ্র রাগ রচনায়ও তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। ইমন-বসন্ত, ইমন-পুরিয়া, ইমন-ভূপালী প্রভৃতি রাগ তাঁর রচনা বলে মনে করা হয়। আমীর খসরু মূর্ছনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করেন ও বিকৃতস্বর যোগ করে মূর্ছনার সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। এর ফলে সপ্তক ও ঠাট সম্পর্কে নতুন ধারণার উন্মেষ ঘটে।

আমীর খসরু কাওয়ালির প্রবর্তক। কাওয়ালি অবলম্বনে তিনি খেয়ালের (দ্র) ভিত্তি স্থাপন করেন বলে উল্লেখ করা হয়। তিনি তারানা, গুল্‌নক্‌স, সহলা প্রভৃতি গীতরীতিরও প্রবর্তন করেছিলেন। যৎ, ফরদোস্ত, সওয়ারি, পহলওয়ান, খামসা প্রভৃতি তাল তাঁর সৃষ্ট। তিনি সঙ্গীতযন্ত্র সিতারের উদ্ভাবক। সিতারে গৎ ও তোড়া তাঁরই প্রবর্তন বলে জানা যায়। তবলা ও ঢোল (দ্র) বাদ্যযন্ত্র তিনিই উদ্ভাবন করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। যাকে হিন্দুস্থানি সঙ্গীতরীতি বলা হয়, আমীর খসরু ছিলেন তার পথপ্রদর্শক।

ক. গো.

আমেরিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্র

আমেরিকান ইণ্ডিয়ান রেড ইণ্ডিয়ান দ্র

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ

গ্রেট ব্রিটেনের কাছ থেকে আটলান্টিক উপকূলের ১৩টি উপনিবেশ বা কলোনির স্বাধিকার আদায়ের জন্য সংঘটিত যুদ্ধই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ১৭৭৫ থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত চলে।

কলম্বাসের (দ্র) আমেরিকা আবিষ্কারের পর স্পেন এই নতুন মহাদেশের দক্ষিণ ও মধ্যঅঞ্চল দখল করে নেয়। কিন্তু মহাদেশের উত্তরভাগে অর্থাৎ আটলান্টিক উপকূলবর্তী এলাকায় ইংরেজদের ১৩টি উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ সরকারের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উপনিবেশগুলোর সকল দলিলপত্রে সরকারি নতুন স্ট্যাম্প লাগানোর আইন জারি করা হলে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ব্রিটিশ স্বার্থের সংঘাত বাধে। জনসাধারণের প্রবল আপত্তির মুখেও ইংরেজ সরকার বাণিজ্য এবং বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের ওপর নতুন নতুন শুল্ক আরোপ করতে থাকে। এর প্রতিবাদে ১৭৭৩ সালে এক দল লোক বোস্টন বন্দরে জাহাজ থেকে চায়ের বাক্স সমুদ্রে ফেলে দেয়। এই অবাধ্যতা দমনের জন্য সরকার বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দিয়ে সেখানে ইংরেজ

সৈন্যের সমাবেশ ঘটায়। এভাবে ১৭৭৫ সালে 'লেক্সিংটন-কংকর্ড'-এ সরাসরি সংঘর্ষ শুরু হয়।

১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই উপনিবেশগুলোর মিলিত প্রতিনিধিসভায় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) ভিত্তি রচিত হয়। জর্জ ওয়াশিংটন (দ্র) সৈন্যদল গঠন করেন এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের আহ্বান জানান। অবশেষে ১৭৮৩ সালে প্যারিস সন্ধির ভিতর দিয়ে গ্রেট ব্রিটেন উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা মেনে নেয়। এভাবে আটলান্টিক থেকে মিসিসিপি নদী পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডটি আমেরিকার স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুজ. ব.

আম্রপালী

প্রাচীন বৈশালী নগরীর প্রধানা নগরনটী ছিলেন। গৌতম বুদ্ধ (দ্র) পরিনির্বাণের (দ্র) বছর আম্রপালী বৈশালীর এক আমবাগানে কিছু সময় অবস্থান করেন। আম্রপালী নটী হয়েও বুদ্ধের কথা শুনে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁকে আহারের আমন্ত্রণ জানান। বুদ্ধ তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এর পর লিচ্ছবীরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে গেলে বুদ্ধ বলেন, 'আমি আম্রপালীর গৃহে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। কাজেই আপনাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলাম না।' লিচ্ছবীরা আম্রপালীর কাছে গিয়ে অনুরোধ করেন, "আম্রপালী, তোমাকে লক্ষ মুদ্রা দেব, তুমি শাক্যসিংহ বুদ্ধের নিমন্ত্রণ আমাদের জন্য ছেড়ে দাও'। আম্রপালী তখন বলেন, 'আর্যপুত্রগণ, সমগ্র বৈশালী রাজ্যের বিনিময়েও আমি এই নিমন্ত্রণ ছাড়ব না।' লিচ্ছবীরা এতে ক্ষুণ্ন হয়ে হাতে তুড়ি দিয়ে বলে, 'আমাদের এই আমওয়ালী জিতে গেল, এই আমওয়ালীর কাছে আমরা হেরে গেলাম।' আম্রপালী তখন বিগতযৌবনা, নতুবা লিচ্ছবী যুবকেরা তাঁকে 'আমওয়ালী' বলে তাচ্ছিল্য করতে পারত না।

বুদ্ধ যথাসময়ে আম্রপালীর গৃহে গমন করেন এবং আহারশেষে আম্রপালী তাঁর আমবাগানটি বুদ্ধকে দান করেন। তারপর আম্রপালী বুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে ভিক্ষুণী হন। থেরীগাথা নামক ভিক্ষুণীদের রচিত গাথায় আম্রপালীর কয়েকটি অত্যন্ত সুন্দর ও কবিত্বপূর্ণ গাথা পাওয়া যায়। তিনি ভিক্ষুণী হিসাবেও বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। রাজা বিম্বিসারের (দ্র) সঙ্গে আম্রপালীর হৃদ্যতা ছিল।

বি. ব.

আযান

আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ ঘোষণা, আহ্বান। ইসলামী পরিভাষায় আযান অর্থ মসজিদে (দ্র) নামাযে (দ্র) যোগদানের জন্য বিধিবদ্ধ আহ্বান বা ঘোষণা। যিনি এই আহ্বান জানান, তাঁকে বলা হয় মুয়াজ্জিন (দ্র)। শুক্রবার জুমার নামায এবং অন্যান্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে আযান দেওয়ার রীতি প্রচলিত।

জানা যায়, মহানবীর (স.) (দ্র) হিজরতের (দ্র) এক বা

দু' বছর পর আযান দেওয়ার বর্তমান রীতি প্রচলিত হয়। বিখ্যাত দুই সাহাবী (দ্র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে যায়েদ (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) (দ্র) স্বপ্নের মাধ্যমে আযানপ্রণালী লাভ করেন। মহানবী (স.)-এর

অনুমোদনক্রমে তা-ই প্রবর্তিত হয় নামাযের আহ্বানবাক্য হিসাবে। এখনো সমগ্র মুসলিম বিশ্বের কোটি কোটি মসজিদের মিনার থেকে প্রত্যহ নামাযের পূর্বে আযানের ধ্বনি শোনা যায়।

মু. মা.

আয়তন

কোনো বস্তু বা পদার্থ যে পরিমাণ জায়গা দখল করে তাকে ঐ বস্তু বা পদার্থের আয়তন বলে। সুষম কঠিন বস্তুর আয়তন এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা গুণ করে পাওয়া যায়। অসম কঠিন বস্তুর আয়তন এভাবে বের করা যায় না। অসম কঠিন বস্তুর আয়তন বের করতে হলে একে সম্পূর্ণরূপে পানিপূর্ণ কোনো পাত্রে ডোবাতে হয়। যে পরিমাণ পানি উপচে পড়ে তার আয়তন বস্তুটির আয়তনের সমান। অসম ক্ষুদ্র বস্তুকে পানিভর্তি মাপচোঙে ডুবিয়ে পানির আয়তনের পরিবর্তন বা পার্থক্য বের করে অসম বস্তুটির আয়তন নির্ণয় করা যায়।

আয়তন পরিমাপের সি জি এস (c g s = centime-tre- gramme-second) একক হল সিসি (cc = cubic-centimetre) যাকে বাংলায় ঘনসেন্টিমিটার বলে।

আন্তর্জাতিক এককে আয়তন মাপা হয় ঘনমিটারে। কোনো তরল পদার্থের আয়তন বের করতে হলে একে কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের দাগ কাটা পাত্রে ঢেলে পরিমাপ করতে হবে।

হো. আ.

আয়ন (ion)

তড়িতাবিষ্ট পরমাণু (দ্র) বা পরমাণুসমষ্টি। কোনো পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসে যতগুলি প্রোটন (দ্র) থাকে, নিউক্লিয়াসের চারদিকে ততগুলি ইলেক্ট্রন (দ্র) থাকে। এই ইলেকট্রনের সংখ্যা কম হয়ে গেলে পরমাণুটি ধনাত্মকভাবে চার্জড্ বা তড়িতাহিত হয়। আবার ইলেক্ট্রনের সংখ্যা বেশি হলে পরমাণুটি তড়িতাহিত হয় ঋনাত্মকভাবে। এভাবে পরমাণুটির তড়িতাহিত হওয়াকে বলে আয়নায়ন এবং তড়িতাহিত পরমাণু বা পরমাণু-জোটকে বলে আয়ন। ধনাত্মকভাবে তড়িতাহিত পরমাণু বা পরমাণুসমষ্টিকে বলা হয় ক্যাটায়ন আর ঋণাত্মকভাবে তড়িতাহিত পরমাণু বা পরমাণুসমষ্টিকে বলা হয় অ্যানায়ন।

সু. ব.

আয়নমণ্ডল (ionosphere)

ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫০ কিলোমিটার উপরে অবস্থিত আয়নায়িত বায়বীয় স্তর। সূর্যকিরণের তীব্র অতিবেগুনি রশ্মি এই স্তরের বায়ুকে আয়নায়িত করে। এর ফলে আয়ন ও মুক্ত ইলেক্ট্রন (দ্র) সৃষ্টি হয়। আয়নমণ্ডলে মুক্ত ইলেক্ট্রন থাকায় বেতার-তরঙ্গ এই স্তরে প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীর (দ্র) দিকে ফিরে আসে। এর ফলেই পৃথিবীতে অনেক দূরের স্থানেও বেতার-তরঙ্গ পাঠানো সম্ভব হয়। আন্তঃমহাদেশীয় বেতার যোগাযোগ স্থাপনে তাই আয়নমণ্ডল খুব কাজে আসে। তবে বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় এতে কিছু অসুবিধাও হয়। কারণ মহাশূন্য থেকে আসা বিকিরণের বেশির ভাগই আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। আয়নমণ্ডলের তিনটি স্তর : ডি-স্তর (৫০-৯০ কিলোমিটার); ই-স্তর (৯০-১৫০ কিলোমিটার); এবং এফ-স্তর (১৫০-১০০০ কিলোমিটার)।

সু. ব.

আয়না

আয়না বলতে এমন একটি তলকে বোঝানো হয়ে থাকে যার ওপরে আপতিত আলো প্রচুর পরিমাণে প্রতিফলিত হয় ও প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। এখানে লক্ষণীয় যে সব বস্তুই আলোকে প্রতিফলিত করে না। কাঠ, কাপড়, গাছের পাতা বা কালো বস্তুর উপরে যে আলো পড়ে তা বেশির ভাগই শোষিত হয়। কাচ বা স্বচ্ছ কোনো বস্তুর উপরে পতিত আলোর প্রতিসরণ ঘটে। অন্য দিকে পারদ-মাখানো কাচ বা মসৃণ ধাতব পাতের উপরে আপতিত আলো প্রতিফলিত হয়। কিন্তু আপতিত আলো প্রতিফলিত হলেই তা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে না। প্রতিফলনকারী তলকে যথেষ্ট মসৃণ হতে হবে যাতে প্রতিফলিত আলোর রশ্মিগুলো বিক্ষিপ্তভাবে নানা দিকে

ছড়িয়ে না পড়ে। চুনকাম করা সাদা দেয়াল বা বালুর চর আলোকে প্রতিফলিত করে, কিন্তু প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে না। কারণ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হিসাবে এদের পৃষ্ঠদেশ মসৃণ নয় বলে আলোর বিক্ষেপণ ঘটে এসব তল থেকে।

সবচেয়ে পরিচিত আয়না হচ্ছে সমতল আয়না। সমতল আয়নার সামনে কোনো উজ্জ্বল বস্তু রাখলে আয়না পিছন দিকে অসদবিম্ব সৃষ্টি হয়। এই বিম্ব বস্তুর সমমাপের এবং বস্তুটি আয়নার যতটা সামনে বিম্বটি আয়নার ততটা পিছনে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বিম্বটিতে পার্শ্বিক উৎক্রম ঘটে। অর্থাৎ বাঁ দিকটা ডান দিক ও ডান দিকটা বাঁ দিক হয়। বক্র আয়না প্রতিবিম্বের আকৃতিকে বদলে দিতে পারে। বক্র আয়না হতে পারে গোলীয় অথবা উপবৃত্তাকার, উত্তল বা অবতল।

আ. আ.

আয়রন (iron)

বাংলা ভাষায় (দ্র) লৌহ বা লোহা নামে পরিচিত। এটি মৌলিক ধাতব পদার্থ। লোহা কঠিন পদার্থ। খাঁটি লোহা খুব কম পাওয়া যায়। সাধারণত অক্সাইড (দ্র) রূপেই খনিতে পাওয়া যায়। লোহা আবিষ্কৃত হয়েছিল প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। সেকালে লোহা ছিল খুব দামি ধাতু। যুদ্ধ ও শিকারের অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কাজে লোহা খুব বেশি ব্যবহার করা হত। তবে লোহার আকরিক (দ্র) থেকে লোহাকে আলাদা করার উপায় জানতে মানুষের অনেক সময় লেগেছিল। এ পদ্ধতি প্রথমে আবিষ্কৃত হয়েছিল মিশরে ও মেসোপটেমিয়ায় (দ্র), আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে।

লোহা উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল চুল্লি আবিষ্কার। এই চুল্লিতে লোহা গলানো হত। তারপর গলিত লোহা দিয়ে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করা হত।

বিশুদ্ধ লোহা একটু নরম। কার্বন (দ্র) বা বিশেষ ধরনের ধাতু মিশিয়ে একে কঠিন করা হয়। কঠিন লোহাই আমাদের নানা কাজে লাগে। নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্বন মিশিয়ে লোহাকে ইস্পাত (দ্র) বানানো হয়ে থাকে। লোহার একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে, এটি চুম্বক (দ্র) দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

লোহার লাতিন নাম *ফেরাম (ferrum)*। তাই এর রাসায়নিক সঙ্কেতচিহ্ন Fe। লোহার পারমাণবিক ওজন ৫৫.৮৫।

সু. ব.

আয়েশা সিদ্দিকা (রা.), হযরত [৬১৩/৬১৪—৬৭৮]

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ছিলেন হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর স্ত্রী এবং প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রা.) (দ্র)-এর কন্যা। ৬১৩ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ৬১৪) তাঁর জন্ম হয়। তাঁর মায়ের নাম উম্মে রাওমান। হযরত খাদিজা (রা.)-র ইন্তেকালের পর মহানবী (স.)-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন সুন্দরী, গুণবতী ও বিদূষী মহিলা। তাঁর মেধা, বুদ্ধি এবং সুবিবেচনা দ্বারা তিনি অনেক সময় খিলাফতের বহু সমস্যা সমাধান করেন এবং মুসলমানদের বিভিন্ন বিষয়ে দিঙ্‌নির্দেশনা দিতেন।

রসূল (স.) (দ্র)-এর হাদিস (দ্র) বর্ণনাকারী হিসাবে হযরত আয়েশা (রা.)-র বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রখর স্মরণশক্তি তাঁকে সহায়তা করেছে। তিনি ২,২১০টি হাদিস বর্ণনা করেন বলে জানা যায়। কুরআন (দ্র), হাদিস এবং ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন দিকে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি সুবক্তা ছিলেন। এই মহীয়সী মহিলা ৬৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই জুলাই মদিনায় (দ্র) ইন্তেকাল করেন।

মু. মা.

আয়ু

মানুষ কিংবা অন্যান্য জীবের মোট জীবনকালকে আয়ু বলে। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর জীন (দ্র)-গত বৈশিষ্ট্যের জন্য আয়ু বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সবচেয়ে ভাল পরিবেশে রাখলেও দেখা যায়, একটি ইঁদুর সর্বোচ্চ ৩.৫ বছর বাঁচে; একটি কুকুর ৩৪ বছর, মানুষ ১১৫ বছর এবং কচ্ছপ ১৫০ বছর বেঁচে থাকতে পারে। জীবনকালের প্রথম তৃতীয়াংশে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ সবচেয়ে ভাল থাকে। মধ্য-তৃতীয়াংশে শরীরের প্রতিরক্ষা শক্তি,

হর্মোনের (দ্র) কার্যকলাপ এবং প্রজননক্ষমতা কমতে শুরু করে।

কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ উদ্ভিদ কয়েক বছর থেকে কয়েক শ' বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। ব্যতিক্রমের মধ্যে রয়েছে সেকুইয়া (Sequoia) বৃক্ষ—এ গাছ ৩০০০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

যা হোক, বয়সের পরিবর্তন ও শেষ পর্যন্ত মৃত্যু প্রাণী এবং উদ্ভিদ-উভয়ের মধ্যে সব পর্যায়েই ঘটে; এটা বিপাকক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত অণু থেকে শুরু করে অঙ্গাণু, কোষ, কলা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা পুরো জীব পর্যন্ত বিস্তৃত।

চিকিৎসাবিজ্ঞান (দ্র) এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতির ফলে বর্তমান শতকে সংক্রামক ব্যাধি কমে যাওয়ায় অকালমৃত্যুর হার অনেক কমেছে। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য ও পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে মানুষের গড় আয়ু না বাড়লেও আজকাল অধিকাংশ মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে তার ব্যক্তিগত আয়ুর প্রায় শেষ সীমা পর্যন্ত বাঁচছে।

সা. এ.

আয়ুর্বেদশাস্ত্র

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাব্যবস্থার নাম আয়ুর্বেদশাস্ত্র। ব্রহ্মাকে মনে করা হয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্তা। ব্রহ্মার কাছ থেকে প্রথমে প্রজাপতি, পরে তাঁর কাছ থেকে দু' জন অশ্বিনীকুমার এবং এ দু' জনের নিকট হতে দেবরাজ ইন্দ্র আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিক্ষালাভ করেন। এর পর ঋষি ভরদ্বাজ, আত্রেয়, অগ্নিবেশ, চরক (দ্র), সুশ্রুত (দ্র) প্রমুখ ঋষিগণ আয়ুর্বেদশাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। প্রাচীন আয়ুর্বেদচিকিৎসার ক্ষেত্রে চরক ও সুশ্রুতের অবদান সবচেয়ে বেশি।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিজ্ঞানকে অগ্নিবেশ সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করে তা 'অগ্নিবেশসংহিতা' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এর পর চরক অগ্নিবেশসংহিতা বিশেষভাবে সঙ্কলন করেন, যা 'চরকসংহিতা' নামে পরিচিত। চরকের পর সুশ্রুত তাঁর আয়ুর্বেদ বিষয়ক জ্ঞান 'সুশ্রুতসংহিতা' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। আয়ুর্বেদচিকিৎসার ক্ষেত্রে শল্যবিদ্যার (দ্র) প্রয়োগ সুশ্রুতের উল্লেখযোগ্য অবদান।

আয়ুর্বেদশাস্ত্র মোট ৯টি ভাগে বিভক্ত। সেগুলো হল : ১. কায়বিদ্যা বা সর্বাঙ্গব্যাধিবিদ্যা, ২. শল্যচিকিৎসা, ৩. শালাক্য চিকিৎসা বা কণ্ঠার হাড়ের ও পরিভাগস্থ অংশের (যেমন—নাক, কান, গলা, চক্ষু ইত্যাদি) অস্ত্রোপচার, ৪. ভূতবিদ্যা বা মানসিক রোগের চিকিৎসা, ৫. কৌমারভৃত্য বা শিশুরোগবিদ্যা, ৬. অগদচিকিৎসা বা বিষক্রিয়ার চিকিৎসা, ৭. রসায়নশাস্ত্র, ৮. বাজীকরণ বা প্রজনন বিষয়ক চিকিৎসা, এবং ৯. পশুচিকিৎসা।

ভারতবর্ষ থেকে আয়ুর্বেদশাস্ত্র আরব দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। বাগদাদের খলিফা হারুন-উর-রশীদ (দ্র) আয়ুর্বেদচিকিৎসার অনুরক্ত ছিলেন বলে কথিত আছে। 'চরকসংহিতা' এবং 'সুশ্রুতসংহিতা' শীর্ষক আয়ুর্বেদগ্রন্থদ্বয় আরবি ভাষায় (দ্র) অনূদিত হয়েছিল।

সি. না. হ.

আয়োডিন (iodine)

গাঢ় ধূসর বর্ণের কঠিন মৌলিক পদার্থ। পারমাণবিক ওজন ১২৬·৯২, পারমাণবিক সংখ্যা ৫৩।

উদ্বায়ী পদার্থ। বাতাসে উন্মুক্ত রাখলে বেগুনি পদার্থে পরিণত হয়ে উবে যায়। পানিতে প্রায় গলে না, কিন্তু অ্যালকোহলে (দ্র) সঙ্গে সঙ্গে গলে যায়। এই দ্রব-কে বলে টিংচার (tincture) আয়োডিন যা কাটা-ছেঁড়ায় জীবাণু-প্রতিরোধক হিসাবে লাগানো হয়। টিংচার আয়োডিন হচ্ছে সমপরিমাণ আয়োডিন, পটাসিয়াম আয়োডাইড, পানি ও ৯৫% রেক্টিফাইড স্পিরিটের (দ্র) মিশ্রণ। বিভিন্ন সামুদ্রিক শেওলায় ও চিলি সল্ট-পিটার (Salt-petre) নামক একটি খনিজ পদার্থে যৌগিক আকারে পাওয়া যায় এবং তা থেকে বিশুদ্ধ আয়োডিন পৃথক করা হয়। বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে এর যৌগিক মিলনে বিভিন্ন আয়োডাইড সল্ট সৃষ্টি হয়। অনেক খাদ্যবস্তুতে সামান্য আয়োডিন থাকে। খাদ্যে এর অভাবে গলগণ্ড (দ্র) রোগ হয়। বিভিন্ন আয়োডাইড সল্ট ঔষধ (দ্র) হিসাবে এবং আলোকচিত্র-শিল্পে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

আয়োডিনকে বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়। সাগরের পানিতে, সামুদ্রিক শৈবালে, প্রাণীর থাইরয়েড গ্রন্থিতে এবং চিলির সোরার খনিতে। ফরাসি দেশে বের্নার্ কুর্তোয়া (Bernard Courtois) নামে এক রসায়নবিদ ছিলেন।

১৮১১ সালে তিনিই সর্বপ্রথম আয়োডিন প্রস্তুত করেন। সাগরের গভীর পানিতে শৈবাল জাতীয় কয়েক রকমের উদ্ভিদ (দ্র) জন্মে। ঐ সব উদ্ভিদের মধ্যে আয়োডিন বেশি পরিমাণে থাকে। এমন একটি উদ্ভিদের নাম *ল্যামিনারিস স্টেনোফাইলা*। এতে আয়োডিন থাকে শতকরা ০.৪৮ ভাগ। *ল্যামিনারিস ডিজিটাটা* নামে আরেকটি সামুদ্রিক উদ্ভিদে আয়োডিনের পরিমাণ হল শতকরা ০.৪০ ভাগ। এই জাতীয় উদ্ভিদ থেকেই আয়োডিন বের করার এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেন কুর্তোয়া । কুর্তোয়া ঐ দু'রকমের উদ্ভিদকে রোদে ফেলে বেশ ভালভাবে শুকিয়ে নেন। তারপর সেই শুকনো উদ্ভিদকে আগুনের মৃদু তাপে পোড়ান। পোড়াবার সময় সাবধান হন যাতে একটুও আয়োডিন উবে গিয়ে নষ্ট না হয়। পোড়াবার পর কুর্তোয়া যে ছাই পান তার নাম দেন 'কেল্প'। দেখা যায় যে এই কেল্পের মধ্যে আয়োডিনের লবণ 'আয়োডাইড' (iodide) আছে। তার সঙ্গে অবশ্য মিশে থাকে কয়েকটি অবাঞ্ছিত লবণ। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপায়ে কুর্তোয়া ঐ অবাঞ্ছিত লবণগুলোকে দূর করে আয়োডিনের যে লবণ পান তা একটি লোহার বকযন্ত্রে রাখেন। লোহার এই বকযন্ত্রের ওপর সীসার একটি ঢাকনা লাগানো থাকে। সীসার ঢাকনা থেকে বেরিয়েছে নির্গম-নল। নির্গম-নল কয়েকটি চীনামাটির গ্রাহকের সঙ্গে লাগানো থাকে। কুর্তোয়া লোহার বকযন্ত্রটিকে গরম করেন। তাপ পেয়ে বকযন্ত্রের মধ্যকার দ্রবণ (দ্র) থেকে বেগুনি রঙের আয়োডিন বাষ্পমুক্ত হয়। ঐ আয়োডিন বাষ্প ঠাণ্ডা চীনামাটির গ্রাহক পাত্রে গিয়ে জমা হয়। গ্রাহক পাত্র থেকে ছুরি দিয়ে চেঁচে কুর্তোয়া কেলাসিত আয়োডিনকে পৃথক করেন। বেগুনি রঙের উজ্জ্বল কেলাস (দ্র)। গ্রিক ভাষায় ioeides নামে একটি শব্দ আছে। তার মানে বেগুনি রঙ। কুর্তোয়া-র আবিষ্কৃত নতুন ঐ রাসায়নিক দ্রব্যটিও বেগুনি রঙের। তাই তিনি ঐ রাসায়নিক দ্রবটিরও নাম দেন 'আয়োডিন'।

আ. হ. খ.

আর-এইচ-ফ্যাক্টর রক্তগ্রুপ দ্র

আরতি

একটি বিশেষ ধরনের আরাধনা। দেবমূর্তি বরণ উপলক্ষে এটি করা হয়। এর প্রধান উপাদান পাঁচটি : দীপমালা, জলপূর্ণ শঙ্খ, ধৌতবস্ত্র, অশ্বত্থ পত্র বা বেলপাতা এবং সাষ্টাঙ্গপ্রণাম। ধূপধুনা ও কর্পূর বাতির সাহায্যেও আরতি করা হয়। এসব সামগ্রী বিশেষ একটি পাত্রে নিয়ে প্রথমে দেবতার পদতলে চার বার, তারপর নাভিদেশে দু' বার, মুখমণ্ডলে তিন বার এবং সর্বাঙ্গে সাত বার ঘোরাতে হয়। এর একটি বিশেষ কায়দা আছে। বাজনার তালের সঙ্গে মিল রেখে হেলেদুলে নেচে নেচে তা করতে হয়।

আরতিকে আরো কয়েকটি নামে অভিহিত করা হয়। সেগুলো হল—আরাত্রিক, নীরাজন, নির্মন্থন ইত্যাদি।

সুজ. ব.

আরব জাতি

আজকের দিনে যেসব মানুষের মাতৃভাষা আরবি (দ্র), যারা আরব অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছে কিংবা আরব সংস্কৃতিকে নিজস্ব সংস্কৃতি বলে দাবি বা স্বীকার করে তাদের আরব জাতি বলা যায়। এরা এক অঞ্চলের মানুষ কিংবা এক গোষ্ঠীভুক্ত নাও হতে পারে। সাদা-কালো-তামাটে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ এর অন্তর্ভুক্ত। উত্তর আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া পর্যন্ত এক বিস্তৃত ভূখণ্ডে আরবেরা বসবাস করে।

তবে একদা আরব বলতে বোঝাত খাস আরব উপদ্বীপের বেদুইন গোষ্ঠীসমূহ। এরা মূলে সেমিটিক জাতিভুক্ত মানুষ এবং যাযাবর জীবন যাপন করত। এদের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত নিচু মানের। দারিদ্র্য, লুণ্ঠন, মৃত্যু আর ক্ষুধা ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। তবে এরই মধ্যে তারা একটি চমৎকার ভাষা (আরবি) এবং কাব্যসম্ভার গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। অতিথিপরায়ণতা ছিল এদের বৈশিষ্ট্য।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইসলাম ধর্ম (দ্র) এদের ঐক্যবদ্ধ করে। একতাবদ্ধ হয়ে কালক্রমে এরা এক বিশাল সামন্ত-সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

বিভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্যচেতনা, অর্থনৈতিক অবনতি, আত্মকলহ এবং বহিরাক্রমণের ফলে এই আরবীয় সভ্যতার পতন ঘটে। তারা প্রথমে তুর্কি এবং পরে ইউরোপীয় শাসনাধীনে চলে যায়। পশ্চিমী সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভাবে ২০ শতকে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। বিভিন্ন অঞ্চলের অতীত সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলোকে

বিভিন্ন রাষ্ট্র আপন সত্তা নিয়ে জেগে ওঠে। বর্তমানে প্রায় ২০ কোটি আরব ১৯টি স্বাধীন রাষ্ট্রে বাস করছে। সেগুলো হল : আলজেরিয়া, বাহরাইন, মিশর, ইরান, জর্দান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সুদান, সিরিয়া, তিউনিসিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ইয়েমেন। পশ্চিম সাহারাকেও আরব অঞ্চল ধরা হয়। মরক্কো এর দাবিদার।

আরব জাতির বেশির ভাগ মানুষই ইসলামধর্মাবলম্বী, তবে কিছু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীও আছে।

সৈ. আ. ই.

আরব লীগ

আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত সংগঠন। ১৯৪৫ সালের ২২শে মার্চ মিশর, ইরাক, জর্দান, লেবানন, সৌদি আরব, সিরিয়া এবং ইয়েমেন কর্তৃক এটি গঠিত হয়। পরে আলজেরিয়া, বাহরাইন, কুয়েত, লিবিয়া, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, ওমান, কাতার, সোমালিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন, সুদান, তিউনিসিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত এই সংগঠনে যোগদান করে।

সদস্য রাষ্ট্রসমূহের যে কোনো বিরোধ মীমাংসা করা, আন্তর্জাতিক চুক্তির বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করা এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সামরিক ও কূটনৈতিক বিষয়ে পররাষ্ট্রনীতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করাই আরব লীগের মূল উদ্দেশ্য। আগে এর সদর দপ্তর ছিল মিশরের কায়রোতে। মিশর-ইসরায়েল শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর মিশর সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিলে কায়রো থেকে আরব লীগের সদর দপ্তর তিউনিসে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে এর সদস্যসংখ্যা ২১।

সুজ. ব.

আরব সভ্যতা

বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ সভ্যতার একটি। আনুমানিক খ্রি.পূ. ৩৫০০ থেকে খ্রি.পূ. ৫০০ অব্দের মধ্যে সেমিটিক জাতির বিভিন্ন অংশ দজলা–ফুরাত উপত্যকা, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও সিনাই উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন সভ্যতা গড়ে তোলে।

খ্রি.পূ. ৯ম শতাব্দীর অ্যাসেরীয় উৎকীর্ণ-লিপি থেকে জানা যায়, আরব বলতে আরব উপদ্বীপের সুদূর উত্তরাঞ্চলের

যাযাবরদেরকেই বোঝানো হত। এর পর সমগ্র আরব উপদ্বীপের এবং মধ্যপ্রাচ্যের মরু এলাকার অধিবাসীদের আরব বলে অভিহিত করা হতে থাকে। মধ্যযুগে তারা অভিহিত হত 'স্যারাসেন' নামে। এরা ছিল মূর্তিপূজক ও প্রকৃতিপূজক। আরব সভ্যতা প্রাথমিকভাবে মিশরীয় ও মেসোপটেমীয় সভ্যতা (দ্র) দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। পরবর্তী কালে যে আরব সভ্যতা (দ্র) গড়ে ওঠে তার অবস্থান ছিল মূলত দক্ষিণ অঞ্চলে।

প্রাচীন কালে আরব অঞ্চলে দু'টি রাজতন্ত্র গড়ে ওঠে। একটির নাম মিনায়েম (খ্রিষ্টপূর্ব আনু. ৭০০ অব্দ থেকে খ্রি.পূ. ৩য় শতক)। অন্যটির নাম সাবাইন, খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ৭৫০ অব্দ থেকে খ্রি.পূ. ১১৫ অব্দ সময়সীমার মধ্যে সাবাতিয়ান রাজতন্ত্রকে ঘিরে একটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে দক্ষিণাঞ্চলীয় এ দু'টি আরব রাজতন্ত্রের আমলে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এই সময় আরবদের মুখ্য রপ্তানি পণ্য ছিল নানা ধরনের সুগন্ধী দ্রব্য, পাথর ও মসলা।

'জাহেলিয়া' বা তমসাচ্ছন্ন নামে কথিত যুগে মক্কা (দ্র) ছিল ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবে পশ্চিম এশিয়ার সমৃদ্ধতম নগরী। স্থল-বাণিজ্যপথে আরব বণিকদের ছিল নিরঙ্কুশ আধিপত্য। এই সময় মক্কায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। মহাজনী ব্যবসা প্রসার লাভ করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সহায়ক হিসাবে 'ক্লিয়ারিং হাউস' বা নিকাশ-ঘর স্থাপন করা হয়।

জাহেলিয়া যুগের অর্থাৎ প্রাক-ইসলামী যুগের কবি ও পণ্ডিতদের মধ্যে ইমরুল কায়েস, তারাকা আমর, উম্মে কুলসুম, লোবিদ, যুহায়ের, হারিস ও আনতারার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'আল মুয়াল্লাকাত', 'দিওয়ান-আল-হামসা' এবং 'কিতাব-আল-আগানী' নামক বিভিন্ন গ্রন্থে এই যুগের গীতিকবিতাসমূহ সঙ্কলিত হয়েছে।

আরবের সাংস্কৃতিক জীবনে 'উকাজ' নামে একটি মেলার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। প্রতি বছর এখানে সাহিত্য-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিতা (দ্র) কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হত। এ জাতীয় কবিতার একটি সঙ্কলন উমাইয়া আমলে প্রস্তুত করা হয়। সমগ্র আরবি সাহিত্যে এই সব কবিতা অসাধারণ সৃষ্টি বলে অভিহিত।

৬১০ থেকে ৬৫১ খ্রিস্টাব্দ সময়সীমার মধ্যে কুরআন শরীফ (দ্র) সঙ্কলন ও লিপিবদ্ধকরণের কাজ সমাপ্ত হয়। হযরত মুহম্মদের (স.) (দ্র) ব্যক্তিগত জীবনাচারের দৃষ্টান্ত ও কুরআনের মানুষে মানুষে সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের উদার বাণী আরব ভূখণ্ড ছাড়িয়ে বিস্তৃত হলে এক নতুন সভ্যতার উন্মেষ ঘটে।

৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয় ইসলাম (দ্র) ধর্মাবলম্বী আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনকাল। ৭৮৬ থেকে ৮০৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কালকে বলা হয় আরব সভ্যতার স্বর্ণযুগ। বাগদাদ ছিল এই সময়ে সাম্রাজ্যের মূলকেন্দ্র। ফলে এখানে গড়ে ওঠে বিশাল সব সুরম্য অট্টালিকা, উদ্যান, বিপণিকেন্দ্র, রাস্তাঘাট, বিনোদনকেন্দ্র ইত্যাদি। বাণিজ্যেরও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয় বাগদাদ। এই সময় আরবি ভাষার (দ্র) ব্যাপক প্রসার ঘটে।

আরবদেরকে বলা হয় আধুনিক বিজ্ঞানের জনক। চিকিৎসাবিজ্ঞান (দ্র), গণিত (দ্র) ও রসায়নশাস্ত্রে (দ্র) তাদের রয়েছে মৌলিক অবদান। দূরবীন, দিগ্‌দর্শন ও বকযন্ত্র (distillation) আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাদেরই। পাশ্চাত্যে পায়ে মোজা পরার প্রচলন ঘটায় আরবীয়রাই। ভেষজবিদ্যার (দ্র) ক্ষেত্রেও তাদের রয়েছে প্রভূত অবদান।

বাগদাদ ছাড়াও আরবীয় স্পেনের রাজধানী কর্দোবা (Cordova) এবং কায়রো, বসরা ও কুফা ইত্যাদি নগরী ছিল বিদ্যানুশীলদের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই সভ্যতার অবদান কম নয়। 'আরব্য রজনী'(দ্র) বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। ৯ম খ্রিস্টাব্দে আরবীয় সঙ্গীতকলার প্রভূত বিকাশ ঘটে। তাদের কাছ থেকেই ভারতীয়রা একটি বাদ্যযন্ত্র—তবলা এবং ইউরোপীয়রা 'লিউট' নামের একটি বীণাযন্ত্র গ্রহণ করে।

আ. হু.

আরবি ভাষা

মানুষের সমাজকে যেমন জাতি হিসাবে নানা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে (যথা—ইংরেজ, ফরাসি, রুশ, বাঙালি, চৈনিক ইত্যাদি) তেমনি মানুষের মুখের ভাষাকেও কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে। একই ভাষা-পরিবারের সদস্য যেসব ভাষা তাদের মধ্যে কোনো-না-কোনো ধরনের মিল থাকে।

এ ধরনের একটি ভাষাগোষ্ঠী বা ভাষা-পরিবার হল

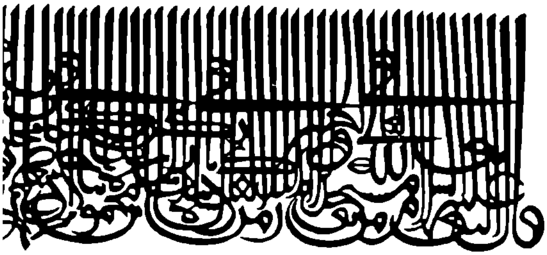

আরবি লিপি, শিল্পীদের হাতে পড়ে হয়ে উঠেছে অপূর্ব সুন্দর ক্যালিগ্রাফি চিত্র

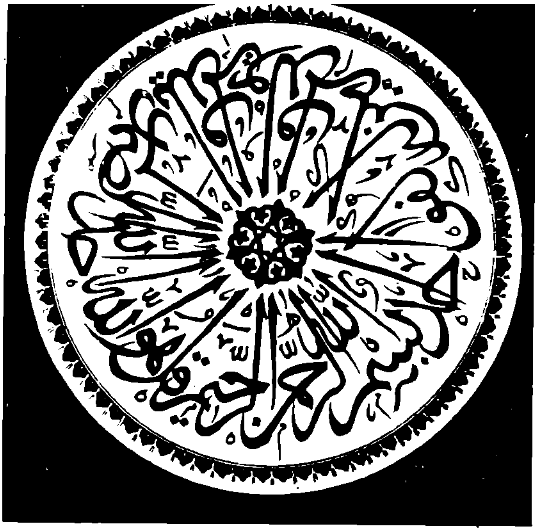

সেমিটিক (Semitic)। এই সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠীর আবার তিনটি আলাদা-আলাদা বংশ ছিল : দক্ষিণী সেমিটিক, পশ্চিমী সেমিটিক, আর পূর্বী সেমিটিক।

দক্ষিণী সেমিটিকের বংশ থেকে দু'টি শাখা বেরিয়েছে : আরবি ভাষা ও ইথিওপীয় ভাষা। আরবি ভাষা লিখতে হয় ডান দিক থেকে বাঁ দিকে, আর আরবি লিপির উদ্ভব হয়েছে আরামাইক্ লিপি থেকে। আরব দেশগুলোর সব ক'টিতেই (যেমন—আরব আমিরাত, সিরিয়া, কুয়েত, ওমান, ইয়েমেন, ইরাক, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, সুদান, লিবিয়া, লেবানন, সৌদি আরব, জর্দান, ইসরায়েল) মাতৃভাষা হিসাবে আরবি চালু আছে। আরবি ভাষার লেখ্য রূপ সর্বত্র এক রকম হলেও কথ্য আরবির ক্ষেত্রে দেশে দেশে কিছুটা পার্থক্য আছে। এটি একটি সর্বজনস্বীকৃত আন্তর্জাতিক ভাষা। মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, মিশর, ইরাক, সৌদি আরবে যে আরবি বলা হয় তাতে উচ্চারণগত নানা পার্থক্য বর্তমান। আরবি ভাষায় কুরআন (দ্র) প্রবর্তিত হওয়ার ফলে সারা দুনিয়ার মুসলমানেরা এ ভাষাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলন করে থাকেন।

আরবি ভাষায় বাংলার মতো দুটি লিঙ্গ (পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ) রয়েছে, ক্লীব লিঙ্গ নেই। বচন আছে তিনটি : একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন।

আরবি বর্ণমালায় মোট ২৮টি বর্ণ। এগুলো সবই ব্যঞ্জন বর্ণ। বর্ণমালায় কোনো স্বরবর্ণ নেই, কিন্তু স্বরধ্বনি বোঝায় এমন চিহ্ন আছে—অনেকটা বাংলার মতো, া ি ু ইত্যাদি। যে কোনো ব্যঞ্জনবর্ণে এই স্বরধ্বনির চিহ্নগুলো বসতে পারে। ইংরেজির মতো বড় বা ছোট বর্ণমালা নেই, তবে শব্দের আদিতে মধ্যে বা অন্তে অক্ষরের রূপ কিছুটা পাল্টে যায়।

হা. মা.

আরব্য রজনী

আরবি ভাষায় (দ্র) রচিত বিশ্বের সবচাইতে বিখ্যাত গল্পগুচ্ছ। গ্রন্থটি 'সহস্র ও এক রজনী' নামেও পরিচিত। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতেই লোকমুখে এর ২৬৪টি গল্পের কয়েকটি চালু ছিল। পরবর্তী সময়ে আরবেরা স্বদেশের সীমানার ব'ইরে থেকেও কয়েকটি কাহিনী আহরণ করে এর সঙ্গে যুক্ত করে। আমরা বর্তমানে 'আরব্য রজনী'-র যে রূপ দেখি তা ১৪৫০ সাল নাগাদ পূর্ণতা লাভ করে। যে কাঠামো আশ্রয় করে 'আরব্য রজনী'-র গল্পগুলি গড়ে উঠেছে তা নিম্নরূপ :

সুলতান শাহরিয়ার ছিলেন অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ ও ঈর্ষাপরায়ণ এক ব্যক্তি। তাঁর ধারণা, স্ত্রীলোক মাত্রই অবিশ্বাসী ও প্রতারক। তাই তিনি প্রতি সন্ধ্যায় এক স্ত্রী গ্রহণ করতেন এবং বিয়ের প্রথম রজনী অতিক্রান্ত হবার পর ভোর বেলায় তাকে হত্যা করতেন। এইভাবে তিনি যখন শাহারজাদ নাম্নী এক রমণীকে বিয়ে করলেন তখন সুলতানের নবপরিণীতা স্ত্রী বললেন যে তিনি স্বামীকে অর্থাৎ সুলতানকে একটি গল্প শোনাতে চান, সুলতান তাকে হত্যা করলেও গল্পটি শেষ হবার আগে যেন না করেন। সুলতান কথা দিলেন এবং শাহারজাদ গল্প বলতে শুরু করলেন। বাসররাতে গল্প বলা শুরু করে গল্পটি বুদ্ধিমতী শাহারজাদ শেষ করি-করি করেও শেষ করলেন না। তিনি সুলতানের তীব্র কৌতূহল জাগিয়ে রাখলেন। ভোর বেলায় শাহারজাদকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে সুলতান তাঁকে আবার পরের রাতে গল্পটি শেষ করতে নির্দেশ দিলেন। সে রাতেও শাহারজাদ গল্পটি শেষ করলেন না। এইভাবে সময় কেটে যেতে থাকে। এক

হাজার এক রজনী ধরে শাহারজাদ গল্প বলে চলেন আর সুলতান মুগ্ধ হয়ে তাঁর গল্প শুনতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত শাহারজাদ সুলতানের মন জয় করে নেন, তাঁকে পুত্রসন্তান উপহার দেন এবং সুলতান শাহরিয়ার স্ত্রী শাহারজাদকে হত্যা করবার সঙ্কল্প চিরতরে ত্যাগ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরব্য রজনীর গল্পগুলি অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপে (দ্র) এসে পৌছায় এবং বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। আলিবাবা ও চল্লিশ চোর, আলাদীন ও তার জাদুই চেরাগ, নাবিক সিন্দবাদ প্রভৃতি গল্প এখন সমগ্র বিশ্বের সম্পদ।

পৃথিবীর নানা ভাষায় আরব্য রজনীর গল্পগুলির অজস্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। মূল গল্পগুলিতে তথ্য ও কল্পনা, বাস্তবতা ও অতিপ্রাকৃত, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ ও অভিজাত বিত্তশালীদের জীবন, দুঃসাহসিক অভিযান, আনন্দ উপভোগের নেশা এবং তার পাশাপাশি সুন্দর নিষ্কলঙ্ক নৈতিক জীবন যাপনের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার বিষয়সমূহ অতি চমৎকারভাবে পরিবেশিত হয়েছে। প্রাচ্যের সৌন্দর্য ও রহস্যময়তা 'আরব্য রজনীতে' যেভাবে ফুটে উঠেছে আর কোথাও তেমনভাবে ফুটে ওঠে নি।

ক. চৌ.

আরসোলা

আরসোলা বা তেলাপোকা একটি অতি পরিচিত সন্ধিপদী প্রাণী। ইংরেজিতে বলে কক্‌রোচ্ (cockroach)। মেরু অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীর (দ্র) সব জায়গাতেই এদের দেখতে পাওয়া যায়। নিশাচর এই পতঙ্গটি অন্ধকার স্যাঁতসেতে গরম স্থানে থাকতে পছন্দ করে। এদের প্রায় ৪০০০ প্রজাতি রয়েছে। এদের মধ্যে *পেরিপ্লানেটা আমেরিকানা (Periplaneta americana)* এবং *ব্লাটা ওরিয়েণ্টালিস (Blatta orientalis)* আমাদের দেশের দু'টি সাধারণ প্রজাতি।

হাল্কা বাদামি থেকে গাঢ় বাদামি রঙের আরসোলার দেহ লম্বা, চ্যাপ্টা এবং দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। দেহ কাইটিনজাত পদার্থের একটি আবরণে মোড়ানো। একে বহিঃকঙ্কাল বলা হয়। এদের দেহ বাইরে থেকে খণ্ডিত এবং মাথা, বুক ও পেট এই তিনটি অংশে বিভক্ত। আরসোলার প্রায় একই ধরনের তিন জোড়া পা এবং দু'জোড়া পাখা থাকে। এদের বেশ লম্বা দু'টি শুঙ্গ বা অ্যান্টেনা (দ্র) থাকে। অ্যান্টেনা স্পর্শ এবং গন্ধ নেওয়ার ইন্দ্রিয়রূপে কাজ করে। তেলাপোকার মাথার সামনে দু' পাশে দু'টি কালো অর্ধবর্তুলের

মতো পুঞ্জাক্ষি থাকে। প্রতিটি পুঞ্জাক্ষি আসলে অসংখ্য সরলাক্ষির সমষ্টি। প্রত্যেকটি সরলাক্ষিকে *অসিলাস (ocellus)* বা *ওমাটিডিয়াম (ommatidium)* বলা হয়। কোনো বস্তুর সামান্য নড়াচড়াও পুঞ্জাক্ষিতে ধরা পড়ে।

আরসোলা সর্বভুক প্রাণী। এরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবস্তু থেকে শুরু করে কাগজ, কাপড়, তুলা, চামড়া ইত্যাদি খায়। তেলাপোকার পরিপাকনালী এবং দেহপ্রাচীরের মাঝখানে প্রকৃত *সিলোম (true coelom)* থাকে না। এটাকে *হিমোসিল (haemocoele)* বলা হয়, যা আসলে রক্তসংবহন তন্ত্রের (দ্র) অংশ। তেলাপোকার রক্ত বর্ণহীন। কারণ এতে কোনো শ্বাসরঞ্জক বা হিমোগ্লোবিন (দ্র) থাকে না।

তেলাপোকা একলিঙ্গ (unisexual) প্রাণী। পুরুষ

তেলাপোকার নবম খণ্ডের নিচে একজোড়া কাঁটার মতো কূর্চ (anal style) থাকে। স্ত্রী তেলাপোকায় এটা থাকে না। এই বৈশিষ্ট্য দিয়ে সহজেই পুরুষ ও স্ত্রী তেলাপোকা শনাক্ত করা যায়। তেলাপোকা যৌন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করে।

স্ত্রী আরসোলার নিষিক্ত ডিম্বাণুর ওপর কোলেটারাল গ্রন্থি (collateral glands) থেকে নিঃসরণ জমা হয়ে একটি আবরণী তৈরি করে এবং এটি পরে শক্ত হয়ে কালচে বাদামি থলি তৈরি করে, যাকে উথিকা (ootheca) বলা হয়। একটি স্ত্রী তেলাপোকা অন্তত ৩০টি উথিকা তৈরি করতে পারে। উথিকা ডিমসমূহকে শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। *পেরিপ্লানেটা আমেরিকানার* প্রতিটি থলিতে সাধারণত দু' সারিতে ১০টি করে মোট ২০টি ডিম থাকে। *ব্লাটা ওরিয়েন্টালিসের* ক্ষেত্রে দু'সারিতে ১৬টি ডিম থাকে। উথিকা লম্বালম্বি ফেটে গেলে প্রতিটি প্রকোষ্ঠ থেকে একটি করে শিশু তেলাপোকা (nymph) বের হয়ে আসে। একটি শিশু তেলাপোকা কয়েক বার খোলস পাল্টানোর পর পূর্ণাঙ্গ আরসোলায় পরিণত হয়। খোলস বদলানোকে একডাইসিস (ecdysis) বা মৌল্টিং (moulting) বলে।

তেলাপোকা একটি অপকারী পতঙ্গ। এরা খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র, কাপড়চোপড়, কাগজপত্র ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য জিনিস নষ্ট করে। অনেক সংক্রামক ব্যাধি বিস্তারেও এদের ভূমিকা রয়েছে। অবশ্য এদের উপকারী ভূমিকাও রয়েছে। যেমন— এরা শুধু হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসাবেই নয়, কোনো কোনো দেশে মানুষের খাদ্য রূপেও ব্যবহৃত হয়। মাছ ধরার জন্য বঁড়শিতে টোপ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। জীববিজ্ঞানের গবেষণাগারে ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণের জন্যও তেলাপোকার ব্যবহার রয়েছে।

সা. এ.

আরাগঁ, লুই [১৮৯৭—১৯৮২]

ফরাসি কবি ও সাহিত্যিক আরাগঁ (Louis Aragon) আধুনিক যুগের অন্যতম পুরোধা শিল্পী।

আরাগঁ ১৮৯৭ সালে প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে স্যুররিয়ালিস্ট কাব্য-আন্দোলনে যোগ দিয়ে এর সমৃদ্ধি ও বিস্তার সাধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩০ সালে তিনি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন এবং ১৯৩৪ সালে যোগ দেন ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টিতে।

হিটলারের (দ্র) নাৎসি (দ্র) বাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় ফ্রান্স দখল করে নিলে যে প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হয়, তিনি তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই সময় তাঁর কবিত্বশক্তি নবজীবন লাভ করে। গোপনে প্রকাশিত তাঁর কবিতা স্বদেশবাসীর দুঃখ-বেদনা, ক্রোধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়।

গল্প, উপন্যাস (দ্র), কবিতা (দ্র) ও প্রবন্ধ (দ্র) মিলিয়ে আরাগঁর গ্রন্থসংখ্যা অজস্র। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের নাম 'ল্য পইজঁ দ্য পারী' এবং গল্পসংকলন 'ব্রোয়া কঁৎ'। 'আয়নার সামনে এল্সা' সিরিজের কবিতাসমূহও ফরাসি সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

১৯৮২ সালে লুই আরাগঁ প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

আরাফাত

আরাফাত মক্কার (দ্র) অদূরবর্তী একটি পাহাড়ের নাম। তবে 'আরাফাত' নামের প্রসিদ্ধি এই পাহাড়ের জন্য নয়, পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে প্রসারিত বিশাল প্রান্তরের জন্য। কারণ এই প্রান্তরে প্রতি বছর ৯ই জিলহজ্ব তারিখে সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলমান সমবেত হন এবং নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে হজ্ব (দ্র) পালন করেন। আরাফাত বিশ্ব-মুসলিমের পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের কেন্দ্র এবং ঐক্যচেতনার প্রতীক হিসাবেও বিবেচিত হয়।

মু. মা.

আরিস্টোটল [খ্রি.পূ. ৩৮৪—৩২২]

সর্বকালের অন্যতম প্রধান দার্শনিক হিসাবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। জন্ম ম্যাসিডোনিয়ার একটি নগরে ৩৮৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। মৃত্যু ৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। পিতা ছিলেন

চিকিৎসক। ১৭ বছর বয়সে তিনি প্লেটোর (দ্র) একাডেমীতে যোগ দেন ছাত্র হিসাবে। প্লেটোর মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ২০ বছর ধরে সেখানে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৩ সালে তিনি বিশ্বজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের (দ্র) শিক্ষক হিসাবে ম্যাসিডনে যান। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিলে তিনি এথেন্সে ফিরে আসেন। পরে ৩৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লাইসিয়াম নামক স্থানে নিজেই একটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। এখানে অবস্থানকালেই তিনি তাঁর প্রধান রচনাগুলো সমাপ্ত করেন। জীবন ও জগতের এমন কোনো দিক ছিল না যে দিকে তিনি গবেষকের দৃষ্টিতে তাকান নি। এ জন্য তাঁকে জ্ঞানের সমুদ্র বলা হত। বিজ্ঞান ও দর্শনে তাঁর চিন্তা দেড় হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বের জ্ঞানপিপাসুদের প্রভাবিত করেছে। তিনি মনে করতেন, মাটি (দ্র), বায়ু (দ্র), আগুন (দ্র) ও পানি (দ্র) এই চারটি মূল পদার্থে এই পৃথিবী (দ্র) বিভক্ত।

আরিস্টোটলের সব তত্ত্ব বা ব্যাখ্যা সঠিক ছিল না। তবু তিনি দার্শনিক এই কারণে যে পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৌলিক বিষয়ে প্রথমে তিনিই চিন্তার সূচনা করেছিলেন। আর তা থেকেই পরবর্তী কালে মানুষের জ্ঞান এগিয়েছে। পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, রাজনীতি, যুক্তিবিদ্যা, কাব্যতত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত বেশ কিছু পুঁথি পাওয়া গেছে। তাঁর রচিত কাব্যতত্ত্বে স্থান ও কালের ঐক্য বিষয়ে যে কথা বলা আছে তা অনেক ক্ষেত্রেই আজও সত্য। তাঁকে 'যুক্তিশাস্ত্রের জনক' বলা হয়, কারণ ইউরোপের (দ্র) দর্শনের ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তা ও চিন্তার প্রকাশকে বিশ্লেষণ করে তিনিই প্রথম সুশৃঙ্খলভাবে তার প্রকার নির্ধারণ করেন।

আ. মা.

আর্কটিক সুমেরু দ্র

আর্কবাতি (electric arc)

কোনো তড়িৎ-বর্তনীর মাঝখানে অতি সামান্য শূন্যস্থান বা ফাঁক সৃষ্টি হলে সেখানে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়। তড়িৎ-চার্জ লাফিয়ে ঐ ফাঁকা স্থান অতিক্রম করে, বর্তনী পূর্ণ হয়। বর্তনীর ফাঁকের দুই প্রান্তকে বলে মেরু। দুই মেরুর মাঝখানে বিভবপার্থক্য সৃষ্টি হলে এদের মধ্যবর্তী স্থানের বায়ু (গ্যাস) আয়নিত (চার্জযুক্ত) হয়। এক্ষেত্রে চার্জ (দ্র) একটি মেরুদ্বার থেকে অন্য মেরুদ্বারে যাওয়ার সময় স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে। এই স্ফুলিঙ্গ সরলরেখা বরাবর না গিয়ে বৃত্তচাপের মতো বাঁকা পথে মেরু দু'টিকে যুক্ত করে। তাই একে বলে ইলেকট্রিক আর্ক, সংক্ষেপে আর্কবাতি। ১৮০৮ সালে স্যার হামফ্রি ডেভি (দ্র) সর্বপ্রথম দু'টি কার্বনদণ্ডকে মেরুদ্বার হিসাবে ব্যবহার করে অত্যুজ্জ্বল আর্কবাতি উদ্ভাবন করেন।

আর্কের বিস্তৃতি বিভবপার্থক্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর্ক-বাতির মেরুদ্বার তৈরি হয় ধাতু (দ্র), গ্রাফাইট (দ্র) অথবা গ্রাফাইটমিশ্রিত ধাতুদণ্ড দিয়ে। এই দণ্ডের প্রান্তগুলো থাকে অত্যন্ত সূচালো। একটি তড়িৎ-দ্বার থেকে অন্য তড়িৎ-দ্বারে চার্জ লাফিয়ে যাওয়ার সময় বাষ্প, তাপ ও আলো উৎপন্ন হয় এবং দণ্ডটি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দণ্ডের মধ্যে ফাঁক সব সময় সমান রাখলে তড়িৎপ্রবাহ ও বাতির উজ্জ্বলতা সমান থাকে। এটা করা হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে। যেসব কাজে অত্যুজ্জ্বল আলোর প্রয়োজন, যেমন— সার্চলাইটে, থিয়েটারের স্পটলাইটে, চলচ্চিত্র প্রক্ষেপণে, ক্যামেরার ফ্লাশগান ইত্যাদি ক্ষেত্রে আর্কবাতি ব্যবহৃত হয়।

স. রা.

মেঝেতে এঁকে গণিতের সূত্র সমাধানে আর্কিমিডিস

আর্কিমিডিস [খ্রি. পূ. ২৮৭–২১২]

প্রাচীন গ্রিসের অধিবাসী। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী এবং যন্ত্রপ্রকৌশলী। জন্ম আনুমানিক ২৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, মৃত্যু খ্রিস্টপূর্ব ২১২ অব্দে। সম্ভবত তিনি সিসিলি দ্বীপের সিরাকিউসে জন্মগ্রহণ করেন। গণিত (দ্র) ও বিজ্ঞানে (দ্র) তিনি অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর তত্ত্বীয় বিজ্ঞানচর্চার বেশির ভাগ তথ্যই অবলুপ্ত হয়েছে। যে সামান্য তথ্য এখনো মেলে তা থেকে তাঁর জ্ঞানের পরিমাপ সম্ভব নয়।

তিনি লিভার (lever)-এর সূত্র, প্লবতার নীতি বা তরলে নিমজ্জিত বস্তুর ওজনহীনতা, ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্র আবিষ্কার করেন। স্থিতিবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্ব আবিষ্কার করে তিনি স্থিতিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ভারকেন্দ্রের ধারণা দেন। তিনি বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের সম্পর্ক r-এর মান $\frac{২২}{৭}$ পুনর্নির্ধারণ করেন। তিনি এক ধরনের পানি তোলার পাম্প তৈরি করেন, তার নাম 'আর্কিমিডিসের স্ক্রু'। শত্রুবাহিনীর ওপর পাথর ছোঁড়ার জন্য তিনি বিশেষ ধরনের ক্ষেপণযন্ত্র, দূর থেকে শত্রুজাহাজে আগুন ধরানোর জন্য প্রতিফলক দর্পণ ইত্যাদি আবিষ্কার করেন। সম্ভবত তিনি তৎকালীন মিশরের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়াতে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অজস্র লেখার মধ্যে ৯টি গবেষণা-প্রবন্ধ এখনো বিদ্যমান। রোমক বাহিনী খ্রি.পূ. ২১২ অব্দে সিসিলি দখল করে। রোমের সেনাধ্যক্ষের নির্দেশ ছিল আর্কিমিডিসকে জীবিত গ্রেফতার করার, কিন্তু জনৈক সৈন্য তাঁকে চিনতে না পেরে হত্যা করে বসে।

স. রা.

আর্গন (argon)

একটি মৌলিক গ্যাস (দ্র)। বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ খুবই কম, মাত্র ০·৯ শতাংশ। আর্গন একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস (দ্র) অর্থাৎ সহজে অন্য কোনো পদার্থের সঙ্গে এটি রাসায়নিকভাবে মিলিত হতে পারে না। আর্গন গ্যাস সাধারণত বৈদ্যুতিক বাল্বে ব্যবহার করা হয়।

গ্রিক ভাষায় আর্গন শব্দের অর্থ নিষ্ক্রিয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নিতে চায় না বলেই গ্যাসটির এই নাম রাখা হয়। আর্গনের রাসায়নিক সঙ্কেতচিহ্ন প্রথমে A রাখা হয়, পরে তা Ar করা হয়। এর পারমাণবিক ওজন ৩৯·৯৪।

সু. ব.

আর্চারি (archery)

আর্চারি-কে সহজ বাংলায় তীরন্দাজি বা তীর-ধনুকের খেলা বলা যেতে পারে। মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে অর্থাৎ প্রস্তর-যুগের (দ্র) পর থেকেই এই অস্ত্র মানুষ নিজের বাঁচার তাগিদে শিকার করার কাজে ব্যবহার করেছে। ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত তৎকালীন বিশ্বে তীর-ধনুকের ব্যবহার ছিল সর্বব্যাপী। বারুদ আবিষ্কারের পরে তীর-ধনুকের ব্যবহার চিত্তবিনোদনমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। খ্রিস্টের জন্মের বিশ হাজার বছর পূর্বেও তীর-ধনুকের ব্যবহার মানুষ জানত। স্পেন, ফ্রান্স, সুইডেন, পুরাতন রোম ও মিশরের গুহার অভ্যন্তরে অঙ্কিত পাথরের গায়ে আঁকা ছবি থেকে তা সুবিদিত হয়েছে।

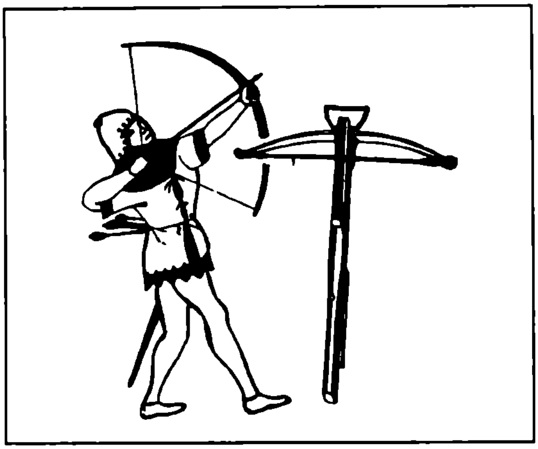

ব্রিটেনের ইয়র্ক নামক স্থানে ১৮৪৪ সালে তীরন্দাজি প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। ১৯৩১ সালে FITA (Fédération Internationale de Tir à l'Arc) আন্তর্জাতিক আর্চারি ফেডারেশন গঠিত হয়। বর্তমান বিশ্বে এই ফেডারেশনের সদস্যসংখ্যা এক শ' ত্রিশের বেশি। ১৯০০ সালে প্যারিস অলিম্পিকে এটা সংযুক্ত হয়। ১৯০৪ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে টার্গেট তীরন্দাজি পুনরায় ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিকে আরম্ভ হয়। এর পর থেকে পরবর্তী সবগুলি অলিম্পিকে তা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯৭৮ সালে এশিয়ান গেম্‌সে (দ্র) তা অন্তর্ভুক্ত হয়।

টার্গেট আর্চারিতে নির্দিষ্ট চার ধরনের দূরত্ব থেকে গোল কাগজে (দ্র) মোড়া খড়ের নিশানায় চার ফুটের ব্যাসযুক্ত টার্গেট বা লক্ষ্যস্থলে বৃত্তরেখার মধ্যে তীর দিয়ে নিশানা করতে হয়। আর তীরটি হয় কাঠের বা ফাইবার গ্লাসের তৈরি। বাংলাদেশে (দ্র) এই খেলা এখনো সবার কাছে পরিচিতি লাভ করে নি। তবে দিনাজপুর ও রংপুরে সাঁওতালেরা এখনো তীর-ধনুক দিয়ে শিকার করে থাকে।

কা. আ. আ.

আর্দ্রতা

পানির পৃষ্ঠদেশ থেকে সব সময় পানির কিছু অণু (দ্র) জলীয় বাষ্প রূপে বাতাসে (দ্র) মিশছে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের মাত্রা হল এর আর্দ্রতা। বাতাসের একটি নির্দিষ্ট উত্তাপে ও চাপে এটি সর্বাধিক কতখানি জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারবে তা সুনির্দিষ্ট। এ রকম সর্বাধিক জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাসকে সম্পৃক্ত অবস্থায় রয়েছে বলা হয়। উত্তাপ বাড়লে বাতাস আরো বেশি জলীয় বাষ্প নিতে পারে। সচরাচর আর্দ্রতার যে-পরিমাণ ব্যবহৃত হয় তাতে আর্দ্রতাকে সম্পৃক্ত অবস্থার সঙ্গে শতকরা হিসাবে তুলনা করা হয়। একে বলা হয় আপেক্ষিক আর্দ্রতা। সম্পৃক্ত অবস্থায় বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ১০০%। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঐ উত্তাপে সম্পৃক্ত অবস্থার অর্ধেক হলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৫০%। আর্দ্রতা মাপার যন্ত্রকে বলা হয় হাইগ্রোমিটার (hygrometer)। সচরাচর ব্যবহৃত একটি হাইগ্রোমিটারে পাশাপাশি দু'টি থার্মোমিটার (দ্র) রাখা থাকে। এর একটির বাল্ব ভেজা সলতের মধ্যে জড়িয়ে সব সময় ভেজা রাখা হয়। সলতে থেকে পানি বাষ্পীভূত হয়ে এই বাল্বটিকে ঠাণ্ডা করে ফেলে বলে অন্য থার্মোমিটারটির তুলনায় এই থার্মোমিটারে উত্তাপ খানিকটা কম হয়। এই পার্থক্য থেকে একটি চার্টের মাধ্যমে আপেক্ষিক আর্দ্রতা জানা যায়। বাতাস কম আর্দ্র হলে বাষ্পীভবন বেশি হবে বলে ভেজা ও শুষ্ক থার্মোমিটারে দেখানো উত্তাপে পার্থক্যও বেশি হবে।

বাতাসের আর্দ্রতার সঙ্গে বৃষ্টিপাতের এবং সার্বিকভাবে

আবহাওয়ার (দ্র) সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের শরীর-স্বাস্থ্যও বাতাসের আর্দ্রতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি হলে ঘাম সহজে শুকায় না, তখন আমাদের গা চটচটে হয় ও আমরা অস্বস্তি বোধ করি। আবার আর্দ্রতা খুব কমে গেলে ঠোঁট-মুখ শুকিয়ে যায়। এটি স্বাস্থ্যের জন্যও ভাল নয়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের একটি কাজ হল বাতাসে জলীয় বাষ্প বাড়িয়ে-কমিয়ে আর্দ্রতাকে আরামপ্রদ অবস্থায় রাখা। অধিক আর্দ্রতা স্যাঁতসেঁতে অবস্থা সৃষ্টি করে, যা জিনিসপত্র ও কোনো কোনো যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের অনুকূল নয়।

ম. ই.

আর্ভিং, ওয়াশিংটন [১৭৮৩—১৮৫৯]

মার্কিন সাহিত্যের (দ্র) প্রথম নামকরা লেখক ওয়াশিংটন আর্ভিং (Washington Irving)। ১৭৮৩ সালে নিউইয়র্ক সিটিতে জন্মগ্রহণ করেন। আইনজীবী হওয়ার জন্য প্রথমে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেও তিনি শেষ পর্যন্ত লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং অচিরেই প্রতিভাবান লেখক হিসাবে স্বীকৃতি পান।

বিভিন্ন দেশ সফর শেষে ১৮৩২ সালে তিনি যখন আমেরিকায় (দ্র) ফিরে আসেন, তার নাম তখন স্বদেশের ঘরে ঘরে। কিছুকাল তিনি স্পেনে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

আর্ভিং-এর রচিত 'দ্য স্কেচ-বুক' একটি চমৎকার ছোটগল্প-সঙ্কলন। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্পের নাম 'দ্য লিজেণ্ড অব স্লিপি হলো' এবং 'রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্ক্‌ল্' (দ্র)।

১৮৫৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

বৌদ্ধধর্মের (দ্র) মূল সত্য—মানবজীবন দুঃখময়, সেই দুঃখের প্রকৃত কারণ তৃষ্ণা। পৃথিবী দুঃখে পূর্ণ। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, রোদন, মনের খিন্নতা, অশান্তিই হল দুঃখ। অপ্রিয় ব্যক্তির সংযোগ দুঃখ, প্রিয়বিয়োগ দুঃখ, চাহিদা অনুযায়ী বস্তু না-পাওয়া দুঃখ, যা অনভিপ্রেত তেমন বস্তু লাভ দুঃখ। আমার চাই—এটিই তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণা সকল অশান্তির কারণ। এই তৃষ্ণা বিনাশ করতে পারলে শান্তি পাওয়া সম্ভব। এ জন্য দুঃখের মূল কারণ নিরোধ করতে হবে। তার উপায় কী? উপায়—আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ৮টি পথ) : ১. সম্যক দৃষ্টি, ২. সম্যক সঙ্কল্প, ৩. সম্যক বাক্য, ৪. সম্যক কর্ম, ৫. সম্যক জীবিকা ৬. সম্যক প্রযত্ন, ৭. সম্যক 'স্মৃতি', ৮. সম্যক সমাধি।

সম্যক দৃষ্টি—ভালমন্দ কাজের সঠিক জ্ঞানকে বলে সম্যক দৃষ্টি। নিচে প্রদত্ত ভাল ও মন্দ কাজের বিশ্লেষণ থেকে সঠিক দৃষ্টি নিতে হবে –

মন্দ কর্ম	ভাল কর্ম
হিংসা	অহিংসা
চুরি	চুরি না করা
ব্যভিচার	অ-ব্যভিচার
মিথ্যা বলা	সত্য ভাষণ
চুকলি	চুকলি না করা
কটু বাক্য	প্রিয়ভাষণ
বৃথা বাক্য	অর্থপূর্ণ বাক্য
লোভ	নির্লোভ
প্রতিহিংসা	মৈত্রী, করুণা
ভ্রান্ত ধারণা	অভ্রান্ত ধারণা

দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখনিরোধগামী মার্গ (বা পথের) জ্ঞান হল সম্যক দৃষ্টি।

সম্যক সঙ্কল্প—রাগ, হিংসা, প্রতিহিংসাবিহীন সঙ্কল্পকেই সম্যক সঙ্কল্প বলে।

সম্যক বাক্য—মিথ্যা, চুকলি, কটু ভাষণ ও বৃথা বাক্য থেকে বিরত হয়ে সত্য, প্রিয় ও অর্থপূর্ণ বাক্য বলা।

সম্যক কর্ম—হিংসা, চুরি, ব্যভিচার ছাড়া ভাল কাজ।

সম্যক জীবিকা—মিথ্যা জীবিকা ত্যাগ করে সৎ জীবিকা দ্বারা জীবন যাপন করা। সমস্ত রকম প্রাণিহিংসা, প্রাণিহত্যা প্রভৃতির মাধ্যমে গৃহীত জীবিকাকে মিথ্যা জীবিকা বলে। অস্ত্র, প্রাণী, মাংস, নেশা ও বিষ প্রভৃতি নিয়ে বাণিজ্যকে মিথ্যা জীবিকা বলে।

সম্যক প্রযত্ন—কুচিন্তা ত্যাগ করে সুচিন্তা উৎপাদন, সুচিন্তার যত্ন ও বৃদ্ধির চেষ্টাই সম্যক প্রযত্ন বা প্রচেষ্টা।

সম্যক স্মৃতি—ভাল কাজের প্রকৃত স্থিতি এবং মলিনতা

দূর করা সম্ভব এ কথা স্মরণ ও ভাবনাকে বলে সঠিক স্মৃতি।

সম্যক সমাধি—চিত্তের একাগ্রতাকে বলে সমাধি। এর দ্বারা মনের চঞ্চলতা দূর করা সম্ভব। 'সব রকম পাপকাজ থেকে বিরত থাকা, আপন চিত্তকে সংযত ও পরিশুদ্ধ রাখাই বুদ্ধগণের উপদেশ'—এই শিক্ষা মনে রাখা।

এই আটটি মার্গ বা পথ অনুশীলন করাই হল 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ'। এই পথ অনুসরণ করা কঠিন, কিন্তু এতে কোনো রকম দুর্জ্ঞেয়তা বা অস্পষ্টতা নেই। এই পথ অনুসরণ করলে চরম শান্তি পাওয়া অবশ্যই সম্ভব।

বি. ব.

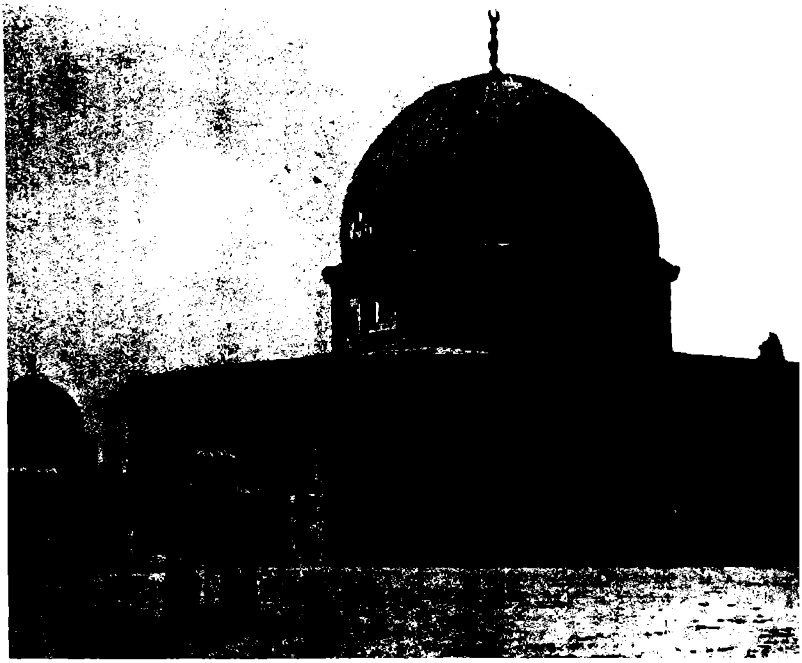

আল আক্‌সা মসজিদ

আর্যভাষী জাতি

আর্য কোনো মানব-জাতিগোষ্ঠীর নাম নয়। এটি একটি ভাষার নাম। তবে এই ভাষাভাষী মানুষদের চিহ্নিত করার জন্য সাধারণভাবে আর্য নামটি জাতিনাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে দক্ষিণ ইউরোপ ও এশিয়া (দ্র) থেকে বারংবার দলে দলে এরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। কোনো কোনো দল ভারতবর্ষের সিন্ধু অঞ্চলে আসে, আবার কোনো কোনো দল ইউরোপে (দ্র) চলে যায়। এদের সকলকে সম্মিলিতভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় বলা হয়। এদের ভাষাও ইন্দো-ইউরোপীয় নামে পরিচিত। আধুনিক ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ভাষা এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত, বাংলা (দ্র) তন্মধ্যে একটি।

সংস্কৃত ভাষায় আর্য শব্দের অর্থ 'ভদ্র' বা 'পরিমার্জিত'। কিন্তু শুরুতে আর্যরা ছিল যাযাবর। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খাদ্যের অন্বেষণে এরা ঘুরে বেড়াত। গোচারণ ও অশ্বপালন ছিল এদের প্রধান উপজীবিকা। কালক্রমে এরা কৃষিকাজও শেখে, তুলা থেকে কাপড় তৈরির উপায়ও আয়ত্ত করে।

আর্যরা ছিল যোদ্ধাজাতি। এদের আক্রমণে সিন্ধু উপত্যকার হরপ্পা (দ্র) মহেনজোদারো (দ্র) সভ্যতার পতন ঘটে। এশিয়া মাইনর (দ্র) এবং মেসোপটেমিয়ার নগরগুলোও এদের আক্রমণে ধ্বংস হয়। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এরা ছড়িয়ে পড়ে। এরা এই উপমহাদেশে ব্রোঞ্জনির্মিত বিভিন্ন দ্রব্যের প্রচলন করে। এ ছাড়া অশ্বরথ, যুদ্ধবর্ম, অগ্নিপূজা (দ্র) এবং বেদ নামক ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা এ অঞ্চলে এদের মুখ্য অবদান।

সৈ. আ. ই.

আল-আক্‌সা মসজিদ

আল-আক্‌সা একটি প্রাচীন মসজিদ (দ্র)। জেরুজালেমের (দ্র) একটি প্রাচীন উপাসনা-গৃহের ধ্বংসাবশেষের পূর্ব দিকে ৬৪১ কিংবা ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে (দ্র) দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (দ্র)-এর নির্দেশে মসজিদটি নির্মিত হয়।

ধ্বংসপ্রাপ্ত যে প্রাচীন উপাসনা-গৃহের চত্বরে আল-আক্সা নির্মিত হয়, তার আদি নির্মাতা হযরত সুলাইমান (আ.) (দ্র) বলে জানা যায়। কাবাঘরের (দ্র) দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায (দ্র) পড়ার রীতি প্রচলনের পূর্বে এই স্থানে কিবলা (দ্র) করে মুসলমানগণ নামায আদায় করতেন। এখান থেকে হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র) মিরাজে রওনা হন বলে কুরআনে (দ্র) উল্লেখ আছে।

আল-আক্সার নির্মাণশৈলী সাদামাঠা হলেও এর ভেতরটা সুপ্রশস্ত। এর অভ্যন্তরে ৩৬০টি স্তম্ভ চার সারিতে বিন্যস্ত ছিল। এক সঙ্গে তিন হাজার মানুষ এখানে নামায আদায় করতে পারত।

উমাইয়া শাসনামলে ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে আল-আক্সা মসজিদটি ভেঙে নতুন আঙ্গিকে নির্মাণ করা হয়। এর পর ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হওয়ার কারণে আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর (শা. ৭৫৪-৭৭৫) এবং তার পর খলিফা আল-মাহ্দী মসজিদটি পুনর্নির্মাণ (৭৮০) করেন।

মু. মা.

আল-ফারাবী [৮৭৩—৯৫০]

পুরো নাম আবু নসর মুহম্মদ আল-ফারাবী।

তিনি শিক্ষালাভ করেন প্রধানত বাগদাদের আরিস্টোটল (দ্র)-দর্শন শিক্ষাকেন্দ্রে। দর্শন শিক্ষার পাশাপাশি পদার্থবিদ্যা (দ্র), জ্যোতির্বিদ্যা (দ্র) ও সঙ্গীতবিদ্যায়ও তিনি পারদর্শিতা লাভ করেন।

গ্রিকদর্শনের দুই প্রধান ব্যক্তিত্ব প্লেটো (দ্র) ও আরিস্টোটল আল-ফারাবীকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলেন। তিনি এই দুই মতবাদের সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করেছেন। ফারাবীর একটি উল্লেযোগ্য গ্রন্থের নাম 'উত্তম রাষ্ট্রের অধিবাসীদের ভ্রান্তি সম্পর্কিত গ্রন্থ'। প্লেটোর মতো আল-ফারাবীও একটি আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলেন।

আল-ফারাবীর মতে, আল্লাহ্ (দ্র) সব কিছুর স্রষ্টা এবং সকল সৃষ্টি আল্লাহ্‌রই প্রকাশ। আবার একই সঙ্গে বিশ্বকেও তিনি শাশ্বত জ্ঞান করেছেন। এর অর্থ বস্তুজগতের প্রাধান্য মেনে নেওয়া। চরমসত্য বা স্রষ্টার ব্যাখ্যায় তিনি প্লেটোর চিন্তা গ্রহণ করেছেন, অন্য দিকে মনোজগতের বিশ্লেষণে আরিস্টোটলের মতামতই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে।

বিজ্ঞান ও ধর্ম এই দুইয়ের টানাপোড়েনে আল-ফারাবী বরাবরই মধ্যপন্থার আশ্রয় নিয়েছেন। এ ধরনের আপসবাদিতার প্রকাশ তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার মধ্যেও লক্ষ করা যায়। তাঁর রচনা ইউরোপে (দ্র) একাধিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যু হয় ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে (দ্র)।

আ. র.

আল-বদর

'আল বদর' শব্দের অর্থ পূর্ণিমার চাঁদ। শব্দটি আরবি (দ্র)।

মদিনার (দ্র) কাছে বদর নামে একটি জায়গায় ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে (দ্র) হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর নেতৃত্বে মুসলিমদের সঙ্গে মক্কার (দ্র) অমুসলিমদের যুদ্ধ হয়। মুসলিমেরা সংখ্যায় অতি অল্প হয়েও অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করে। ইসলাম ধর্মের (দ্র) ইতিহাসে এই বিজয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গৌরবজনক বলে বিবেচিত।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে (দ্র) মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগিতায় পাকিস্তানভক্ত রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর (দ্র) উদ্যোগে ধর্মান্ধ তরুণদের নিয়ে আল-বদর বাহিনী গড়ে তোলা হয়। এরা মুক্তিযুদ্ধের সমর্থকদের হত্যার নেশায় মেতে উঠেছিল। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জনের ঠিক পূর্বক্ষণে দেশের স্বাধীনতাকামী শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের এরা নির্মমভাবে হত্যা করে।

সৈ. আ. ই.

আল-রাযি [১১৪৯—১২০৯]

আল-রাযির পুরো নাম ফাখর্ আল-দীন আবূ আব্দ আল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে উমার ইবনে আল হুসায়ন। তিনি এক জন খ্যাতনামা চিকিৎসক ও দার্শনিক। তাঁর জন্ম ১১৪৯ খ্রিস্টাব্দে (দ্র), ইরানের আল-রা'য় নামক স্থানে।

আল-রাযি প্রথমে তাঁর জন্মস্থান আল-রা'য় শহরে এবং পরে বাগদাদে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত থেকে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন।

তিনি ১৫০টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'এল হাওয়াই' নামক চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থটি 'লিবার কন্টিনেন্স' (Liber continens) নামে লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। আল-রাযির চিকিৎসা বিষয়ক আরেকটি ছোট গ্রন্থের নাম 'মানসুরী' বা 'লিবার আলমান্‌সোরিস্‌' (Liber Almansoris) যা তিনি মানসুর ইবনে ইসহাক নামে জনৈক শাসককে উৎসর্গ করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থে ভ্রমণকারীদের জন্য চিকিৎসা-উপদেশ, বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের প্রতিকারসহ অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে।

আল-রাযি তাঁর চিকিৎসাগ্রন্থে গুটিবসন্ত এবং হাম রোগের লক্ষণসমূহের সঠিক বিবরণ এবং পার্থক্য লিপিবদ্ধ করেন, যা তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। উক্ত চিকিৎসাগ্রন্থটি 'অন স্মল পক্স অ্যাণ্ড মিজ্‌ল্‌স্‌' (On Small-pox and Measles) নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল।

আল-রাযি চিকিৎসা ছাড়াও জ্যোতিষবিদ্যা, জ্যামিতি, ধর্মীয় দর্শন, খনিজবিদ্যা, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। ১২০৯ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান আফগানিস্তানের হেরাত নামক স্থানে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

সি. না. হ.

আল-শাম্‌স্‌

'আল-শামস্‌' অর্থ সূর্য। শব্দটি আরবি।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের (দ্র) মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী স্বাধীনতা-বিরোধী এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ ও শিক্ষিত তরুণ। প্রধানত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ও ধর্মান্ধ রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে আল-শাম্‌স্‌ বাহিনী গঠন করা হয়।

আল-বদর (দ্র) বাহিনীর সঙ্গে মিলে এরা দেশের স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিদের এবং স্বাধীনতালাভের পূর্বক্ষণে বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে।

উল্লেখ্য, শাম্‌স্‌ বা সূর্য ছিল আব্বাসীয় খলিফাদের পতাকায় খচিত একটা প্রতীক।

সৈ. আ. ই.

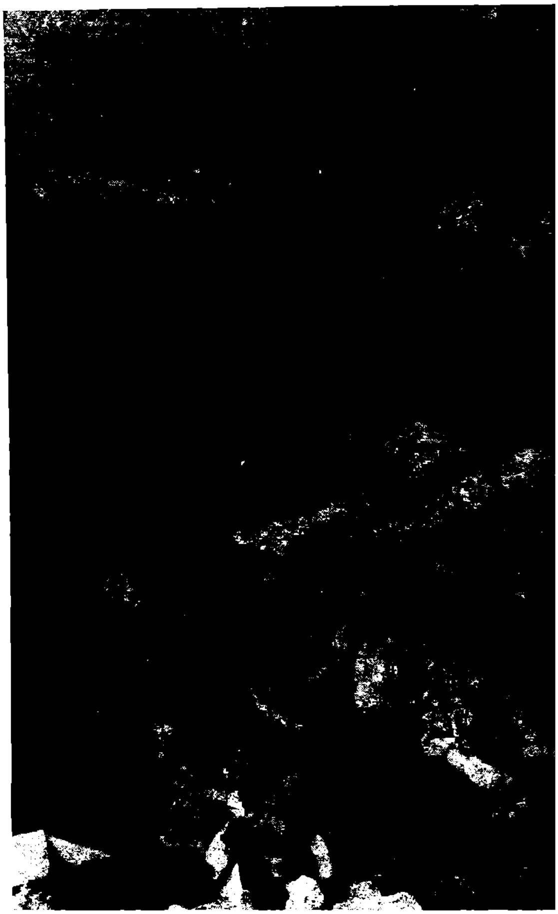

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আল-বদর ও আল-শাম্‌স্‌ বাহিনী নির্মম ও পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। বুদ্ধিজীবী কয়েক জনের লাশ পড়ে আছে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে

আলকাতরা

কয়লাকে অন্তর্ধূম পাতন (destructive distillation) করলে নানা প্রকার মূল্যবান পদার্থ পাওয়া যায়, যাদের মধ্যে আলকাতরা অন্যতম। এক কালে অবশ্য আলকাতরার কোনো ব্যবহার জানা ছিল না বলে তাকে বর্জ্য পদার্থ হিসাবে গণ্য করা হত। তদুপরি এটি বিষাক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ায় একমাত্র সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু তরুণ বিজ্ঞানী উইলিয়াম হেনরি

পার্কিন (William Henry Perkin) আলকাতরার একটি পদার্থ থেকে কুইনাইন তৈরি করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করেন 'মভ' (mauve) নামের একটি কৃত্রিম রঞ্জক (dye)। সেই থেকে শুরু হল আরো নানা রকমের রঞ্জক বাদেও হরেক রকমের জিনিস উৎপাদন—সুগন্ধি সুমিষ্ট দ্রব্য তো ছিলই, তা ছাড়া ছিল নানা রকমের প্লাস্টিক (দ্র), রজন, ঔষধপত্র (দ্র), জীবাণু (দ্র) ও কীটনাশক (দ্র) দ্রব্য এবং আরো কত কি যে আলকাতরা দিয়ে তৈরি হতে লাগল তার হিসাব নেই। দিনে দিনে যেমন তার দাম বাড়ল, তেমনি কদরও বাড়ল এবং তা অতি প্রয়োজনীয় জিনিস হিসাবে পরিগণিত হল।

আলকাতরায় সূক্ষ্ম কণা ছাড়াও থাকে নানা রকমের জটিল পদার্থ। লোহার বড় ট্যাঙ্কে আলকাতরা ভরে বিভিন্ন উষ্ণতায় উত্তপ্ত করে উদ্বায়ী বাষ্পগুলিকে সংগ্রহ করে মোটামুটি বারো রকমের তেলে পৃথক করা হয়। যেমন-

উষ্ণতা ডিগ্রি সেলসিয়াস	*প্রধান উপাদান*
১. লাইট অয়েল ১৭০°C	বেনজিন
২. কার্বলিক অয়েল ২৩০°C	ফিনোল, ন্যাপথালিন
৩. ক্রিয়োজোট অয়েল ২৭০°C	ক্রেসোল
৪. অ্যানথ্রাসিন অয়েল ৩৬০°C	অ্যানথ্রাসিন

এদের প্রত্যেক অংশ নিয়ে পুনঃ পুনঃ আংশিক পাতন (fractional distillation) দ্বারা তা শোধিত করে বিভিন্ন পদার্থে পৃথক করা হয়। লাইট অয়েল নিয়ে তাকে আবার পাতিত করা হয়। প্রথমে ৭০° সেলসিয়াস পর্যন্ত বাষ্পগুলিকে আলাদাভাবে সংগ্রহ করা হয়। ৭০° সে.-এর অধিক উষ্ণতায় পাতিত পদার্থে প্রায় ৭০% বেনজিন থাকে। H_2SO_4 এবং NaOH দ্রবণ দ্বারা শোধিত ও পরিষ্কার করে আবার আংশিক পাতন করলে বেনজিন পাওয়া যায়। এই বেনজিন থেকে বহু মূল্যবান পদার্থ, যেমন— টলুইন, ন্যাপথালিন, কার্বলিক অ্যাসিড, অ্যানিলিন প্রভৃতি এবং আলকাতরার উপজাত দ্রব্যাদি থেকে প্লাস্টিক, ঔষধ, বীজাণুবারক, বিস্ফোরক, স্যাকারিন প্রভৃতি কত যে বিভিন্ন ও বিচিত্র দ্রব্য পাওয়া যায় তার হিসাব দেওয়া কঠিন।

আ. হ. খ.

আলকেমি (alchemy)

বহু কাল আগে মিশর দেশকে আরবি (দ্র) ভাষায় বলা হত 'অল্-কিমিয়া'। অল্-কিমিয়া থেকে 'আলকেমি' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য 'আলকেমি' বলতে আমরা বুঝি প্রাচীন ও মধ্যযুগের রসায়নচর্চা।

এ সময়ে মিশর, ভারতবর্ষ, গ্রিস, চীন (দ্র) প্রভৃতি দেশ অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ সভ্য ছিল। তারা তামা (দ্র), সীসা (দ্র), লোহা (দ্র), সোনা (দ্র) প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার জানত। কিন্তু তারা সোনাকে অন্য সব ধাতুর (দ্র) চেয়ে বেশি পছন্দ করত। কারণ সোনার উজ্জ্বল রঙ যেমন সুন্দর তেমনি অনেক দিনেও নষ্ট হত না। কিন্তু তা হলে হবে কি, সোনা তারা বেশি পেত না, তার পরিমাণ ছিল খুবই কম। এ জন্য তারা বেশি সোনা পাওয়ার লোভে সাধারণ ধাতুকে, যেমন—লোহা, সীসা, তামা প্রভৃতিকে সোনায় পরিণত করার চেষ্টা করতে লাগল। অন্য দিকে লতাপাতা ও ধাতুভস্মের গুঁড়ো ব্যবহার করে অমৃতরস তৈরি করার চেষ্টা করতে লাগল—উদ্দেশ্য সেই অমৃতরস পান করে তাঁরা অমর হবেন, বেঁচে থাকবেন চিরকাল। আর সেই থেকে শুরু হল আলকেমি বা কিমিয়াবিদ্যার চর্চা। এই বিদ্যার চর্চাকারীদের বলা হত আলকেমিস্ট (alchemist)। আলকেমিস্টেরা তাঁদের কাজের ফল পাওয়ার জন্য গোপনে জাদুবিদ্যার আশ্রয় নিতেন, সেই সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালাতেন। তাঁরা একটার সঙ্গে আরেকটা জিনিস মেশাতেন, পোড়াতেন, সেদ্ধ করতেন। কখনো গুপ্ত গাছগাছড়া থেকে ঔষধ (দ্র) তৈরি করতেন এবং তা প্রয়োগও করতেন। কিন্তু তাঁদের কাজের বিজ্ঞানসম্মত কোনো পদ্ধতি ছিল না। তবে এসব পরীক্ষার ফলাফল যাই হোক না কেন, তাঁরা গোপনীয়তা রক্ষা করতেন। সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে তাঁরা তা লিখে রাখতেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের আশা বা চেষ্টা কোনোটাই সফল হয় নি। লোহা বা তামাকে তাঁরা কখনো সোনায় পরিণত করতে সক্ষম হন নি, খুঁজে পান নি অমৃতরস। সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে লিখে রাখার ফলও ভাল হয় নি। পরের যুগের মানুষেরা এই লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারেন নি। তাই হাজার বছর ধরে তাঁরা কিমিয়াবিদ্যার চর্চা করে এলেও

আসলে রসায়নবিদ্যার কোনো উন্নতিই হয় নি। তবে এই আলকেমিস্টদের দেখাদেখি এক দল মানুষ মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন কিমিয়া বিদ্যাকে মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাতে। এদের মধ্যে জাবির, ইবনে সিনা (দ্র), রজার বেকন (Roger Bacon)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এক দল বিজ্ঞানী কিমিয়াবিদ্যা থেকে জাদুবিদ্যাকে আলাদা করে রসায়নবিদ্যাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গতিশীল করে তুলেছিলেন। ফলে ভিন্ন শাস্ত্র হিসাবে জাদুবিদ্যার চর্চা শুরু হয় এবং কিমিয়াবিদ্যার বিলুপ্তি ঘটে। সে জায়গায় গড়ে ওঠে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা, যার নাম রসায়নশাস্ত্র (দ্র) বা কেমিস্ট্রি।

আ. হ. খ.

আলট্রাসাউণ্ড (ultrasound)

স্বাভাবিকভাবে মানুষের কানে শ্রুতিগোচর হয় না এমন শব্দকে আলট্রাসাউণ্ড বা অতিশব্দ বলা হয়। সাধারণত শব্দতরঙ্গের হার প্রতি সেকেণ্ডে ২০ থেকে ২০,০০০ হলে আমরা শুনতে পাই। কিন্তু শব্দতরঙ্গের হার ২০,০০০ হার্ট্জ্ (hertz)-এর বেশি হলে আর শোনা যায় না। পিজো-ইলেক্ট্রিক স্ফটিক (Piezo electric crystal)-এর মধ্য দিয়ে দ্রত পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে এরকম আলট্রা-সাউণ্ড তৈরি হয়। এভাবে শুধু আলট্রাসাউণ্ড তৈরি হয় না, চলার পথে তা বাধা পেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরেও আসে এবং বিশেষ ধরনের টেলিভিশনের পর্দায় ইলেক্ট্রনিক কৌশলে তার ছবি ধরে রাখা যায়। আলট্রাসাউণ্ডের সাহায্যে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার যন্ত্রকে আলট্রাসোনোগ্রাম (ultra-sonogram) এবং এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাকে আলট্রাসোনোগ্রাফি (ultrasonography) বলা হয়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে (দ্র) আলট্রাসাউণ্ডের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। যকৃৎ (দ্র) কিংবা পিত্তথলির রোগ নির্ণয় করতে, গর্ভস্থ শিশুর অবস্থা জানতে, মূত্রাশয় কিংবা পিত্তাশয় (দ্র)-এর পাথর ভাঙার জন্য আলট্রাসাউণ্ড ব্যবহার করা হয়। দুধের ব্যাক্টেরিয়া (দ্র) ধ্বংস করতে কিংবা বড় বড় অণু (দ্র) ভাঙতেও এর ব্যবহার আছে। নদী (দ্র) কিংবা সাগরের (দ্র) গভীরতা, মাটির (দ্র) নিচে খনিজ পদার্থের অবস্থান নির্ণয় ইত্যাদি নানারকম ভূ-তাত্ত্বিক এবং প্রকৌশল কাজেও আলট্রাসাউণ্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সা. এ.

আলতাফ মাহমুদ [১৯৩৩—১৯৭১]

সঙ্গীতশিল্পী, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা; এদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম সংগ্রামী পুরুষ। তিনিই অমর একুশের (দ্র) স্মরণে আবদুল গাফফার চৌধুরীর লেখা জনপ্রিয় গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'র সুরারোপ করেন।

১৯৩৩ সালে বরিশালে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম এ. এম. নাজেম আলী। পিতা তাঁর নাম দিয়েছিলেন এ. এন. এম. আলতাফ আলী। তিনি তাঁর পিতামহ 'আলক মাহমুদ'-এর উপাধি গ্রহণ করে নাম নেন আলতাফ মাহমুদ।

১৯৪৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হন। এর পর কিছু দিন কলিকাতা আর্ট স্কুলেও পড়াশোনা করেন।

শৈশব থেকেই সঙ্গীতের (দ্র) প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ প্রকাশ পায়। তাঁর কণ্ঠও ছিল দরদ আর আমেজে ভরা এক অতুলনীয় সম্পদ। বরিশাল জেলা স্কুলে পড়ার সময় তাঁর সঙ্গীতচর্চা শুরু হয়। বিভিন্ন জলসা-অনুষ্ঠানে কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করে তিনি প্রশংসা অর্জন করেন। বিখ্যাত বেহালাবাদক সুরেন রায়ের নিকট তিনি সঙ্গীতের প্রাথমিক তালিম গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৫০ সালে আলতাফ মাহমুদ ঢাকায় (দ্র) চলে আসেন এবং এ বছরই পুরনো ঢাকায় 'শিল্পীসংসদ' নামে একটি গণসঙ্গীতগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ ঘটলে সেই সংগঠনে যোগ দেন। এভাবে গণজীবনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় একাত্মতা গড়ে ওঠে। গণসঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে তিনি সরাসরি ভাষা-আন্দোলনের (দ্র) সঙ্গে যুক্ত হন এবং ব্যাপক গণজাগরণের লক্ষ্যে কাজ করতে থাকেন। এ সময় তিনি হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত 'শান্তি সম্মেলনে' যোগ দেবার আমন্ত্রণ পান। কিন্তু সরকারের বিদেশগমন সংক্রান্ত জটিল আইন–কানুনে নিরাশ হয়ে তিনি করাচি যাত্রা করেন। ভেবেছিলেন, সেখান থেকে বিদেশ যাবার সুযোগ পাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে তিনি করাচিতেই থেকে যান।

করাচিতে অবস্থানকালে আলতাফ মাহমুদ খ্যাতনামা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী ওস্তাদ আবদুল কাদের খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সঙ্গীতের আনুষ্ঠানিক তালিম গ্রহণ করতে থাকেন। সেখানে তিনি নৃত্যশিল্পী ঘনশ্যাম, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী দেবু ভট্টাচার্য ও তিমিরবরণের সঙ্গে কর্মরত ছিলেন। শিল্পী শেখ লুৎফর রহমান (দ্র) ও নিজামুল হকের সহযোগিতায় তিনি করাচিতে প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষ থেকে ১৯৬১ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি (দ্র) উদযাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকারের হুমকি ও প্রতিরোধের ফলে তা সফল হতে পারে নি।

আলতাফ মাহমুদ করাচি থেকে ঢাকায় ফিরে ১৯৬৫ সালের দিকে চলচ্চিত্রে (দ্র) সঙ্গীত পরিচালনার কাজ শুরু করেন। তাঁর সঙ্গীত পরিচালনায় নির্মিত উল্লেখযোগ্য ছায়াছবি 'তান্হা'। চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি সাংগঠনিক তৎপরতাও অব্যাহত রাখেন। এ সময় তিনি দেশের নামকরা শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের দ্বারা গঠিত 'ক্রান্তি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী' (১৯৬৭ সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'ক্রান্তি শিল্পীগোষ্ঠী')সহ বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিতে গণগঙ্গীত পরিবেশন করতে থাকেন। ১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত পূর্ববঙ্গের উপকূল অঞ্চলের মানুষের সাহায্যের জন্য শিল্পীসমাজের পক্ষ থেকে তিনি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। আসলে একই সঙ্গে গণসঙ্গীত আর গণমানুষের প্রতি তাঁর ছিল সমান টান।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও (দ্র) আলতাফ মাহমুদ অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি অস্ত্র আদানপ্রদানে সাহায্য করতেন। গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ৩১শে আগস্ট ভোর পাঁচটায় তাঁর বাসা ঘিরে ফেলে। বাসায় একটি গাছের গোড়ায় অস্ত্রভর্তি একটি ট্রাঙ্ক পাওয়া যায়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তখনই তাঁকে বন্দি করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। এর পর তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। পাকবাহিনী ভয়াবহ অত্যাচার করে সম্ভবত সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই তাঁকে হত্যা করে।

১৯৭৭ সালে আলতাফ মাহমুদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদকে' (দ্র) (মরণোত্তর) ভূষিত হন। তাঁর স্মরণে কার্জন হলের সামনের দোয়েল চত্বর থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পর্যন্ত পশ্চিমমুখী সড়কটির নাম রাখা হয়েছে 'শহীদ আলতাফ মাহমুদ সড়ক'।

সুজ. ব.

আলতামিরা

স্পেনের উত্তরাংশে আলতামিরা (Altamira) নামে একটি পাহাড়ি জায়গায় একটি গুহা খুঁজে পাওয়া যায়। ঐ গুহার জন্য জায়গাটি শিল্পকলার ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। গুহাটি ১৮৭৯ সালে আবিষ্কৃত হয়। দেখা যায় যে গুহার ছাদে একটি বাইসনের ছবি আঁকা আছে। বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করে বলেন যে ঐ ছবি খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০০ অব্দ থেকে ৯০০০ অব্দের ভিতরে কোনো সময়ে আঁকা হয়েছিল।

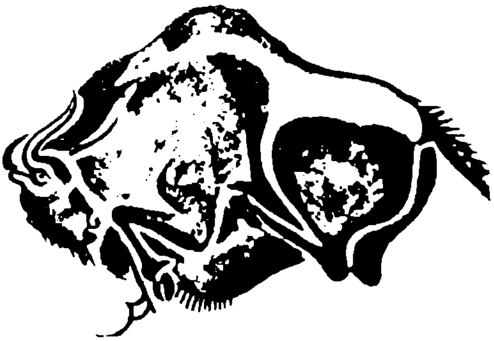

আলতামিরা গুহার গায়ে আঁকা একটি বাইসনের ছবি

সাধারণভাবে ভাবা হত যে শিল্পকলার চর্চা মানুষ 'সভ্য' হবার পরে করেছে। আলতামিরা গুহার ছবি এই ধারণা পাল্টে দিয়ে প্রমাণ করে যে প্রাগৈতিহাসিক মানুষও ভিতরের তাগিদ থেকে এমন কিছু করতে পারত যা শিল্পবোধে উজ্জ্বল। পরে ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের লাস্কো (Lascaux) গুহায় অজস্র গুহাচিত্র খুঁজে পাওয়া গেলে এই ধারণার সমর্থন মিলল।

হা. মা.

আলপনা

আলপনা একটি ঐতিহ্যবাহী ও প্রথাগত আদিম শিল্পকর্ম। এ দেশে বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবে আলপনা অঙ্কন করার রীতির প্রচলন রয়েছে।

এটা নারীকেন্দ্রিক সমাজের মেয়েলি ব্রতের আদিম চিত্রের প্রথা। যতদূর জানা যায়, মূলত ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির যে বিপর্যয় বা ক্ষয়-ক্ষতি দেখা দিত, সেগুলোকে ঠেকানোর জন্য ব্রত পালন করা হত। আলপনার অঙ্কনপদ্ধতি ও চিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আলপনাকে রেখাচিত্রের অঙ্গীভূত করা যায়। মোটা ও চিকন রেখায় ছন্দ তৈরির মাধ্যমে আলপনাচিত্র আঁকা হয়ে থাকে।

লক্ষ্মীপূজার সময় হিন্দু মেয়েরা লক্ষ্মীর পূজামণ্ডপে তাঁর আসনে আলপনা এঁকে উৎসব এবং পবিত্রতার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। এসব আলপনা অতীতে ধানের ছড়া দিয়ে করা হত। লক্ষ্মীর আসনে বিভিন্ন রকম ফুল, লতাপাতা—বিশেষ করে পদ্মফুল আঁকা হত। লক্ষ্মীর আসনের পাশে থাকত পাতিল, তার উপর লক্ষ্মীর সরা। এই সরার পিঠে লাল, নীল, হলুদ এবং উজ্জ্বল কালো রং-এর লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্মীপেঁচা আঁকার রেওয়াজ ছিল, এখনো আছে।

হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজেই আলপনা আঁকার রেওয়াজ থাকলেও আদর্শ ও নীতির দিক থেকে অনেক পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

যেমন—পূজার সময় মন্দিরের মেঝে, পূজামণ্ডপে আলপনা আঁকার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু মসজিদের (দ্র) মেঝে বা মুসলমানদের কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আলপনা আঁকার নিয়ম নেই। তবে মুসলমানেরা যে জায়নামায ব্যবহার করেন, তাতে অনেক ইসলামী নকশা (মসজিদ ইত্যাদির নকশা ও ক্যালিগ্রাফি) ও লতাপাতার বাহারি নকশা অলঙ্কৃত হয়ে থাকে। অবশ্য মসজিদগাত্রে কখনো আঁকা, কখনো খোদাই করা নকশা থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার এবং অপূর্ব সব নকশার জন্য বাংলাদেশে (দ্র) তথা সারা বিশ্বে অনেক মসজিদ বিখ্যাত। ঠিক একইভাবে নানা রকম নকশায় সুসজ্জিত অনেক হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ মন্দিরও রয়েছে।

এ দেশের সমাজে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এক সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণভাবে বাস করে আসছে। যে যার ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান যেমন ভিন্ন ভিন্নভাবে পালন করে এসেছে, তেমনি কিছু কিছু সামাজিক অনুষ্ঠান এক সঙ্গে পালন করে এসেছে। যেসব অনুষ্ঠানে 'আলপনা' আঁকা অনেক দিন থেকেই একটা নিয়ম (যেমন নবান্ন উৎসব, নববর্ষ অনুষ্ঠান, বিয়ে ইত্যাদি) সেসব অনুষ্ঠানে গ্রামের মেয়েরাই আলপনা আঁকতেন। তাঁরা রং বানিয়ে নিতেন

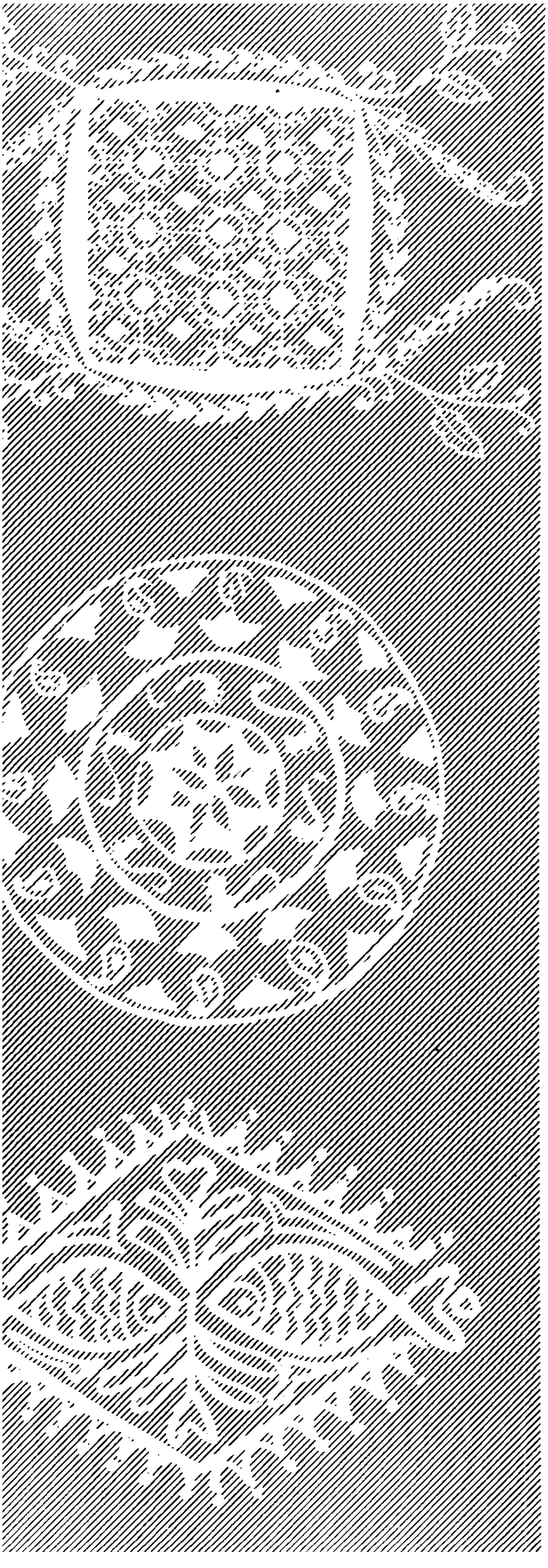

আতপ চাল গুঁড়ো করে পানিতে গুলে, এবং আঁকতেন হাতের মধ্যমা ও অনামিকায় ন্যাকড়া জড়িয়ে। ন্যাকড়ায় রং ভিজিয়ে এক বিশেষ কায়দায় হাতের মুঠিতে ধরে রাখলে তা চুঁইয়ে রং আঙুলে চলে আসে। বেশির ভাগ আলপনা করা হত সমতল জায়গায়—মেঝেতে, কখনো কখনো দেয়ালে, এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রয়োজনে মাটির সরা, কলসি, কুলা ইত্যাদিতেও।

আলপনার অঙ্কনশৈলীতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আলপনা এখন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিক অনেক আচার-অনুষ্ঠানের বিশেষ মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এখন মধ্যবিত্ত বাঙালির যে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে আলপনা অবশ্যকরণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তেমনি জন্মদিনে বা পারিবারিক যে কোনো শুভ অনুষ্ঠানেও আলপনা থাকে। স্কুল-কলেজের নবীনবরণ উৎসব থেকে শুরু করে নাটক(দ্র)–থিয়েটার (দ্র) অর্থাৎ যে কোনো আনন্দানুষ্ঠানে আলপনা নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি (দ্র) উদ্‌যাপনে আলপনা আঁকা হয় শহীদ মিনারে (দ্র) প্রভাতফেরির রাস্তায়। আলপনা এখন পবিত্রতার প্রতীক, সুন্দর ও আনন্দের প্রতীক।

সে. এ.

আলফা কণিকা (alpha particle)

পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় বিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড (Ernest Rutherford) আলফা-কণিকা আবিষ্কার করেন। তিনি তখন কাজ করতেন কানাডার মন্ট্রিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে। পদার্থবিদ্যার (দ্র) অধ্যাপক ছাড়াও তিনি ছিলেন পদার্থবিদ্যা বিভাগের গবেষণাগারের প্রধান। ইউরেনিয়াম এবং অন্যান্য পদার্থের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নিয়ে কয়েক বছর কাজ করে তিনি দেখলেন, তেজস্ক্রিয় পদার্থের যে বিকিরণ ঘটে তাতে কয়েক ধরনের রশ্মি থাকে। এর মধ্যে একটি হল ধনাত্মক বৈদ্যুতিক আধান (দ্র)-বিশিষ্ট রশ্মিকণার সমষ্টি। এই রশ্মির নাম দিলেন তিনি আলফা-রশ্মি আর আলফা-রশ্মির কণার নাম আলফা কণিকা (দ্র)। আলফা কণিকা হচ্ছে হিলিয়াম (দ্র)-এর নিউক্লিয়াস। এর চার্জ +২ এবং ভর +৪।

সু. ব.

আলফা সেন্টোরি (Alpha Centauri)

সৌরজগতের (দ্র) নিকটতম তারাপুঞ্জ (star system)। তিনটি তারার সমন্বয়ে এই তারাপুঞ্জ গঠিত। পৃথিবী (দ্র) থেকে ৪·৩ আলোকবর্ষ (দ্র) দূরে তারা তিনটির অবস্থান। তিনটির মধ্যে দু'টি আবার যুগ্মতারা বা বাইনারি স্টার। পরস্পর থেকে ২৩·১ জ্যোতির্বিদ্যা-একক (জ্যোতির্বিদ্যা-একক হল পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব) দূরত্বে এগুলো পরস্পরকে ৭৯·৯ বছরে এক বার প্রদক্ষিণ করছে। এই দু'টির একটির ভর (দ্র) সূর্যের ভরের সমান ও অপরটির ভর সূর্যের ভরের ০·৯ গুণ। আলফা সেন্টোরির অপর তারাটি ১১ উজ্জ্বলতার একটি ছোট তারা। তিনটি তারাই বামন তারা। উজ্জ্বলতার বিচারে প্রধান ৫টি উজ্জ্বল তারকামণ্ডলীর অন্যতম আলফা সেন্টোরি।

মু. হা.

আলবেরুনী [৯৭৩—১০৪৮]

বিখ্যাত পণ্ডিত, বহুভাষাবিদ, পর্যটক, ঐতিহাসিক, দর্শনশাস্ত্রী, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, ভূতত্ত্ববিদ ও বিশ্বকোষপ্রণেতা।

তাঁর পুরো নাম আবু রায়হান মুহম্মদ ইবনে আহমদ আলবেরুনী। তবে সাধারণভাবে তিনি আলবেরুনী নামে পরিচিত। মধ্য-এশিয়ার খোরেজম্ বা খারিজ্মের খিবায় ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে (দ্র) তাঁর জন্ম। আফগানিস্তানের গজ্নি বা সিজিস্তানে ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ইবনে সিনার (দ্র) সমসাময়িক ছিলেন।

আলবেরুনী দীর্ঘকাল এই উপমহাদেশে অবস্থান করেন। গজ্নির সুলতান মাহমুদ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ দখল করার পর মধ্য-এশিয়ার ক্ষুদ্র রাষ্ট্র খারিজমও জয় করেন। এ সময় সুলতান মাহমুদ খারিজ্মের জ্ঞানী-গুণী, গণ্যমান্য নাগরিকদের বন্দি করে তাঁর রাজ্য গজ্নিতে নিয়ে আসেন। এই বন্দিদের মধ্যে আলবেরুনীও ছিলেন। আলবেরুনীকে সুলতান মাহমুদ গজ্নির দরবারে রাজজ্যোতিষী নিযুক্ত করেন। পরবর্তী কালে সুলতান তাঁকে রাজদায়িত্ব পালনের জন্য ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষে থাকাকালীন সময়ে আলবেরুনী গভীর অভিনিবেশ ও আগ্রহের সঙ্গে ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে তথ্যাবলি সংগ্রহ করেন। এই সংগ্রহ এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তিনি 'কিতাবুল হিন্দ্' বা ভারততত্ত্ব নামে একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। এর মূল আরবি নাম হল 'কিতাব ফি তাহকিক মালিল হিন্দ্ মাকুলাৎ মাকবুলাৎ ফি আল আকল উ মরযুলাৎ'। বাংলায় এর অর্থ দাঁড়ায়—বুদ্ধিবিচারে যা গ্রহণযোগ্য আর গ্রহণ নয়, হিন্দুদের সব রকম চিন্তাপদ্ধতির সঠিক বর্ণনা। এর আনুমানিক রচনাকাল ১০৩০ খ্রিস্টাব্দ। এটি দশম-একাদশ শতকের ভারতীয় জ্ঞান, সমাজ, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের একটি সম্পূর্ণ জ্ঞানকোষবিশেষ। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের অতুলনীয় উপাদানের জন্য এই গ্রন্থের প্রসিদ্ধি আজ পৃথিবীব্যাপী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) অধ্যাপক, ঐতিহাসিক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ 'আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব' নামের এই গ্রন্থটি মূল আরবি ভাষা (দ্র) থেকে বাংলায় (দ্র) অনুবাদ (দ্র) (১৯৭৪) করেছেন। সাহিত্যিক সত্যেন সেন (দ্র) আলবেরুনীর ভারত আগমন এবং তাঁর জ্ঞানসাধনাকে ভিত্তি করে ১৯৬৯ সালে 'আলবেরুনী' নামক একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন।

আলবেরুনী হিন্দু-দর্শন বিশেষত 'ভগবদ্‌গীতা' দ্বারা গভীরভাবে আলোড়িত হন। তিনি সংস্কৃত থেকে ষষ্ঠ শতকের বরাহমিহিরের দু'খানা গ্রন্থসহ ছোটবড় ২২টি ভারতীয় পুস্তক আরবিতে অনুবাদ করেন। তিনি আরবি ভাষায় ভূগোল, গণিত (দ্র) ও জ্যোতির্বিদ্যা (দ্র) সম্পর্কেও কয়েকটি বই লেখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই হল— 'কিতাবুল আত্‌হার আল-বাকিয়া আনিল করুন' (প্রাচীন জাতিসমূহের ঘটনাপঞ্জি বা অতীতের পদচিহ্ন); 'আল্ কানুন্ আল্ মাস্‌উদী-ফীল-হাইয়া-ওয়াল-নূজুম (জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক বিশ্বকোষ); 'আল্-তাফ্‌হীম্ লি-আওয়াইল সিনা আত্ আল্-তান্‌জীম্' (গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের সংক্ষিপ্তসার)।

আলবেরুনী ভারতীয় সংখ্যালিখনপদ্ধতির বিবরণও লিপিবদ্ধ করেন। কোণ (angle)-কে তিনি সমানভাবে বিভক্ত করার নিয়ম প্রবর্তন করেন এবং অন্যান্য যে সকল জ্যামিতিক সম্পাদ্য রুলার ও কম্পাসের সাহায্যে সমাধানের নিয়ম ছিল না, তিনি সে সব সম্পাদ্য সমাধান করেন। সেগুলো পরবর্তী কালে 'আলবেরুনীর সম্পাদ্য' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

আলবেরুনী নিখুঁতভাবে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা নির্ণয় করেন এবং জরিপের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের অনুসন্ধান চালিয়ে ১৮টি মূল্যবান প্রস্তর ও ধাতুর (দ্র) নির্ভুল আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করেন। শব্দের (দ্র) গতির (দ্র) তুলনায় আলোর (দ্র) গতি যে অনেক গুণ বেশি তিনি তাও প্রমাণ করেছিলেন।

আলবেরুনীর সমালোচনাদক্ষতা, সহনশীলতা, সত্যানুরাগ এবং মানসিক সাহস মধ্যযুগে অতুলনীয় ছিল। তাঁকে শুধু মুসলমান সামাজের নয়, সমগ্র বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রূপে গণ্য করা হয়।

সুজ. ব.

আলমগীর কবির [১৯৩৮—১৯৮৯]

সাংবাদিক, চিত্রনাট্য-রচিয়তা ও চলচ্চিত্রনির্মাতা। আলমগীর কবির বিচিত্রকর্মা, বর্ণাঢ্য চরিত্রের মানুষ ছিলেন।

১৯৩৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে জন্ম। পিতা আবু সাইয়েদ আহ্‌মদ ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। পিতার কর্মসূত্রে বিভিন্ন স্থানে থাকার কারণে নানান জায়গায় শিক্ষালাভ করেছিলেন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন : হুগলি কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময়ে বৃত্তি পেয়েছিলেন, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা (১৯৫২) পাশের সময়ে গণিতশাস্ত্রে লেটার নম্বর পেয়েছিলেন, ঢাকা কলেজ থেকে আই. এসসি. (১৯৫৪) পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান (দ্র) বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫৮ সালে সেখান থেকে স্নাতক সম্মান ডিগ্রি নিয়ে ইংল্যাণ্ড চলে যান এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত গণিতে বি. এসসি. ডিগ্রি লাভ করেন। এর পর শুরু হয় তাঁর সাংবাদিক জীবন।

পেশা হিসাবে সাংবাদিকতা বেছে নেন বিদেশে থাকতেই, ১৯৫৯ সাল থেকে। অতঃপর ১৯৬৫ পর্যন্ত নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন : লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলচ্চিত্রের (দ্র) ইতিহাস ও পরিচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ, চলচ্চিত্র–সমালোচনাকে পেশা হিসাবে নেওয়া, বামপন্থী রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হওয়া, আলজেরিয়া মুক্তিসংগ্রামে অংশ নেওয়া ইত্যাদি। দেশে ফিরে আসেন ১৯৬৬-র প্রারম্ভে এবং সঙ্গে সঙ্গেই চিত্র-সাংবাদিক হিসাবে সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য আইয়ুব খানের (দ্র) আমলে মাস কয়েক জেলও খাটতে হয়। ১৯৬৭ সাল থেকে ইংরেজি রবিবাসরীয় সাপ্তাহিক 'Holiday' কাগজের সম্পাদকীয় দপ্তরে যোগ দেন। দেশের চলচ্চিত্র–শিল্প ও চলচ্চিত্র–আন্দোলনের দিকে এ সময়েই তাঁর দৃষ্টি পড়ে এবং তিনি 'পাকিস্তান ফিল্ম সোসাইটি', 'ঢাকা সিনে ক্লাব' প্রভৃতির সঙ্গে কর্মসূত্রে জড়িত হয়ে পড়েন। 'ঢাকা ফিল্ম ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁরই

ব্যক্তিগত উদ্যোগে; পরে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গেলেও দেশের মানুষকে চলচ্চিত্রের মান ও ভূমিকা বিষয়ে সচেতন করার চেষ্টা তিনি কখনো পরিত্যাগ করেন নি। ইংরেজিতে 'Cinema in Pakistan' নামে একটি বইও (১৯৬৯) লিখেছিলেন।

আলমগীর কবির পরিচালিত 'সীমানা পেরিয়ে' ছবির একটি দৃশ্য ও

নিচে : তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা সিকোয়েন্সের একটি সংখ্যা

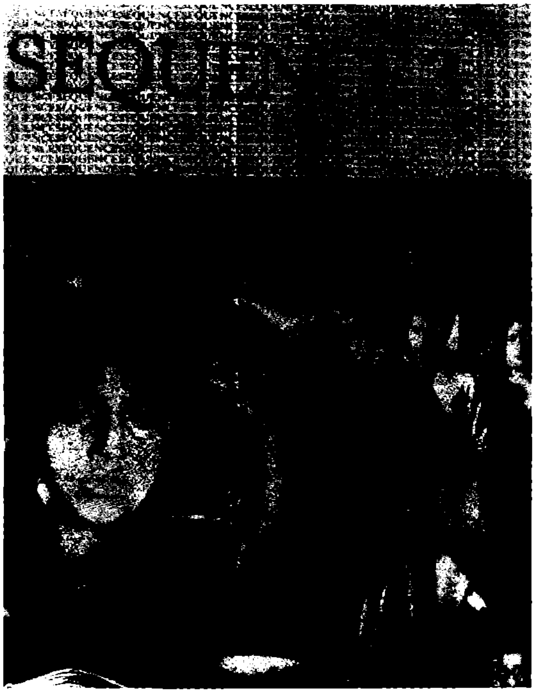

চলচ্চিত্র নির্মাণে তাঁর পদক্ষেপ শুরু হয়েছিল ১৯৭০ সালে। মুক্তিযুদ্ধ (দ্র) শুরু হলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে (দ্র) যোগ দেন। ইংরেজিতে কথিকা লিখতেন ও পাঠ করতেন। কথাশিল্পী ও চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানের (দ্র) 'Stop Genocide' ছবি তৈরিতে তিনিও অংশ নিয়েছিলেন; উপরন্তু এর চিত্রনাট্য রচনা ও ধারাবর্ণনাতেও তিনি ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে পরে নিজেই একটি প্রামাণ্য ছবি তৈরি করেন 'Liberation Fighters' নামে।

এর পর থেকে তিনি পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র নির্মাণ করতে থাকেন : 'ধীরে বহে মেঘনা' (১৯৭৩), 'সূর্যকন্যা' (১৯৭৬), 'সীমানা পেরিয়ে' (১৯৭৭), 'রূপালী সৈকতে' (১৯৭৯), 'মোহনা' (১৯৮২), শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' (১৯৮৪), 'মহানায়ক' (১৯৮৬) ইত্যাদি।

'বাংলাদেশ ফেডারেশন অব্ ফিল্ম সোসাইটিজ' নামে চলচ্চিত্র-সংসদসমূহের সম্মিলিত সংগঠনের প্রথম সভাপতি ছিলেন তিনি। দেশে ও বিদেশে বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন।

১৯৮৯ সালের ২০শে জানুয়ারি নগরবাড়ি ফেরিঘাটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

হা. মা.

আলাউদ্দিন খলজি [শা. ১২৯৬—১৩৫১]

সুলতান জালালউদ্দিন খলজিকে হত্যা করে আলাউদ্দিন খলজি ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে (দ্র) দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১২৯৬ থেকে ১৩০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মঙ্গোলগণ প্রায় সাত বার আলাউদ্দিন খলজির রাজ্য আক্রমণ করেন। আলাউদ্দিন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মঙ্গোলদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। ভবিষ্যতে মঙ্গোলগণ যাতে আর ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে না পারে সে জন্য সীমান্তবর্তী অঞ্চলে তিনি অনেকগুলো দুর্গ স্থাপন ও সংস্কার করে প্রতিরোধের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে তোলেন।

আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। তিনি গুজরাট, রণথম্বোর, চিতোর ও মেবার অধিকার করেন। এ ছাড়া তিনি উজ্জয়িনী, মালব, চান্দেরি প্রভৃতি রাজ্য জয় করে সমগ্র উত্তর ভারত পদানত করেন। তিনি দেবগিরি, দ্বারসমুদ্র, বরঙ্গল আক্রমণ করে সমগ্র দাক্ষিণাত্য জয় করেন। প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁর রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে।

আলাউদ্দিন খলজি শুধু বীর যোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি সুদক্ষ শাসকও ছিলেন। আলাউদ্দিন শাসনকার্যে আলেমদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করে দেন। তিনি ধর্মকে (দ্র) রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মের বাইরে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।

আলাউদ্দিন গুপ্তচরের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার খবরাখবর সংগ্রহ করতেন। তিনি মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি জমির উৎপাদনের অর্ধাংশ রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা দেওয়ার আদেশ জারি করেন। তিনি চারণকর, গৃহকর প্রভৃতি ধার্য করেন। ভারতবর্ষের শাসকদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ভূমি জরিপ ও বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে সৈন্যদের বেতন প্রদানের রীতি প্রবর্তন করেন।

আলাউদ্দিন নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করার আদেশ জারি করেন এবং এই সমস্ত দ্রব্য চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। তিনি মজুতদারির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

আলাউদ্দিন শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও মসজিদ (দ্র) নির্মাণ করেন। আলাই 'দরওয়াজা' ও নিজামুদ্দিন আউলিয়ার (র.) দরগাহের মসজিদ তিনি নির্মাণ করেন। বিখ্যাত কবি আমীর খসরু (দ্র) এবং আমীর হাসান তাঁর দরবার অলঙ্কৃত করেছিলেন। নিজামুদ্দিন আউলিয়া (দ্র) ও শেখ রুকুনউদ্দিন তাঁর সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

খু. জা.

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ [শা. ১৪৯৩—১৫১৯]

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বাংলার ইতিহাসে 'হোসেন শাহী' বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রজাহিতৈষী শাসক হিসাবে খ্যাত। এ ছাড়া, বাংলা সাহিত্যের (দ্র) পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও তিনি স্মরণীয় ও নন্দিত। তিনি ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ছাব্বিশ বছর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থেকে অত্যন্ত যোগ্যতা ও সুনামের সঙ্গে রাজ্য শাসন করেন।

সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এক জন দক্ষ শাসক ছিলেন। ন্যায়বিচারক হিসাবেও তাঁর সুনাম ছিল। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন উদার মনের মানুষ। বহু হিন্দু তাঁর অধীনে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কায়স্থ বংশীয় পুরন্দর খাঁ ছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী। এ ছাড়া রূপ ও সনাতন নামক হিন্দু ধর্মাবলম্বী দুই ভাই হোসেন শাহের অধীনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রূপ ও সনাতনের আরেক ভাই অনুপকে গৌড়ের টাঁকশালের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করা হয়। তাঁরই সময়ে শ্রীচৈতন্য (দ্র) বৈষ্ণব ধর্ম (দ্র) প্রচার করেন।

বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে আলাউদ্দিন হোসেন শাহের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। জন্মসূত্রে আরবীয় হলেও বৈবাহিক সূত্রে তিনি এ দেশের মানুষের একান্ত আপন জন হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে বাংলা ভাষা (দ্র) ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ দেখা যায়। হিন্দু ধর্ম-সাহিত্যের বাংলা অনুবাদে (দ্র) পৃষ্ঠপোষকতা দান

আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলের একটি লিপিচিত্র

হোসেন শাহের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁ (দ্র)-র আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর শ্রীকর নন্দী সংস্কৃত মহাভারতের (দ্র) অনুবাদ 'মহাভারত পাঁচালী' রচনা করেন। এই সময়ে রচিত সাহিত্যে হোসেন শাহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দেখতে পাওয়া যায়।

তিনি বীর যোদ্ধা, প্রজাহিতৈষী, সুশাসক, অসাম্প্রদায়িক ও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর স্থাপত্যপ্রীতিও ছিল অপরিসীম। তাঁর আমলে নির্মিত বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মনোরম স্থাপত্যশৈলীসমৃদ্ধ মসজিদসমূহ তারই প্রমাণ বহন করে।

মু. মা.

আলাওল [১৬০৭—১৬৮০]

আলাওলের জন্ম আনুমানিক ১৬০৭ সালে। আলাওলের কবিখ্যাতি অসাধারণ। 'পদ্মাবতী'-র রচয়িতা হিসাবে তিনি বিখ্যাত। তিনি মুখ্যত অনুবাদক। কিন্তু 'পদ্মাবতী' অনুবাদ হলেও তাঁর মৌলিক রচনা হিসাবেই বিবেচিত হয়।

আলাওল বাংলা (দ্র), মৈথিল, ব্রজভাষা, ঠেট খাড়িবোলি প্রভৃতি বহু ভাষা জানতেন। এগুলো উত্তর ভারতীয় উপভাষা। আরবি (দ্র), ফার্সি ও সংস্কৃত তিনি খুব ভাল জানতেন। যোগতন্ত্র-তাসাউফও তিনি জানতেন। কাব্যতত্ত্ব, ছন্দোবিজ্ঞান ও অলঙ্কারশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর ও ব্যাপক। রোসাঙ্গে তাঁর পরিচয়-খ্যাতি সঙ্গীতশিক্ষক রূপে।

আলাওল সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে এটুকু বলা যায় যে ফরিদপুরের ফতেহাবাদ পরগনার জালালপুর তাঁর পিতার কর্মস্থল ছিল। তাঁর পিতা উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। জলপথে কোথাও যাওয়ার সময় তাঁর পিতা জলদস্যুদের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যুবরণ করেন এবং আলাওল আহত হন। অতঃপর তিনি রোসাঙ্গে (বর্তমানে মায়ানমারের অন্তর্গত আরাকান) উপস্থিত হন এবং সেখানে অশ্বারোহী সৈনিকের চাকুরি নেন। তাঁর সঙ্গীতখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ায় তিনি সঙ্গীতশিক্ষক রূপে রোসাঙ্গের রাজার অমাত্যবৃন্দের মধ্যে স্থান পেলেন। তার পর ক্রমেই তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি যে উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত এ খবরও জানাজানি হয়ে যায়। তিনি এক অমাত্যের আগ্রহে ও সাহায্যে অনেকগুলো কাব্য (দ্র) রচনা করেন। তিনি কত বছর জীবিত ছিলেন তা বলা সম্ভব নয়। তবে ১৬৫৯-৭৩ সালের মধ্যে তাঁর কবিজীবনের শুরু ও শেষ হয়।

ইতিহাসবিদগণ বলেন, আলাওল সাদউমেঙদারের সিংহাসন পাওয়ার (১৬৪৫) দু' তিন বছর পর ১৬৪৭-'৪৮ সালে রোসাঙ্গে পৌছান। 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনার সময়ে (১৬৫১) তিনি প্রায় প্রৌঢ়।

রোসাঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাগন ঠাকুর (দ্র) আলাওলের সঙ্গীতশিষ্য হতে পারেন, কাব্যশিষ্যও বলা যায়। তবে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া না। মাগনের মৃত্যু হলে আলাওল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সয়ফুল্‌মুল্‌ক' অসমাপ্ত থেকে

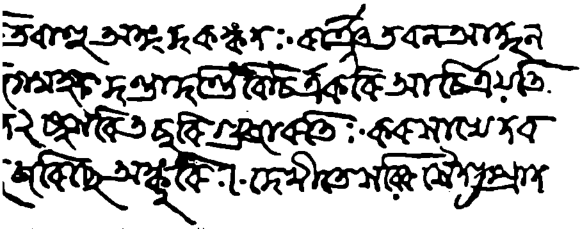

আলাওলের হাতের লেখা

যায়। কারণ ঐ গ্রন্থ রচনাকালে তিনি তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন।

আলাওল কোনো এক কারণে রাজরোষে পড়েন। ফলে তিনি অমাত্যদের আনুকুল্য থেকে বঞ্চিত হন। প্রায় অন্নাভাবে তাঁর দিন কাটে।

আলাওলের 'পদ্মাবতী' বিখ্যাত গ্রন্থ। এটি জায়সীর 'পদুমাবত' কাব্যের স্বাধীন অনুবাদ। অনুবাদে তিনি কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন, আবার নিজে যোগও করেছেন অনেক কিছু।

আ. হা.

আলাপ

রাগের রূপ (দ্র) প্রকাশ করা বা রাগরূপকে বিস্তৃত করার প্রধান পদ্ধতির নাম আলাপ। সাধারণত কোনো ছন্দের ছক অনুসরণ না করে স্বাধীনভাবে স্বরবিস্তারের সাহায্যে বা বিভিন্ন স্বরধ্বনির সাহায্যে বা নোম্-তোম্ প্রভৃতি বোলের সাহায্যে অত্যন্ত ধীর লয়ে আলাপ করা হয়। বর্তমান কালে খেয়াল (দ্র) সঙ্গীত রীতিতে ছন্দ অনুসরণ করেও আলাপ করা হয়ে থাকে। রাগসঙ্গীতের আলাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ঘরানা (দ্র) ভেদে আলাপে পার্থক্য হয়। ধ্রুপদ (দ্র), খেয়াল ইত্যাদি রীতি ভেদেও আলাপে পার্থক্য ঘটে। পূর্বে আলাপ বা আলাপনকে বলা হত আলপ্তি। খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে জীবিত পার্শ্বদেব তাঁর বিখ্যাত 'সঙ্গীত সময়সার' গ্রন্থে আলাপ সম্পর্কে প্রথম প্রামাণ্য আলোচনা করেন। কণ্ঠসঙ্গীতের মতো যন্ত্রসঙ্গীতেও আলাপ করতে হয়। যন্ত্রসঙ্গীতের প্রামাণ্য আলাপের সিল্‌সিলায় বা ক্রমে বারোটি অঙ্গ থাকে।

ক. গো.

আলাপনী শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র
আলালের ঘরের দুলাল প্যারীচাঁদ মিত্র দ্র

আলী (রা.), হযরত [আনু. ৬০০–৬৬১]

হযরত আলী (রা.) ছিলেন ইসলামের (দ্র) চতুর্থ খলিফা। আরবের বিখ্যাত হাশিমী গোত্রে আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টাব্দে (দ্র) তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম আবু তালিব। তিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (স.) (দ্র)-এর নিকট-আত্মীয় এবং জামাতা।

হযরত আলী (রা.) ইসলাম গ্রহণকারী পুরুষদের মধ্যে দ্বিতীয় এবং বয়সে সর্বকনিষ্ঠ ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম ছিলেন। তিনি অমিত শক্তিশালী ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। বুদ্ধি, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ইসলামের জন্য ত্যাগ—এসব গুণের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে।

হযরত উসমান (রা.) (দ্র)-র মর্মান্তিক মৃত্যুর পর ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে আলী (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনকালও স্থিতিশীল ছিল না এবং দেশে নানা অসন্তোষ বিরাজমান ছিল। হযরত উসমানকে হত্যার পর মুসলিম সাম্রাজ্যে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, হযরত আলী (রা.)-র পক্ষে তার অবসান ঘটানো সম্ভব হয় নি। স্বার্থপর ও সুবিধাবাদী ব্যক্তিদের প্রাধান্য, অন্তর্দ্বন্দ্ব, গৃহযুদ্ধ এবং গণ-অসন্তোষ পরিস্থিতিকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয়। হযরত আলী (রা.) এতৎসত্ত্বেও ইসলামী বিধান থেকে এতটুকু বিচ্যুত হন নি, অন্যায় দাবির কাছে মাথা নত করেন নি।

অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলার পরিণতি হিসাবে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে (৩৯ হিজরি) হযরত আলী (রা.) জনৈক খারিজি গুপ্তঘাতকের ছুরিকাঘাতে শহীদ হন।

মু. মা.

আলীবর্দী খাঁ, নবাব [১৬৭৬—১৭৫৬]

নবাব আলীবর্দী খাঁ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার (দ্র) মাতামহ। তাঁর জন্ম ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে (দ্র)। ১৭৪০ থেকে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৬ বছর তিনি বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম মীর্জা মুহম্মদ আলী। জানা যায়, তাঁর পিতামহ ও পিতা যথাক্রমে সম্রাট আওরঙ্গজেব ও তাঁর পুত্র আজম শাহের অধীনে চাকুরি করতেন।

তৎকালীন বাংলার নবাব সুজাউদ্দিনের বিশেষ আনুকূল্যে আলীবর্দী ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে বিহারের নায়েব সুবাদার পদ লাভ করেন। এর পর ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দিনের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ মসনদে আসীন হন। সরফরাজ শাসক হিসাবে ছিলেন অযোগ্য ও দুর্বলচিত্ত। এমতাবস্থায় আলীবর্দী খাঁ নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কতিপয় প্রভাবশালী অমাত্যের সহযোগিতায় গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত করে বাংলার সিংহাসনে আসীন হন (১৭৪০)। আলীবর্দীর ১৬ বছরের শাসনামলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল মারাঠাদের আক্রমণ, যা 'বর্গীর হাঙ্গামা' নামে ইতিহাসে খ্যাত। ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ন' বছর বর্গীর (দ্র) আক্রমণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়, শাসনকার্যেও ব্যাঘাত ঘটে। শেষে এক সন্ধির মাধ্যমে তিনি মারাঠাদের সঙ্গে আপসরফা করে এই সমস্যার অবসান ঘটান।

সভাসদদের সঙ্গে নবাব আলীবর্দী খাঁ (একটি চিত্রকলা)

নবাব আলীবর্দী খাঁ অত্যন্ত কুশলী ও উদারমনা শাসক ছিলেন। বহু হিন্দুকে তিনি সরকারি কাজে নিযুক্ত করেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও ছিল সুশৃঙ্খল, সংযত। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে ৮০ বছর বয়সে মুর্শিদাবাদে তাঁর মৃত্যু হয়।

মু. মা.

আলু

বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত সব্জি আলু অনেক দেশে প্রধান খাদ্য হিসাবে বিবেচিত। আলু গাছের আহার্য অংশটুকু মাটির নিচে থাকলেও এটি আসলে কাণ্ডেরই স্ফীত অংশ, যা 'টিউবার' (tuber) নামে পরিচিত। মাটির উপর আলুগাছ ছোট ঝাঁকড়া হয়ে ১০০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। যদিও এটি পুষ্পিত হয়ে বীজ দেয়, সাধারণত টিউবারের

উপরের 'চোখ' বা মুকুল থেকে গজিয়ে আলুর চাষ করা হয়। প্রতি বছর আলু ফলাবার পর আলু গাছ মরে যায়। তখন নতুন করে একটি গোটা টিউবার অথবা তার চোখসহ কাটা অংশ আলুবীজ হিসাবে বপন করা হয়।

আলুর শতকরা ৮০ ভাগ পানি। বাকি অংশের শতকরা ৮৫ ভাগ শর্করা ও অন্য ১৫ ভাগের প্রায় সবটা আমিষ। এতে শরীরের জন্য জরুরি ভিটামিন বি ও ভিটামিন সি রয়েছে। ক্যালসিয়াম (দ্র) ও লোহা (দ্র)- সহ কিছু প্রয়োজনীয় খনিজও রয়েছে। এদিক থেকে আলুর পুষ্টি-উপাদানগুলো বেশ সুষম।

আলু ইনকা সভ্যতার (দ্র) অবদান, এর আদি প্রাপ্তিস্থান দক্ষিণ আমেরিকা (দ্র)। ইউরোপীয়রা সেখান থেকে এটি নিজের দেশে এবং অন্যান্য উপনিবেশে নিয়ে যায়। পঞ্চাশ-ষাটের দশকেও আমাদের দেশে আলু একটি শীতকালীন সব্জি হিসাবেই প্রচলিত ছিল। পরে আলু সংরক্ষণের জন্য দেশে ব্যাপকভাবে হিমাগার চালু হলে সারা বছর ধরে আল খাওয়া সম্ভব হয়েছে। হিমাগারে আলুকে ৪° থেকে ১০° সেলসিয়াস উত্তাপে রাখা হয়। শুধু তরকারি হিসাবে ব্যবহার না করে আলুকে ভাতের বিকল্প হিসাবে গুরুত্ব দিলে আমরা পুষ্টির দিক থেকে ও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতাম। আলুর চাষ ও একর প্রতি এর ফলন উভয়ই যেভাবে বেড়েছে তাতে সে রকম সুযোগ রয়েছে। ষাটের দশক থেকে আমাদের দেশে উচ্চ ফলনশীল আধুনিক জাতের আলুর চাষ হচ্ছে। এসব জাতের কিছু আলুবীজ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হলেও এখনো প্রতি বছর প্রচুর আলুবীজ বিদেশ থেকে আনতে হয়। স্থানীয়ভাবে রোগমুক্ত বীজ পাওয়া আলুচাষের ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে আলুর উৎপাদন প্রচুর বৃদ্ধি করা সম্ভব।

মু. ই.

আলেকজাণ্ডার [খ্রি.পূ. ৩৩৬—৩০৩]

গ্রিসের ম্যাসিডোনিয়া রাজ্যের রাজা ও বিশ্ববিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর। পিতা ফিলিপের মৃত্যুর পর আলেকজাণ্ডার ৩৩৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মাত্র বিশ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণের পরই তিনি বিশ্ববিজয়ে বের হন। প্রথমে তিনি সমগ্র গ্রিসে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র তিন বছরের মধ্যে সিরিয়া, মিশর, তুরস্ক, ইরান, ইরাক,

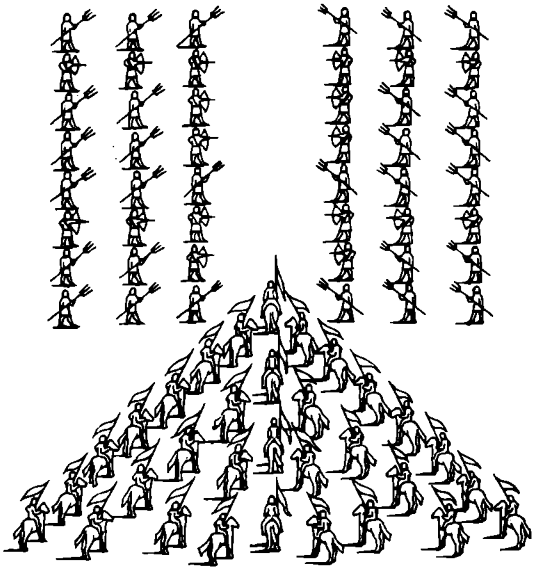

দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার ও নিচে : বিভিন্ন দেশ অভিযানে তাঁর সুশৃঙ্খল বাহিনী পরিচালনার একটি বুদ্ধিদীপ্ত ছবি

আফগানিস্তান দখল করে ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি বিনা বাধায় একের পর এক দেশ জয় করতে থাকেন।

সিন্ধু নদীর পূর্ব-তীরে পুরু রাজার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পুরু রাজা পরাজিত হন। কিন্তু আলেকজাণ্ডার পুরু রাজার বীরত্বে খুশি হয়ে তাঁকে রাজ্য ফিরিয়ে দেন।

আলেকজাণ্ডার ভারতে আরো এলাকা দখল করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ায় এবং তারা ফিরে যেতে ইচ্ছুক হওয়ায় স্বদেশের দিকে যাত্রা করেন। ফেরার পথে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে আলেকজাণ্ডার ব্যাবিলনে মারা যান।

আলেকজাণ্ডারের অভিযানের কারণেই ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রথম যোগাযোগ ঘটে।

আ. ই.

আলেকজান্দ্রিয়া ইউক্লিড দ্র

আলেন্দে, সালভাদোর [১৯০৮—১৯৭৩]

চিলির সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা এবং এককালীন প্রেসিডেন্ট। পুরো নাম সালভাদোর আলেন্দে গোসেন্স (Salvador Allende Gossens)। 'আলেন্দে' শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ কিন্তু 'আইয়েন্দে'। জন্ম চিলির ভালপারাইজোতে, ১৯০৮ সালের ২৬শে জুলাই।

চিলি বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিভাগে অধ্যয়নকালে রাজনীতিতে আলেন্দের হাতেখড়ি। ১৯৩২ সালে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৩ সালে তাঁর একান্ত চেষ্টায় গড়ে ওঠে চিলির সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং তিনি এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৩৮ সালে দেশে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পপুলার ফ্রন্টের বিজয়ে আলেন্দে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং এই সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদ লাভ করেন।

১৯৩৯ সালে চিলিতে সংঘটিত ভয়াবহ ভূমিকম্পে ব্যাপক জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। আলেন্দে এই সময় যে ত্রাণতৎপরতা চালান, তার সুবাদে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

১৯৭০ সালে তিনি পপুলার ইউনিটি পার্টির সর্বসম্মত প্রার্থী হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়ান। নোবেল পুরস্কার (দ্র) বিজয়ী কবি পাবলো নেরুদা (দ্র) তাঁর সমর্থনে নিজের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেন। নেরুদা এই নির্বাচনে চিলির কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ছিলেন।

১৯৭০ সালের এই নির্বাচনে আলেন্দে জয়ী হন। তিনি দেশের সাধারণ মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে বেশ কিছু যুগান্তকারী কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন, যা ছিল বিদেশী স্বার্থের বিরোধী। ১৯৭৩ সালে তাঁকে লেনিন শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এই বছরেই ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে সংঘটিত এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন।

আ. হু.

আলেয়া

রাতের আঁধারে নির্জন জলাভূমি কিংবা আবর্জনাপূর্ণ খোলা প্রান্তরে আলেয়া (*Ignus fatuus* বা will-o-the-wisp) দেখা যায়। এর অপর নাম ভুতুড়ে আলো বা ভৌতিক আলো। সাধারণত মাটি (দ্র) থেকে কয়েক হাত উঁচুতে আগুনের শিখা অগ্নিগোলকের মতো হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে। এমনকি বৃষ্টির পানিতেও এই আগুন নিবতে চায় না।

আলেয়া সৃষ্টির সঠিক কারণ বলা মুশকিল। মনে করা হয়, জলাভূমিতে পানির নিচে নানা জাতের গাছপালা পচনের ফলে মিথেন (দ্র) গ্যাস তৈরি হয়। জলাভূমিতে তৈরি হয় বলে একে মার্শ গ্যাস (marsh gas) - ও বলা হয়। এই গ্যাস জ্বলার ফলে আলেয়া সৃষ্টি হয়। কিন্তু মার্শ গ্যাসের আপনা আপনি জ্বলার ক্ষমতা নেই। সে জন্য বিজ্ঞানীদের ধারণা, উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজ পদার্থ পচনের ফলে সৃষ্ট ফস্‌কিন্ PH_3 বা ফস্‌ফোরেটেড হাইড্রোজেন নামের আরেক রকম গ্যাস আলেয়া সৃষ্টির আসল কারণ। কেননা পরীক্ষাগারে অন্ধকারে ফস্‌কিন্ গ্যাস তৈরি করলেও আলেয়ার নমুনা পাওয়া যায়।

সা. এ.

আলো

এক প্রকার তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ, যা মানুষ চোখে দেখতে পায়। এই বিকিরণ কোনো বস্তুর উপর পড়লে প্রতিফলিত

হয়ে আমাদের চোখের লেন্সে ফিরে এলে আমরা বস্তুটি দেখতে পাই। প্রতিফলন ঘটে বস্তুর আকার ও আকৃতি অনুযায়ী। আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ৪ × ১০^{-৫} সেন্টিমিটার থেকে ৮ × ১০^{-৫} সেন্টিমিটার। বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক-রশ্মি চোখে বিভিন্ন বর্ণের অনুভূতি সৃষ্টি করে। আলোক-তরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,৩২৬ মাইল বা ২·৯৯৭৮ × ১০^{১০} সেন্টিমিটার।

সু. ব.

আলোকবর্ষ

জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত দূরত্বের একক। আলো এক বছরে যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে তাই-ই আলোকবর্ষ নামে অভিহিত। এই দূরত্বের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৯·৪৬০ × ১০^৫ মিটার অথবা ৬ × ১০^{১২} মাইল। বহু কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির দূরত্ব প্রকাশের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই একক ব্যবহৃত হয়।

সু. ব.

আলোর প্রতিফলন

আলো একটি তরঙ্গ (দ্র)। কোনো স্বচ্ছ ও সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলো নির্দিষ্ট বেগে, সোজা পথে চলে। কিন্তু আলো যখন মাধ্যম পরিবর্তন করে বা করতে চায়, তখন তিনটি ব্যাপার লক্ষ করা যায় :

ক. আলো দু' মাধ্যমের বিভাজক তল থেকে প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে, এটি আলোর প্রতিফলন;

খ. কিছু আলো দ্বিতীয় মাধ্যমটি শোষণ করে; এবং

গ. আলো দ্বিতীয় মাধ্যমে ভিন্ন পথে চলতে থাকে। এটি আলোর প্রতিসরণ (দ্র)।

অর্থাৎ, কোনো মাধ্যমে বাধা পেয়ে আলোর প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসার ঘটনাকে আলোর প্রতিফলন বলা হয়।

তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের সাধারণ ধর্ম হিসাবে আলোর প্রতিফলনও দু'টি নিয়ম মেনে চলে।

দ্বিতীয় মাধ্যমের যে বিন্দুতে আলো আপতিত হয় সে বিন্দুতে একটি কল্পিত লম্বকে বলা হয় অভিলম্ব। নিয়মানুযায়ী আপতিত আলো, প্রতিফলিত আলো ও অভিলম্ব একই সমতলে থাকে। শুধু তাই নয়, অভিলম্বের সঙ্গে আপতিত আলো যে কোণ তৈরি করে, প্রতিফলিত আলোও অভিলম্বের সঙ্গে সমান কোণ তৈরি করে।

প্রতিফলনের ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের দর্পণ বানানো হয়ে থাকে।

মু. হা.

আলোর প্রতিসরণ

আলো এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে যাবার সময় দু' মাধ্যমের সংযোগস্থলে গতিপথ পরিবর্তন করে। এই ব্যাপারটিকে আলোর প্রতিসরণ বলে। প্রতিসরণের জন্য পানিতে আংশিক ডোবানো কোনো সোজা দণ্ডকে বাঁকা দেখায়।

আলোর প্রতিসরণ দু'টি নিয়ম মেনে চলে :

ক. আপতিত আলো, প্রতিসৃত আলো ও অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।

খ. দুটো নির্দিষ্ট মাধ্যম ও একটি নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপতিত রশ্মি ও প্রতিসৃত রশ্মির প্রত্যেকে অভিলম্বের সঙ্গে যে কোণ উৎপন্ন করে তাদের জ্যামিতিক সাইন (sine) -এর অনুপাত (দ্র) সর্বদা ধ্রুব থাকে। এই ধ্রুব সংখ্যাটিই মাধ্যম দু'টির একটির সাপেক্ষে অপরটির প্রতিসরাঙ্ক।

প্রতিসরণের জন্য আলোর বেগই দায়ী। একটি নির্দিষ্ট মাধ্যমে আলোর বেগ অভিন্ন, কিন্তু ভিন্ন-ভিন্ন মাধ্যমে আলোর বেগ ভিন্ন। বিভিন্ন মাধ্যমে আলোর বেগের ভিন্নতাই প্রতিসরণের জন্য দায়ী। প্রতিসরণের কারণে সূর্যোদয়ের কিছু আগে সূর্যকে (দ্র) দেখা যায়।

বহুদূরের নক্ষত্র (দ্র) থেকে আসা আলো বিভিন্ন ঘনত্বের বায়ুমাধ্যমের মধ্য দিয়ে আসার সময় অনবরত দিক পরিবর্তন করে। ফলে দর্শকের কাছে কখনো বেশি আলো ও কখনো কম আলো এসে পৌঁছায়। এ কারণে নক্ষত্রের আলো ঝিকমিক করে। গ্রহগুলো পৃথিবীর (দ্র) অপেক্ষাকৃত কাছে বলে এদের আলোর (আসলে সূর্যের আলো গ্রহের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে) বাড়া-কমা বোঝা যায় না। তাই গ্রহের আলো স্থির।

মু. হা.

বাংলা ও আরবি হরফে ক্যালিগ্রাফি

আল্লাহ্

এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌম সত্তাবাচক নাম। বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মে (দ্র) স্রষ্টার বিভিন্ন নাম রয়েছে। ইসলাম ধর্মের (দ্র) অনুসারীদের মধ্যে আরবি 'আল্লাহ্' শব্দটি স্রষ্টার সত্তাবাচক নাম হিসাবে বহুল প্রচলিত। তবে ফার্সি 'খোদা' শব্দটিরও প্রচলন রয়েছে।

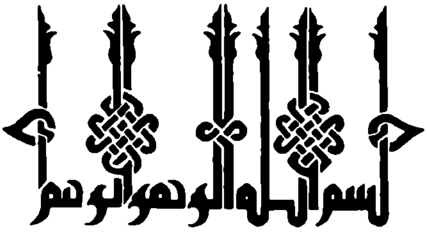

আরবি হরফে একটি ক্যালিগ্রাফি চিত্র

ইসলামে 'আল্লাহ্' শব্দটির ব্যবহার ব্যাপক তাৎপর্যবহ। এ পর্যায়ে তিনি সর্বশক্তিমান, সার্বভৌম এবং একমাত্র আরাধ্য; তাঁর কোনো শরিক নেই; তিনি যাবতীয় জীবের জন্ম ও মৃত্যুর নিরঙ্কুশ মালিক; তিনি স্বয়ম্ভূ এবং সর্বশক্তিমান; তাঁর কোনো জন্মদাতা নেই; তিনিও কারো জনক নন; তিনি নিরাকার, অনাদি, অনন্ত এক মহাশক্তিময় সত্তা।

মু. মা.

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দ্র

আশুরা

'আশুরা' অর্থে আরবি মুহর্‌রম মাসের দশম দিবসকে বোঝায়। নানা কারণে মুহর্‌রম মাসের এই তারিখটি বিশিষ্টতা লাভ করেছে। হাদিসের (দ্র) বর্ণনায় পাওয়া যায়— এই দিনে হযরত মুসা (আ.) (দ্র) বনী ইসরায়েলদের ফিরাউনের কবল থেকে মুক্ত করে মিশর থেকে পলায়ন করেন এবং তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে ফিরাউনের সলিলসমাধি ঘটে। হযরত নূহ (আ.) (দ্র) মহাপ্লাবনের পর এই তারিখেই সঙ্গীসাথীসহ জাহাজ থেকে নতুন জনপদে অবতরণ করেছিলেন।

'আশুরা'কে জড়িয়ে এমনি আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। তবে এই দিবসটি সারা মুসলিম বিশ্বে যে কারণে দীর্ঘ প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে আলোচিত ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত, তা হল কারবালার যুদ্ধে হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদৎ বরণ। ইসলামের (দ্র) চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) (দ্র)-র কনিষ্ঠ পুত্রের নাম হযরত হুসাইন (রা.) (দ্র)। তিনি উমাইয়া শাসক ইয়াজিদের সৈন্যদের সঙ্গে এক অন্যায় ও অসম যুদ্ধে ফুরাত নদীর তীরবর্তী কারবালা প্রান্তরে ১০ই মুহর্‌রম তারিখে সঙ্গীসাথীসহ শহীদ হন।

মুসলমানগণ হযরত হুসাইনের এই আত্মত্যাগের দিনটিকে শোকদিবস হিসাবে পালন করে।

মু. মা.

আশ্রম

সাধারণ অর্থে 'আশ্রম' বলতে সংসার ত্যাগীদের আবাসস্থল এবং সাধনা বা শাস্ত্রচর্চাকেন্দ্রকে বোঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে আশ্রম ব্রাহ্মণদের জীবনযাত্রার চারটি অবস্থা বা ধর্মবিশেষ। এই চারটি অবস্থা হল ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। গুরুগৃহে থেকে গুরুসেবা করে বেদাধ্যয়ন ও শিক্ষাগ্রহণ পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যের আওতাভুক্ত। শিক্ষাশেষে গুরুর অনুমতি নিয়ে বিয়ে করে সংসারধর্ম পালন করার নামই গার্হস্থ্য অবস্থা। পরিণত বয়সে যখন গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্তব্যকর্ম শেষ হয়ে যায়, তখন স্ত্রীকে পুত্রের কাছে রেখে বা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বনে গিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে হয়। সাধারণভাবে

বলা হয় যে পঞ্চাশ বছরের অধিক বয়সে বনগমন শ্রেয়। সকল প্রকার দুঃখ–কষ্ট সহ্য করে ভগবৎপূজা ও ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকা বানপ্রস্থাশ্রমের কর্তব্য। আর সকল প্রকার আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের হাতে জীবন সমর্পণ করে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করতে হয়। শাস্ত্রে সত্তর বছর পূর্ণ হলে এই আশ্রম গ্রহণ করবার নির্দেশ আছে।

সুজ. ব.

আষাঢ়ী পূর্ণিমা

এই পূর্ণিমা তিথিতে গৌতম বুদ্ধ (দ্র) মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। পরে এই পূর্ণিমা তিথিতেই ২৯ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেন। ৩৫ বছর বয়সে বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি এই পূর্ণিমা তিথিতে সারনাথে প্রথম 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' করেন, অর্থাৎ পাঁচ জন শিষ্যের কাছে প্রথম ধর্ম প্রচার করেন। গৌতম বুদ্ধের জীবনের উক্ত তিন ঘটনার জন্য আষাঢ়ী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের নিকট পবিত্র পরব। আবার এই পূর্ণিমা থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তিন মাসের জন্য বর্ষাব্রত পালন আরম্ভ করেন।

বি. ব.

আসওয়ান বাঁধ

আসওয়ান বাঁধ দক্ষিণ–পূর্ব মিশরের নাসের হ্রদের উত্তর দিকে আসওয়ান শহরের নিকট অবস্থিত। এই বাঁধের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ কিমি এবং উচ্চতা ১১০ মিটার। এই বাঁধ মিশরের নীল নদের বন্যার পানি নিয়ন্ত্রণ করে।

আসওয়ান বাঁধ তৈরির কাজ ১৯৬০ সালে আরম্ভ হয়ে ১৯৭০ সালে শেষ হয়। এতে খরচ পড়ে প্রায় এক শ' কোটি মার্কিন ডলার।

বর্ষাকালে এই বাঁধ নীল নদের বন্যার পানি ধরে রাখে এবং অতিরিক্ত পানি নাসের হ্রদে জমা করে রাখা হয়। পরে শুকনো মওসুমে এই পানি সেচের কাজে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। এই বাঁধের পানি দিয়ে প্রায় ২০ লক্ষ একর জমিতে চাষাবাদ চলে। এই বাঁধ দেওয়ার ফলে মিশরের কৃষি-উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অবশ্য এই বাঁধ পরিবেশগত কিছু অসুবিধারও সৃষ্টি করেছে। হাজার হাজার বছর ধরে নীল নদের বন্যা সমগ্র কৃষিভূমিকে প্লাবিত করার ফলে সেখানে পলি জমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পেত। বর্তমানে সেখানে বাধ্য হয়ে রাসায়নিক সার (দ্র) ব্যবহার করে ফসল ফলাতে হচ্ছে। তা ছাড়া এই বাঁধনির্মাণের ফলে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে ভূমির ক্ষয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিকটবর্তী ভূমিতে পানি নিষ্কাশনে দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বন্যার পানিতে নীল নদের অববাহিকা বিধৌত হতে পারে না বলে সেখানে শামুক জাতীয় প্রাণীর বৃদ্ধি ঘটেছে যা *শিস্টোসোমিয়াসিস (Schistosomiasis)* রোগের জীবাণু (দ্র) বহন করে। এই রোগে অন্ত্র (দ্র) ও কিডনি (দ্র) আক্রান্ত হয়।

মু. এ.

আসন্ন শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

আসহাবউদ্দীন আহমদ [১৯১৪—১৯৯৪]

শিক্ষাবিদ, মননশীল ও রম্য প্রবন্ধকার এবং বামপন্থী রাজনীতিক। জন্ম চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালি থানার সাধনপুর গ্রামে, ১৯১৪ সালে।

আসহাবউদ্দীন আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে ১৯৩৯ সালে ইংরেজি সাহিত্যে (দ্র) এম. এ. পাশ করার পর অধ্যাপনা পেশায় নিয়োজিত হন। চট্টগ্রাম, ফেনী ও কুমিল্লার বিভিন্ন কলেজে চৌদ্দ বছর তিনি অধ্যাপনা করেন। তিনি তৎকালীন পূর্ববঙ্গ বেসরকারি কলেজশিক্ষক সমিতির ইংরেজি মুখপত্র 'টিচার' পত্রিকা সম্পাদনার (দ্র) দায়িত্বও পালন করেন।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যাপনাকালে '৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের (দ্র) সূচনা হয়। তিনি কুমিল্লায় এই

আন্দোলন সংগঠিত ও জোরদার করার কাজে নেতৃস্থানীয় সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন।

আসহাবউদ্দীন আহমদ ১৯৫৩ সালে অধ্যাপনার পেশা পুরোপুরি ত্যাগ করে সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন বেছে নেন। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের (দ্র) মনোনীত প্রার্থী হিসাবে তিনি জয়লাভ করে সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু এর অনতিকাল পরে ৯২-ক ধারা জারি হলে তিনি কারারুদ্ধ হন। জেল থেকে মুক্তিলাভ করলেও বামপন্থী ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার জন্য পাকিস্তান আমলে তাঁকে দীর্ঘ পনেরো বছর আত্মগোপন করে কাটাতে হয়। আত্মগোপনরত অবস্থাতেই তিনি রচনা করেন তাঁর জীবনের প্রথম সাহিত্যকর্ম 'ধার' ও 'সের এক আনা মাত্র'। দু'টিই রম্য ও ব্যঙ্গরসাত্মক রচনার সঙ্কলন।

অধ্যাপক আসহাবউদ্দীন আহমদ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাংলাদেশের (দ্র) বামপন্থী রাজনৈতিক দল 'সাম্যবাদী দলে'র কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং কৃষকসংগঠন 'চাষীমুক্তি সমিতি'র সভাপতি ছিলেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির (দ্র) আমন্ত্রণক্রমে তিনি ১৯৮০ সালে চীন দেশ সফর করেন। তিনি বাংলাদেশ লেখকশিবির চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। শুধু তাই নয়, চট্টগ্রাম সিটি কলেজসহ জেলার একাধিক স্কুল-কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। দেশের বেশ ক'টি প্রথম শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় কলাম লিখেও তিনি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। আসহাবউদ্দীন আহমদের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম 'ধার', 'সের এক আনা মাত্র', 'ইন্দিরা গান্ধীর বিচার চাই' ও 'উজান স্রোতে জীবনের ভেলা'। তাঁর রচনাসংগ্রহও ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

আসহাবউদ্দীন আহমদের রচনাকর্মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সহজ সরল ও রসাত্মক বাক্‌ভঙ্গি সহযোগে সামাজিক অসঙ্গতিসমূহ তুলে ধরা, গভীর মানবিক বোধ এবং শোষিত, নিপীড়িত মানুষের দাবিদাওয়ার প্রতি আপসহীন সমর্থন দান।

তিনি ১৯৯৪ সালে ২৮শে মে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

আসাদুজ্জামান (শহীদ) [১৯৪২—১৯৬৯]

পুরো নাম আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। পিতা মোহাম্মদ আবু তাহের, মাতা মতিজাহান খাদিজা খাতুন। জন্ম ১৯৪২ সালের ১০ই জুন নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার ধনিয়া গ্রামে। ১৯৬০ সালে শিবপুর হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৬৩ সালে সিলেট এম.সি. কলেজ থেকে আই. এ., ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে ১৯৬৬ সালে ইতিহাসে বি. এ. অনার্স ও ১৯৬৭ সালে এম. এ. পাশ করেন।

আসাদ ছিলেন তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ)-এর একনিষ্ঠ কর্মী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা ছাত্রনেতা। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর (দ্র) অনুসারী আসাদ কৃষক সমিতির আহ্বানে ১৯৬৮ সালে সারা বাংলার হাট-বাজারে হরতাল পালন কর্মসূচি উপলক্ষে নরসিংদীর হাতিরদিয়ায় নেতৃত্ব দেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের (দ্র) কর্মতৎপরতায় যুক্ত ছিলেন আসাদ। সেই বছর ২০শে জানুয়ারি ছাত্রসমাজের ১১-দফার দাবিতে ঢাকাসহ দেশের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় নগরীর বিভিন্ন শিক্ষায়তনের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী যোগ দেয়। সভাশেষে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে বেরিয়ে আসা মিছিলের এক অংশ সামনের রাস্তা ধরে চান খাঁর পুলের দিকে এগোলে পুলিশ বাধা দিয়ে গুলি ছোঁড়ে। অত্যন্ত কাছে থেকে মিছিলের পুরোভাগে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানের দিকে গুলি ছোঁড়া হলে তিনি শহীদ হন।

এর পর থেকে প্রতি বছর ২০শে জানুয়ারি দিনটি 'আসাদ দিবস' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। শহীদ

গুলিবিদ্ধ আসাদ, নিচের ছবি : আসাদের রক্তাক্ত শার্ট নিয়ে পল্টন ময়দানে রুদ্ররোষে বিক্ষুব্ধ জনতা

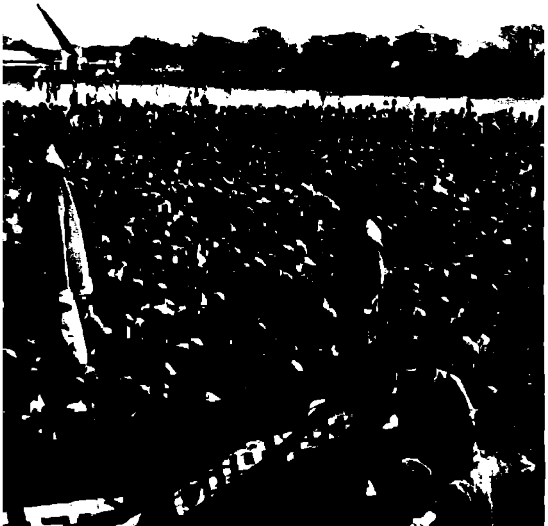

আসাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মোহাম্মদপুরে একদা পরিচিত আইয়ুব গেটের নাম বদল করে রাখা হয়েছে 'আসাদ গেট'। কবি শামসুর রাহমানের বিখ্যাত কবিতা 'আসাদের শার্ট' এই শহীদের স্মৃতিতে রচিত।

হা. র.

আসেরীয় সভ্যতা অ্যাসেরীয় সভ্যতা দ্র

আস্তীক

জরৎকারু মুনি ও তাঁর স্ত্রী জরৎকারু বা মনসাদেবীর পুত্র এবং নাগরাজ বাসুকির ভাগ্নে।

সর্পকুলজননী কদ্রু তাঁর সপত্নী বিনতাকে দাসী বানাবার সঙ্কল্প করে ছেলেদের সাহায্য চান। কিন্তু ছেলেদের মধ্যে অনেকেই তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা করে। তখন তিনি অভিশাপ দেন যে রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে তারা ধ্বংস হবে।

মায়ের এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বাসুকি ব্রহ্মার কাছে উপায় প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা বলেন— জরৎকারু মুনির সঙ্গে জরৎকারু নামের কুমারীর বিয়ে হলে তাদের যে পুত্রসন্তান হবে সে-ই সর্পকুলকে মাতৃশাপ থেকে মুক্ত করবে। ব্রহ্মার এই কথায় নাগরাজ বাসুকি তাঁর বোন জরৎকারু কুমারীকে জরৎকারু মুনির সঙ্গে বিয়ে দেন, তবে জরৎকারু মুনি বলে রাখেন যে স্ত্রী কখনো এমন কোনো কাজ করতে পারবে না, যাতে সে অপ্রিয় হয়। তা হলে তিনি স্ত্রীকে ত্যাগ করবেন। এক দিন তা-ই ঘটে গেল। মুনির নিদ্রাভঙ্গ করে স্ত্রী তাঁর অপ্রিয় হয়। তখন স্ত্রীকে ত্যাগ করে যাবার সময় মুনি তাঁর পুত্র হবার সম্ভাবনা সম্পর্কে বলেন—'অস্তি' (আছে)। তাই জন্মের পর সেই পুত্রের নাম দেওয়া হল আস্তীক।

এদিকে ব্রহ্মশাপে মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্পদংশনে মৃত্যু বরণ করেছেন। এতে রুষ্ট হয়ে তাঁর পুত্র জনমেজয় নাগবংশ নির্মূল করতে উঠে পড়ে লাগলেন। তিনি সর্পযজ্ঞের আয়োজন করলেন। সর্পকুলকে তবে রক্ষা করবে কে ? আস্তীকের ওপরই পড়ল সেই দায়িত্ব। তিনি যজ্ঞস্থানে গিয়ে রাজা জনমেজয়ের মন জয় করেন এবং তাঁকে সর্পনিধন থেকে নিরস্ত করেন।

আস্তীকের নাম স্মরণ করলে সাপের ভয় দূর হয় বলে অনেকের বিশ্বাস।

সুজ. ব.

আহমদীয়া

'আহমদীয়া' আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মীর্যা গোলাম আহমদের নামানুসারে এই সম্প্রদায় 'আহমদীয়া' নামে পরিচিত। তিনি ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলায় কাদিয়ান্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ (১৮৩৫) করায় এ দেশে অনেকে আহমদীয়া সম্প্রদায়কে 'কাদিয়ানী'ও বলে থাকেন। এঁদের মতবাদ সম্পর্কে বৃহত্তর মুসলমান সমাজে তীব্র দ্বিমত ও বিরোধিতা বিদ্যমান। তাঁদের দাবি, এই মতবাদ কুরআনের (দ্র) মূল বক্তব্যের পরিপন্থী ও তা ধর্মদ্রোহিতার সামিল। কিন্তু আহমদীয়া মতাবলম্বীগণ নিজেদের মুসলমান হিসাবেই গণ্য করে থাকেন এবং বর্তমানে পৃথিবীর (দ্র) ১৪২টি দেশে প্রায় ২ কোটি লোক এই ধর্মীয় মতাদর্শের অনুসারী।

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের মতে, ইসলাম ধর্ম (দ্র) যেহেতু শান্তির ধর্ম, তাই জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ কখনো সহিংস হতে পারে না, এই যুদ্ধ চালাতে হবে অহিংস পন্থায়, শান্তিপূর্ণ উপায়ে, শত্রুকে জয় করতে হবে জ্ঞান এবং ভালবাসা ও সেবা দ্বারা। ইমাম মাহ্দী (দ্র) নামে সর্বশেষ ধর্মপ্রচারকের কথা ইসলাম ধর্মে আছে; মীর্যা গোলাম আহমদ দাবি করেছিলেন যে তিনিই সেই ইমাম মাহ্দী।

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের মত হল : সকল ধর্মই মূলত এক। সকল নবী বা অবতার যুগের চাহিদা অনুযায়ী মানুষের কল্যাণে ঐশী বাণী নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন। তবে, অতীতের ঐশী পুরুষেরা এসেছিলেন বিশেষ বিশেষ জাতি ও অঞ্চলের জন্য, কিন্তু হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র) এসেছেন সারা বিশ্বের জন্য। হযরত মুহম্মদই (স.) বিশ্বনবীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁরই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের মানবসমাজকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে মীর্যা গোলাম আহমদের আবির্ভাব ঘটেছে।

১৯০৮ সালে মীর্যা গোলাম আহমদের মৃত্যুর পর মৌলানা হাফেজ নূরুদ্দিন আহমদীয়া জামাতের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। তারপর যথাক্রমে মীর্যা বশিরউদ্দীন মাহমুদ ও হাফেজ মীর্যা নাসের আহমদ (এম. এ. অক্সন) খলিফা হয়েছিলেন। বর্তমান খলিফা (ইনি চতুর্থ) হলেন মীর্যা তাহের আহমদ।

মো. ই.

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

মুসলমানদের বিশেষ সম্প্রদায় 'সুন্নী', যাঁরা পবিত্র কুরআন (দ্র) ও মহানবীর (স.) (দ্র) সুন্নাতের অনুসারী। তাঁরা মহানবীর (স.) নির্দেশিত পথ পরিত্যাগ করে ধর্মে বিদা'ত বা নতুনত্ব সৃষ্টি করার বিরোধী। কোনো বিষয়ে অতি উগ্র মনোভাবের, এমনকি গোঁড়ামির পন্থা তাঁরা গ্রহণ করেন না। তাঁরা তাঁদের মতবাদের সপক্ষে যুক্তি হিসাবে মহানবীর (স.) এই বাণী উপস্থাপন করেন : "আমি তোমাদের নিকট দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যত দিন তোমরা এদের অনুসরণ করবে, তত দিন পথভ্রষ্ট হবে না। এ দু'টি জিনিস হচ্ছে পবিত্র কুরআন (দ্র) ও আমার সুন্না।" 'সুন্না' হচ্ছে মহানবী (স.)-এর বাণী ও জীবনাচরণ।

মো. ই.

আহলে হাদিস

আহলে হাদিস অর্থাৎ হাদিসপন্থী। মুসলমানদের মধ্যে এক ভিন্ন মতবাদের অনুসারী সম্প্রদায়। এঁরা ইসলামের (দ্র) মূল আদর্শ ও শিক্ষার পরিপন্থী নন, ইসলামেরই অনুসারী, কুরআন (দ্র) ও সুন্নায় (দ্র) বিশ্বাসী। তাঁদের মতে, কেবল কুরআন শরীফই ইসলামী বিধানের উৎস নয়, হাদিস (দ্র) বা সুন্নাহ্ এবং ইসলামী আচার-অনুষ্ঠানও শরীয়তী বিধানের উৎস হিসাবে গণ্য। এ ছাড়া, তাঁদের উপাসনার সময় বাহ্যিক ভিন্নতাসূচক কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রেও তাঁদের ভিন্ন বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা তাঁদেরকে সুন্নী মুসলমানদের থেকে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশে আহ্লে হাদিসপন্থীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

মু. মা.

আহসান মঞ্জিল

ঢাকায় (দ্র) বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ঐতিহাসিক প্রাসাদ। নওয়াব স্যার আহসানুল্লাহর নাম অনুসারে এই প্রাসাদের নামকরণ হয়েছে। এর প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব স্যার আবদুল গণি। প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭২ সাল। আহসান মঞ্জিলের

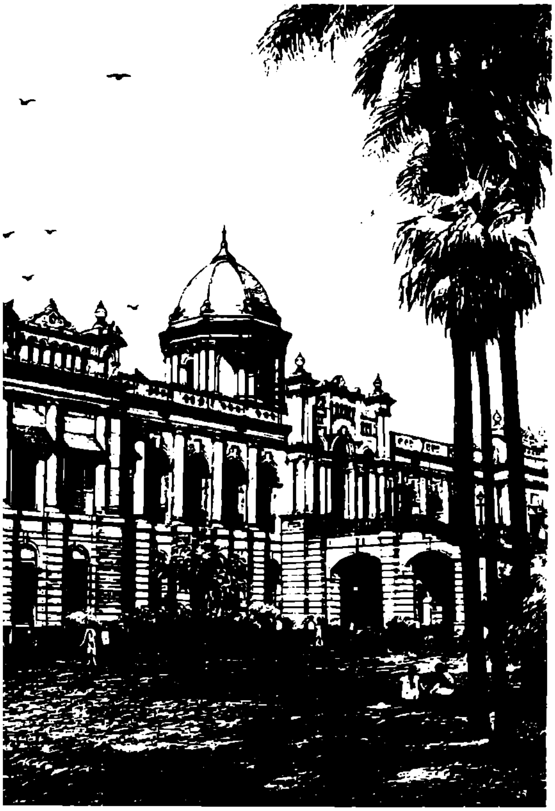

জায়গায় এক সময় একটি ফরাসি কারখানা ছিল। এই প্রাসাদ নির্মাণের ১৬ বছর পর প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় হয়। তাতে এটি প্রায় ভেঙে পড়ে। আহসান মঞ্জিল কয়েক বার সংস্কার করা হয়েছে। সর্বশেষ সংস্কার করা হয়েছে অতি সম্প্রতি। এখন এটি একটি জাদুঘর। দর্শনার্থীরা দু' টাকা প্রবেশমূল্যের বিনিময়ে এই জাদুঘর দেখতে পারে।

এই প্রাসাদের ছাদের ওপরে সুন্দর একটি গম্বুজ আছে। এক সময় এই গম্বুজের চূড়াটি ছিল ঢাকা শহরে সর্বোচ্চ। মূল ভবনের বাইরে ত্রি-তোরণবিশিষ্ট প্রবেশদ্বারও দেখতে সুন্দর। একইভাবে উপরে ওঠার সিঁড়িগুলোও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভবনের খিলানগুলোর প্রতিটি সুন্দর কারুকার্যময়। পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে এরকম দু'টি মনোরম খিলান আছে যা সবচেয়ে সুন্দর। আহসান মঞ্জিলের অভ্যন্তরে দু'টি অংশ আছে। বৈঠকখানা ও পাঠাগার আছে পূর্ব অংশে। পশ্চিম অংশে আছে নাচঘর ও অন্যান্য আবাসিক কক্ষ। নিচতলায় দরবারগৃহ ও ভোজন কক্ষ রয়েছে।

এই উপমহাদেশের ইতিহাসের অনেক ঘটনার সাক্ষী আহ্‌সান মঞ্জিলে দেশ-বিদেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি আতিথ্য গ্রহণ করেছেন কিংবা রাজনৈতিক বৈঠক করেছেন। ১৯০৬ সালে এখানে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে মুসলিম লীগ (দ্র) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। লর্ড কার্জনসহ অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি এখানে নওয়াবদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এসব ঐতিহাসিক স্মৃতি ধারণ করে টিকে আছে আহসান মঞ্জিল।

মো. হো.

আহসান হাবীব [১৯১৭—১৯৮৫]

যশস্বী কবি, সাংবাদিক ও সাহিত্যসম্পাদক। তিনি ১৯১৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি বৃহত্তর বরিশাল (দ্র) জেলার পিরোজপুরের শঙ্করপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তাঁর জীবনের প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। ১৯৩৩ সালে স্কুল ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। শিরোনাম ছিল 'ধর্ম'। ১৯৩৪ সালে তাঁর প্রথম কবিতা 'মায়ের কবর পাড়ে কিশোর' ছাপা হয় পিরোজপুর গভর্নমেণ্ট স্কুল ম্যাগাজিনে, তখন তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র।

আহসান হাবীব ১৯৩৫ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর বরিশাল বি এম কলেজে আই. এ. ক্লাশে ভর্তি হন। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষে উঠে শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটিয়ে তিনি ১৯৩৬ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে কলিকাতায় (দ্র) চলে যান।

১৯৩৭ সালে তিনি কলিকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকায় সাব-এডিটর হিসাবে যোগ দেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত মাসিক 'বুলবুল'-এর সহকারী সম্পাদক, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত মাসিক 'সওগাত'-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র স্টাফ আর্টিস্ট, ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ফ্র্যাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রাম্‌স্-এর প্রকাশনা উপদেষ্টা

এবং ১৯৬৪ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত 'দৈনিক পাকিস্তান' থেকে 'দৈনিক বাংলা'য় রূপান্তরিত পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মাসিক 'মোহাম্মদী'(দ্র) ও 'ইত্তেহাদ'-এর সঙ্গেও সম্পাদনাসূত্রে কিছু কাল জড়িত ছিলেন।

আহসান হাবীবের কবিজীবন রোম্যান্টিকতার অনুসারী। তবে তা সমাজভাবনাবিচ্ছিন্ন নয়। সাহিত্যসম্পাদক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রায় প্রবাদতুল্য। এ দেশের বহু লেখক ও কবির জীবনের প্রথম রচনা তাঁর হাত দিয়েই প্রকাশিত হয়। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল দৃষ্টান্তস্থানীয়।

আহসান হাবীবের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে : কাব্যগ্রন্থ 'রাত্রিশেষ' (১৯৪৭), 'ছায়াহরিণ' (১৯৬২), 'সারা দুপুর' (১৯৬৪), 'আশায় বসতি' (১৯৭৪), 'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো' (১৯৭৬), 'দুই হাতে দুই আদিম পাথর' (১৯৮১), 'প্রেমের কবিতা' (১৯৮২) ও 'বিদীর্ণ দর্পণে মুখ' (১৯৮৫); কাব্যানুবাদ : খসড়া (১৯৮৬); উপন্যাস : 'অরণ্য নীলিমা' (১৯৬২); শিশুসাহিত্য : 'জোছনারাতের গল্প', 'রাণী খালের সাঁকো', 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' (১৯৭৭), 'ছুটির দিন দুপুরে' (১৯৭৮), অনুবাদ : 'প্রবাল দ্বীপে তিন বন্ধু', 'অভিযাত্রী কলম্বাস' (১৯৫৯), 'রত্নদ্বীপ', 'রাজা বাদশা হাজার মানুষ', 'এসো পথ চিনে নিই', 'ইন্দোনেশিয়া'(১৯৬৬), 'ছোটদের পাকিস্তান' (১৩৫৩ ব.) ও 'বোকা বোকাই' (যুগ্ম রচনা); সম্পাদিত গ্রন্থ : 'বিদেশের সেরা গল্প' ও 'কাব্যলোক' (১৯৬৮)।

আহসান হাবীব তাঁর সাহিত্যকৃতির স্বীকৃতিস্বরূপ যে সব পুরস্কার লাভ করেন, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'ইউনেস্কো সাহিত্য পুরস্কার' (১৯৬০-৬১), কবিতার জন্য 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' (১৯৬১), 'আদমজী পুরস্কার' (১৯৬৪), 'নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক' (১৯৭৭), 'একুশে পদক' (১৯৭৮), 'আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার' (১৯৮০), 'পদাবলী সাহিত্য পুরস্কার' (১৯৮২) ও 'আবুল কালাম স্মৃতি পুরস্কার' (১৯৮৪)।

তিনি ১৯৮৫ সালের ১০ই জুলাই ঢাকায় পরলোক গমন করেন।

আ. হু.

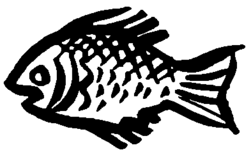

ই

ই ই সি ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায় দ্র

ইউ এফ ও

মাঝে মাঝে পৃথিবীর আকাশে দেখা যায় বিস্ময়কর আগন্তুক আলো বা বস্তু। এগুলো কখনো পৃথিবীর (দ্র) খুব কাছে চলে আসে, কখনো পৃথিবীতে অবতরণ করে আবার দ্রুত উড়ে যায়। দেখতে কোনোটি লম্বা চুরুটের মতো, কোনোটি চ্যাপটা থলের মতো। এগুলো কী, কোথা থেকে আসে আজ পর্যন্ত তা শনাক্ত করা যায় নি। তাই এদের বলা হয় Unidentified Flying Object সংক্ষেপে UFO বা অ-শনাক্ত উড়ন্ত বস্তু।

বহু যুগ থেকেই মানুষ আকাশে এ ধরনের বস্তু দেখেছে। ৩,৪০০ বছর আগে মিশরের ফারাও ও তাঁর সৈন্যসামন্ত এরূপ বস্তু দেখেছেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় ইউ এফ ও দেখার ঘটনা খুব বেড়ে যায়। অনেক সামরিক-বেসামরিক পাইলট ইউ এফ ও দেখতে পান। তাঁরা এর নাম দেন foo-fighter। কেউ বলেন ফ্লাইং সসার (flying saucer) বা উড়ন্ত পিরিচ। পত্র-পত্রিকায় এর ছবি পর্যন্ত ছাপা হয়।

এই ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী ১৯৪৭ সালে প্রজেক্ট ব্লু-বুক নামে ইউ এফ ও অনুসন্ধানের কর্মসূচি নেয়। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে ১২ হাজারেরও অধিক ইউ এফ ও দর্শনের তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে বস্তুগুলি শনাক্তকরণে ব্যর্থ হলে ১৯৬৯ সালে প্রজেক্টটি বন্ধ হয়ে যায়। বলা হয়, ইউ এফ ও জাতীয় নিরাপত্তায় কোনো হুমকি নয়। কলেরোডো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল বিজ্ঞানী গবেষণা (১৯৬৬-১৯৬৮) চালিয়ে ইউ এফ ও শনাক্ত করতে ব্যর্থ হন। ১৯৭৩ সালে আরেক দল বিজ্ঞানী ইউ এফ ও গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।

স. রা.

ইউ এন ডি পি

উন্নয়নশীল দেশে প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পদ আহরণ ও পরিকল্পিত ব্যবহারে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থার সংক্ষিপ্ত নাম। ইংরেজিতে এর পুরো নাম United Nations Development Programme (UNDP)। বাংলায় একে বলা হয় 'জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী'। এটি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ এজেন্সিসমূহের একটি। ১৯৬৫ সালের ২২শে নভেম্বর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য দিয়ে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের কার্যক্রমের সমন্বয়ও করে থাকে।

সুজ. ব.

ইউক্লিড [আনু. ৩০০]

এক জন গ্রিক গণিতবিদ। তাঁর বিশেষ আগ্রহের বিষয় ছিল জ্যামিতি। জ্যামিতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ইউক্লিড (Euclid) অধিক সুপরিচিত। জ্যামিতির উপর তাঁর রচিত 'জ্যামিতির উপাদানসমূহ' আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত পাঠ্যপুস্তক। বলা হয়ে থাকে, খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের (দ্র) পর সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ ছিল এই বই। এটি এত বেশি সাড়া জাগিয়েছিল যে প্রকাশিত হওয়ার পর প্রচলিত অন্য বইগুলোর কথা মানুষ খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। দু' হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে স্কুলের শিশুরা এই বইকে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহার করে। এমনকি বর্তমানে জ্যামিতি বিষয়ে যেসব বই চালু আছে, সেগুলোও ইউক্লিডের জ্যামিতি-শিক্ষণপদ্ধতিতে রচিত। ইউক্লিড অন্যান্য বইও লিখেছিলেন, তবে সেগুলোর সন্ধান মেলে নি।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে এই প্রখ্যাত জ্যামিতিবিদের জীবন সম্পর্কে আমরা তেমন কিছুই জানতে পারি নি। এমনকি তাঁর জন্ম-মৃত্যুর তারিখ, কোন শহর বা মহাদেশে (দ্র) তিনি জন্মেছিলেন তাও জানা যায় নি। জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতকে তিনি মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাস করতেন। মহামতি আলেকজাণ্ডার (দ্র) মিশর দখল করে নেওয়ার পর আলেকজান্দ্রিয়া নামে একটি শহর তৈরি করেন। সুবিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়ায় চমৎকার সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। শহরটি তখন পড়াশোনা ও গবেষণার জন্য পৃথিবীবিখ্যাত হয়ে ওঠে। বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানপাগল গণিতবিদ ইউক্লিড তখন অধ্যয়নের জন্য গ্রিস থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় আসেন ও পরবর্তী কালে সেখানে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। যদিও ইউক্লিডের জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় নি, তথাপি জ্যামিতি তথা গণিতে অবদানের জন্য তাঁর নাম পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

হো. আ.

ইউগ্লেনা (Euglena)

ইউগ্লেনা এক বা একাধিক ফ্লাজেলাবিশিষ্ট এককোষী জীব। ফ্লাজেলা (flagella) দেখতে চুলের মতো। ফ্লাজেলা দেহের সামনের দিকে অবস্থিত। ইউগ্লেনার দেহ লম্বাটে ধরনের। এর দেহের দুই প্রান্ত ক্রমশ সরু। অনেকটা চটি জুতোর সুখতলার মতো দেখতে। তাই বিজ্ঞানীরা একে 'স্লিপার এনিমলকিউল' নাম দিয়েছেন। ইউগ্লেনার দেহের ভিতরে সবুজ রঙের এক রকম কণা থাকে। এই কণা গাছের সবুজ পাতা বা কাণ্ডের ক্লোরোফিল (দ্র) বা পত্রহরিতের মতো। সবুজ কণার সাহায্যে গাছ যেমন পাতায় বা কাণ্ডে খাদ্য তৈরি করতে পারে, তেমনি ইউগ্লেনাও দিনের আলোয় দেহের সবুজ কণা দিয়ে খাদ্য তৈরি করে। এ কারণে উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা ইউগ্লেনাকে শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ বলে দাবি করে থাকেন। আবার এরা প্রাণীর মতো দেহকোষ দিয়ে তৈরি খাদ্যও গ্রহণ করতে পারে। বিপাক-ক্রিয়াসহ অন্যান্য ক্রিয়া উচ্চতর প্রাণীতে যেমনটি হয়ে থাকে, ইউগ্লেনাতেও অনুরূপভাবে তা সম্পন্ন হয়। ফলে, প্রাণিবিজ্ঞানীদের জোর দাবি এই যে ইউগ্লেনা উদ্ভিদ নয়, প্রাণী। আবার কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে, ইউগ্লেনা না উদ্ভিদ না প্রাণী, এটি উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করছে। ইউগ্লেনা দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে। অর্থাৎ কোষের নিউক্লিয়াস দুই ভাগে ভাগ হয়ে দুটো ইউগ্লেনায় পরিণত হয়।

ত. চ.

ইউজিন্ ওনেগিন্ (Eugene Onegin)

রুশ কবি পুশ্‌কিনের (দ্র) লেখা 'ইভ্‌গিয়েনি অনিয়েগিন্' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের শিরোনাম। বইটি 'ছন্দে রচিত উপন্যাস', অর্থাৎ এমন একটি কবিতার বই যেখানে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় একটি গল্প বলা হয়েছে।

হা. মা.

ইউটোপিয়া (utopia)

একটি গ্রিক শব্দ। অর্থ 'কোথাও নেই' অর্থাৎ যা কাল্পনিক। পরে এই শব্দটিকেই বিশুদ্ধ বা আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণার অন্তর্গত করা হয়। এর মূলে রয়েছে ইংরেজ পণ্ডিত ও রাজনীতিক সেইন্ট টমাস মোর (Saint Thomas More: ১৪৭৮—১৫৩৫)-এর বিখ্যাত লাতিন গ্রন্থ Utopia (১৫১৬)। মোর-বর্ণিত একটি কল্পিত দ্বীপে বিশুদ্ধ জীবন ও সমাজসংগঠন গড়ে তোলার এই ধারণা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় এবং বহু চিন্তাবিদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। অবশ্য 'ইউটোপিয়া'য় সমাজের অশুভ দিকগুলোর সমালোচনা ছাড়া এধরনের সমাজ বা রাষ্ট্র গড়ে তোলার বাস্তব কোনো দিঙ্‌নির্দেশ নেই। প্লেটোর (দ্র) 'রিপাবলিক'ও এ ধরনের গ্রন্থের একটি প্রাচীনতম নিদর্শন। 'ভাববাদী' বলে এই ধারণা অন্যদের সমালোচনা, নিন্দা ও ব্যঙ্গ-কৌতুকেরও শিকার হয়েছে।

নীতি হিসাবে আকর্ষণীয় কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন অসম্ভব— এমন রাজনৈতিক-সামাজিক চিন্তার কল্পনাবিলাসই 'ইউটোপিয়া' বা 'কল্পস্বর্গ' (দ্র) নামে অভিহিত।

আ. হু.

ইউনানি চিকিৎসাপদ্ধতি

ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত প্রাচ্যদেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতিগুলোর মধ্যে ইউনানি অন্যতম। একে হাকিমি চিকিৎসাও বলা হয়। প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতির জনক হিপোক্রেটিস (দ্র) গ্রিস দেশে জন্মেছিলেন বলে প্রাচীন গ্রিসের আরবি নাম 'ইউনান'-এর নামানুসারে ইউনানি চিকিৎসার নামকরণ।

ইউনানিশাস্ত্রে হিপোক্রেটিস ও রোমদেশীয় চিকিৎসক গালেন্ (দ্র)-এর চিকিৎসাতত্ত্বের প্রভাব রয়েছে। তবে এ চিকিৎসায় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতি ও চীনদেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতির মূলনীতিও বহুলাংশে অনুসৃত।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতির মতো ইউনানি পদ্ধতিও বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনটি উপাদানের অস্বাভাবিকতার ফলে শরীরে রোগসৃষ্টি হওয়ার তত্ত্বে বিশ্বাসী। ইউনানি চিকিৎসাশাস্ত্রের দু'টি প্রধান অংশ রয়েছে : প্রথম অংশে আলোচিত হয়েছে চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব; দ্বিতীয় অংশে রয়েছে রোগ (দ্র), রোগের কারণ, রোগের লক্ষণগুলোর চিকিৎসা, ঔষধ (দ্র) প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী, স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি এবং চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন নির্দেশাবলি। ইউনানি চিকিৎসায় শরীরে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পথে ঔষধ প্রয়োগের বিধান রয়েছে।

ইউনানি চিকিৎসাপদ্ধতির সূচনালগ্নে এ পদ্ধতি শুধু শহর এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরাই এ চিকিৎসার সুবিধা ভোগ করত। কিন্তু সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ চিকিৎসাপদ্ধতি সর্বত্র এবং সব শ্রেণীর মানুষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে (দ্র) ১৯৮২ সালের ঔষধনীতির মাধ্যমে ইউনানি, আয়ুর্বেদী চিকিৎসাব্যবস্থাকে আধুনিক করে তোলার চেষ্টা চলছে।

সি. না. হ.

ইউনিসেফ

জাতিসংঘের (দ্র) একটি বিশেষ সংস্থার সংক্ষিপ্ত নাম। ইংরেজিতে এর পুরো নাম ছিল United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF); এখন 'ইন্টারন্যাশনাল' ও 'ইমার্জেন্সি' শব্দ দুটো বাদ পড়েছে, তবু UNICEF-ই বলা হয়। বাংলায় 'জাতিসংঘ শিশু তহবিল'। সারা বিশ্বের শিশুদের সার্বিক

উন্নতি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড এর আওতাধীন।

১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশনে এই তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথম দিকে এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (দ্র) বিধ্বস্ত দেশগুলোর শিশুদের সাহায্যার্থে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। ১৯৫০ সালের পর এর কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারিত হয়। এখন জাতিসংঘের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদের অধীনে এই সংস্থা সারা বিশ্বের শিশুদের খাদ্য, চিকিৎসা ও শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিবিধানসহ যে কোনো জরুরি অবস্থায় শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ৩০টি সদস্য দেশের ৩০ জন প্রতিনিধি এই সংস্থা পরিচালনা করেন। অবশ্য এর প্রশাসনিক দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকে একজন নির্বাহী পরিচালকের ওপর। সদর দপ্তর নিউইয়র্কে হলেও লণ্ডনে (দ্র) এর কার্যালয় আছে।

১৯৬৫ সালে কল্যাণমুখী ভূমিকার জন্য ইউনিসেফকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

সুজ. ব.

অলিম্পিক টর্চ। আধুনিক অলিম্পিকের একটি প্রধান আনুষ্ঠানিকতা—যা শুরু হয় ১৯২৮ সালে একাদশ অলিম্পিকে আমেস্টার্ডামে। টর্চ-রিলে শুরু হয় বার্লিন অলিম্পিকে ১৯৩৬ সালে।

অশ্বত্থ গাছের পাতা ও ফল

ডানে : আদিবাসী—গারো তরুণী

আদিবাসী—সাঁওতাল নৃত্য

নিচে : মণিপুরী শিশুদের নৃত্য

আদিবাসী চাকমা মেয়েদের বোতল নৃত্য

আলতামিরা গুহার গায়ে আদিম মানুষের আঁকা বাইসনের ছবি

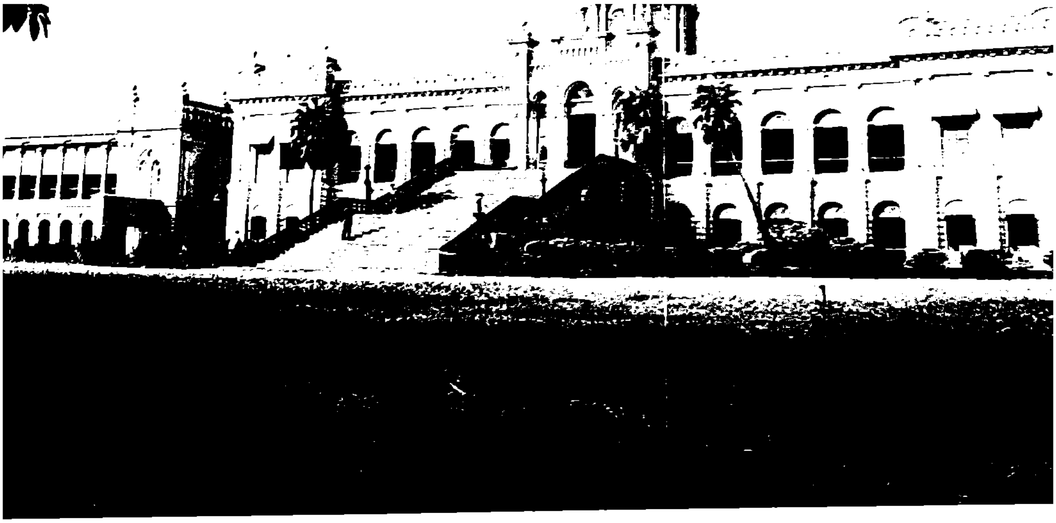

আহসান মঞ্জিল

ইতালীয় চিত্রকলা
মাদোনা
শিল্পী : রাফায়েল

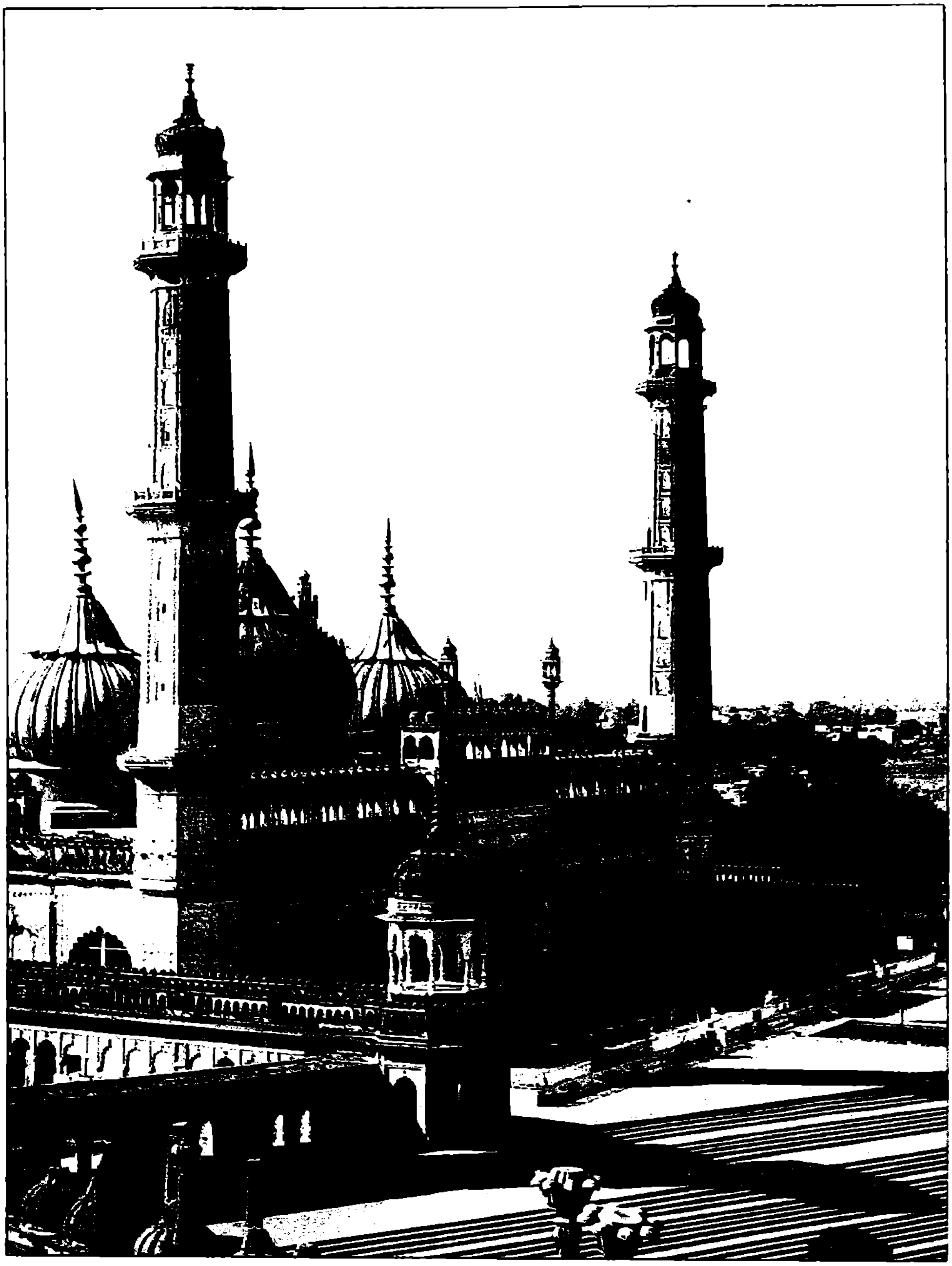
ইমামবারা মসজিদ

ইম্প্রেশনিস্ট চিত্র—কাফে কনসার্ট
শিল্পী : দেগা

হলুদ যিশু : শিল্পী—গোগ্যাঁ

মুল্যাঁ রুজ্
শিল্পী : তুলুজ্-লোত্রেক

ফল : শিল্পী—পল সেজান

বাফিন দ্বীপ
বেফিন উপসাগর
ফোর্ট ম্যাকফারসন
ফোর্ট নরম্যান
পোর্ট রেডিয়ম
হাডসন
উপসাগর
চার্চিল
পোর্ট নেলসন
সিটকা
ভিক্টোরিয়া
ভ্যাঙ্কুভার
এডমন্টন
সাস্কাটুন
রেজিনা
উইনিপেগ
কুইবেক
অটোয়া
টরন্টো
স্যাক্রামেন্টো
সান ফ্রান্সিসকো
লস এঞ্জেলস
সান ডিয়েগো
বাল্টিমোর
নরফোক
হাটেরাস অঃ
টাম্পা
বাহামা
চিহুয়াহুয়া
মন্টেরি
মে ক্সি কো
উ প সা গ
হাভানা
টাম্পিকো
ক্যাম্পেচি
উপসাগর
মাজাটলান
গুয়াডালাজারা
মেক্সিকো
ভেরাক্রুজ
আকাপুল্কো
বেলিজ
জামাইকা
ক্যা রি বি য়া
গুয়াটেমালা
সান সালভাডর
মধ্য আমেরিকা

উদ্ভিদ : কয়েকটি পতঙ্গভুক গাছ। বাংলাদেশের বনবাদাড়ে এদের দেখা যায়

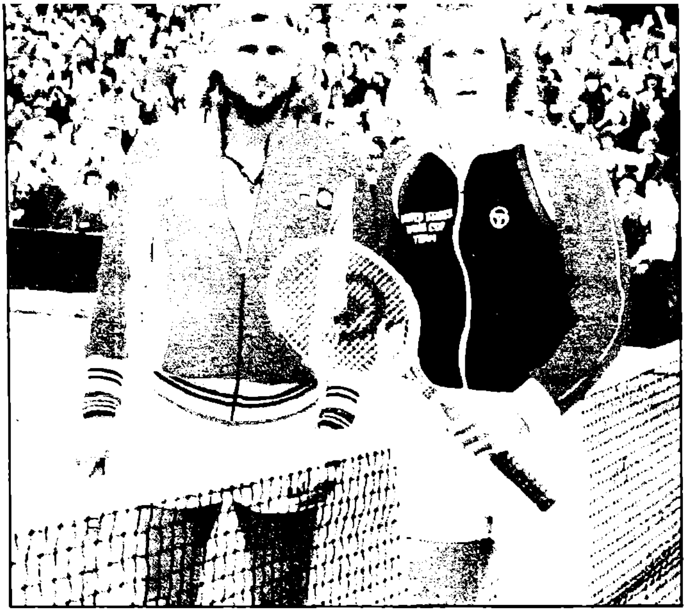

উইম্ব্‌ল্‌ডন্ :
বিশ্বের খ্যাতিমান দুই টেনিস তারকা—বিয়র্ন বোর্গ্, যিনি ৫ বার উইম্ব্‌ল্‌ডন্ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন; তাঁর বাম পাশে জন ম্যাকেনরো, ৩ বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন

এল গ্রেকোর আঁকা একটি ছবি

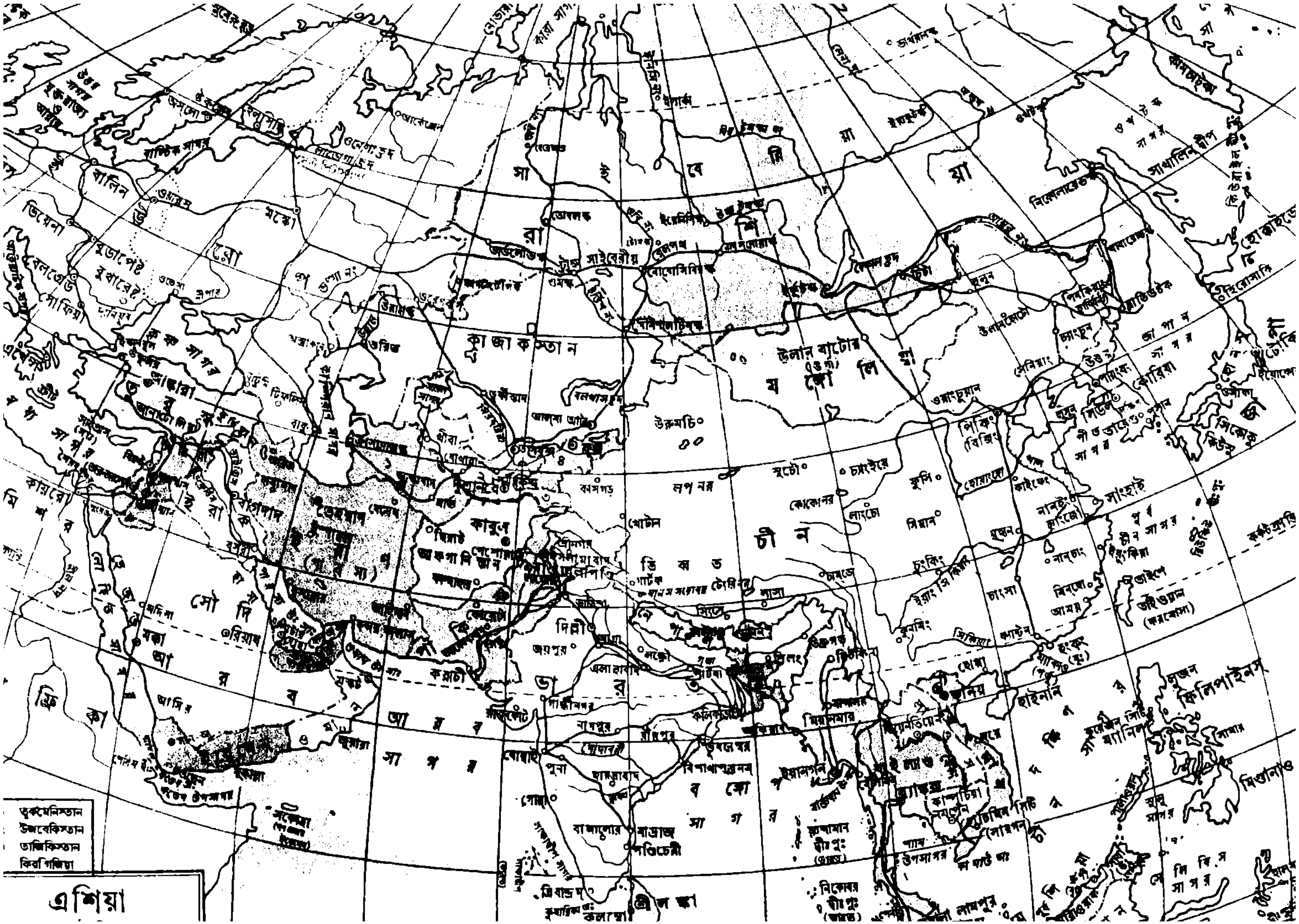
এশিয়া
তুর্কমেনিস্তান
উজবেকিস্তান
তাজিকিস্তান
কির্গিজিয়া
কাজাকস্তান
মঙ্গোলিয়া
চীন
ভারত
তিব্বত
সাইবেরিয়া
জাপান
কোরিয়া
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
জাপান সাগর
ওখটস্ক সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
পূর্ব চীন সাগর
দক্ষিণ চীন সাগর
সৌদি আরব
ইরান
ফিলিপাইনস
শ্রীলঙ্কা
মস্কো
বার্লিন
ভিয়েনা
বুডাপেস্ট
বুখারেস্ট
কায়রো
বাগদাদ
কাবুল
দিল্লী
কলকাতা
বোম্বাই
মাদ্রাজ
জয়পুর
নাগপুর
বাঙ্গালোর
পণ্ডিচেরী
কলম্বো
কলম্বো
করাচী
লাসা
সাংহাই
হংকং
উলান বাটোর
নিকোলায়েভস্ক
ভ্লাদিভস্টক
সাখালিন দ্বীপ
হাইনান
মিন্দানাও
রিয়াধ
মক্কা
এডেন
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

শিল্পী এস. এম. সুলতানের
একটি শিল্পকর্ম

ওমর খৈয়াম সিরিজ থেকে,
শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের
একটি শিল্পকর্ম

ওলন্দাজ শিল্পকলা : ভিনসেন্ট ভান গখের একটি বিখ্যাত ছবি–'আইরিসেস'

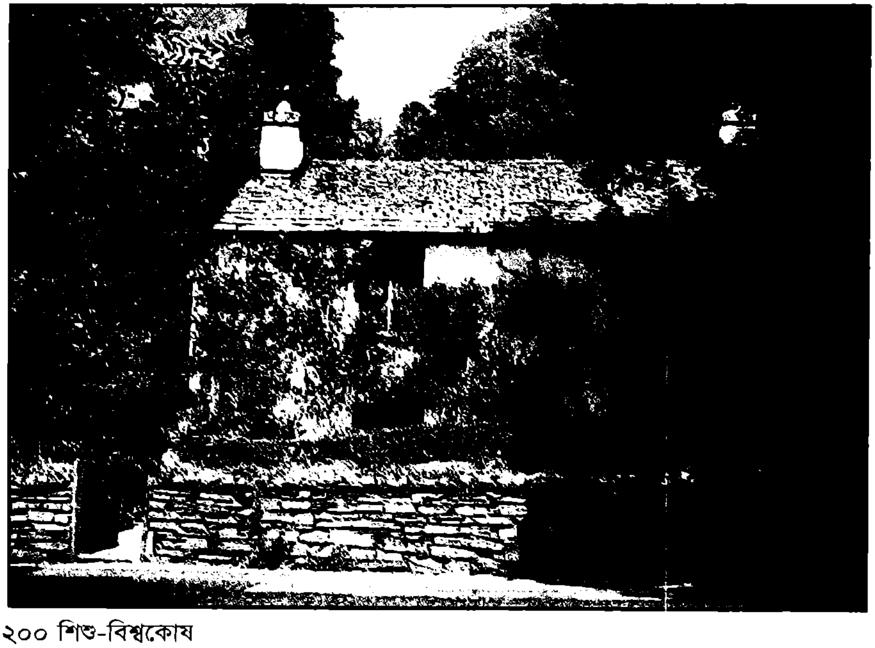

ওয়ার্ডসওয়ার্থের বাড়ি 'ডাভ কটেজ', ইংল্যাণ্ডের গ্রাসমেয়ারে অবস্থিত। কবি অনেক কবিতা এ বাড়িতে বসেই লিখেছেন

ইউনুস (আ.), হযরত

বিশিষ্ট পয়গম্বর বা নবী। পবিত্র কুরআনে (দ্র) তাঁর নামে একটি সূরা (দ্র) আছে। এই সূরা থেকে জানা যায়, ইউনুস (আ.) পথভ্রষ্ট মানুষদের সৎপথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু এসব মানুষ এতই পাপাসক্ত ছিল যে তারা ইউনুস (আ.)-এর কথায় কর্ণপাত করে নি। ইউনুস (আ.) তাদের অন্যায় ও উদ্ধত আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যান।

হযরত ইউনুসকে (আ.) নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, যা থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করলে তিনি মানুষকে শাস্তি দিয়ে থাকেন।

মো. ই.

ইউনেস্কো

মানুষকে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতি উৎসাহী করে তোলার জন্য গঠিত জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থার সংক্ষিপ্ত নাম। ইংরেজিতে এর পুরো নাম United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), বাংলায় 'জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা'।

ইউনেস্কোর মূল কার্যক্রম হল বিশ্বে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রসার ও উন্নয়নের মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা-বিধান করা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও মৌলিক শিক্ষার প্রতি উৎসাহদান এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বহুমুখী শিক্ষা গ্রহণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করা।

১৯৪৫ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত লণ্ডন সম্মেলনে ইউনেস্কো প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৬ সালে এটি জাতিসংঘের বিশেষ এজেন্সির মর্যাদা পায়। বর্তমানে এর সদস্যসংখ্যা ১০৫। ফ্রান্সের প্যারিসে এর সদর দপ্তর অবস্থিত।

প্রতি ছয় বছর অন্তর ইউনেস্কোর নতুন অধিকর্তা নিযুক্ত হন। তবে একই অধিকর্তা পুনরায় নিযুক্ত হতে পারেন। এর প্রথম অধিকর্তা ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলি (Julian Huxley)।

সুজ. ব.

ইউরিপিডিস্ এউরিপিদেস্ দ্র

ইউরিয়া (urea)

কার্বনিক অ্যাসিডের ডাই অ্যামাইড। এটা সাদা, স্ফটিকাকার, পানিতে দ্রবণীয় যৌগ। গলনাঙ্ক ১৩২·৭° সে.; ফর্মুলা $H_2N\text{-}CO\text{-}NH_2$। প্রাণী এবং মানবদেহে প্রোটিন বিপাকের ফলে ইউরিয়া উৎপন্ন হয়। সাধারণত দুই অণু (দ্র) অ্যামোনিয়া (দ্র) এবং এক অণু কার্বন ডাই-অক্সাইডের (দ্র) বিক্রিয়ার ফলে এক অণু ইউরিয়া তৈরি হয়। এই জটিল বিক্রিয়াটি ঘটাতে কমপক্ষে সাতটি এনজাইম (দ্র) দরকার হয়।

প্লাস্টিক (দ্র) তৈরি করতে এবং অনেক বিস্ফোরক দ্রব্যের স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য ইউরিয়া ব্যবহার করা হয়। আগে রেচকরূপেও ইউরিয়া ব্যবহার করা হত। এতে প্রচুর নাইট্রোজেন (দ্র) থাকায় সার হিসাবে এর ব্যবহার রয়েছে। বাংলাদেশে ঢাকার অদূরে আশুগঞ্জ জিয়া সার কারখানায় এবং সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানায় প্রাকৃতিক গ্যাস (দ্র) দিয়ে ইউরিয়া সার তৈরি করা হয়।

কিডনির (দ্র) অনেক রোগে (দ্র) রক্তে (দ্র) ইউরিয়ার মাত্রা বেড়ে যায়। সাধারণত স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি ১০০ মিলি রক্তে ১৫-৪০ মিলিগ্রাম ইউরিয়া থাকে।

সা. এ.

ইউরেনাস (Uranus)

সূর্যের (দ্র) একটি গ্রহ। গ্রিক পুরাণে বর্ণিত আকাশের দেবতা 'ইউরেনাস'-এর নামানুসারে জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ এর নাম দেন ইউরেনাস। জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম হার্শেল (Sir William Herschel : ১৭৩৮—১৮২২) ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ইউরেনাস গ্রহটি আবিষ্কার করেন।

সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে গ্রহদের মধ্যে ইউরেনাসের স্থান সপ্তম। সূর্য থেকে ইউরেনাসের গড় দূরত্ব প্রায় ২৮৫

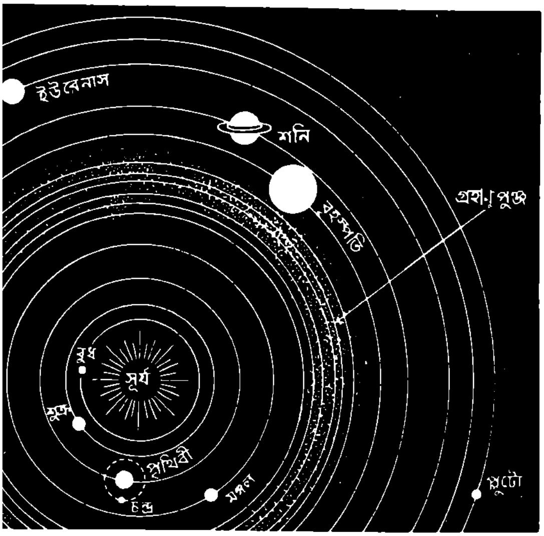

সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে ইউরেনাস

কোটি কিমি (১৭৮ কোটি মাইল)। এই দূরত্ব সূর্য থেকে পৃথিবীর (দ্র) গড় দূরত্বের প্রায় ১৯ গুণ বেশি। ইউরেনাসের ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের এক চতুর্থাংশ এবং এর ভর (দ্র) পৃথিবীর ভরের ১৪.৭ গুণ বেশি।

ইউরেনাসের আকৃতি অন্য গ্রহগুলোর মতোই গোল। এর ব্যাস ৪৮ হাজার কিমি বা ৩০ হাজার মাইলের কিছু কম। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে এর ৮৪ বছরের কিছু বেশি সময় লাগে। ইউরেনাস নিজের অক্ষরেখার চারপাশ ১০ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট সময়ে এক বার আবর্তন করে।

বৃহস্পতি (দ্র) ও শনিগ্রহের (দ্র) মতোই ইউরেনাসের ভিতরের প্রধান অংশ পাথরে এবং বাইরের অংশ বা পৃষ্ঠদেশ পুরু বরফে রচিত। ইউরেনাসে বায়ুমণ্ডল আছে, আর সে বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন (দ্র) ও মিথেন (দ্র) গ্যাস বিদ্যমান।

ইউরেনাসের উপগ্রহ ১৫টি। এগুলোর মধ্যে ২টি উপগ্রহ উইলিয়াম হার্শেল নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯৭৭ সালে আমেরিকার (দ্র) কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক জন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর গবেষণায় ইউরেনাস সম্পর্কে এক চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশ পায়। তা হল শনির মতো ইউরেনাসের চারপাশেও একাধিক 'বলয়' (ring) আছে।

সুজ. ব.

ইউরোপ (Europe)

আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর (দ্র) সাতটি মহাদেশের (দ্র) মধ্যে ষষ্ঠ মহাদেশ, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে শ্রেষ্ঠ। এর আয়তন ১,০৬,১৯,০০০ বর্গ কিমি (৪১,০০,০০০ বর্গ মাইল)। এর পূর্ব দিকে এশিয়া (দ্র), উত্তরে উত্তর মহাসাগর, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর (দ্র) ও কৃষ্ণসাগর। উরাল পর্বতমালা, উরাল নদী, কাস্পিয়ান সাগর, ককেশাস পর্বতমালা, কৃষ্ণসাগর, বস্‌পরাস ও দার্দানালেস প্রণালী ইউরোপকে এশিয়া থেকে এবং ভূমধ্যসাগর ও জিব্রাল্টার প্রণালী এই মহাদেশকে আফ্রিকা থেকে আলাদা করেছে।

ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত দেশগুলো হল : রাশিয়া, (দ্র) লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রিস, তুরস্ক, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, স্লোভাক প্রজাতন্ত্র, জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড, লিখ্‌টেন্‌শ্‌টাইন, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড বা নেদারল্যাণ্ডস্‌, লুক্সেমবুর্গ, ফ্রান্স, মোনাকো, ইতালি, সান মারিনো, ভ্যাটিক্যান সিটি, স্পেন, পর্তুগাল, অ্যান্‌ডোরা, গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যাণ্ড প্রজাতন্ত্র ও আইসল্যাণ্ড। ইউরোপের অন্তর্গত যুগোস্লাভিয়া এত দিন পর্যন্ত একটি দেশ ছিল, কিন্তু বর্তমানে স্লোভেনিয়া ও ক্রোয়েশিয়া প্রদেশ বেরিয়ে এসে স্বাধীন দেশ হয়ে গেছে; বাকি অংশগুলোর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছে—শেষ অবধি সেখানেও একাধিক স্বাধীন দেশ হবে। তুরস্ক (দ্র) ও রাশিয়ার কিছু অংশ এশিয়া মহাদেশভুক্ত হয়েছে।

ইউরোপের ভূখণ্ডের অধিকাংশ সমভূমি এবং কিছু অংশ পর্বত ও মালভূমি। পিরেনীয়, আল্‌প্‌স, কারপেথিয়ান, বলকান ও ককেশাস পর্বতমালা এই মহাদেশের পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বিস্তৃত রয়েছে। ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম অংশের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া উপদ্বীপ, ফিনল্যাণ্ডের উত্তর অংশ, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও আইসল্যাণ্ড দ্বীপের অনেকাংশ প্রাচীন কঠিন শিলায় গঠিত ক্ষয়প্রাপ্ত পর্বত আর মালভূমি। পূর্ব অংশ অর্থাৎ এশিয়ার দিক থেকে এর প্রধান প্রধান নদী যেগুলো বেরিয়েছে তারা হল—ভোল্‌গা, ডন, নিপার, দানিউব, ওডার, এল্‌বে, রাইন, লোয়ার টেম্‌স্‌ ও টেগাস।

নদীগুলো বছরের অধিকাংশ সময়েই নাব্য। লবণাক্ত কাস্পিয়ান সাগর ইউরোপ ও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হ্রদ। সুপেয় জলের বৃহত্তম হ্রদ লাদোগা এবং ওলেগা। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া অঞ্চলের সবচেয়ে বড় হ্রদ সাইমা, ভাটেরা ও ভানের।

ইউরোপের পশ্চিম উপকূলে উষ্ণ আটলান্টিক স্রোত প্রবাহিত হয় বলে অধিকাংশ জায়গায় সব ঋতুতে পশ্চিমা বায়ু পরিলক্ষিত হয়। শীতকালে পশ্চিম অংশে সমুদ্রের প্রভাব খুব বেশি। পশ্চিম থেকে পূর্ব অংশে এই প্রভাব কম হওয়ায় মধ্য ভাগে ও পূর্ব ভাগে উষ্ণতা ক্রমশ হ্রাস পায়। উত্তর-পূর্ব দিকে শীত সবচেয়ে বেশি। পশ্চিমা বায়ুর জন্য শীতকালে গ্রীষ্মকালের তুলনায় বৃষ্টিপাত বেশি হয়। দক্ষিণ-পূর্ব অংশের কয়েক জায়গায় গ্রীষ্মকালে কিছুদিন উষ্ণতা বেশি থাকে।

ইউরোপে তিনটি প্রধান ভাষা-গোষ্ঠী আছে—জার্মানিক (দ্র), রোমান্স (দ্র) এবং স্লাভনিক ভাষা (দ্র)। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ডের কিছু অংশ, বেলজিয়াম, আইসল্যাণ্ড এবং ব্রিটিশ দ্বীপগুলোতে জার্মানিক ভাষা ব্যবহৃত হয়। রোমান্স ভাষার মধ্যে আছে লাতিন, ইতালীয়, স্প্যানিশ, ফরাসি, পর্তুগিজ, রোমান এবং রুমানীয় ভাষা। মধ্য- ও পূর্ব- ইউরোপে বিভিন্ন স্লাভনিক ভাষার ব্যবহার আছে।

বর্তমানে শিক্ষা, শিল্প ও বিজ্ঞানে ইউরোপ মহাদেশ খুব উন্নত। রাশিয়া থেকে শুরু করে উত্তর পশ্চিম ইউরোপে প্রায় সব লোকই শিক্ষিত। স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশগুলোতে শতকরা ৯৯ ভাগ লোক শিক্ষিত। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা আনুপাতিকভাবে বেশি।

ইউরোপের বড় শহরগুলোর মধ্যে মস্কো (দ্র) ও লণ্ডন (দ্র) উল্লেখযোগ্য। বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর হল রোটার্ডাম। নেদারল্যাণ্ডস্, ফ্রান্স এবং জার্মানি প্রধান বন্দর হিসাবে রোটার্ডামকে ব্যবহার করে। বর্তমানে ইউরোপের লোকসংখ্যা ৭৫ কোটির বেশি। প্রচলিত ধর্মমতগুলোর মধ্যে খ্রিস্টধর্ম (দ্র) প্রধান।

সুজ. ব.

ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায়

European Economic Community, সংক্ষেপে EEC -কে বাংলায় বলা হয় 'ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায়'। সাধারণভাবে এটি ইউরোপীয় অভিন্ন বাজার (Common Market) নামে অধিক পরিচিত। ১৯৫৭ সালের ২৫শে মার্চ সম্পাদিত রোম চুক্তির ভিত্তিতে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ১৯৫৮ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদেশগুলো হল—বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইতালি, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যাণ্ডস্ এবং পশ্চিম জার্মানি। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেল্স্-এ এর সদর দপ্তর।

ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায় গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সদস্য-দেশসমূহের পারস্পরিক স্বার্থে উল্লেখযোগ্য হারে শুল্ক হ্রাস করে নিজেদের পণ্যের জন্য সুলভ ও সাধারণ বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে বাণিজ্যিক উন্নতি সাধন করা। প্রথম দশকেই সদস্য-দেশসমূহ নিজেদের মধ্যে যাবতীয় আমদানি-রপ্তানি শুল্ক এবং উৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে নেয়। এর পাশাপাশি তারা বিশ্ববাজারের বিপরীতে নিজেদের মধ্যে একটি অভিন্ন সাধারণ শুল্কহার আরোপ করে। এসব ব্যবস্থার অধীনে ১৯৬০ সালের দিকে সদস্য-দেশগুলোর অর্থনীতিতে অনুকূল অবস্থার সূচনা হয়।

এর পর সদস্যরা নিজেদের মধ্যে জনশক্তিবিনিময় ও পুঁজিবিনিয়োগসহ সম্পদ ব্যবহারে আরো গতিশীলতা আনয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এভাবে ক্রমে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের সহযোগিতা প্রসারিত হয়। ১৯৬৭ সালে এই সংস্থা ইউরোপীয় আণবিক শক্তি সম্প্রদায় (European Atomic Energy Community) এবং ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত সম্প্রদায় (European Coal and Steel Community) নামক সংস্থা দু'টিকে আনুষ্ঠানিকভাবে একীভূত করে নেয়।

১৯৭৩ সালে এই সংস্থার ছয়টি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য-দেশের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও আয়ারল্যাণ্ড পূর্ণ সদস্য হিসাবে যোগ দেয়। গ্রিস, তুরস্ক (দ্র), সাইপ্রাস, মাল্টা এবং আফ্রিকার (দ্র) আরো ৪৬টি রাষ্ট্রকে এর সহযোগী সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এশিয়ার (দ্র) অনেক দেশও এখন এর সঙ্গে নিয়মিত ব্যবসায়িক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

একটি মন্ত্রীপরিষদ, একটি বিশেষজ্ঞপরিষদ, একটি ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এবং একটি বিচার বিভাগ নিয়ে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায়ের স্থায়ী সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত।

সুজ. ব.

ইউসুফ (আ.), হযরত

এক জন প্রসিদ্ধ নবী। বাইবেল (দ্র) এবং কুরআনে (দ্র) তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ইংরেজি বাইবেলে তিনি জোসেফ নামে অভিহিত।

পবিত্র কুরআনে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রসঙ্গ বর্ণনার জন্য একটি স্বতন্ত্র সূরা (দ্র) বা অধ্যায়ের অবতারণা করা হয়েছে (সূরা ইউসুফ, ১২নং সূরা)। এই বিবরণ থেকে ইয়াকুব নবীর পুত্র ইউসুফ (আ.)-এর জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতময় ঘটনাবলি সম্পর্কে জানা যায়। এক পর্যায়ে তিনি মিশরের শাসনকর্তার ক্রীতদাস হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু পরে তিনি মিশরের শাসনকর্তার পদ লাভ করেন এবং অশেষ মর্যাদার অধিকারী হন।

মু. মা.

ইউসুফ-জোলেখা

মধ্যযুগের বাংলা প্রণয়োপাখ্যানগুলোর অন্যতম ইউসুফ-জোলেখা'র কাহিনী। ইউসুফ-জোলেখার যেসব পুঁথি পাওয়া গেছে তার মধ্যে কবি শাহ মোহাম্মদ সগীর (দ্র) প্রণীত 'ইছুফ-জলিখা' এবং কবি আবদুল হাকিম (আনু ১৬২০-১৬৯০)-এর 'ইউসুফ জলিখা' পুঁথিটিই উল্লেখযোগ্য। ইউসুফ-জোলেখার কাহিনী অত্যন্ত প্রাচীন। বাইবেল (দ্র) ও কুরআন শরীফে (দ্র) এই কাহিনীর কিছু কিছু উল্লেখ আছে। ইউসুফ নবীর প্রতি মিশরের রানী জোলেখা বা জুলেখার ভালবাসার কাহিনী অত্যন্ত পরিচিত। ফার্সি কবি ফেরদৌসী (দ্র) ও জামী কাহিনীটিকে কাব্যে রূপ দেন। কবি আবদুল হাকিমের কাব্যে নায়ক–নায়িকার যে চমৎকার চিত্র রয়েছে তা জামীর কাব্যের অনুসরণ বলে মনে হয়।

মে. খা.

ইংরেজি ভাষা

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষাসমূহের মধ্যে বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত। গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (দ্র), অস্ট্রেলিয়া (দ্র), নিউজিল্যাণ্ড, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকার বহু অঞ্চল, এককালীন ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের অনেক দেশে ইংরেজি ভাষা চালু আছে। ভারতে (দ্র) ইংরেজি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাষার স্থান অধিকার করে আছে; সেখানে এ ভাষা 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' (দ্র.) তো বটেই, এমনকি ইংরেজিতে রচিত ভারতীয় সাহিত্য আজ বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

ইংরেজি ভাষার উদ্ভব পঞ্চম শতাব্দীতে; তখন তাকে বলা হত অ্যাংলো–স্যাক্সন। সব পুরানো ভাষার মতোই ইংরেজি ভাষাও বিভিন্ন পর্যায় (অর্থাৎ প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ইত্যাদি) অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। ইংরেজি ভাষার প্রাচীন যুগ ধরা হয় মোটামুটি ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, মধ্যযুগের সীমারেখা প্রায় ১৪৫০ অবধি এবং তার পর থেকে আধুনিক কালপর্ব শুরু।

ইংরেজি ভাষায় গ্রিক, লাতিন, জার্মান, ফরাসি, এমনকি ভারতীয় শব্দও প্রচুর আছে। বিদেশী শব্দ পরিগ্রহণে ইংরেজি তুলনামূলকভাবে উদার।

হা. মা.

ইংরেজি মাস মাস দ্র

ইংরেজি সাহিত্য

প্রাচীনতম ইংরেজি সাহিত্যের নাম অ্যাংলো-স্যাক্সন সাহিত্য, রচনাকাল আনুমানিক ৬০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ (দ্র)। অ্যাংলো-স্যাক্সন সাহিত্যের কালজয়ী সৃষ্টি 'বেউল্‌ফ' মহাকাব্যের গুণে গুণান্বিত।

একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিবেশী নর্মানেরা ইংরেজদের পরাজিত করে তাদের রাজ্য দখল করে নেয়। নর্মানদের মাতৃভাষা ফরাসির সংস্পর্শে এসে নতুন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মধ্য-ইংরেজি ভাষার সৃষ্টি হল। মধ্য–ইংরেজি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক চসার-এর 'ক্যান্টারবেরি টেইল্‌স্' (The Canterbury Tales) (দ্র)-এ উন্নত সাহিত্যগুণের পাশাপাশি সে যুগের সমাজজীবনের বিশ্বস্ত চিত্র পাওয়া যায়। চসারের পর প্রায় দু শ' বছর ইংরেজি সাহিত্য মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের (দ্র) ছোঁয়া পেয়ে ইংরেজি সাহিত্য ব্যাপকতা ও প্রাণশক্তিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এ সময়ে আমরা পাই কবিতায় (দ্র) স্পেন্সার, নাটকে (দ্র) মার্লো, শেক্সপীয়র (দ্র), বেন্ জন্‌সন্ এবং গদ্যে ফ্রান্সিস বেকনের (দ্র) মতো শ্রেষ্ঠ লেখকদের। শেক্সপীয়রের ট্র্যাজিক নাটক 'হ্যামলেট' (দ্র), 'ম্যাকবেথ',

'ওথেলো' এবং 'কিং লীয়ার' শুধু ইংরেজি সাহিত্যেরই নয়, বিশ্বসাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদরূপে সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর 'রোমিও-জুলিয়েট' (দ্র) ও 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' প্রভৃতি নাটকও সর্বজন-পরিচিত।

সপ্তদশ শতাব্দীতেও আমরা কতিপয় অসামান্য সাহিত্যিককে পাই। 'প্যারাডাইস লস্ট' (দ্র)-এর রচয়িতা জন মিল্টন (দ্র) ও কবি জন ডান (Donne)এবং নাট্যকার ও ব্যঙ্গরসাত্মক কবি ড্রাইডেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ যুগের আরেক জন শ্রেষ্ঠ লেখক হলেন জন বানিয়ান। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য পিলগ্রিম্স্ প্রোগ্রেস' স্বীয় প্রেরণা থেকে রচিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে প্রাধান্য পেল রচনার শৃঙ্খলা ও সংযম এবং নাগরিক জীবন। আলেকজাণ্ডার পোপ এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। গদ্যে জোসেফ এডিসন, 'গালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত' (দ্র)-র লেখক জোনাথন সুইফ্‌ট্ (দ্র) ও 'রবিনসন ক্রুসো' (দ্র)-র লেখক ড্যানিয়েল ডিফো এ যুগের সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখেন। এ শতাব্দীতেই রিচার্ডসন ও ফিল্ডিং–এর মাধ্যমে উপন্যাসের (দ্র) যাত্রা শুরু হয়। এ কালের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য লেখকের মধ্যে আছেন কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার অলিভার গোল্ডস্মিথ; প্রাবন্ধিক, সাহিত্য–সমালোচক ও অভিধান-প্রণেতা স্যামুয়েল জনসন; কবি উইলিয়াম ব্লেক্ ও নাট্যকার শেরিডান।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজি সাহিত্যে একটা বড় পরিবর্তনের আভাস লক্ষিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তা উজ্জ্বলভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ (দ্র), কোলরিজ (দ্র), বায়রন (দ্র), শেলি (দ্র) ও কীটসের (দ্র) কবিতায় প্রকৃতি, কল্পনার মায়াবী জগৎ, মানুষের মুক্তি প্রভৃতি বিষয় গভীর হৃদয়াবেগ ও উন্নত কাব্যময়তা নিয়ে ফুটে ওঠে। এ যুগকে বলা হয় রোম্যান্টিক যুগ। এ যুগের উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক হলেন ওয়াল্টার স্কট (দ্র) ও জেন অস্টিন।

এর পর আমরা পাই ভিক্টোরীয় যুগ। এ সময় কবিতায় আমরা এক দিকে দেখি আশাবাদ, বিজ্ঞানের (দ্র) সাফল্যের আনন্দানুভূতি, অন্য দিকে দ্বিধা, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের (দ্র) বিরোধের প্রশ্নে টানাপোড়েন এবং একটা হতাশার ভাব। এ সময়ের শ্রেষ্ঠ কবিরা হলেন টেনিসন (দ্র), ব্রাউনিং (দ্র) ও ম্যাথু আর্নল্ড। ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যে উপন্যাসেরও বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটে। 'ডেভিড কপারফিল্ড' (দ্র)-সহ বহু উপন্যাসের রচয়িতা চার্লস ডিকেন্স (দ্র) সারা বিশ্বে সুপরিচিত। স্বতন্ত্র ধারার ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডির নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যে নানা চিন্তাধারা ও প্রবণতা লক্ষিত হয়। নাটকে বার্নার্ড শ (দ্র), গল্‌স্‌ওয়ার্দি, সিঙ্গ, ওসবোর্ন, পিন্টার; উপন্যাসে গল্‌স্‌ওয়ার্দি, এইচ. জি. ওয়েলস (দ্র), অল্ডুস হাক্সলি, ই. এম. ফর্স্টার, জেম্‌স্ জয়েস, ডি. এইচ. লরেন্স, গ্র্যাহাম গ্রিন, উইলিয়াম গোল্ডিং, সমারসেট মম (দ্র); কবিতায় এজরা পাউণ্ড, টি.এস.এলিয়ট (দ্র), অডেন, ডিলান টমাস, রবার্ট গ্রেভস, ফিলিপ লার্কিন, টেড হিউজ প্রমুখ বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, রচনাশৈলীর নৈপুণ্য ও সাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

ইংরেজি সাহিত্যিকদের মধ্যে নোবেল পুরস্কারে (দ্র) ভূষিত হয়েছেন বার্নার্ড শ' ১৯২৫ সালে, গল্‌স্‌ওয়ার্দি ১৯৩২ সালে, টি. এস. এলিয়ট ১৯৪৮ সালে এবং উইলিয়াম গোল্ডিং ১৯৮৩ সালে।

ক. চৌ.

ইঁদুর

ইঁদুর অতি পরিচিত ক্ষুদ্রকায় স্তন্যপায়ী প্রাণী (দ্র)। এদের ছোটগুলোকে নেংটি ইঁদুর (mouse) ও বড়গুলোকে ধেড়ে ইঁদুর (rat) বলে। ঘরে-বাইরে, মাঠে-বাগানে, বনে-জঙ্গলে সবখানেই এদের দেখা মেলে। পৃথিবীতে প্রায় ১২০

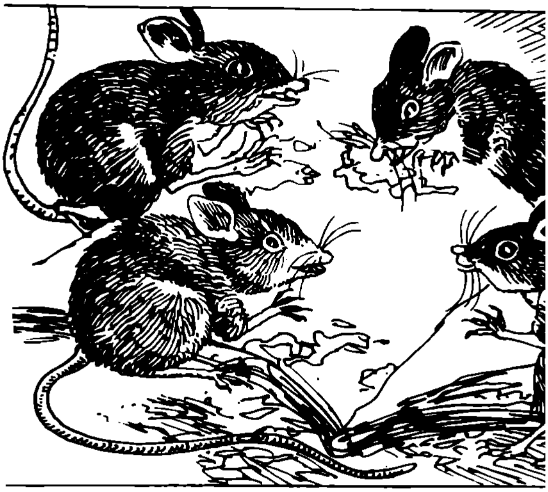

প্রজাতির ধেড়ে ও ১০০ প্রজাতির নেংটি ইঁদুর রয়েছে। বৃহত্তম প্রজাতির নেংটি ইঁদুর ক্ষুদ্রতম প্রজাতির ধেড়ের থেকেও ছোট।

ইঁদুরের নাক চোখা। চিকন লেজটি লম্বা। গায়ের লোম নরম। সামনের দাঁতগুলো অত্যন্ত ধারালো, সারা জীবন ধরে বাড়ে; ইঁদুর যদি সর্বক্ষণ দাঁত দিয়ে কেটেকুটে তছনছ না করত, তো তার দাঁত বেড়ে মাইলখানেক লম্বা হত। প্রজাতিভেদে ইঁদুরের আকার, আকৃতি ও বর্ণে পার্থক্য থাকে। কালো ধেড়েগুলো বৃহত্তম। ওজন প্রায় ২৪০ গ্রাম। শরীর ১৮-২০ সেন্টিমিটার। লেজ শরীর থেকেও লম্বা। ঘরের নেংটিগুলো মাত্র ১৪-১৮ গ্রাম। শরীর ৬·৫–৯ সেন্টিমিটার, লেজও প্রায় সমান লম্বা।

এরা যা পায় তা-ই খায়, এমনকি সাবান, টুথপেস্ট, আঠাও খেতে পারে। এরা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ও উষ্ণ জায়গায় বাসা বানায়। সারা বছরই এদের বাচ্চা হয়। ১৮-২১ দিন গর্ভধারণের পর স্ত্রী-ইঁদুর তিন থেকে সাতটি অন্ধ, লোমহীন গোলাপী বর্ণের বাচ্চার জন্ম দেয়। দশ দিনে এদের লোম গজায়, চৌদ্দ দিনে চোখ ফোটে। এটি দেড়-দুই মাসে প্রজননক্ষম হয়। এক থেকে তিন বছর বাঁচে।

ইঁদুর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রাণী। খাদ্যদ্রব্য, ফসল, জিনিসপত্র নষ্ট করা ছাড়াও এরা বিভিন্ন রোগের জীবাণু ছড়ায়।

আ. ন. ম. আ. র.

ইকবাল, মুহম্মদ (স্যার) [১৮৭৭—১৯৩৮]

বিখ্যাত সর্বভারতীয় উর্দু কবি ও দার্শনিক। তিনি ১৮৭৭ সালের ৯ই নভেম্বর অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাবের শিয়ালকোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

ইকবাল প্রথমে পাঞ্জাব, পরে কেম্ব্রিজ এবং পরিশেষে মিউনিখে আইন ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি ১৯০৮ সালে 'ডক্টরেট' ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণাপত্রের শিরোনাম ছিল 'ডেভেলপমেন্ট অব মেটাফিজিক্স ইন পারসিয়া' (অর্থাৎ 'পারস্যে অধিবিদ্যার বিকাশ')। শিক্ষাজীবনশেষে তিনি লাহোর সরকারি কলেজে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন এবং বেশ কিছু কাল অধ্যাপনা পেশায় নিয়োজিত থাকেন। ১৯২৭ সালে তিনি পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের (দ্র) বার্ষিক অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এ দু'টি ঘটনা থেকে ধারণা করা হয়, তিনি জ্ঞান আহরণ ও গবেষণাকর্মে ব্যাপৃত থাকার পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণেও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

১৯২২ সালে ব্রিটিশ সরকার মুহম্মদ ইকবালকে তাঁর সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ 'নাইট' খেতাবে ভূষিত করেন। এর পর থেকেই তিনি 'স্যার মুহম্মদ ইকবাল' নামে সমধিক পরিচিত হয়ে ওঠেন।

ইকবাল তাঁর মুখ্য সাহিত্যকর্ম (কবিতা) উর্দু (দ্র) ও ফার্সি ভাষায় রচনা করেন। তাঁর কাব্যভাবনা প্রথম পর্বে সর্বভারতীয় বৈচিত্র্যের অনুসন্ধানী, বিশ্বসংস্কৃতিকে ধারণ করতেও উন্মুখ ছিল। ধর্মান্ধতার সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে ছিল তাঁর ভাবনালোক। 'বাং-ই-দারা' (কারাভানের ডাক) কবিতায় তিনি বলেন, 'ধর্ম (দ্র) আমাদের শেখায় নি কলহ, ভারতীয় আমরা—মাতৃভূমি আমাদের এই ভারতবর্ষ।' এই সময়কালে তাঁর রচিত একটি কবিতা ভারতের প্রায় জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে সুর সহযোগে গীত হত, যার প্রথম চরণ ছিল 'হিন্দুস্তান হামারা'। ব্রিটিশ ভারতে গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

ধনতন্ত্রবাদ (দ্র) ও সাম্রাজ্যবাদের (দ্র) বিরোধিতাতেও ইকবাল সমান মুখর ছিলেন। 'পুড়িয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও সেই শস্যক্ষেত্রকে/চাষীকে যা দেয় না অন্ন' এবং 'ইম্পেরিয়ালিজমের দেহটা প্রকাণ্ড/হৃদয়টা অন্ধকার' জাতীয় কবিতার পঙ্‌ক্তির ভেতর দিয়ে তাঁর এই ভাবাদর্শগত চেতনার ছাপ সুপরিস্ফুট। শুধু তাই নয়, ইকবাল তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ 'দ্য রিকন্‌স্ট্রাক্‌শন্ অব রিলিজিয়াস থট্ ইন্ ইসলাম'-এ বলেন : 'সামাজিক ক্ষেত্রে মুক্তি এবং অগ্রগতির জন্য অবশ্যই ইসলামের গোঁড়ামি ও অতীতের অবাস্তব শিকল থেকে নিজেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। এক

কালের বিধান অপর কালের মানুষের বিচারের উর্ধ্বে হতে পারে না।'

ইকবাল তাঁর উদার ও সুফিবাদী (দ্র) চিন্তাধারার জন্য গোঁড়া ধর্মাবলম্বীদের আক্রমণের শিকার পর্যন্ত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, তিনি তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থে যে ভূমিকা লেখেন, তাতে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র 'ভগবদ্গীতা' (দ্র) র প্রশস্তি ছিল। কিন্তু উল্লিখিত ধর্মীয় গোঁড়াপন্থীদের বিরোধিতার কারণে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে সেটি আর রাখতে পারেন নি। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়েছিল ওই ভূমিকা বাদ দিয়েই।

ইকবালের দ্বিতীয় পর্বের জীবন পাকিস্তান আন্দোলনের (দ্র) সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে। এই সময় তিনি মুসলমানদের হারানো অতীত, ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার ভাবনা দ্বারা আলোড়িত হন। ইকবালকে তাই 'মুসলিম জাগরণের কবি' বলেও আখ্যায়িত করা হয়। মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য, শক্তি ও স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাঁর নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের 'স্বপ্নদ্রষ্টা' বলেও অভিহিত করা হতে থাকে। কিন্তু ইকবাল তাঁর মৃত্যুর পূর্বে 'পাকিস্তান আন্দোলন'-এর সঙ্গে নিজেকে জড়িত করার জন্য গভীর মনস্তাপের শিকার হয়েছিলেন। এই সময় তিনি মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীদের প্রায়শ বলতেন, 'আমার নাম তোমরা ব্যবহার করতে চেয়েছ, দিয়েছি। ইকবাল বেঁচে নেই। ইকবাল মৃত।'

ইকবালের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে 'বাং-ই-দারা', 'বাল-ই-জিব্রিল', 'জবর-ই-কালিম', 'আশরার-ই-খুদি', 'দিন-ও-তালিম', 'শিকোয়াহ্ ও জবাব-ই-শিকোয়াহ্' ও প্রবন্ধগ্রন্থ 'দ্য রিকন্স্ট্রাক্‌শন্ অব রিলিজিয়াস্ থট্ ইন্ ইসলাম' এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'আরমিথান-ই-হিজাজ' উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষায় (দ্র) ইকবালের প্রায় সমুদয় রচনাকর্ম অনূদিত ওগ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তবে তাঁর রচনাকর্মের সঠিক মূল্যায়ন হয় নি। এই মহাকবি সম্পর্কে একপেশে ধারণার নিরসন আজও হয় নি।

স্যার ইকবাল ১৯৩৮ সালের ২১শে এপ্রিল লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

ইকুইস্ট্রিয়ান (অশ্বারোহণ ক্রীড়া)

মানুষ তার বাহক ঘোড়ার সাহায্যে যেসব খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে থাকে, তাকে অশ্বারোহণ সংক্রান্ত খেলাধুলা বা ইকুইস্ট্রিয়ান স্পোর্ট্‌স্ (equestrian sports) বলা হয়। এ কিন্তু ঘোড়দৌড় (দ্র) নয়। ঘোড়ার চালক ও ঘোড়ার মধ্যে সম্পূর্ণ সমঝোতা ও সহযোগিতার মধ্যে খেলাটি চলে। এই অশ্বারোহণ ক্রীড়ার তিনটি প্রধান ভাগ আছে, যথা–ড্রেসেজ, শো জাম্পিং ও তিন দিনের প্রতিযোগিতা:

১. ড্রেসেজের প্রতিযোগিতা দ্বারা চালককে প্রমাণ করতে হয় সে তার ঘোড়াকে কত নিপুণভাবে ক্রিয়াকর্মে শিক্ষিত করেছে।

২. শো জাম্পিং-এর দ্বারা বিভিন্ন উচ্চতায় তিন দিন সময়ের মধ্যে ঘোড়ায় সওয়ার অবস্থায় সাফল্যের সঙ্গে উচ্চতা ও বাধা অতিক্রমের প্রতিযোগিতা বোঝায়।

৩. তিন দিনের প্রতিযোগিতার বিষয় হল ড্রেসেজ, এণ্ডিওরেন্স বা ধৈর্যের পরীক্ষা এবং শো জাম্পিং, যা তিন দিনের মধ্যে শেষ করতে হয়। এই প্রতিযোগিতা একক ও দলগতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্বে পারস্যের গুহাচিত্র থেকে এই ক্রীড়ার বনেদিপনার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৬০০ শতকে ইতালিতে এবং ১৮৬৯ সালে ইংল্যাণ্ডে এই খেলার প্রচলন হয়। ১৯১২ সালের স্টকহোল্‌ম্ অলিম্পিক হতে পূর্ণমাত্রায় ইকুইস্ট্রিয়ান ক্রীড়া এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯৮২ সালে এশিয়ান গেম্‌সে (দ্র) এই খেলা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়ে ছিল।

কা. আ. আ.

ইগলু (igloo)

পূর্ব দিকে গ্রিনল্যাণ্ড থেকে শুরু করে পশ্চিমে বেরিং সাগর পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ভূভাগে এবং বেরিং প্রণালীর কাছাকাছি সাইবেরিয়া অঞ্চলে ও আমেরিকার (দ্র) আলাস্কায় এস্কিমো (দ্র) নামে এক বিশেষ জাতি বাস করে।

এস্কিমোরা চিরতুষার দেশে বাস করে এবং সেখানে শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়—প্রায় নয় মাস। তাই তাদের চারিদিকে দিনের পর দিন জমে থাকে বরফ। এত

হাড়কাঁপানো শীতেও এস্কিমোদের বাস করতে তেমন অসুবিধা হয় না।

আমরা যেমন বাঁশ, কাঠ, খড়, ইট, সিমেন্ট দিয়ে বাড়ি তৈরি করি, এস্কিমোরাও তেমনি বরফ দিয়ে ঘর তৈরি করে। তাদের এই বাড়ির নামই ইগ্‌লু। ইগ্‌লু তৈরি করতে এস্কিমোরা খুবই পটু।

লম্বা ছুরি দিয়ে বরফকে সুবিধামতো আকারে কেটে নিতে হয়। সাধারণত ১ মি. লম্বা, $\frac{১}{২}$ মি. প্রস্থ ও $\frac{১}{৬}$ মি. পুরু আকারের বরফ প্রয়োজন হয় ইগ্‌লু তৈরি করতে। ইগ্‌লু মসজিদের (দ্র) গম্বুজের মতো দেখায়। এর পরিধি প্রায় ৩ মি. হয়ে থাকে। ইগ্‌লু ভিতর থেকেই তৈরি করতে হয়। তৈরির সময় এর কোনো দরজা বা জানালা থাকে না। তবে ইগ্‌লু তৈরি শেষ হয়ে গেলে যে লোকটি ইগ্‌লু তৈরি করছিল সে ঘরের নিচের দিক দিয়ে একটা দরজা কেটে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে। পরে এই দরজা যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা হয়। আমাদের কাছে ইগ্‌লু তেমন আরামদায়ক হবে না। এর ভেতরটা অন্ধকার, ধোঁয়ায় ভরা ও নোংরা। সীল (দ্র) মাছের তেল দিয়ে কুপি জ্বালিয়ে এস্কিমোরা ইগ্‌লু গরম রাখে।

চৌকি হিসাবে এস্কিমোরা প্রায় $\frac{১}{২}$ মি. উঁচু বরফখণ্ড ব্যবহার করে। সেই বরফের উপর তারা পুরু করে শেওলা ও পশুর চামড়া বিছায়। শোওয়ার সময় চামড়ার পোশাক পরে নেয় এবং একেবারে কুঁকড়িসুঁকড়ি হয়ে শুয়ে থাকে। শীতকাল গেলে গ্রীষ্মের উত্তাপে বরফ গলতে আরম্ভ করে এবং ইগ্‌লু গলে যায়। তখন এস্কিমোরা তাঁবুতে আশ্রয় গ্রহণ নেয়।

মু. এ.

ইগুয়ানা (iguana)

ইগুয়ানা এক ধরনের সরীসৃপ। দেখতে অনেকটা বড়সড় টিকটিকি (দ্র) বা গুইসাপের মতো। ইগুয়ানার দেহ বিশাল এবং মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত ক্রমশ মোটা থেকে সরু। মাথার অংশ বেশ মোটা ও স্থূল। গলার অংশে একটি থলের মতো ঝোলানো অঙ্গ থাকে। অনেক সময় এই থলেকে ফুলিয়ে ইগুয়ানা শত্রুকে ভয় দেখায়। ইগুয়ানার পিঠে সারবাঁধা কাঁটা রয়েছে। প্রথম দিকের কাঁটাগুলো আকারে লম্বা, কিন্তু ক্রমশ ছোট হয়ে লেজের ওপর পর্যন্ত বিস্তৃত

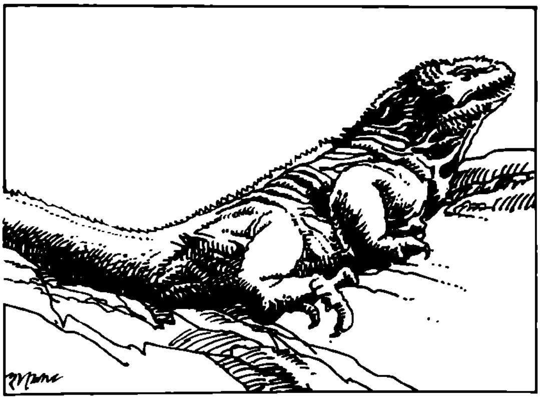

হয়েছে। ভয় পেলে বা উত্তেজিত হলে এসব কাঁটা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। শুধু তাই নয়, একই সাথে গলার থলে ফুলিয়ে এটি এমন এক রূপ ধারণ করে যা দেখে শত্রু ভয় পায়। ইগুয়ানার চারটি পা, সামনের পাগুলো ছোট এবং প্রত্যেক পায়ে পাঁচটি আঙুল থাকে। পেছনের পায়ের আঙুল লম্বা। পাথুরে এলাকায় চলাচলের জন্য এ ধরনের আঙুল খুব কাজে

গ্যালাপাগোসের মতোই নারবোরোগ দ্বীপে ইগুয়ানা। এরা সারাদিন রোদে কাটায়। খাওয়ার সময় হলে সাগরের পানিতে নেমে শেওলা খায়। এরা তিন ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং ওজন প্রায় ২০ পাউণ্ড

আসে। প্রতিটি প্রজনন ঋতুতে ইগুয়ানা এক বা একাধিক ডিম পাড়ে। ওরা ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়।

ইগুয়ানা দল বেঁধে বসবাস করতে পছন্দ করে। প্রশান্ত মহাসাগরের (দ্র) বিভিন্ন দ্বীপ, বিশেষত গ্যালাপাগোস দ্বীপে এদের মূল আস্তানা। এরা জলজ প্রাণী ও কীটপতঙ্গ (দ্র) খেয়ে জীবনধারণ করে।

ত. চ.

ইঞ্জিন, অন্তর্দহন (internal-combustion engine)

যে ইঞ্জিনের ভেতরে কোনো জ্বালানি ব্যবহার করে জ্বালানি থেকে উৎপন্ন গ্যাসের চাপকে যান্ত্রিক কৌশলে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তা-ই অন্তর্দহন ইঞ্জিন। এ ধরনের ইঞ্জিনে সাধারণত পেট্রোল, ডিজেল, তেল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অন্তর্দহন ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন নিকোলাউস আউগুস্ট ওটো (Nikolaus August Otto : ১৮৩২-১৮৯১) নামে একজন জার্মান যন্ত্রবিজ্ঞানী।

সু. ব.

নিচের ছবি : অন্তর্দহন ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ। নাম ও বিবরণ ইংরেজিতে দেওয়া হয়েছে

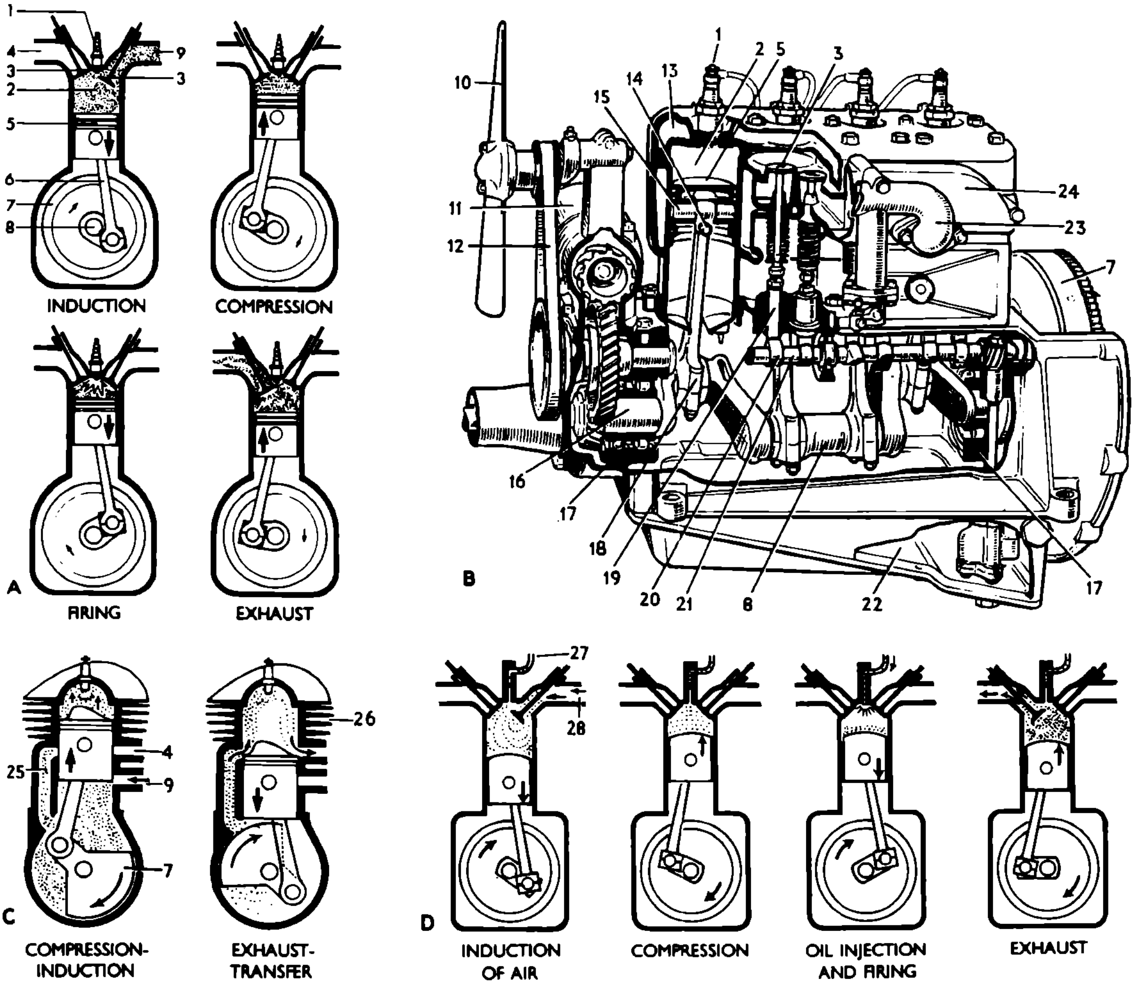

INTERNAL COMBUSTION ENGINES

A. STROKES OF FOUR-STROKE ENGINE. B. FOUR-CYLINDER FOUR-STROKE ENGINE. C. TWO-STROKE ENGINE. D. DIESEL ENGINE

A. 1 Sparking plug. 2. Cylinder. 3. Poppet-valve. 4. Exhaust port. 5. Piston. 6. Connecting rod. 7. Fly-wheel. 8. Crankshaft. 9. Inlet port. B. 10. Fan. 11. Dynamo. 12. Fan belt. 13. Water jacket. 14. Little end of connecting rod. 15. Gudgeon pin. 16. Journal. 17. Main bearings. 18. Big end of connecting rod. 19. Tappet. 20. Cam. 21. Camshaft. 22. Sump, 23. Inlet manifold. 24. Exhaust manifold. C. 25. Transfer port. 26. Cooling fins. D. 27. Oil injector. 28. Air inlet port

ইঞ্জিন, বাষ্পীয় (steam engine)

বাষ্পচালিত ইঞ্জিন। আবদ্ধ সুদৃঢ় আধারে জলীয় বাষ্প তৈরি করে সেই জলীয় বাষ্পের অত্যধিক চাপ ব্যবহারের সাহায্যে এ ইঞ্জিন চালানো হয়। আধারটির নাম বয়লার। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সঙ্গে আরো কিছু যান্ত্রিক ব্যবস্থা যোগ করে এতে গতি সঞ্চারিত করা হয়। এই ইঞ্জিন আবিষ্কার (১৭৫৮)

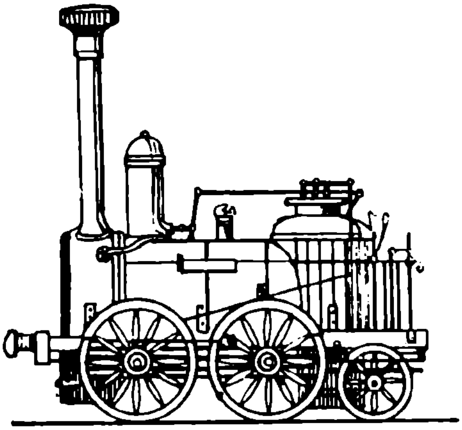

করেন বিখ্যাত ব্রিটিশ যন্ত্রবিজ্ঞানী জেম্‌স্ ওয়াট্ (দ্র)। পরে জর্জ স্টিফেন্সন (George Stephenson : ১৭৮১–১৮৪৮) নামে আরেক জন ইংরেজ যন্ত্রবিজ্ঞানী বাষ্পীয় ইঞ্জিনকে চলমান ইঞ্জিনের রূপ দিতে সক্ষম হন। তিনিই প্রথম ঘোড়ায় টানা ওয়াগনের বদলে বাষ্পীয় ইঞ্জিন দ্বারা চালিত রেল-ওয়াগন চালু করেন।

সু. ব.

ইডিপাস ঈডিপাস দ্র

ইতালীয় চিত্রকলা

উনিশ শতক পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে যত নাম-করা শিল্পী জন্মগ্রহণ করেছেন তার বেশির ভাগই জন্মেছেন ইতালিতে। বিশেষ করে চৌদ্দ শ' শতক থেকে ইতালিতে শিল্পের পুনর্জাগরণের জোয়ার বইতে শুরু করে। দু' হাজার বছর

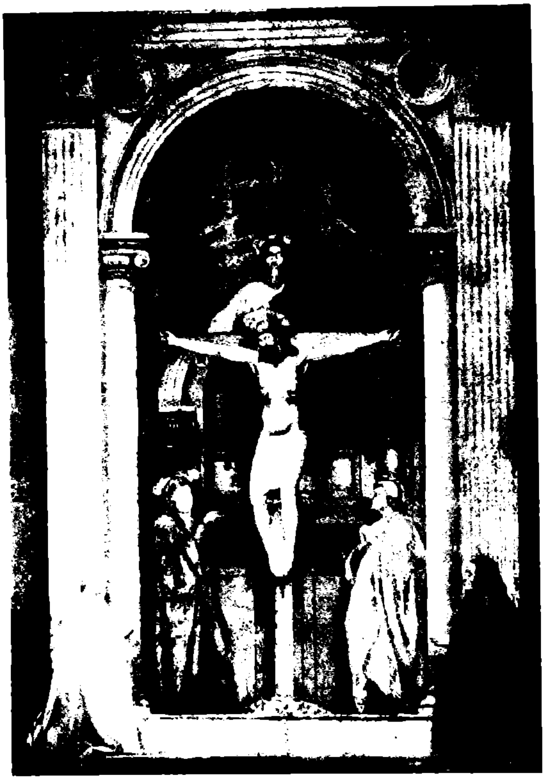

মাজাচ্চো : যিশু

আগে যেসব গ্রিক শিল্পকর্ম সারা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল, চতুর্দশ শতকে ইতালিতে সেরকম শিল্পকর্ম পুনর্জন্ম নিল। সেই কারণেই হয়তো ইতালির এই স্বর্ণময় যুগকে বলা হয় পুনর্জন্মের যুগ, ইউরোপীয় ভাষায় বলা হয়ে থাকে 'রেনেসাঁস' (দ্র)।

এ সময়ে প্রথম বড় শিল্পী ছিলেন মাজাচ্চো (Masaccio))। ফ্লোরেন্সের কাছে ১৪০১ সালে এই শিল্পী জন্মগ্রহণ করেন। ফ্লোরেন্স নামের অর্থ ফুলের শহর। ইতালির ঠিক মাঝখানে এর অবস্থান।

মাজাচ্চো ছবিতে সর্বপ্রথম এমন এক রীতির প্রবর্তন করলেন, যা তাঁর আগে আর কেউ করেন নি। তাঁর ছবিতে সম্মুখ-পিছন এল, ফলে ছবির বিষয়বস্তুর মধ্যে পরস্পরের দূরত্ব নির্ণয় সম্ভব হল— যাকে বাংলায় আমরা বলি পরিপ্রেক্ষিত, ইংরেজিতে বলা হয় পার্সপেক্টিভ। মাজাচ্চোর

মাতেঙ্গা : মৃত যিশুখ্রিস্ট

বত্তিচেল্লি : ছয় পরীর সঙ্গে মাদোনা

রাফায়েল : মেরির বিবাহ

ফ্রা ফিলিপ্পো লিপ্পি : মাদোনা

এরূপ একটি বিখ্যাত ছবি হল—ইডেন উদ্যান থেকে একজন স্বর্গদূত আদম এবং ইভকে বের করে দিচ্ছেন।

মাজাচ্চোর প্রায় সব ছবিই ফ্রেস্কো। ফ্রেস্কো হচ্ছে সদ্য আস্তর করা দেয়ালে ও হলে গোলা রং দিয়ে আঁকা ছবি।

জত্তো (Giotto), ফ্রা আঞ্জেলিকো (Fra Angelico), বত্তিচেল্লি (Botticelli), চিমাবুয়ে (Cimabue), বেল্লিনি (Bellini), জর্জো (Giorgio), পেরুজিনো (Perugino), রাফায়েল (দ্র), মিকেলাঞ্জেলো (দ্র), তিশান (Titian), জর্জোনে (Giorgione), লেওনার্দো দা ভিঞ্চি (দ্র)—ইতালির এই দিক্‌পাল বা 'ওল্ড মাস্টার্স' শিল্পীরা বেশির ভাগই ফ্রেস্কো এবং টেম্পারা মাধ্যমে কাজ করেছেন। আবার এঁদের মধ্যে কেউ কেউ একাধারে চিত্রশিল্পী, ভাস্কর এবং স্থপতি হিসাবেও বিখ্যাত হয়েছেন। গুঁড়ো রঙের সঙ্গে আঠা, গঁদ বা ডিমের কুসুম মিশিয়ে তামার পাতে বা দেওয়ালের শুকনো আস্তরে আঁকাকে টেম্পারা মাধ্যম বলে। 'টেম্পারা' শব্দের অর্থ হচ্ছে মিশ্রিত।

এই সব মাধ্যমে চিত্রকর বেশির ভাগ ছবিই এঁকেছেন গির্জা বা মঠে। আর এসব ছবির বিষয়বস্তু ও কাহিনী বাইবেলের (দ্র) ধর্মীয় অনুশাসনকে কেন্দ্র করে। এসব ছবিতে কুমারী মেরি, স্বর্গদূত, যিশু এগুলো মূল বিষয় হিসাবে থাকলেও ব্যক্তিকে সামনে এনে পিছনে নৈসর্গিক দৃশ্যের মনোরম বর্ণনা থাকত। এসব ছবি ছিল অত্যন্ত সুন্দর এবং ধর্মভাবে পরিপূর্ণ। এদের মধ্যে বত্তিচেল্লি সর্বপ্রথম বাইবেলের কাহিনীকে বর্জন করে সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়ে ছবি আঁকা শুরু করেন। বিশ্বের বেশির ভাগ বিখ্যাত ছবিই এঁকেছেন ইতালির এসব শিল্পী, তবে মাদোনার (দ্র) ছবি আঁকেন নি ইতালিতে এরকম শিল্পী নেই বললেই চলে। ১২০০ থেকে ১৬০০ সাল পর্যন্ত ইতালিতে ছবি ছিল লিখিত রচনার বিকল্প, বিশেষ করে জত্তোর কাছে। তাঁর ছবি দেখে মনে হত, মঞ্চের উপর যেন বাস্তব অভিনয় চলছে। জত্তোর এরকম একটি বিখ্যাত ছবি 'সন্ত ফ্রান্সিসের মৃত্যু'।

এসব দিক্‌পাল ইতালীয় শিল্পীরা শিল্পসাধনা করেই

জত্তো : সন্ত ফ্রান্সিসের মৃত্যু

মিকেলাঞ্জেলো : লিবিয়ান সিবাইল

ফ্রা আঞ্জেলিকো : সঙ্গীতজ্ঞ পরী

দিন কাটাতেন। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল কী করে একটি সুন্দর ছবি আঁকবেন।

রাফায়েল সপ্তাহে অন্তত একটি করে ছবি আঁকতেন। অধিকাংশ ছবিই খুব বড় বড় হত আর বিষয়বস্তু ছিল লোকজনে ভর্তি। তাঁর ছাত্রেরা তাঁর কাজে সাহায্য করতেন। তাই তাড়াতাড়ি ছবি আঁকা সম্ভব হত। চিত্রকলার ক্ষেত্রে অনেক বিখ্যাত মাদোনার (বা মাতৃমূর্তির) ছবি এঁকে রাফায়েল বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। 'সিস্তিন্ মাদোনা' তার অন্যতম একটি। আরেক জন বিশ্বখ্যাত শিল্পী যিনি সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন, তিনি হচ্ছেন মিকেলাঞ্জেলো। এই শিল্পী ছবি আঁকার চেয়ে মূর্তি গড়া বেশি পছন্দ করতেন। তাঁর বিখ্যাত ভাস্কর্যসমূহের নাম পিয়েতা (১৪৯৮), ডেভিড (১৫০০–০৪), বাকুস (১৪৪৭)। এসব ভাস্কর্যের মাধ্যমে তিনি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও মিকেলাঞ্জেলো শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। 'সিস্তিন চ্যাপেল' ভ্যাটিকান প্রাসাদের সিস্তিন গির্জার ছাদে-আঁকা। ফ্রেস্কো মাধ্যমে এই চিত্রটি আঁকতে সাড়ে চার বছর সময় লেগেছিল। কাজের তুলনায় বলতে গেলে খুবই অল্প সময়। সিস্তিন্ চ্যাপেলের কাহিনী ছিল বাইবেলের গল্প। এ চিত্রে রয়েছে সিস্তিন্ গির্জার ছাদের কানা ধরে ধরে অবতারদের ছবি, যাঁরা যিশুর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। ছাদের লম্বালম্বি মাঝ বরাবর ওল্ড টেস্টামেন্টের কাহিনী আঁকা—সৃষ্টির প্রথম ছ' দিন, নৌকা, মহাপ্লাবন, মানুষের সৃষ্টি ও পতন, ইভ কর্তৃক আদমকে প্রলুব্ধ করা এবং আদম ও ইভের পতন ইত্যাদি। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকলা রূপে এই ছবি স্বীকৃত হয়েছে।

মিকেলাঞ্জেলো আশ্চর্য সুন্দর কবিতাও লিখেছেন—১০০টির মতো চতুর্দশপদী প্রেমের কবিতা। এই জগদ্বিখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী মারা যান ৮৯ বছর বয়সে। লোকে তাঁকে মহান শিল্পী হিসাবে গণ্য করতেন।

আরেক জন শিল্পী—যাঁকে বলা হয় পৃথিবীর (দ্র) সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা, এই ইতালিতেই জন্মেছিলেন। তিনি

লেওনার্দো দা ভিঞ্চি : অন্তিম ভোজ

লেওনার্দো দা ভিঞ্চি। এই শিল্পী শুধুমাত্র শিল্পী হিসাবেই পরিচিত ছিলেন না, একাধারে পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, কবি, চিত্রশিল্পী হিসাবেও খ্যাতি তিনি অর্জন করেন। অনেকে লেওনার্দোর সঙ্গে তুলনা করেন গ্রিক দার্শনিক আরিস্টোটলের (দ্র)।

লেওনার্দো দা ভিঞ্চি ১৪৫২ সালে ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন। মারা যান ফ্রান্সে ১৫১৯ সালে। লেওনার্দোর একটি ছবি বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ছবি 'মোনা লিসা'। এটি ইতালীয় এক মহিলার ছবি। আরেকটা বিখ্যাত ছবি আঁকা হয়েছিল ইতালির একটি মঠের দেওয়ালে। এই ছবিটির নাম 'শেষ ভোজ'। এই ছবিতে যিশুখ্রিস্ট (দ্র) ও তাঁর বারো জন শিষ্য একটা লম্বা টেবিল ঘিরে বসে আছেন। তিনি সব সময় ভাবতেন কী করে নতুন উপায়ে, নতুন পদ্ধতিতে ছবি আঁকা যায়। গাছপালা-ফুল সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। বৈজ্ঞানিক মডিউল তৈরিতেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। শরীরবিদ্যার অনেক অজানা তথ্য তিনি আবিষ্কার করেছেন, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে। অস্ত্রশস্ত্র ও বিজ্ঞানের বহু যন্ত্রপাতির অসংখ্য ড্রইং তিনি করেছেন। এমনকি উড়োজাহাজের প্রাথমিক চিন্তাভাবনা ও উড়োজাহাজের প্রাথমিক ড্রইংও তিনি করে গেছেন, যা পরবর্তী কালে বৈজ্ঞানিকদের অনেক কাজে লেগেছে। ১২০০ থেকে ১৬০০ সাল পর্যন্ত ইতালীয় শিল্পকলায় যে চরম উন্নতি ও বিকাশ ঘটে, সে ক্ষেত্রে এই সব শিল্পীর যে অবদান তা শুধু ইতালীয় মানুষের সম্পদ নয়, সারা বিশ্বের এক অমূল্য সম্পদ।

সে. এ.

ইথিলিন (ethylene)

একটি সরল, অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। এটি একটি বর্ণহীন গ্যাস। ফর্মুলা $H_2C = CH_2$। স্ফুটনাঙ্ক –১০৩·৮° সে. (–২৭২·৯° ফা.) এবং গলনাঙ্ক – ১৬৯·৪° সে. (–১৫৪·৮° ফা.)। ইথিলিন একটি মূল্যবান জৈব যৌগ। পলিমার (দ্র) বিক্রিয়ার সাহায্যে ইথিলিন থেকে পলিথিলিন (দ্র) বা পলিথিন তৈরি করা হয়, যার বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। এ ছাড়া এ থেকে তৈরি অন্যান্য যৌগের মধ্যে ইথিলিন ক্লোরোহাইড্রিন, ইথিলিন ডাই ক্লোরাইড, ভিনাইল ক্লোরাইড, ইথানল, ভিনাইল অ্যাসিটেট এবং অ্যাসিটালডিহাইড-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

সা. এ.

ঘরভর্তি সোনা-রূপা পেয়েও স্পেনীয়রা আতাহুয়ালপাকে হত্যা করে

ইনকা (Inca) **সভ্যতা**

ইনকাদের কিংবদন্তি অনুসারে শিক্ষাদান ও শাসন করার জন্য পিতা সূর্য কর্তৃক তার পুত্র-কন্যারা পৃথিবীতে (দ্র) প্রেরিত হয়। ইনকারা আদিতে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনে বসবাস করত। এদের মূল বাসভূমি ছিল পেরু অঞ্চলের দক্ষিণাংশে কুস্কো (Cuzco) নামক স্থান। খ্রিস্টীয় বারো শতকের দিকে এরা আশেপাশে বিস্তৃত হতে থাকে।

১৪৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইনকাদের নবম শাসক পাচাকুতি (Pachakuti) পাশের চাঙা সংযুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ প্রতিহত করেন। তিনি অতঃপর আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করেন। তিনি সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংস্কার সাধন করেন। তাঁর পুত্র তোপা ইন্‌কা ইয়াপানকুই উত্তর ও দক্ষিণে সাম্রাজ্য আরো বৃদ্ধি করেন। পশ্চিমে বলিভিয়া, উত্তর-পশ্চিমে আর্জেন্টিনা (বা আর্হেন্তিনা), উত্তরে চিলি (বা চিলে) এবং ইকুয়েডর পর্যন্ত তিনি রাজ্য বিস্তৃত করেন। এঁর পুত্র ওয়াইনা কাপেক (Huayna Capac) ইকুয়েডর এবং কলম্বিয়ার আরো অঞ্চল দখল করে ঐক্যবদ্ধ করেন।

১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে ওয়াইনার মৃত্যু হলে তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে রাজ্য নিয়ে বিরোধ বেধে ওঠে। ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে আতাহুয়াল্পা (Atahualpa) সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তাঁর ভাই ওয়াস্কারকে পরাজিত করেন। স্পেনীয় ফ্রান্সিসকো পিজারো ঐ বছরেই আতাহুয়াল্পাকে পরাজিত ও বন্দি করে মুক্তিপণ দাবি করেন। এক ঘর ভর্তি সোনা এবং দুই ঘর ভর্তি রূপা মুক্তিপণ পেয়েও স্পেনীয়রা আতাহুয়াল্পাকে হত্যা করে। ওয়াস্কার ইতঃপূর্বেই বন্দি ও নিহত হয়েছিলেন। উত্তরাধিকারীবিহীন বিশাল সাম্রাজ্যটি স্পেনীয়রা সহজেই দখল করে নেয়।

স্পেনীয়রা ইনকা সভ্যতার অনেক কিছুই ধ্বংস করে ফেলে। তবে অতীত স্মৃতি হিসাবে এদের কেউ কেউ রোগীর অসুখের সময় ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান উদযাপন করে। উঁচু ভূমিতে ফসল ফলানো এবং কাপড় পরার পঞ্চো ধরন (মেক্সিকো বা মেহিকোর লোকেরা এখনো এ ধরনের পোশাক পরে) ও কাপড় বোনায়ও পুরানো ঐতিহ্য তারা অনুসরণ করে। রাস্তা, সেতু, জলাধার, নর্দমা ইত্যাদি নির্মাণে ইন্‌কা সভ্যতার দক্ষতার পরিচয় মেলে। আলু গাছের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ইনকা সভ্যতার মাধ্যমে।

সৈ. আ. ই.

ইনফ্লুয়েঞ্জা (influenza)

এক ধরনের ভাইরাসের (দ্র) আক্রমণে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের সৃষ্টি হয়। তবে বিশেষ ধরনের জীবাণুও (হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি) এ রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

রোগের সূচনা হঠাৎ করে ঘটে। প্রাথমিক অবস্থায় রোগীর গায়ে জ্বর জ্বর ভাব এবং মাথাব্যথা দেখা দেয়। সর্বাঙ্গে কষ্টদায়ক ব্যথা এ রোগের প্রধান লক্ষণ। এ ছাড়া ক্ষুধামান্দ্য, বমি-বমি ভাব ইত্যাদি অসুবিধা দেখা দিতে পারে। শরীরের তাপমাত্রা (দ্র) বেড়ে গিয়ে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর (দ্র) আসে। সময়মতো সঠিক চিকিৎসার অভাবে এ রোগ থেকে বিভিন্ন শারীরিক উপসর্গ, যেমন নিউমোনিয়া (দ্র), দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুস (দ্র)-প্রদাহ, ফুসফুসে পুঁজ, সাইনুসাইটিস, হৃদ্‌পেশিতে প্রদাহ, প্রান্তীয় স্নায়ুর প্রদাহ, মেনিনজাইটিস (দ্র) ইত্যাদি সৃষ্টি হতে পারে।

রোগীর শ্লেষ্মা, হাঁচি-কাশির মাধ্যমে এর জীবাণু অন্যের শরীরে সংক্রমিত হতে পারে। সাধারণত শীত এবং বসন্ত কালেই এ রোগ বেশি দেখা দেয়। রোগের প্রকোপ বিক্ষিপ্ত হলেও কখনো কখনো তা মহামারীরূপেও দেখা দিতে পারে। বঙ্গদেশে এ রোগ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (দ্র) সময়ে প্রথম আসে।

এণ্টিবায়োটিক (দ্র) জাতীয় ঔষধ সেবনে এ রোগের উপসর্গ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। টিকা (দ্র) গ্রহণের মাধ্যমে এ রোগের প্রতিরোধ সম্ভব।

সি. না. হ.

ইনসুলিন (insulin)

ইনসুলিন লাতিন শব্দ insula (দ্বীপ) থেকে নেওয়া হয়েছে। অগ্ন্যাশয়ের (দ্র) বিটাকোষ থেকে নিঃসৃত ইনসুলিন নামক এই হরমোন (দ্র) প্রথম আবিষ্কার (১৯২২) করেন ব্যান্টিং (Sir Frederick G. Banting : ১৮৯১—১৯৪১) ও বেস্ট (Charles Best : ১৮৯৯—১৯৭৮)। ইনসুলিনের নিঃসরণ নির্ভর করে রক্তে শর্করার মাত্রার উপর। রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে ইনসুলিনের নিঃসরণ কমে এবং শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে ইনসুলিনের নিঃসরণ বাড়ে।

ইনসুলিন শ্বেতসার, আমিষ ও চর্বির বিপাকপ্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ইনসুলিনের প্রধান কাজ রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রায় রাখা। ইনসুলিনের অভাবে ডায়াবেটিস (দ্র) রোগ দেখা দেয়। ইনসুলিনের উৎস বিটাকোষ নষ্ট হবার কারণ এখনো স্পষ্ট নয়। বংশগত বৈশিষ্ট্য, ভাইরাস (দ্র) সংক্রমণ (দ্র) এবং অন্যান্য অজানা কারণে বিটাকোষ বিনষ্ট হয়ে থাকে।

ডায়াবেটিস মেলিটাসের চিকিৎসায় ইনসুলিন ব্যবহৃত হয়। পাকস্থলীর (দ্র) জারক-রসের কার্যকারিতা নষ্ট হবার কারণে ইনসুলিন মুখে খাবার পরিবর্তে ইনজেকশন মাধ্যমে নেওয়া হয়। কার্যকাল হিসাবে একাধিক প্রকার ইনসুলিন রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আ. আ. হা.

ইন্দিরা গান্ধী [১৯১৭–১৯৮৪]

ভারতের রাষ্ট্রনেত্রী এবং প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। তাঁর জন্ম এলাহাবাদে ১৯১৭ সালের ১৯শে নভেম্বর। পিতা জওহরলাল নেহরু (দ্র)।

১৯৩৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রথমে শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে (দ্র) ও পরে অক্সফোর্ডের সামারভিল কলেজে ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৮ সালে ইণ্ডিয়ান লীগে যোগ দিয়ে হ্যারল্ড লাস্কির মতো মনীষীর সংস্পর্শে আসেন।

পারিবারিক পরিবেশেই ইন্দিরা গান্ধীর রাজনীতিতে হাতেখড়ি (দ্র)। মহাত্মা গান্ধী (দ্র) সূচিত আইন অমান্য

আন্দোলনে (দ্র) তিনি বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালের ১৯শে নভেম্বর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে (দ্র) যোগ দিয়ে এর পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি ফিরোজ গান্ধীর (১৯১২-১৯৬০) সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৯৫৯ সালে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালের ২৭শে মে তাঁর পিতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর তিনি প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মন্ত্রিসভায় তথ্য ও বেতারমন্ত্রীর পদ লাভ করেন।

বিভিন্ন সময়ে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন মোট ৪ বার (১৯৬৬ থেকে ১৯৬৭, ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১, ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ এবং ১৯৮০ থেকে ১৯৮৪)। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন বেশ কয়েক বার।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ভারতের শিল্প ও কৃষির আধুনিকায়নেও তাঁর প্রয়াস সুবিদিত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে (দ্র) (১৯৭১) তাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি দেশ-বিদেশের বহু সম্মান ও উপাধিতে ভূষিত হন। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সাম্মানিক 'Doctor of Civil Laws' উপাধি। ১৯৮৪ সালের ৩১শে অক্টোবর নয়াদিল্লিতে তিনি তাঁর দু'জন শিখ নিরাপত্তা রক্ষীর গুলিতে নিহত হন।

আ. হু.

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী [১৮৭৩–১৯৬০]

পিতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) কর্মস্থল কালাদ্‌ঘি-বোম্বাইয়ে জন্ম। রবীন্দ্রনাথের (দ্র) 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের অধিকাংশ চিঠি তাঁর এই আদরের ভাইঝি ইন্দিরাকে লেখা। ১৮৯২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) বি. এ. পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে 'পদ্মাবতী স্বর্ণপদকে' ভূষিত হন। ১৮৯৯ সালে বাংলা সাহিত্যের (দ্র) 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরীর (দ্র) সঙ্গে বিবাহ হয়। শৈশবেই পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ পরিচালিত ও মা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় ইংরেজ লেখক ও সমালোচক জন রাস্কিনের রচনা অনুবাদ করেন। 'সাধনা', 'সবুজপত্র'. 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকায় ফরাসি সাহিত্য মূল থেকে অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এবং 'জাপানযাত্রী' বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। মহিলা বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনার পরিচয় 'নারীর উক্তি' গ্রন্থ। 'বাংলার স্ত্রী-আচার', 'স্মৃতিকথা', 'পুরাতনী' প্রভৃতি সম্পাদনা/রচনা ইন্দিরা দেবীর অন্যতম অবদান। বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যচর্চাই নয়, সঙ্গীতেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। দেশী-বিদেশী সুরে পিয়ানো, বেহালা, সেতার বাদনে তিনি ছিলেন দক্ষ। স্বামী প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে যুক্তভাবে রচিত 'হিন্দুসঙ্গীত' তাঁর সঙ্গীতচিন্তারই পরিচয়। 'মায়ার খেলা', 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'কালমৃগয়া'সহ দু'শ' রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি তিনি প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গম' রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিকা। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর অনবদ্য স্মৃতিচারণ 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (১৩৬৭ ব.) গ্রন্থ। ১৯৪৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ভুবনমোহিনী পদকে' ভূষিত করে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী ১৯৫৬ সালে বিশ্বভারতীর (দ্র) অস্থায়ী উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালে বিশ্বভারতী থেকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি পান। ১৯৫৯ সালে রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করেন। বহু সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে ইন্দিরা দেবী যুক্ত ছিলেন।

মে. খা.

ইন্দো–ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী

পৃথিবীতে (দ্র) যত ভাষাগোষ্ঠী আছে তাদের মধ্যে ইন্দো–ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী আয়তনে সবচেয়ে বড়, অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তি এই সব ভাষায় কথা বলে।

এই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান যেসব ভাষাবংশ আছে সেগুলো হচ্ছে : আর্মেনীয়, বাল্টিক, জার্মানিক (দ্র), গ্রিক, ইন্দো–আর্য, ইন্দো–ইরানীয়, রোমান্স (দ্র), স্লাভনিক (দ্র)।

আমাদের চেনাশোনা অনেক ভাষা—যেমন বাংলা (দ্র), হিন্দি, অহমিয়া, ওড়িয়া, উর্দু (দ্র), পাঞ্জাবি ইত্যাদি এই উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষা; ইংরেজি (দ্র), ফরাসি, জার্মান, রুশ (দ্র), স্প্যানিশ, ফার্সি ইত্যাদি—এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

হা. মা.

এখনকার দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কাম্পুচিয়া, লাওস ও ভিয়েৎনাম দেশগুলো যখন ফরাসিদের উপনিবেশ ছিল তখন এদের সম্মিলিত সাধারণ নাম ছিল ইন্দোচীন। ইংরেজিতে বলত ইন্দোচায়না (Indochina) আর ফরাসিতে বলত অ্যাঁদোশিন্ (Indochine)।

১৮৬২ থেকে ১৮৯৩ সালের মধ্যে এ অঞ্চলে ফরাসি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কোচিন্ চীন (অর্থাৎ ভিয়েৎনামের দক্ষিণাংশ), আন্নাম্ (অর্থাৎ মধ্য-ভিয়েৎনাম), তোন্‌কিন্ (অর্থাৎ ভিয়েৎনামের উত্তরাংশ) এবং কাম্বোডিয়া (অর্থাৎ কাম্পুচিয়া) মিলিয়ে ফরাসিরা ১৮৮৭ সালে একটা ফেডারেশন গঠন করে, নাম দেয় ইন্দোচীন ইউনিয়ন; পরে ১৮৯৩ সালে এর সঙ্গে লাওস্ যুক্ত করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পর ক্রমে ক্রমে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র এ অঞ্চলে গঠিত হয়ে ওঠে।

হা. মা.

ড. আহমেদ সুকার্নো

ইন্দোনেশিয়া

নিরক্ষরেখার (দ্র) এক পাশে মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইন আর অন্য পাশে অস্ট্রেলিয়া (দ্র)। ইন্দোনেশিয়া নামে পৃথিবীর (দ্র) বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জটি পড়েছে এর মাঝখানে। কয়েক শতাব্দী ধরে ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজদের অধীনে ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (দ্র) সময় সমগ্র ইন্দোনেশিয়া জাপানের অধীনে চলে যায়। পরে হল্যাণ্ডের সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সাল থেকে ইন্দোনেশিয়ায় প্রশাসনিক পরিবর্তন শুরু হয় এবং প্রেসিডেন্ট আহমেদ সুকার্নো (দ্র) 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র' প্রবর্তন করেন। ১৯৬৬ সালে লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল সুহার্তো সুকার্নোর অনেক ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে দেশের সংসদ জেনারেল সুহার্তোকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। ১৯৬৮ সাল থেকে জেনারেল সুহার্তো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন।

তিন সহস্রেরও বেশি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দ্বীপ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া গঠিত। বৃহৎ দ্বীপগুলোর মধ্যে সুমাত্রা, জাভা, বালি, সেলিবিশ, মাদুরা, লম্বক, দক্ষিণ বোর্নিও, মালাক্কাস ও দক্ষিণ তিমুর অন্যতম। ইন্দোনেশিয়ার আয়তন প্রায় ১৪,৯১,৫৬৫ বর্গ কিমি এবং জনসংখ্যা প্রায় ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ ৪৪ হাজার (১৯৯২)। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল মুসলিম রাষ্ট্র। অধিবাসীদের শতকরা ৯০ ভাগই মুসলমান।

সমগ্র দেশটি ভূমিকম্পবলয়ে অবস্থিত বলে অধিকাংশ দ্বীপই ভূমিকম্পপ্রবণ। এখানে অনেক জীবিত ও মৃত আগ্নেয়গিরি (দ্র) আছে।

নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত হওয়ায় ইন্দোনেশিয়ার জলবায়ু (দ্র) উষ্ণ এবং আর্দ্র। এখানে সারা বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ইন্দোনেশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ এবং বিভিন্ন দ্বীপের জমি লাভা (দ্র) দিয়ে গঠিত বলে খুবই উর্বর। এ দেশে পর্বতের নিম্ন ঢালে প্রচুর সিনকোনা, রাবার (দ্র), চা (দ্র) ও কফির (দ্র) চাষ হয়। উপকূলে ধান, নীল, আখ, আনারস, নারিকেল প্রভৃতির চাষ হয়। মালাক্কাস দ্বীপে প্রচুর মসলা জন্মে। সিনকোনা, রাবার, কফি ও চা উৎপাদনে ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীতে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করে আছে।

ইন্দোনেশিয়ায় প্রচুর খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। জাভা, সুমাত্রা ও বোর্নিওতে কয়লা, খনিজ তেল ও রাং পাওয়া যায়। অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের মধ্যে সোনা (দ্র), রূপা (দ্র), ম্যাঙ্গানিজ ও নিকেল উল্লেখযোগ্য। চিনির কল, টিনের কারখানা, কাপড় ও কাগজের কল ইন্দোনেশিয়ার প্রধান শিল্প। রপ্তানিদ্রব্যের মধ্যে তেল, রাবার, নারিকেলজাত দ্রব্য, সিমেন্ট (দ্র) ও কফি প্রধান। আমদানিদ্রব্যের মধ্যে বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, পরিবহণযান, ইস্পাত (দ্র) ও লোহা (দ্র) এবং চাল প্রধান।

জাভা দ্বীপে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা অবস্থিত। আগে এর নাম ছিল বাটাভিয়া। এটি ইন্দোনেশিয়ার প্রধান শহর ও বন্দর। সুরাবায়া ও সেমারাং ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম বন্দর। ম্যাকাসার (Macassar) সেলিবিস দ্বীপের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যস্থান। বান্দুং স্বাস্থ্যকর স্থান। বালি দ্বীপে প্রচুর পর্যটকের সমাগম ঘটে।

মু. এ.

ইফতার

সারা দিন রোজা (ইসলামী নিয়মে দিবাভাগে পানাহার ও অন্যান্য নির্দেশিত কৃত্যাদি বর্জন) পালনের পর সন্ধ্যায় পানাহার গ্রহণকে ইসলামী পরিভাষায় 'ইফতার' বলা হয়। সূর্যাস্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই পানাহার গ্রহণ বা ইফতার করতে হয়। অধুনা ইলেক্ট্রনিক প্রচারমাধ্যমের কল্যাণে রেডিও (দ্র) বা টেলিভিশনের (দ্র) সূত্রে ইফতারের সঠিক সময় জানা সহজ হয়েছে।

প্রথমে পানি, তারপর শরবত ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ইফতার সম্পন্ন করা হয়। ইফতারের পূর্বক্ষণে নির্দিষ্ট একটি দোয়া পড়ে পানাহার গ্রহণের বিধান আছে।

মু. মা.

ইবনে আল-হাইসাম [৯৬৫—১০৩৮]

মিশরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। ৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের বসরা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম আবু আলী আল-হাসান ইবনুল হাসান ইবনে আল-হাইসাম। সংক্ষেপে তিনি ইবনে আল-হাইসাম (Ibn al-Haitham) নামে পরিচিত। ইউরোপীয়দের উচ্চারণে ইবনে আল-হাইসাম নামটি আল-হাজেন (Al-Hazen)-এ পরিণত হয়েছে।

ইবনে আল হাইসাম মিশরের ফাতিমী খলিফা আল-হাকিম (৯৯৬-১০২১)-এর দরবারে বিজ্ঞানীরূপে নিযুক্ত হন। নীল নদের বার্ষিক বন্যা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি এ কাজে সফল হতে পারেন নি। এই ব্যর্থতার কারণে খলিফা তাঁর প্রতি বিরূপ হন।

আল-হাইসামের খ্যাতি প্রধানত পদার্থবিদ হিসাবে। এই খ্যাতির মূলে রয়েছে তাঁর আলোক সংক্রান্ত গবেষণা। বস্তুত, আলোক সংক্রান্ত গবেষণায় তিনি ছিলেন প্রাচীন বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তার পূর্বসূরি গ্রিক বিজ্ঞানীদের ভুল ধারণাগুলো ধরিয়ে দিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম আলোকবিদ্যাকে আধুনিক বিজ্ঞানে উন্নীত করেন। আলোর প্রবাহ, আলোর সঙ্গে বিভিন্ন রঙের সম্পর্ক, আলোর প্রতিসরণ (দ্র) ও প্রতিফলন (দ্র) এবং তার ফলে সৃষ্ট দৃষ্টিভ্রম ও মরীচিকা ইত্যাদি বিষয়ে আল-হাইসাম নানাবিধ পরীক্ষা ও তাদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

আল-হাইসামের গবেষণা মধ্যযুগে রজার বেকন (Roger Bacon : ১২২০—১২৯২) এবং রেনেসাঁসের সময়কার ইওহানেস্ কেপলার (দ্র) প্রমুখ বিজ্ঞানীকে গভীরভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল। ইতালির বিজ্ঞানী গালিলেও গালিলেই (দ্র)-এর রচনাপদ্ধতির সঙ্গে

আল-হাইসামের রচনাপদ্ধতির মিল পাওয়া যায়। তাঁর রচনাপদ্ধতি দেখে মনে হয় যেন সেগুলো সপ্তদশ শতকে লিখিত কোনো প্রখ্যাত ইউরোপীয় পদার্থবিদের রচনা। তিনি প্রায় দু' শ' বই লিখে গেছেন। ঐ বইগুলির মধ্যে 'কিতাবুল মানাজির' এবং গোধূলি সম্পর্কে লিখিত রচনাটি পদার্থবিদ্যা বিষয়ে পূর্বেকার ধারণাকে বদলে দিয়েছিল।

জীবনে বহু বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আল-হাইসাম বিজ্ঞানজগতে যে বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণা প্রবর্তন করেন, তা শুধু সে যুগেই বিস্ময় সৃষ্টি করে নি, আজও তা বিজ্ঞানীদের নিকট বিস্ময়ের বিষয়।

পদার্থবিদ্যা ছাড়াও অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রেও ইবনে আল-হাইসামের দান কম নয়। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে বীজগণিত, গতিবিদ্যা, তরল পদার্থবিজ্ঞান (hydrostatics) এবং জ্যামিতিও তাঁর জাদুস্পর্শে ধন্য হয়েছে। এ পর্যন্ত তাঁর ৩৯টি বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ইবনে আল-হাইসাম ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে মিশরের রাজধানী কায়রো শহরে পরলোকগমন করেন।

শা. হ.

ইবনে খল্‌দুন্‌ [১৩৩২—১৪০৬]

আরব সভ্যতা (দ্র) জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেসব মৌলিক প্রতিভার জন্ম দিয়েছে ইবনে খল্‌দুন্‌ তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট। তাঁর জন্ম উত্তর আফ্রিকার তিউনিসে, ১৩৩২ খ্রিষ্টাব্দে।

কর্মজীবনে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর প্রতিভার যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে ইতিহাস ও ইতিহাসের তত্ত্ব সম্পর্কে রচিত সুবিশাল 'আল-মুকাদ্দিমা' নামক গ্রন্থে। আরব ও অন্যান্য জাতিসমূহের বিবরণমূলক ইতিহাসের সঙ্গে ইতিহাসপাঠের তাত্ত্বিক দর্শনের আলোচনাতেই ইবনে খল্‌দুনের সৃষ্টিশীলতা ও মৌলিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক, পরিবেশগত প্রভাবে আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি-বিধানে সংঘটিত পরিবর্তন সম্পর্কিত তাঁর আলোচনায় বস্তুবাদী চেতনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

আর্নল্ড টয়েনবি প্রমুখ কয়েক জন পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদের মতে ইতিহাসের দর্শনতত্ত্বের ব্যাখ্যায় ইবনে খল্‌দুনের সমকক্ষ প্রতিভা বিরল।

ইবনে খল্‌দুনের মৃত্যু কায়রোতে, ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে।

আ. র.

ইবনে বতুতা [১৩০৪—১৩৬৯]

বিশ্বের খ্যাতিমান পরিব্রাজকদের এক জন। তাঁর পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহম্মদ আল-লাওয়াতী আল তানজী ইবনে বতুতা। সংক্ষেপে তিনি ইবনে বতুতা নামে পরিচিত। শামসুদ্দিন ও মওলানা বদরুদ্দিন নামেও তিনি অভিহিত হতেন।

ইবনে বতুতা ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি মরক্কোর তানজির শহরের এক বিখ্যাত কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে তিনি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হন। ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি হজ্ব (দ্র) পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন, কিন্তু হজ্বব্রত শেষে তিনি দেশে ফিরে না গিয়ে আরব, পারস্য (ইরান), মিশর, সিরিয়া, ইরাকসহ এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতে থাকেন। এ সময় তিনি এসব দেশের শীর্ষস্থানীয় মুসলিম মনীষীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বিভিন্ন তীর্থস্থান ঘুরে দেখেন। এভাবে তিনি ধর্ম (দ্র), দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান (দ্র) ও সাহিত্য বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হন।

১৩৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরব অঞ্চলে অবস্থান করে ইবনে বতুতা সিরিয়া হয়ে রাশিয়া (দ্র) ঘুরে বোখারা, সমরখন্দ, বল্‌খ, হেরাত, তুস, নিশাপুর, এবং হিন্দুকুশ পেরিয়ে গজ্‌নি ও কাবুলের মধ্য দিয়ে ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর সিন্ধুদেশে উপনীত হন। কিছু দিন পর সেখান থেকে মুলতানে পৌঁছালে তৎকালীন দিল্লির সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের (শা.১৩২৪-৫১) আমন্ত্রণে ইবনে বতুতা দিল্লিতে উপস্থিত হন। সুলতান তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দিল্লির প্রধান কাজী বা বিচারপতি নিযুক্ত করেন। ১৩৩৪ থেকে ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সময় রাজকার্য উপলক্ষে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শনের সুযোগ পান।

১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইবনে বতুতাকে চীনের মঙ্গোল বংশের শেষ সম্রাটের দরবারে দিল্লির রাজদূত নিয়োগ করেন। কিন্তু চীনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে আলীগড়ের নিকট জালালী নামক স্থানে এক দল দস্যুর আক্রমণে সর্বস্ব হারিয়ে তিনি মালাবার উপকূল (কালিকট) হয়ে মালদ্বীপে পালিয়ে যান। মালদ্বীপে আবার তিনি কাজী নিযুক্ত হন।

দেড় বছর পর সিংহল ঘুরে ৪৩ দিন সমুদ্রযাত্রাশেষে বঙ্গদেশে পৌঁছান। বঙ্গদেশের শ্যামল সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করে। বিখ্যাত পীর শাহজালালের (দ্র) সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি সিলেটে যান। এরপর সুমাত্রা দ্বীপ হয়ে তিনি বৃহত্তম চীনা পোতাশ্রয় 'যাইতুন'-এ উপস্থিত হন। চীনের বিখ্যাত নগর ক্যান্টন, পিকিং ঘুরে তিনি সেখানকার শিল্পকলা ও রীতিনীতি সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এরপর তিনি সমুদ্রপথে স্বদেশ রওয়ানা হন। সুমাত্রা, কালিকট, দক্ষিণ ইয়েমেন, বাগদাদ, দামেশ্‌ক্ হয়ে মক্কায় এসে তিনি আরেক বার হজ্বব্রত পালন করেন। ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজ দেশ মরক্কোতে ফিরে যান।

১৩২৫ থেকে ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে তিনি মোট ৭৫,০০০ মাইল বা ১,২০,০০০ কিলোমিটার পথ পরিক্রমণ করেন। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন।

দেশে ফেরার পর মরক্কোর সুলতানের নির্দেশে ইবনে বতুতা তাঁর সম্পূর্ণ ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্তের নাম 'তুহ্‌ফাত আল্-নুযযার ফী গারাইব আল্-আমসার ওয়া আজাইব আল্-আসফার'। সাধারণভাবে এটি রিহ্‌লাত ইবনে বতুতা বা শুধু 'রিহ্‌লা' অর্থাৎ সফর নামে পরিচিত। বিভিন্ন ভাষায় রিহ্‌লার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়।

শেষজীবনে ইব্‌নে বতুতা সুলতানের অনুরোধে মরক্কোর প্রধান কাজীর পদ গ্রহণ করেন। ১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

সুজ. ব.

ইবনে রুশ্‌দ্ [১১২৬—১১৯৮]

স্বনামখ্যাত আরব দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। তাঁর জন্ম ১১২৬ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের কর্দোবা (Cordova) নগরীতে। দর্শন, গণিত, আইন, চিকিৎসাবিজ্ঞান (দ্র), ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসামান্য। মূলত দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় ইবনে রুশ্‌দের বস্তুবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে।

ইবনে রুশ্‌দের দর্শনচিন্তার মূলকথা হল : বস্তু স্থায়ী আর আত্মা দেহের মতোই নশ্বর। বস্তু ও গতির কোনো স্রষ্টা নেই। তাঁর ধারণায় সত্য দুই ধরনের : দর্শন ও বিজ্ঞানের সত্য এবং ধর্মবিশ্বাসের সত্য। দর্শন ও বিজ্ঞানের সত্য যেমন ধর্ম স্বীকার করে না, তেমনি বস্তু-বিশ্ব সম্পর্কে ধর্মীয় ব্যাখ্যাও বিজ্ঞান ও দর্শনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি আরিস্টোটলীয় দর্শনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে যে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন সেগুলো ইউরোপে (দ্র) বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। মুসলমান ও খ্রিস্টান রক্ষণশীলদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও রুশ্‌দ্ পিছু হটেন নি। সে সময় তাঁর কোনো কোনো গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, তবু তিনি তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করেন নি। এমনকি ইমাম গাজ্জালির (দ্র) ধর্মীয় রহস্যবাদের তীব্র সমালোচনা করতেও দ্বিধা করেন নি। পরবর্তী কয়েক শতকের দর্শনচিন্তায় ইবনে রুশ্‌দের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর ৭ খণ্ডে লেখা বিশ্বকোষ সমকালের বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা। শারীরতত্ত্ব

(দ্র), শারীরসংস্থান (দ্র), রোগবিদ্যা (দ্র), চিকিৎসা, খাদ্য এবং ঔষধ (দ্র) সম্পর্কিত সেসব রচনা তাঁর অগ্রসরচিন্তার পরিচায়ক। তাঁর মৃত্যু ঘটে ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে।

আ. র.

ইবনে সিনা [৯৮০—১০৩৭]

ইবনে সিনা ছিলেন বিখ্যাত ইরানি চিকিৎসক, সেই সঙ্গে দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, রসায়নবিদ ও গণিতবিদ। ভাষাবিদ, বিশ্বকোষপ্রণেতা, এমনকি কবি, হিসাবেও তাঁর খ্যাতি স্বীকৃত। ইবনে সিনার পুরো নাম আবু আলী আল হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা। তিনি ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বুখারার নিকটবর্তী আফসানায় জন্মগ্রহণ করেন।

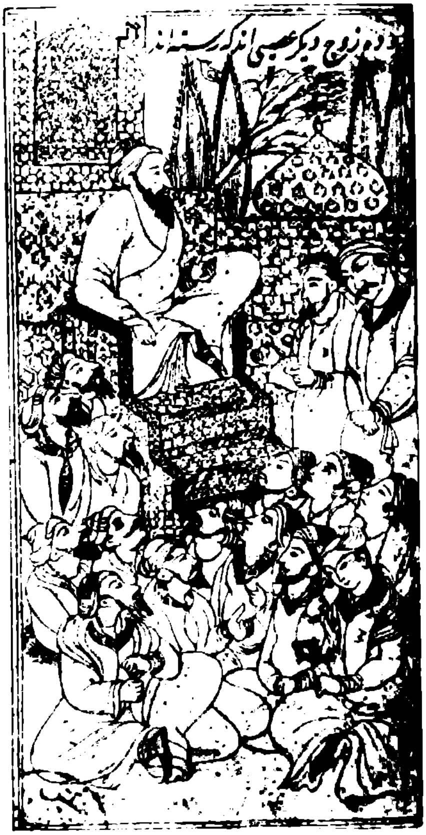

ইবনে সিনা তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করছেন।
১৭ শতকের পারস্য চিত্রকলা

'কানুন ফিৎ-তিব্ব্' (অর্থাৎ Canon of Medicine) নামে চিকিৎসা বিষয়ক বিশাল বিশ্বকোষ ইবনে সিনার অমর কীর্তি। প্রায় ১০ লক্ষ শব্দবিশিষ্ট এ বিশ্বকোষ মধ্যযুগে ব্যাপকভাবে অনূদিত হয়েছিল। বিষয়বস্তু ও রচনার গুণে বইটি রচনার পর ছয় শ' বছরেরও অধিক সময় ধরে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে এবং এখনো প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইবনে সিনা রচিত গ্রন্থের সংখ্যা এক শ'রও বেশি। তাঁর বইগুলোর মধ্যে অধিকাংশই আরবি ভাষায় (দ্র) এবং কিছু সংখ্যক ফার্সি ভাষায় রচিত। তিনি চিকিৎসা বিষয়ক ১৬টি বই, দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যা বিষয়ক ৬৮টি বই এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক ১১টি বই ছাড়াও ৪টি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

ইবনে সিনার দার্শনিক মতবাদে আরিস্টোটল (দ্র) ও নব্য প্লেটোবাদের প্রভাব রয়েছে। তিনি 'কিতাবুশ্ শিফা' নামে দুই খণ্ডে বিভক্ত একটি দার্শনিক বিশ্বকোষ রচনা করেন। ইবনে সিনার দর্শন 'আভিসেনা মেটাফিজিসেস কমপেণ্ডিউম'(Avicennae Metaphysices Compendium) নামক আধুনিক লাতিন অনুবাদগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইবনে সিনা গতি (দ্র), স্পর্শ, বল (দ্র), শূন্য, অসীম, আলো (দ্র), তাপ (দ্র) প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। আপেক্ষিকগুরুত্ব বিষয়েও তিনি পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন।

ইবনে সিনা একটি আত্মজীবনী রচনায় হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। তাঁর শিষ্য আল-জুযজানি গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেন। ইবনে সিনা ১০৩৭ সালে পরলোকগমন করেন।

সি. না. হ.

ইবনে হাম্বল(রা.), ইমাম [৭৮০—৮৫৫]

ইমাম ইবনে হাম্বল 'হাম্বলী মজহাব' বা হাম্বলী মতবাদের স্থপতি, বিশিষ্ট ইসলামী তাত্ত্বিক, পণ্ডিত। তাঁর পুরো নাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল (র.)।

ইমাম ইবনে হাম্বল (র.) ইরাকের বাগদাদ শহরে ৭৮০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক পড়াশোনা বাগদাদ শহরে সম্পন্ন করে উচ্চতর জ্ঞান লাভের আশায় তিনি সিরিয়া, হেজাজ, ইয়েমেন প্রভৃতি দেশে যান।

ইসলামী শাস্ত্র, বিশেষ করে হাদিস(দ্র) সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞান অর্জনশেষে দেশে ফিরে ইমাম হাম্বল শাফি মতবাদের স্রষ্টা বিখ্যাত ইমাম শাফি (র.) (দ্র)-এর নিকট ফিক্‌হ বা ইসলামী আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মুতাজিলা (দ্র) সম্প্রদায়ের সঙ্গে ধর্মীয় কারণে মতভেদের জন্য তাঁকে বন্দি ও কারারুদ্ধ করা হয়। পরে খলিফা আল-মামুনের শাসনামলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ইসলামের (দ্র) বিভিন্ন শাখায়, বিশেষ করে হাদিসে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তাঁর পাণ্ডিত্য ও চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে বহু মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

মু. মা.

ইবরাহিম (আ.), হযরত

হযরত ইবরাহিম (আ.) ছিলেন আল্লাহ্‌র মনোনীত নবীদের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। তাঁর উপাধি ছিল 'খলীলুল্লাহ্' বা আল্লাহর প্রিয় বন্ধু। তাঁরই পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশে নবীশ্রেষ্ঠ হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর জন্ম হয়। পবিত্র কুরআনের (দ্র) আটাশটি সূরার তেষট্টিটি আয়াতে ইবরাহিম (আ.)-এর বর্ণনা রয়েছে।

কুরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ইবরাহিম (আ.)-এর সম্প্রদায়ের সকলেই মূর্তিপূজা করত। দেশের রাজা নমরূদও (দ্র) ছিল মূর্তিপূজক ও আল্লাহর একত্বে অবিশ্বাসী। ইবরাহিম (আ.)-এর পিতা আযর নিজে মূর্তি তৈরি ও বিক্রি করতেন।

খোদা জ্ঞানে মূর্তিপূজা করার এই বিষয়টি ইবরাহিম (আ.) মেনে নিতে পারেন নি। তিনি উপলব্ধি করেন, জড় পদার্থের ভাল বা মন্দ করার কোনো ক্ষমতা নেই, সে কখনো উপাস্য শক্তি হতে পারে না।

তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনকে তাওহীদ (দ্র) বা একত্ববাদের অনুসরণের আহ্বান জানান। ইবরাহিম (আ.) ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রথম প্রচারক। তাঁর প্রচারিত ধর্মই শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে।

আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর ভালবাসা ও আনুগত্য এত বেশি ছিল যে আল্লাহ্‌র নির্দেশে একদা তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি (দ্র) দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, যার স্মৃতি হিসাবে আজও মুসলিম বিশ্বে কোরবানির প্রথা চালু আছে।

মু. মা.

ইবরাহিম ইবনে আদ্‌হাম

বিখ্যাত মুসলিম সুফি সাধক। খোরাসানের অন্তর্গত বলখ্-এর যুবরাজ। তিনি রাজপ্রাসাদের সুখ-সম্পদ ও বিলাস ত্যাগ করে সুফি সাধনার পথ বেছে নেন।

ইবরাহিম ইবনে আদহাম তাঁর পূর্ববর্তী সুফি সাধকদের মতো কায়িক শ্রমে জীবিকার সংস্থান করতেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তির বিরোধী ছিলেন। ভববন্ধন ছিন্ন করে ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্জন করে সুফি সাধনার মাধ্যমে আত্মার চরম পরিত্রাণ ও শান্তিলাভই ছিল তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য।

মো. ই.

ইবসেন, হেন্‌রিক ইওহান্ [১৮২৮—১৯০৬]

বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার। জন্ম ১৮২৮ সালে নরওয়ের এক সম্পন্ন ব্যবসায়ী পরিবারে।

উপকূলবর্তী শহর গ্রিমস্টাডে শিক্ষানবিসির সময়ে ইবসেন (Henrik Johan Ibsen) রঙ্গমঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৫১ সালে বের্গেন্ (Bergen) নগরের রঙ্গমঞ্চের মঞ্চপরিচালক নিযুক্ত হয়ে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই কাজে নিয়োজিত থাকেন।

১৮৫০ সাল থেকেই নাটক (দ্র) রচনা শুরু করলেও

দীর্ঘ এক যুগের ব্যবধানেও তিনি স্বীকৃতিলাভে ব্যর্থ হন। ফলে ব্যক্তিগত হতাশা, দারিদ্র্য এবং কিছুটা রাজনৈতিক কারণে ১৮৬৪ সালে তিনি ইতালিতে স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করেন। এখানে থাকতে তিনি নাটক রচনা করে অচিরেই খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৬৬ সালে নরওয়ের পার্লামেন্টের তরফ থেকে তাঁকে আজীবন পেনশন মঞ্জুর করা হয়।

১৮৬৪ সাল থেকে দীর্ঘ ২৭ বছর ইবসেন ইতালি ও জার্মানিতে প্রবাসজীবন যাপন করেন। এই সময়েই তিনি তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলোর অধিকাংশ রচনা করেছিলেন।

তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে 'কাটিলিনা' (১৮৫০), 'পুতুলের সংসার' (১৮৭৯), 'অশরীরী' (১৮৮১), 'গণশত্রু' (১৮৮২), 'বুনো হাঁস' (১৮৮৪), 'হেড্ডা গ্যাবলার' (১৮৯০), এবং 'মহানায়ক' (১৮৯২)।

হেনরিক ইবসেন মৃত্যুবরণ করেন ১৯০৬ সালে।

আ. হ.

ইবাদত

'ইবাদত' শব্দের অর্থ আনুগত্য। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ মহান স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য প্রকাশার্থে নামায (দ্র), রোজা (দ্র), হজ্ব (দ্র), যাকাত (দ্র)-সহ অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করা, সৎ উদ্দেশ্যে নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করা।

ইসলামী বিধান মোতাবেক ইবাদতের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। শুধু কতিপয় আনুষ্ঠানিকতা পালনই ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না। স্রষ্টার প্রতি নিরঙ্কুশ বিশ্বাসই ইবাদতের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন যেমন ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি বিশ্বমানব তথা প্রতিটি সৃষ্টজীবের কল্যাণার্থে অবদান রাখাও ইবাদত। সৎ কাজে আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধ, এমনকি সৎ উদ্দেশ্যে যে কোনো হিতকর কাজ করাই ইবাদতের অংশ।

মু. মা.

ইব্রাহিম, ডা. মোহাম্মদ [১৯১১—১৯৮৯]

চিকিৎসাবিজ্ঞানী, শিক্ষক ও সংগঠক। তাঁর জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার খাঁড়েরাগ্রামে ১৯১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৩৮ সালে এম.বি. ডিগ্রিলাভ করে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান (১৯৪৫-৪৭) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

দেশবিভাগের পর চট্টগ্রামে (দ্র) সিভিল সার্জন ও জেনারেল হাসপাতালের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট পদে বহাল হন। উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১৯৪৮ সালে যুক্তরাজ্যে গমন করেন। লণ্ডনের (দ্র) রয়েল কলেজ অব ফিজিশিয়ানস থেকে এম.আর.সি.পি ডিগ্রি নিয়ে ১৯৫০ সালে দেশে ফিরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এডিশনাল ফিজিশিয়ান পদে যোগ দেন, এবং পরে ঐ কলেজেই প্রফেসর অব মেডিসিন পদে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত বহাল থাকেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিনের প্রফেসর ও অধ্যক্ষ পদে কাজ করেন। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত করাচির জিন্নাহ্ পোস্টগ্রাজুয়েট মেডিক্যাল সেন্টারের মেডিসিনের প্রফেসর ও পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শ্রম ও জনশক্তি এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন।

অনেক শ্রম ও সাধনার ফসল অত্যাধুনিক বার্ডেম হাসপাতাল। নিচের ছবি : ডা. ইব্রাহিম বার্ডেম হাসপাতাল ঘুরে দেখাচ্ছেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী ড. আবদুস সালামকে

ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিমের কর্মময় জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান দুরারোগ্য ডায়াবেটিস (দ্র) রোগের চিকিৎসার জন্য ডায়াবেটিস সমিতি স্থাপন। ১৯৫৬ সালের ২৮শে এপ্রিল তিনিই প্রথম এ দেশে 'পাকিস্তান ডায়বেটিস

সমিতি' নামের প্রতিষ্ঠানটি গঠন করেন। এর প্রথম সভাপতি মেজর ডা. দবিরুদ্দিন আহমদ। ১৯৫৭ সালে এই সমিতির উদ্যোগে সেগুনবাগিচায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট এমার্জেন্সি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই ছোট্ট হাসপাতাল ডা. ইব্রাহিমের নিরলস শ্রম ও সাধনার ফলে ১৯৮০ সালে শাহবাগে ২০ লক্ষ ৩০ হাজার বর্গফুট স্থান জুড়ে বিশাল ডায়াবেটিস হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। এর অন্য নাম বার্ডেম (BIRDEM = Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation in Diabetes Endocrine and Metabolic Disorders)। সর্বাধুনিক ব্যবস্থা সমন্বিত এই হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ২২৫। এখানে ডায়াবেটিস ছাড়া অন্যান্য রোগের চিকিৎসাও করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বার্ডেমের ২২টি শাখা রয়েছে। চিকিৎসার পাশাপাশি এখানে গবেষণার কাজও চলে।

পেশাগত জীবনে সফল চিকিৎসক ডা. ইব্রাহিম নানা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন— যেমন ব্রিটেনের রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স থেকে সম্মানসূচক এফ.আর.সি.পি, আমেরিকান কলেজ অব চেস্ট ফিজিসিয়ান্স থেকে অনুরূপ এফ.সি.সি.পি, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স থেকে অনুরূপ এফ.সি.পি.এস. ডিগ্রি। এ ছাড়া তিনি একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়েছেন স্বর্ণপদক, নির্বাচিত হয়েছেন বাংলা একাডেমীর ফেলো, জর্দানের ইসলামিক একাডেমী অব সায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা ফেলো। পাকিস্তান সরকার তাঁকে দিয়েছিলেন সিতারা-ই-খিদমত উপাধি। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে দিয়েছিলেন জাতীয় অধ্যাপক পদের মর্যাদা। তাঁর মৃত্যু ১৯৮৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর, ঢাকায় নিজ বাসভবনে।

আ. র.

ইব্রাহিম লোদী [শা.১৫১৭—১৫২৬]

ভারতীয় উপমহাদেশে লোদীবংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদী ১৫১৭ সালে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হলেও শীর্ষস্থানীয় রাজকর্মচারীদের অনেকেই তাঁর কঠোর আচরণের জন্য তাঁর প্রতি বিরাগভাজন হয়ে ওঠেন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী ইব্রাহিম লোদীর অপমানজনক আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে কাবুলের আমীর বাবরকে ভারত আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খান দিল্লির সিংহাসনে বসার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তিনিও বাবরকে দিল্লি আক্রমণ করার জন্য অনুরোধ জানান।

১৫২৬ সালে বাবর ভারত আক্রমণ করেন। পানিপথ নামক স্থানে উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী পরাজিত ও নিহত হন। এই যুদ্ধ ইতিহাসে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (দ্র) নামে অভিহিত। এই যুদ্ধ বাবরকে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের সুযোগ এনে দেয়।

খু. জা.

ইব্রাহীম খাঁ (প্রিন্সিপাল) [১৮৯৪ — ১৯৭৮]

সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। তিনি 'প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর লেখাপত্রে নামের বানান ইব্রাহীম/ইব্‌রাহীম উভয়ই পাওয়া যায়। জন্ম টাঙ্গাইল জেলার ভুয়াপুর উপজেলার শাহবাজনগর গ্রামে, ১৮৯৪ সালে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) থেকে ইংরেজি সাহিত্যে বি. এ. (অনার্স), এম. এ. এবং বি. এল. পাশ করেন। শিক্ষাজীবন শেষে ময়মনসিংহ শহরে আইন ব্যবসায় নিযুক্ত হন।

ইব্রাহীম খাঁ টাঙ্গাইল জেলার করটিয়া সা'দত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। পাকিস্তান গণপরিষদেরও সদস্য ছিলেন তিনি। কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সঙ্গেও ছিলেন সক্রিয়ভাবে জড়িত। ছিলেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের এককালীন চেয়ারম্যান। পাকিস্তান আমলে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশও সফর করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম—উপন্যাস : 'বৌ বেগম' (১৯৫৮); নাটক : 'কাফেলা', 'ভিস্তি ও বাদশা'; 'ছোটগল্প: 'লক্ষ্মীছাড়া', 'উস্তাদ', 'মানুষ'; রসরচনা : 'আলু বোখারা'; স্মৃতিকথা : 'বাতায়ন'; শিশুসাহিত্য : 'ব্যাঘ্রমামা',

'শিয়ালপণ্ডিত'; ভ্রমণকাহিনী : 'ইস্তাম্বুলযাত্রীর পত্র'; অনুবাদ : 'সূর্য্যিমামার রথে' ও 'মহামনীষী আলবার্ট আইনস্টাইন' ইত্যাদি।

১৯৬৩ সালে তিনি নাটকে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (দ্র) লাভ করেন।

ইব্রাহীম খাঁ ১৯৭৮ সালের ২৯শে মার্চ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

ইভ্ হাওয়া, বিবি দ্র

ইভ্‌গিয়েনি অনিয়েগিন্ ইউজিন্ ওনেগিন্ দ্র

ইমরান খান নিয়াজী [১৯৫২-   ]

পাকিস্তানের (দ্র) ক্রিকেট (দ্র) তারকা। তাঁর জন্ম ২৫শে নভেম্বর ১৯৫২, লাহোরে (পাকিস্তান)। ডান হাতী ফার্স্ট বোলার ও ডান হাতী মিডল-অর্ডার আক্রমণাত্মক ব্যাট্‌স্‌ম্যান। ১৯৯২ সালে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম স্থপতি।

তিনি প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলেন ১৯৭১ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। ৮৮টি টেস্টে অংশ নিয়ে ৬টি সেঞ্চুরিসহ ৩৮০৭ রান করেন। সর্বোচ্চ রান ১৩৬। বল করেছেন ৩২৪৩ ওভার; ৮২৫৮ রান দিয়ে ৩৬২ উইকেট নেন। সেরা বোলিং—৫৮ রানে ৮ উইকেট; এক ইনিংসে ৫ উইকেট লাভের রেকর্ড ২৩ বার; এক ম্যাচে ১০ উইকেট নিয়েছেন ৬ বার। ক্যাচ ধরেছেন ২৮ বার।

তিনি এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন ১৭৫টি। ১টি সেঞ্চুরিসহ মোট ৩৭০৯ রান করেন। সর্বোচ্চ রান—অপরাজিত ১০২; হাফসেঞ্চুরি করেছেন ১৯ বার। ক্যাচ ধরেছেন ৩৭টি। বোলিং-এ ১৮৩ উইকেট নিয়েছেন। সেরা বোলিং ১৪ রানে ৬ উইকেট। এক ম্যাচে ৪ উইকেট পান ৪ বার। অধিনায়কত্ব করেছেন ১৩৯টি ম্যাচে। এর মধ্যে জয়ী হন ৭৭টিতে, হেরেছেন ৫৮ ম্যাচে; টাই হয়েছে ১টি ম্যাচে এবং কোনো ফল হয় নি ৫ টিতে। ১৯৭৫, ১৯৭৯, ১৯৮৩, ১৯৮৭ ও ১৯৯২-এর বিশ্বকাপে অংশ নেন এবং গত ৩টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান দলের নেতৃত্ব দেন।

টেস্ট ক্রিকেটে ডাব্‌ল্‌স্ (১০০০ রান করা ও ১০০ উইকেট লাভ) অর্জনের কৃতিত্ব দেখান ৩ বার। এর মধ্যে ১০০০ রান ও ১০০ উইকেট লাভ করেন ৩০ টেস্টে; ২০০০ রান ও ২০০ উইকেট পান ৫০ টেস্টে এবং ৩০০০ রান ও ৩০০ উইকেট পান ৭৫ টেস্টে।

ইমরান খান তাঁর ক্রিকেটজীবনের ইতিবৃত্ত লিখেছেন।

অ. ব.

ইমাম

ইমাম একটি আরবি শব্দ। এর বিভিন্ন অর্থ আছে। তবে ইসলাম ধর্মে (দ্র) শব্দটি প্রধান তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন—১. যে ব্যক্তি নামায (দ্র) পরিচালনা করেন, তিনি ইমাম। এক্ষেত্রে তাঁর ওপর আরোপিত শর্ত হচ্ছে, তাঁকে ইসলামের বিধি-নিষেধগুলোর পরিপূর্ণ অনুসারী হতে হবে, পাশাপাশি এ সম্পর্কে তাঁকে সু-অবহিতও হতে হবে। ২. যে ব্যক্তির হাদিস (দ্র) ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে উত্তম দখল আছে এবং যিনি কুরআন (দ্র) ও সুন্নাহ্‌র ওপর গবেষণাকাজে নিয়োজিত, তাঁকেও বলা হয় ইমাম। যেমন, ইমাম আবু হানিফা (দ্র), ইমাম শাফি (দ্র), ইমাম গাজ্জালি (দ্র) এবং ইমাম বুখারি (দ্র)। ৩. শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের অভিমত বা দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্মের বহু রহস্য সাধারণ মানুষের জ্ঞান (দ্র) বা বোধবুদ্ধির সীমার বাইরে। এ জাতীয় রহস্য উন্মোচনের জ্ঞান মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর কাছ থেকে লাভ করেছেন একমাত্র হযরত আলী (রা.) (দ্র)। পরে সেই প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন বংশানুক্রমিকভাবে তাঁর পরবর্তী বংশধরেরা। একমাত্র তাঁরাই নিষ্পাপ, এবং পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। কিন্তু সুন্নি সম্প্রদায় মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) ব্যতীত অন্য কাউকেই পাপশূন্য বলে বিশ্বাস করেন না এবং তাঁরা ইমামতির এরকম ধারণাও পোষণ করেন না।

ইসলামের সঠিক বিধান মতে, ইমামতি কোনো রকম বৃত্তি বা পেশার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সব ক্ষেত্রে এটা যোগ্যতার মাপকাঠিও নয়। তিনি যতক্ষণ নামায পরিচালনা করেন, কেবল ততক্ষণই ইমাম থাকেন।

আ. হু.

ইমামবারা/ইমামবাড়ি

ইমামদের (দ্র) জন্য বিশেষভাবে রক্ষিত স্থানের পাশাপাশি ভারত উপমহাদেশের (বাংলাদেশ (দ্র), ভারত (দ্র) ও পাকিস্তান (দ্র)) বিভিন্ন এলাকা বা অঞ্চলবিশেষে যেসব দালানে মুসলমানদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব মুহর্‌রম (দ্র) উদ্‌যাপিত হয় এবং সেই উৎসবের প্রধানতম অঙ্গ তাজিয়াগুলি মিছিলে বহন করার আগে বা পরে যে জায়গায় রাখা হয়, তাকেই ইমামবারা বা ইমামবাড়ি বলে। সময় সময় ইমামবারাগুলি এর প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সমাধিক্ষেত্র হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। লখ্‌নৌ এবং মুর্শিদাবাদের ইমামবারাগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ঢাকায় (দ্র) মুহর্‌রম উৎসব পালনের প্রধান কেন্দ্র শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামবারা হোসেনি দালান। এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শাহ সুজার আমলে জনৈক মির মুরাদ ১৬৪২ সালে। তখন থেকে চলতি শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকলেও এখন তার সেই আগের জাঁকজমক বা জৌলুস আর নেই।

এ ছাড়াও ঢাকার সবচেয়ে পুরানো ইমামবারা বা হোসেনি দালান ছিল ফরাশগঞ্জে বিবিকা রওজা মহল্লায় (১৬০০)। ঢাকেশ্বরী মন্দির, ফুলবাড়িয়া, ছোট কাটারা ও মির মুকিম কাটারাতেও (মৌলবিবাজার) যে ইমামবারা বা হোসেনি দালান ছিল, তার সমর্থন পাওয়া গেছে।

বর্তমান হোসেনি দালান উনিশ শতক থেকেই শিয়া সম্প্রদায়ের উৎসব পালনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকার ঢাকার নায়েব নাজিমদের বছরে আড়াই হাজার টাকা দিতেন এই উৎসব পালনের জন্য। শিয়া সম্প্রদায়ের অনেককে এখানে কবরও দেওয়া হয়েছে।

উনিশ শতকের মতো এখনো হোসেনি দালান ঢাকায় মুহর্‌রম উৎসব পালনের প্রধানতম কেন্দ্র।

আ. হু.

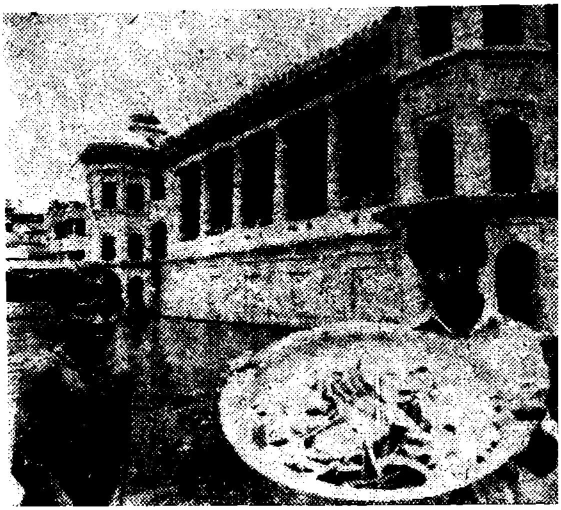

হোসেনি দালান

ইমামুদ্দীন, মওলানা মুহম্মদ [আনু. ১১৯১—১২৫০ ব.]

বাংলাদেশের (দ্র) বিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত, ধর্মপ্রচারক ও ব্রিটিশবিরোধী যোদ্ধা। আনুমানিক ১১৯১ বাংলা সনে নোয়াখালি জেলার হাজিপুর গ্রামে তাঁর জন্ম।

শৈশবে তাঁর পিতা মারা যান। ১৮ বছর বয়সে ইসলামী শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লি (দ্র) যান এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কুরআন (দ্র), হাদিস (দ্র) ও অন্যান্য শরীয়তি শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেন। এরপর তিনি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন।

তিনি ছিলেন পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সৈনিক সৈয়দ আহমদ শহীদের প্রিয় ও বিশ্বস্ত শিষ্য। ইংরেজ ও শিখদের বিরুদ্ধে সৈয়দ আহমদ-পরিচালিত যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৩১ সালে বিখ্যাত বালাকোটের যুদ্ধে শিখবিরোধী সংগ্রামে সৈয়দ আহমদ শহীদ হন। এ সময় ইমামুদ্দীনও গুরুতর আহত হন।

পরে তিনি স্বগ্রামে ফিরে আসেন এবং ইসলাম (দ্র) প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বহু শিষ্য ছিল বলে জানা যায়।

বাংলা ১২৫০ সনে তাঁর মৃত্যু হয়।

মু. মা.

'ইম্প্রেশনিজ্‌ম্' (Impressionism) শব্দ থেকে 'ইম্প্রেশনিস্ট' (impressionist) কথাটি এসেছে।

চিত্রকলার ইতিহাসে 'ইম্প্রেশনিজ্‌ম্' একটি আন্দোলন। গতানুগতিক ধারার পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি নতুন নিয়মে শিল্পসৃষ্টির চিন্তা ও চেতনায় এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ইম্প্রেশনিজ্‌ম্। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের এক দল শিল্পী মনে করলেন পৃথিবীর যাবতীয় দৃশ্যাবলি ও বিষয়বস্তু যেভাবে তাঁদের চোখে ধরা পড়ে সেভাবেই তাঁরা আঁকবেন। আলোর প্রতিফলনে (দ্র) বা সূর্যের (দ্র) অবস্থানের কারণে প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশ পায়। সেই রূপকে অর্থাৎ আলোর প্রতিফলনকে সঠিকভাবে চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা। বিশেষ একটা সময়ের প্রকৃতি শিল্পীর চোখে যে রূপে ধরা পড়েছে বা তিনি যেভাবে তা অনুভব করেছেন, তাকেই তিনি রূপদান করতে চেষ্টা করেছেন। ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা সূর্যের আলোর উজ্জ্বলতাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

এই নতুন ধারার প্রধান শিল্পীর নাম ক্লোদ্ মনে (Claude Monet) । মনে জন্মান ১৮৪০ সালে এবং মারা যান ১৯২৬ সালে। তাঁর একটি চিত্রের নামকরণ থেকেই 'ইম্প্রেশনিজ্‌ম্' নামের উৎপত্তি।

ছোট ছোট রঙের বিন্দু, ছোট ছোট তুলির আঁচড়ে তাঁরা ক্যানভাসে রঙ ভরাতেন। কখনো-বা চাপ চাপ রঙ ও মৌলিক রঙ পাশাপাশি সাজিয়ে রঙের ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়ে আলোর প্রকাশ ঘটাতেন।

ক্লোদ্ মনেকে সমালোচকেরা বলতেন "মুক্ত হাওয়ার শিল্পী"। অর্থাৎ ক্লোদ্ মনে ঘরের বাইরে খোলা মাঠে গিয়ে বাস্তব ও প্রাকৃতিক দৃশ্যে আলোর খেলা আঁকতে পছন্দ করতেন এবং একই দৃশ্যের ছবি তিনি সারা দিন ধরে একাধিক ক্যানভাসে আঁকতেন। যেমন—মনে একবার এক খড়ের গাদার পনেরোটা ছবি আঁকেন। প্রত্যেকটাতেই রঙ আর আলোর (দ্র) খেলা আলাদা। এই ভাবে তিনি প্রতি দিন সকালে এক গাড়ি সাদা ক্যানভাস নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। সারা দিন ধরে একই দৃশ্য আঁকতেন। দেখা গেল, প্রত্যেকটি পেইণ্টিংয়ে আলো বদলে যাচ্ছে। সুতরাং আলো-ছায়ার খেলার সঙ্গে সঙ্গে বস্তু বা বিষয়ের আকার ও রঙও বদলে যাচ্ছে।

ইম্প্রেশনিস্ট ছবিতে বিষয় বা বস্তুর আকারের বা গড়নের বাহাদুরি এবং পারিপাট্য তেমন গুরুত্ব পায় নি। কারণ, তাঁরা বেশি জোর দিতেন রঙ ও আলোর উপর, ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে ছবির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আলো। মনের সঙ্গে আরেক জন শিল্পী ইম্প্রেশনিস্ট হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর নাম এদুয়ার্ মানে (Éduard Manet)। মানে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩২ সালে, মারা যান ১৮৮৩ সালে। ক্লোদ্ মনের মতো এদুয়ার্ মানেও উজ্জ্বল রঙের বিন্দু দিয়ে ছবি আঁকতেন। ক্লোদ্ মনের আঁকা 'পদ্মসরোবর', 'স্যেন নদীর তীরে' এবং এদুয়ার্ মানের ছবি 'গার সাঁ লাজার', 'অলিম্পিয়া', 'ল বার ও ফোলিও-বের্জের' এই ধারার বিখ্যাত ছবি।

আরেকজন ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী হচ্ছেন এদ্‌গা দেগা (Edgar Degas)। দেগার প্রিয় মাধ্যম ছিল প্যাস্টেল রং। দেগার প্রত্যেকটি ছবিই সুন্দর। তবে 'নর্তকীদের মহড়া' নামক প্যাস্টেলে আঁকা ছবিটি বেশি খ্যাতি পেয়েছে।

দেগার জন্ম ১৮৩৪ সালে, মৃত্যু ১৯১৭ সালে। দেগার ছবিতে জাপানি প্রভাব খুব স্পষ্ট। তাঁর অধিকাংশ ছবির বিষয় দৈনন্দিন কাজে রত সাধারণ মানুষ, হঠাৎ-দেখা বিভিন্ন ঘটনা বা দৃশ্য। কিন্তু তিনি সুন্দরী মেয়ের ছবি আঁকতেন না। কারণ দর্শকেরা এ সব ছবির গুণাগুণ বাদ দিয়ে শুধু সুন্দরী মেয়েই দেখতে আরম্ভ করে!

দেগার ছবিতে এত কর্মচাঞ্চল্য, এত লোক, এত ভিড় এবং এত গতি! দেখে মনে হয় যেন তিনি খুব তাড়াহুড়ো করে ছবি আঁকতেন। কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। দেগা খুব ধীরে ধীরে এসব ছবি আঁকতেন। নকশাবিদ্ হিসাবেও তাঁর খুব খ্যাতি ছিল।

ইম্প্রেশনিজ্‌মের আরেক দিক্‌পাল হচ্ছেন পিয়ের ওগুস্ত্ রেনোয়া (দ্র)। এই শিল্পী শত শত রঙের বিন্দু দিয়ে জাল বোনার মতো করে ছবি আঁকতেন। তখন লোকে বলত, প্রাণের প্রাচুর্য আর ঐশ্বর্য, জীবনের প্রতি, রক্ত মাংস ও মাটির প্রতি টান রেনোয়ার ছবিতে যেন উপচে পড়ছে। বিশেষ করে রমণীদের ত্বক ও গাত্রবর্ণ আঁকতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। রেনোয়ার একটি ছবির কথা উল্লেখযোগ্য। তা

স্যুরা : কুরবে ভোয়ার নিকট সেইন

রেনোয়া : ঝাঁঝরি হাতে বালিকা

সেজান : স্থির জীবন

কামিই পিসারো : রাতে বুলভার মোমার্ত

হল 'ঝাঁঝরি হাতে বালিকা।'

আল্‌ফ্রে সিসলে (Alfred Sisley : ১৮৩০–১৮৯৯), কমিঈ পিসারো (Camille Pissarro : ১৮৩০–১৯০৩), অঁরি দ্য তুলুজ্ লোত্রেক্ (Henri de Toulouse-Lautrec: ১৮৬৪–১৯০১) এঁরাও ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

ইম্প্রেশনিজ্‌মের পরে একটি যুগ আসে। চিত্রকলায় এ যুগের নাম পোস্ট-ইম্প্রেশনিজ্‌ম্। এ যুগের শুরু পল্ সেজান্‌কে (দ্র.) দিয়ে। এ যুগের বেশির ভাগ শিল্পীই ছিলেন ফরাসি। সময়টি ছিল উনিশ শতক। মনে-মানে-দেগা-রেনোয়ার বন্ধু পল্ সেজান। ১৮৭৪ সালে যখন প্রথম ইম্প্রেশনিস্টদের প্রদর্শনী হয়, তখন সবচেয়ে বেশি গালাগাল ও বিদ্রূপ জোটে পল্ সেজানের কপালে। অথচ পরে এই সেজান্‌ই তাঁর চিত্রকলার জন্য বিশ্বের খ্যাতিমান সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের এক জন বলে গণ্য হলেন।

মনে, মানে প্রমুখ শিল্পীদের মতো সেজান্ বাস্তব বিষয় বা প্রকৃতি থেকে সরাসরি দেখে না এঁকে স্মৃতির উপর ভর করে আঁকতেন, তাঁর বোধ ও চেতনাকে রূপ দিতেন।

১৮৭৪ সালের পর থেকে সেজান্ ইম্প্রেশনিজ্‌ম্ রীতিতে ছবি আঁকা ছেড়ে দেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতে লাগলেন, শুধু আলো নয়, ছবিতে আরো শাশ্বত, আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু আঁকতে হবে। ছবির বিষয়বস্তুতে আরো গভীরতা, ভার, অস্থিমজ্জা ও কঙ্কালের কথা ভাবা দরকার।

সেজানের যে-কোনো স্টিল লাইফ (still life) দেখলে মনে হবে, আপেলগুলো যেন রসে টসটসে। মাটি ও প্রকৃতির গুণাবলি তার মধ্যে পরিপূর্ণতা পেয়েছে। আর সেজানের ল্যাণ্ডস্কেপ বা ভূদৃশ্যাবলি দেখলে মনে হবে, আমরা তাঁর ছবির মধ্যে ঢুকে মাঠে-ঘাটে-পাহাড়ে বেড়িয়ে আসতে পারি। যেন পায়ের তলায় শক্ত মাটি অনুভব করা যায়। সেজানের ছবিতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা থাকার পরবর্তী যুগে কিউবিজমের (cubism) জন্ম হয়েছে। তাই সেজান্‌কেই কিউবিজ্‌মের জনক বলা হয়, যদিও পরবর্তী কালে জর্জ ব্রাক্ (Georges Braque : ১৮৮২–১৯৬৩), পিকাসো (দ্র) তাকে চূড়ান্ত রূপ দেন।

ভান্ গখ্‌কেও (দ্র) পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী হিসাবে ধরা হয়।

ইম্প্রেশনিস্টেরা আঁকতেন রঙের বিন্দু দিয়ে আর ভান্ গখ্ আঁকলেন তাল তাল রঙের ছোপে, জোরালো তুলির দ্রুত আঁচড়ে, ক্যানভাসের ভূমিকে ঘন রঙের প্রলেপে মোটা পুরু তল তৈরি করে। ভান্ গখের সমস্ত ছবিই যেন সূর্যের আলোয় ভরা। তাঁর আঁকার গুণে ছবিতে রোদের তাপ, ছায়ার ঠাণ্ডা আর বাতাস অনুভব করা যেত।

ভান্ গখের কয়েকটি বিখ্যাত ছবির নাম 'সূর্যমুখী ফুল', 'গম ক্ষেতে কাক', 'আলের প্রতিকৃতি', 'কারাগার-প্রাঙ্গণে কয়েদিদের ড্রিল', 'আলুভোজী', 'পোস্টম্যান', 'আত্মপ্রতিকৃতি' ইত্যাদি।

আরেক জন পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী পল গোগ্যাঁ (দ্র.)। ভান্ গখের বন্ধু ছিলেন গোগ্যাঁ। তাহিতি দ্বীপের দৈনন্দিন জীবন ও প্রাকৃতিক দৃশ্য, সেখানকার জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, উৎসব—এসব বিষয় নিয়ে অসংখ্য ছবি এঁকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন গোগ্যাঁ।

পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের মধ্যে জর্জ্ স্যুরা-র (Georges Seurat : ১৮৫৯—১৮৯১) অবদান অনেক। রঙ সম্পর্কে তাঁর প্রজ্ঞা, কম্পোজিশনের উপর দক্ষতা এবং স্থানভাগ বিষয়ের জ্ঞানে সমসাময়িকদের মধ্যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। রঙের উজ্জ্বলতা বজায় রাখার জন্য বিন্দু বিন্দু করে স্বতন্ত্র রঙের জাল বুনে তিনি চিত্ররচনা করতেন।

বিন্দু বিন্দু রঙের আল্পনীয় চিত্রাঙ্কনের জন্য পোয়ঁ্যাতিইস্ত (pointillist) হিসাবে তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল। স্যুরার বিখ্যাত একটি ছবির নাম 'লা গ্রঁদ্ জাৎ দ্বীপে রবিবারের সন্ধ্যা'।

সে. এ.

ইয়ং বেঙ্গল (Young Bengal)

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের (দ্র) বার্তাবাহী পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকে আলোকিত যুবসমাজ। এই দলের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু কলেজের (দ্র) ছাত্র এবং অধ্যাপক ডিরোজিওর (দ্র) শিষ্য। হিন্দু সমাজের প্রচলিত ধর্মীয় সংস্কার ও নিয়মাদি অমান্য ও অগ্রাহ্য করে সংস্কারমুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়াই ছিল এঁদের মূল লক্ষ্য। তবে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার ইত্যাদিকে আঘাত করার জন্য এঁরা এমন সব কাণ্ড করতেন (যেমন হিন্দুধর্মে নিষিদ্ধ গোমাংস ভক্ষণ, মদ্যপান ইত্যাদি) যার ফলে এঁরা প্রাচীনপন্থীদের বিরাগ ও আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন। ব্যঙ্গার্থে এঁরা 'নববাবু' নামে পরিচিতিলাভ করেন। ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যে ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (দ্র), দীনবন্ধু মিত্র (দ্র), রাধানাথ শিকদার, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিখ্যাত বাঙালি। ইয়ং বেঙ্গলদের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' প্রহসন দু'টি বাংলা সাহিত্যের (দ্র) স্মরণীয় রচনা।

মে. খা.

ইয়াটিং (yachting)

ইয়াট শব্দটি ওলন্দাজ শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ আমোদতরী। ইয়াট এমনি এক আমোদতরী, যা পাল খাটিয়ে বাতাসের (দ্র) সাহায্যে অথবা যান্ত্রিক ইঞ্জিনের সাহায্যে চালিত হতে পারে। যখন থেকে মানুষ বাতাসের শক্তি ও গতিবিধি সম্বন্ধে বুঝতে শিখেছে, তখন থেকেই

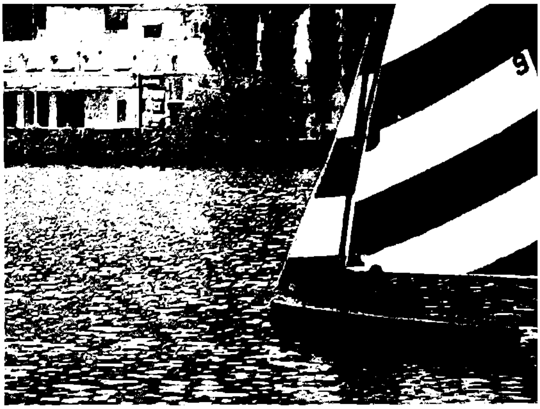

পালখাটানো আমোদতরী বা ইয়াটিং-এর ব্যবহারের সূচনা হয়েছে। ইয়াটিংয়ের সূচনালগ্ন থেকেই এর সঙ্গে রাজকীয় ও অভিজাত সংযোগ লক্ষ করা যায়। তাই একে রাজকীয় খেলা নামেও অভিহিত করা হয়। উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই ইয়াটিং অভিজাত শ্রেণীর ধন ও ঐশ্বর্যের মহিমার ধারক হিসাবে প্রকাশ পেতে থাকে।

১৯০৪ সালে ইয়াটিংয়ের আন্তর্জাতিক আইন-কানুন তৈরি হয় এবং ১৯০৭ সালে আন্তর্জাতিক ইয়াটিং ফেডারেশন গঠিত হয়। ১৯৬৪ সালে ইয়াটিংয়ের প্রতিযোগিতার নিয়মাবলির আধুনিকায়ন করা হয়। ১৯০০ সালে প্যারিস অলিম্পিকে এটি প্রথম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭০ সালে এশিয়ান গেম্সে (দ্র) সংযোজিত হয়। প্রতিযোগিতামূলক ইয়াটিংয়ের জন্য হাল্কা ধরনের পাল-তোলা একই ডিজাইন, আকার-প্রকার ও ওজনের ইয়াট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইয়াটিংয়ে ছয়টি ক্লাস থাকে, যথা— সেইলিং ক্লাস, স্টার ক্লাস, ফ্লাইং ডাচম্যান, ৪৭০ ক্লাস, ফিন ক্লাস ও টর্নেডো ক্লাস। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী দেশ প্রতিযোগিতার ক্লাসগুলিতে একটি করে ইয়াট পাঠাতে পারে।

কা. আ. আ.

ইয়াল্টা সম্মেলন (Yalta Conference)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) শেষ দিকে ১৯৪৫ সালের ৪-১১ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রিমিয়ার সাগরতীরবর্তী স্বাস্থ্যনিবাস ইয়াল্টায় অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপক্ষের তিন প্রধান শীর্ষ সম্মেলন। রাশিয়ার (দ্র) ইওসেফ স্তালিন

(দ্র), ব্রিটেনের উইনস্টন চার্চিল (দ্র) এবং আমেরিকার ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট (দ্র) এই সম্মেলনে জার্মানির আশু আত্মসমর্পণ ও যুদ্ধপরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করেন। ইয়াল্টা সম্মেলনের অনেক সিদ্ধান্তেরই ছিল সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য।

সম্মেলনে জার্মানির শর্তহীন আত্মসমর্পণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে আলাদাভাবে আত্মসমর্পণের জন্য নাৎসি (দ্র) পরিকল্পনা এতে নস্যাৎ হয়ে যায়। স্থির হয় যে জার্মান ফ্যাসিবাদ (দ্র) ও যুদ্ধশক্তি সমূলে উৎপাটন করতে হবে। অধিকৃত নাৎসি জার্মানিকে ভাগ করা হবে চারটি এলাকায়—সোভিয়েত, ব্রিটিশ, ফরাসি ও আমেরিকান অধিকৃত এলাকা। তেমনিভাবে বৃহত্তর বার্লিনকেও চারটি অঞ্চলে ভাগ করে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক কাউন্সিলের অধীনে রাখা হবে এবং মিত্রশক্তির হাই কম্যাণ্ডের সদর দপ্তর হবে বার্লিন।

ইয়াল্টা সম্মেলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল 'মুক্ত ইউরোপ সংক্রান্ত ঘোষণা'। এতে সদ্যমুক্ত দেশসমূহে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও তাদের আর্থিক সহায়তা দানের কথা বলা হয়। মুক্ত পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল, পোল্যাণ্ডের সরকার এবং সীমানা কী হবে এসব নিয়ে ছিল মতপার্থক্য। কেননা লণ্ডনে (দ্র) স্থাপিত প্রবাসী পোলিশ সরকারের প্রতি রাশিয়ার ছিল প্রবল অনাস্থা, অপর দিকে পোল্যাণ্ডের এক বিরাট অঞ্চল যুদ্ধের সূচনাতেই দখল করে নিয়েছিল রাশিয়া। শেষ পর্যন্ত স্থির হয়, অস্থায়ী পোলিশ সরকার, যা এখন ওয়ারশ-তে কাজ করছে তার ভিত্তি সম্প্রসারিত করা হবে এবং উত্তর ও পশ্চিম দিকে পোলিশ সীমানা বৃদ্ধির সুযোগ রাখা হবে।

ইয়াল্টা সম্মেলনের অত্যন্ত তাৎপর্যময় সিদ্ধান্ত ছিল জাতিসমূহের সংঘ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে। জাতিসংঘ (দ্র) সনদের একটি রূপরেখা ইয়াল্টায় স্বীকৃত হয়। তা ছাড়া নিরাপত্তা পরিষদের সাত সদস্যের ভোটদানের পদ্ধতি ও ক্ষমতা সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘ সংস্থার ভূমিকার ওপর সম্মেলনে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। মিত্রপক্ষের অপরাপর শক্তির অনুরোধে ইউরোপে যুদ্ধ অবসানের তিন মাসের মধ্যে জাপানের (দ্র) বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

ইয়াল্টা ছিল মিত্রশক্তির দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন। এর আগে ১৯৪৩ সালের শেষ দিকে তাঁরা মিলিত হয়েছিলেন তেহরানে। দুঃখের বিষয়, ইয়াল্টা সম্মেলনে মিত্রশক্তির মধ্যে যে সমঝোতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল যুদ্ধাবসানের পর তা স্থায়ী হয় নি।

ম. হ.

ইয়াশিন্, লিয়েফ্ [১৯২৯—]

ফুটবল (দ্র)-বিশ্বে লিয়েফ্ ইয়াশিন্‌কে বলা হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক।

রাশিয়ার (দ্র) এক গরিব পরিবারে ১৯২৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবের কষ্টকর জীবন তাঁকে পরবর্তী সময়ে নীতিবান, মহৎ, ধৈর্যশীল ও পরিশ্রমী হতে সাহায্য করেছে।

১৯৪৯ সালে তরুণ ইয়াশিন্ প্রথম খেলতে নামেন মস্কো (দ্র) দিনামো দলের হয়ে। কিন্তু খেলায় তিনি খুব একটা সুবিধা করতে পারেন নি। তাঁর মধ্যে আস্থার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই এক বছর যেতে না যেতেই ইয়াশিন্ দল থেকে বাদ পড়েন। এরপর আইস-হকি খেলতে শুরু করেন তিনি। কিন্তু তাঁর অন্তর জুড়ে ছিল ফুটবল। ধৈর্য সহকারে তিনি নীরবে সাধনা চালিয়ে যেতে থাকেন। দু' বছর পর আবার যোগ দিলেন পুরানো দল মস্কো দিনামো-তে। এবার ইয়াশিন্ নিজের যোগ্যতার প্রমাণ রাখলেন। তাঁকে নিয়ে সারা রাশিয়ায় হৈ চৈ পড়ে গেল।

গোলরক্ষক হলেও লিয়েফ্ ইয়াশিন্ পেনাল্টি সীমানায় দাঁড়িয়ে সারা মাঠ নিয়ন্ত্রণ করতেন।

রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ ফুটবলার হিসাবে লিয়েফ্ ইয়াশিন্ পাঁচ বার স্বর্ণপদক পান। তিনি ১৯৬৩ সালে ইউরোপের (দ্র) শ্রেষ্ঠ ফুটবলার নির্বাচিত হন। রাশিয়ার হয়ে ১৯৫৮, ১৯৬২

এবং ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে মোট তিন বার অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি বিশ্বকাপের শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষকের সম্মান অর্জন করেন। লিয়েফ্ ইয়াশিন্ প্রায় ৮০০টি প্রথম শ্রেণীর খেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং ৭৮টি আন্তর্জাতিক খেলায় অংশ নেন।

লিয়েফ্ ইয়াশিন্ ১৯৭১ সালে ফুটবল খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৮৪ সালে তিনি ফ্লেবাইটিস (phlebitis) রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর একটি পা কেটে বাদ দিতে হয়। বর্তমানে তিনি রাশিয়ার স্পোর্টস্ কমিটির এক জন কর্মকর্তা।

ফুটবলসম্রাট পেলে (দ্র) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'লিয়েফ্ ইয়াশিনের মতো উঁচু মানের গোলরক্ষক আমি আর দেখি নি। আমি যখন গোলে ভাল শট নিতাম, তখন তিনি রুশ প্রথায় বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানাতেন। এ থেকেই বোঝা যায় লিয়েফ্ ইয়াশিন্ কত বড় মাপের গোলরক্ষক ছিলেন।'

তাঁর প্রতি সম্মান প্রর্দশনের জন্য ফিফা (দ্র) ১৯৯৪ সাল থেকে বিশ্বকাপ ফুটবলে শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষককে 'লিয়েফ ইয়াশিন্ পুরস্কার' দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

টি. কি.

ইয়াহিয়া খান, আগা মোহাম্মদ [১৯১৭—১৯৮০]

পাকিস্তানের (দ্র) সামরিক শাসক ও এককালীন প্রেসিডেন্ট। জন্ম পেশোয়ারে, ১৯১৭ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি।

তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাশ করে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান পদে উন্নীত হন।

১৯৬৯ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান (দ্র) উভয় পাকিস্তানে উদ্ভূত রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে ২৪শে মার্চ (১৯৬৯) আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে পদত্যাগ করেন। ক্ষমতাপ্রাপ্তির এক দিন পর অর্থাৎ ২৫শে মার্চ (১৯৬৯) ইয়াহিয়া সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন, সংবিধান বাতিল করেন, বিলুপ্ত ঘোষণা করেন জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ এবং পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের ৫টি প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উভয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ (দ্র) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর (দ্র) পাকিস্তান পিপল্স্ পার্টি (পিপিপি) জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে ৮৮ আসন পেয়ে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যাদা লাভ করে।

কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক গোষ্ঠী ও জুলফিকার আলী ভুট্টো বাঙালিদের হাতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন-ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না। ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। ফলে সেদিন থেকেই তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন (দ্র) শুরু হয়ে যায়।

১৫ই মার্চ (১৯৭১) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ১৬ই থেকে ২৪শে মার্চ (১৯৭১) পর্যন্ত তিনি এবং ভুট্টো পর্যায়ক্রমে রাজনৈতিক অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠতে শেখ মুজিবুর রহমানের (দ্র) সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যান। কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে সশস্ত্র পাক বাহিনী ২৫শে মার্চের মাঝরাত থেকে ঢাকায় ব্যাপক বাঙালিহত্যার পরিকল্পনা কাজে পরিণত করে। ঐ দিন রাতে ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা ত্যাগ করেন।

এর প্রতিক্রিয়ায় ২৬শে মার্চ (১৯৭১) পূর্ব-পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং শুরু হয়ে যায় বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ (দ্র)। ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১) পাক হানাদার বাহিনীর পরাজয়ের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশ (দ্র) শত্রুমুক্ত হয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার হাতেই পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হয়।

তাঁর মৃত্যুদিবস ১৯৮০ সালের ১৪ আগস্ট।

আ. হু.

ইয়েট্‌স্‌, উইলিয়াম বাট্‌লার [১৮৬৫—১৯৩৯]

আইরিশ কাব্য (দ্র) ও নাট্য আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ। জন্ম আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিনে ১৮৬৫ সালের ১৩ই জুন।

চিত্রকর পিতার সন্তান ইয়েট্‌স্‌ (William Butler Yeats) জন্মের অব্যবহিত পরে পিতামাতার সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ড ছেড়ে চলে আসেন ইংল্যাণ্ডে। অবশ্য আজীবন দেশের মাটির সঙ্গে ছিল তাঁর নাড়ির যোগ।

উনিশ বছর বয়সে তাঁর জীবনের প্রথম কবিতা ছাপা হয় 'ডাবলিন ইউনিভার্সিটি রিভিউ' পত্রিকায়। ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয় কবিতা সঙ্কলন (দ্র) 'দ্য ওয়াণ্ডারিং অফ্‌ অয়সিন্‌'।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) সঙ্গে ছিল তাঁর বিশেষ সখ্য। ইয়েট্‌স্‌ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য : 'আধুনিকেরা কাব্যজগতের কবি, ইয়েট্‌স্‌ বিশ্বজগতের কবি।' তাঁদের উভয়ের সাক্ষাৎ-পরিচয়ও ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে। 'গীতাঞ্জলি'র (দ্র) ইংরেজি অনুবাদের (দ্র) অনুপম ভূমিকাও লিখেছিলেন ইয়েট্‌স্‌।

১৮৯৯ সালে তিনি 'আইরিশ লিটর‍্যারি থিয়েটার' গড়ে তোলেন ডাবলিনে। এই থিয়েটারকে কেন্দ্র করে সমগ্র আয়ারল্যাণ্ডে দেখা দেয় নতুন প্রাণচাঞ্চল্য। ইয়েট্‌স্‌-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব ও অনুপ্রেরণায় জন্ম হয় বেশ কয়েক জন বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার ও কবির। ইয়েট্‌স্‌-এর দীর্ঘ ৭৪ বছরের সাহিত্যজীবন একান্ত সাধনার ইতিহাসও বটে।

ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম ভালবাসা। 'অনসূয়া অ্যাণ্ড বিজয়া', 'দ্য ইণ্ডিয়ান আপন গড্‌', 'দ্য ইণ্ডিয়ান টু হিজ লাভ' এবং 'মোহিনী চ্যাটার্জি' শীর্ষক কবিতাবলি তাঁর এই ভালবাসারই চূড়ান্ত নিদর্শন। 'উপনিষদ'-এর অনুবাদ তার অন্যতম কীর্তি।

ইয়েট্‌স্‌-এর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম—কবিতা : 'দ্য ওয়াইল্ড সোয়ান্‌স্‌ অ্যাট্‌ কুল্‌' (১৯১৯), 'দ্য টাওয়ার' (১৯২৮). 'দ্য ওয়াইণ্ডিং স্টেয়ার' (১৯২৯), 'এ ফুল মুন ইন মার্চ' (১৯৩৫); গদ্য রচনা : 'দ্য কেল্টিক টোয়াইলাইট' (১৮৯৩). 'আইডিয়াস অব গুড অ্যাণ্ড ইভিল' (১৯০৩); নাট্যকর্ম 'দ্য কাউন্টেস ক্যাথলিন' (১৮৯২), 'দ্য ল্যাণ্ড অব হার্টস্‌ ডিজায়ার' (১৮৯৪) ইত্যাদি।

ইয়েট্‌স্‌ ১৯২৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার (দ্র) পান। ১৯৩৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

আ. হু.

ইয়েতি (yeti)

হিমালয় (দ্র) পর্বতমালার পাদদেশে বাসকারী উপজাতীয় অধিবাসীরা মনে করেন, রাতে শিকারের সন্ধানে অতিকায়

তুষারমানব পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। এই অতিকায় তুষারমানবের আরেক নাম ইয়েতি। তুষারমানবের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে— এরা খুব লম্বা, সারা শরীর কালো লোমে ভরা এবং দেখতে অনেকটা গরিলা (দ্র) কিংবা বানরের (দ্র) মতো। ১৯২১ সালে এক দল ইংরেজ পর্বতারোহী প্রথম বরফের ওপর অতিকায় পায়ের ছাপ দেখতে পায়। এ পায়ের ছাপের খবর সারা দুনিয়ায় প্রচারিত হলে তুষারমানবের অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়। কিন্তু এর পর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কেউ সত্যি সত্যি তুষারমানব বা ইয়েতির সন্ধান পায় নি।

সা. এ.

ইরানি সভ্যতা পারস্য সভ্যতা দ্র

ইরি

ইরি (IRRI) একটি প্রতিষ্ঠানের নাম। ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান)-এর নামের আদ্যক্ষর নিয়ে শব্দটি গঠিত হয়েছে। তবে এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত কিছু উন্নত জাতের ধানের নামে 'ইরি' শব্দটি রয়েছে। তাই আমাদের দেশে ইরি কথাটিকে সমস্ত উচ্চ ফলনশীল ধানের সাধারণ নাম হিসাবেও অনেক সময় ব্যবহার করা হয়। 'ইরি' প্রতিষ্ঠানটি ফিলিপাইনে অবস্থিত।

ষাটের দশকের শুরুতে এই প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনের যে অগ্রযাত্রা শুরু করেন, তা উন্নয়নশীল বিশ্বের সবুজ বিপ্লবে, বিশেষ করে আমাদের দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টায় জাদুর মতো কাজ করেছে। শুরুটা ছিল এরকম : ইন্দোনেশিয়ার এক ধান 'পেতা', বেশ তার জীবনীশক্তি, কিন্তু অতিরিক্ত লম্বা বলে নুয়ে পড়ে নষ্ট হবার আশঙ্কা বেশি। ডি জি উজেন চীনের একটি ধান। একেবারেই বেঁটেখাটো জাত। ইরির বিজ্ঞানীরা বহু বাছাইয়ের পর এই দুই জাতের ধানের ফুলের মধ্যে কৃত্রিম পরাগায়ণ ঘটিয়ে সৃষ্টি করলেন নতুন জাত। এর বংশপরম্পরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সফল যে জাত পাওয়া গেল তাও বেঁটে, কিন্তু সনাতন ধানের ফলনের তুলনায় তিন গুণ তার ফলন, ফলন–কালও কম। প্রতিষ্ঠানের নামে এবং পরীক্ষার পর্যায়ের সংখ্যা অনুসারে এর নাম দেওয়া হল ইরি-৮। সেই প্রথম সফল ধান ইরি-৮ আজও আমাদের দেশে জনপ্রিয়, আউশ বা বোরো মৌসুমে। সেই থেকে ইরি আরো বেশ কিছু সফল উচ্চ ফলনশীল ধান বিশ্বকে উপহার দিয়েছে। যেমন ইরি-২০, যা আমাদের দেশে ইরি শাইল নামেও পরিচিত। এটি রোপা আমনের একটি বহুল ব্যবহৃত জাত। ইরির গবেষণার সঙ্গে যোগ রেখেই কাজ করে যাচ্ছে আমাদের দেশের নিজস্ব ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট' (BRRI), যার উদ্ভাবিত ধানগুলোর সঙ্গে ব্রি–শব্দটি থাকে।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইরি সারা দুনিয়ার ধান্যসম্পদ নিয়ে বিভিন্নমুখী গবেষণা করে থাকে। উচ্চ ফলনশীলতা ছাড়াও ফলনকাল হ্রাস এবং খরা, বন্যা, লবণাক্ততা, রোগবালাই ইত্যাদি প্রতিকূলতা প্রতিরোধী ধান উদ্ভাবনও এর গবেষণার লক্ষ্য। দুনিয়ার দেশে দেশে এক সময়ে কৃষিতে ব্যবহৃত হত বা এখনো হয় এমন ধানের হাজার হাজার জাত রয়েছে। তার বাইরে বুনো ধান রয়েছে আরো বহু। এসব সংগ্রহ করে বহু যত্নে দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণের কাজও করে থাকে ইরি। তা না করলে সাম্প্রতিক কৃষির একমুখিনতা ও পরিবেশবিনষ্টির ফলে হাজার হাজার বছরে গড়ে ওঠা এই অমূল্য গুণ-বৈচিত্র্য আমরা চিরতরে হারিয়ে ফেলতাম।

মু. ই.

ইলতুৎমিস (শা. ১২১১—১২৩৬)

তাঁর পুরো নাম শামসউদ্দিন ইলতুৎমিস। শৈশবে পারিবারিক চক্রান্তে তাঁকে ক্রীতদাসের জীবন গ্রহণ করতে হয়েছিল। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের (দ্র) ক্রীতদাস থাকাকালে তাঁর কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে সুলতান নিজ কন্যার সঙ্গে ইলতুৎমিসের বিবাহ দেন। কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আরাম শাহ সুলতান হন। কিন্তু তিনি ছিলেন অযোগ্য এবং বিলাসী। দিল্লির আমীরগণের আমন্ত্রণে ইলতুৎমিস আরাম শাহকে পরাজিত ও নিহত করে দিল্লির (দ্র) সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইলতুৎমিস গজনির শাসক ইলদিম, মুলতানের শাসক কাবাচা, বাংলা ও বিহারের শাসক গিয়াসউদ্দিনকে পরাজিত করেন। এই সময়ে (১২২১) মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান (দ্র) চীন ও মধ্য-এশিয়া বিজয়ের পর সিন্ধুতীর পর্যন্ত এসে ফিরে যান।

ইলতুৎমিস নর্মদা পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী, ধর্মপরায়ণ ও সুশাসক ছিলেন। দিল্লিতে তিনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি কুতুব মিনারের (দ্র) নির্মাণকাজ সমাধা করেন। মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম আরবি মুদ্রার প্রচলন করেন। তিনি ১২৩৬ সালে পরলোক গমন করেন।

খু. জা.

ইলিয়াদ (Iliad)

পৃথিবীর (দ্র) প্রাচীন চারটি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের (দ্র) অন্যতম। প্রাচীন গ্রিসের ইলিওন শহরের নামানুসারে এই মহাকাব্যের নাম হয় ইলিয়াদ। মহাকবি ওমেরোস্ (ইংরেজির মাধ্যমে এঁকেই আমরা হোমার (Homer) (দ্র) হিসাবে চিনি) এই মহাকাব্যের রচয়িতা। এই মহাকাব্য ২৪টি সর্গে বিভক্ত ও গ্রিক ভাষায় রচিত। এর বিষয় ট্রয়ের যুদ্ধ (দ্র)। এতে ট্রয় অবরোধের দশ বছরের কাহিনী বর্ণিত আছে। সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে ট্রয় নগরী ঘিরে রেখেও গ্রিকেরা ট্রোজানদের পরাজিত করতে না পারায় গ্রিক যোদ্ধাদের মনোবল প্রায় শেষ হয়ে আসে। গ্রিক বীর ওদিসিউস (Odysseus) ও অন্যান্য বীরগণ অনেক কষ্টে সাধারণ সৈন্যদের ট্রয় নগরী অবরোধ চালিয়ে যেতে সম্মত করান। ওদিসিউসের কূটবুদ্ধিতে গ্রিকেরা বড় এক কাঠের ঘোড়া বানিয়ে তার পেটের ভেতর কিছু সৈন্য লুকিয়ে রাখে। সৈন্যসংখ্যা ছিল ২৩ জন বা তার কিছু বেশি। তাদের মধ্যে ছিলেন সেরা সেরা গ্রিক বীর। বাইরে থেকে বোঝার উপায় ছিল না যে ঐ কাঠের ঘোড়ার ভেতরে সৈন্য আছে। আগামেম্নন্ ও অন্যান্য গ্রিকেরা নিজেদের ক্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়ে দেশে ফেরার ছলে জাহাজে চড়ে পাল উড়িয়ে দিল। প্রকৃতপক্ষে তারা পরিকল্পনা মতো কাছের একটি দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল। শত্রুরা একটা কাঠের ঘোড়া ফেলে রেখে চলে গেছে দেখে ট্রয়বাসীরা ঐ ঘোড়া টেনে টেনে নগরের মধ্যে নিয়ে যায়। আর রাতে কাঠের ঘোড়ার পেট থেকে বেরিয়ে গ্রিক বীরেরা ঘুমন্ত ট্রয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওদিকে জাহাজে চড়ে আগামেম্নন্ ফিরে এসে যোগ দেয় তাদের সঙ্গে। যুদ্ধে ট্রয়বাসীরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়।

গ্রিক বাহিনীতে আখিলিস (Achilles) শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিসম্পন্ন যোদ্ধা হিসাবে পরিচিত। হেক্টর (Hector) ট্রোজান পক্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সাহসী বীর। আখিলিস হেক্টরকে পরাজিত ও হত্যা করেন। এই উভয় বীরের যুদ্ধবর্ণনা ইলিয়াদে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রিক দেবদেবীরা এই যুদ্ধে দুই পক্ষ অবলম্বন করেন।

ইলিয়াদকে গ্রিক সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যায়। এতে মোট ১৬,০০০ পঙ্ক্তি কবিতা আছে। বীররসে পূর্ণ এই মহাকাব্য তার গাম্ভীর্য ও সমৃদ্ধ কাব্যভাষার জন্য বিখ্যাত। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষায় এই মহাকাব্য অনূদিত হয়েছে। খ্রি. পূ. ১১শ–৯ম শতককে হোমারের যুগ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

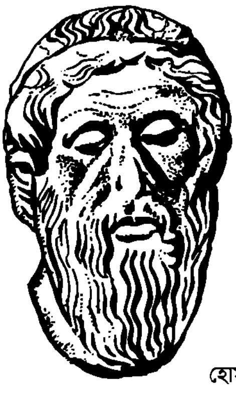

হোমার

বি. ব.

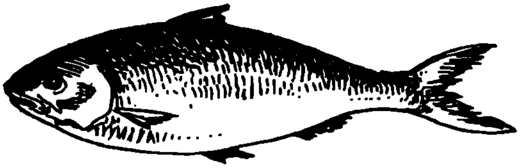

ইলিশ

বাংলাদেশের (দ্র) জাতীয় মাছ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *'হিল্সা ইলিশ।'* হিন্দিতে হিল্সা এবং ইংরেজিতেও একে hilsa বলে। ইলিশ মাছ হেরিং (Clupea Ilisha) -এর গোত্রভুক্ত। এটি ইউরোপ ও আমেরিকার (দ্র) শ্যাড (shad) মাছের মতো দেখতে সুন্দর সাদা আঁশযুক্ত মাছ। এর স্বাদ অতুলনীয়, রান্নার পর এক ধরনের মনকাড়া সুঘ্রাণ ছড়ায়।

ইলিশ সাধারণত সমুদ্রে বা বড় নদীতে বাস করে। সমুদ্রের প্ল্যাংক্টন, ডায়াটম্ (দ্র)–সহ ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ ও নানাবিধ জৈব বস্তু খেয়ে এরা বেঁচে থাকে। এরা পানির ২/৩ ফুট নিচ দিয়ে ঝাঁক বেঁধে চলতে ভালবাসে। ওপরের দিকে স্রোতের বেগ বেশি হলে নিচের দিকে পানির গভীরে নেমে যায়। ডিম ছাড়ার সময় হলে সমুদ্র থেকে নদীতে এসে স্রোতের বিপরীতে চলতে থাকে। সমুদ্র থেকে বহু দূরে

নদীর কম স্রোতের স্থানে গিয়ে স্ত্রী ইলিশ ডিম ছাড়ে এবং পুরুষ ইলিশ সেখানেই ডিমগুলো নিষিক্ত করে। ডিম ফোটার পর ৪/৫ সপ্তাহ জন্মস্থানে থেকে বাচ্চা ইলিশ নদীর প্রধান স্রোতে ভাসতে ভাসতে প্রথমে কিছু দিন নদীর মোহনায় থাকে, পরে সমুদ্রে চলে যায়। সাধারণত দু' বছর বয়স থেকেই এরা ডিম ছাড়তে শুরু করে। ডিম ছাড়ার উপযুক্ত সময় বর্ষাকাল। এ কারণে বাংলাদেশের বড় বড় নদীগুলোতে বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে ইলিশ ধরা পড়ে।

বাংলাদেশের প্রধান নদী মেঘনা (দ্র), পদ্মা (দ্র) ও যমুনা (দ্র) ইলিশ মাছের প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র। ব্রহ্মপুত্র (দ্র) ও তিস্তা নদীর স্রোত প্রবল বলে এ দু'টি নদীতে ইলিশ খুব একটা পাওয়া যায় না। রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় ইলিশ মাছের ব্যাপক মৌসুমি সরবরাহ লক্ষ করা যায়।

ইলিশ ধরার জন্য প্রধানত চার ধরনের জাল ব্যবহৃত হয়—বড় জাল বা টানা জাল, ভাসা জাল, বুজা জাল ও ডোবা জাল। নির্বিচারে ইলিশ ধরায় ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার অভাবে বাংলাদেশে ইলিশের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেন।

ইলিশের সৌন্দর্য যুগ যুগ ধরে বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের আকৃষ্ট করেছে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও অনুষঙ্গ হিসাবে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে আছে ইলিশ।

সুজ. ব.

ইলেক্ট্রন (electron)

একক নেগেটিভ বা ঋণাত্মক আধান (দ্র) বা চার্জ বিশিষ্ট একটি মৌলিক বিদ্যুৎকণিকা। এটি সকল পদার্থে বর্তমান। আমরা জানি, সকল পদার্থ পরমাণু (দ্র) দিয়ে তৈরি। পরমাণুতে প্রধানত তিন ধরনের কণিকা থাকে। এগুলো হল ইলেক্ট্রন, প্রোটন (দ্র) ও নিউট্রন (দ্র)। ইলেক্ট্রন থাকে পরমাণুর খোলকে। গ্রহগুলো যেমন সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, ঠিক তেমনি ইলেক্ট্রন পরমাণুর পজিটিভ বা ধনাত্মক চার্জযুক্ত নিউক্লিয়াসকে ঘিরে আবর্তিত হয়। ইলেক্ট্রন পরমাণুর রাসায়নিক ধর্ম নির্ণয়ে সহায়তা করে। পরমাণুর মধ্যে সবচেয়ে হালকা হল হাইড্রোজেন (দ্র) পরমাণু। ইলেক্ট্রন এতই হালকা যে ১৮৪০টি ইলেক্ট্রনের ভর (দ্র) একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান। ইলেক্ট্রনের ভর $9{\cdot}107 \times 10^{-13}$ কিলোগ্রাম এবং এর চার্জ বা আধান হল $1{\cdot}6 \times 10^{-19}$ কুলম। ইলেক্ট্রনের স্পিন $\frac{১}{২}$ এবং এরা লেপ্টন শ্রেণীভুক্ত। ইলেক্ট্রন যখন কোনো পরিবাহক দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তাকে বলা হয় বিদ্যুৎপ্রবাহ বা ইলেক্ট্রিক কারেন্ট। ধাতু থেকে ইলেক্ট্রন বের করে নেওয়া বা নিঃসরণের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তাপীয় আয়ন (দ্র) নিঃসরণ, বিটাক্ষয়, তড়িৎক্ষয় ও আলোকতাড়িত নিঃসরণ থেকে ইলেক্ট্রন পাওয়া যায়। তাপ প্রয়োগে কোনো ধাতু থেকে ইলেক্ট্রন বের করা ও তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাপের সাহায্যে ধাতু থেকে ইলেক্ট্রন নিঃসরণপ্রক্রিয়াটিকে বলা হয় তাপীয় আয়ন নিঃসরণ। আর ইলেক্ট্রনকে বলা হয় তাপীয় আয়ন। ইলেক্ট্রনিক্সের (দ্র) বিকাশে এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইলেক্ট্রনের বিপরীত কণিকার নাম পজিট্রন। পজিট্রনের ভর ইলেক্ট্রনের সমান। কিন্তু আধান বিপরীত অর্থাৎ পজিটিভ বা ধনাত্মক।

শা. ত.

ইলেক্ট্রনিক্স (electronics)

ইলেক্ট্রন (দ্র) ও ইলেক্ট্রনিক্স কথা দু'টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ইলেক্ট্রন হল পরমাণুর অতি সূক্ষ্ম ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কণিকা। ইলেক্ট্রনিক্সের মূলে রয়েছে এই ইলেক্ট্রন (দ্র)। ইলেক্ট্রনের

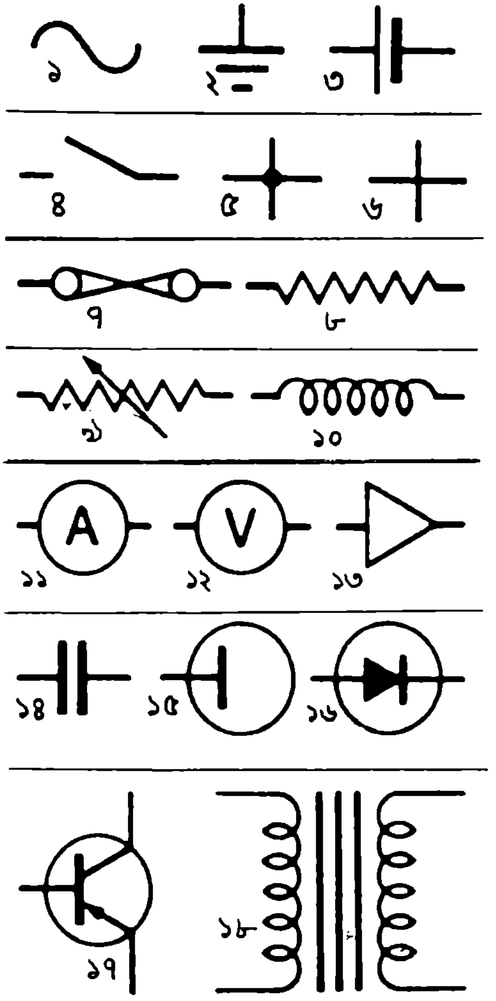

ইলেক্ট্রনিক প্রতীক নির্বাচন

১.	পরিবর্তী প্রবাহ	২.	ভূমি
৩.	বিদ্যুৎকোষ	৪.	সুইচ
৫.	তারের সংযোগ	৬.	তার সংযুক্ত না হয়ে পেরিয়ে যাবে
৭.	ফিউজ	৮.	রোধ (রেজিস্টর)
৯.	পরিবর্তনশীল রোধ	১০.	তারকুণ্ডলী
১১.	অ্যামিটার	১২.	ভোল্টমিটার
১৩.	অ্যামপ্লিফায়ার	১৪.	ধারক (ক্যাপাসিটর)
১৫.	অ্যানোড	১৬.	ডায়োড
১৭.	ট্রানজিস্টর	১৮.	ট্রান্সফর্মার

প্রবাহকে বলা হয় বিদ্যুৎপ্রবাহ বা কারেন্ট। ইলেক্ট্রনের প্রবাহ যেমন কোনো কঠিন পরিবাহীর (দ্র) মধ্য দিয়ে চলতে পারে, তেমনি চলতে পারে ভ্যাকুয়াম বা শূন্য মাধ্যম, গ্যাস মাধ্যম এবং অর্ধপরিবাহী দিয়ে। অর্ধপরিবাহী হল এমন ধরনের পদার্থ, যার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে না, কিন্তু কোনো কোনো শর্ত পূরণ করলে বিশেষ অবস্থায় এর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে শাখা ভ্যাকুয়াম, গ্যাস মাধ্যম বা অর্ধপরিবাহীতে ইলেক্ট্রনের প্রবাহ ও তার গতিপ্রকৃতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করে, তাকে ইলেক্ট্রনিক্স বলে।

অন্য কথায় ইলেক্ট্রনের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে যেসব যন্ত্রাদি তৈরি হয়, তাদের আবিষ্কার ও ব্যবহারিক চর্চা তড়িৎবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয়, তাকে ইলেক্ট্রনিক্স বলে। ইলেক্ট্রনের এরূপ নিয়ন্ত্রিত প্রবাহের জন্য বিশেষ ধরনের সার্কিট ব্যবহার করা হয়। এদের বলা হয় ইলেক্ট্রনিক সার্কিট।

১৮৮৩ সালে ইলেকট্রনিক্সের ভিত্তি স্থাপন করেন টমাস আলভা এডিসন (দ্র)। ফ্লেমিংয়ের (Sir John Ambrose Fleming : ১৮৪৯—১৯৪৫) ডায়োড ভাল্‌ভ্ এবং লি ডি ফরেস্টের (Lee De Forest : ১৮৭৩—১৯৬১) ট্রায়োড ভাল্‌ভ্ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ইলেক্ট্রনিক্সের সূচনা।

ইলেক্ট্রনিক্স বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের সভ্যতার অগ্রগতিতে এক বিপ্লব এনে দিয়েছে। ট্রায়োড ভাল্‌ভের বিকল্প হিসাবে ট্রানজিস্টার (দ্র) আবিষ্কার এবং ট্রানজিস্টরের উন্নত রূপ আই.সি.-র আবিষ্কার এই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছে।

ইলেক্ট্রনিক্সের কল্যাণে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে বহু রকম ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র। এদের মধ্যে রেডিও (দ্র), টেলিভিশন (দ্র), রেডার (দ্র), রোবট (দ্র), ক্যালকুলেটর (দ্র), টেপরেকর্ডার (দ্র), কম্পিউটার (দ্র) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে কোনো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রেই ইলেক্ট্রনিক্সের প্রয়োগ আছে।

শা. ত.

ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স (Electra complex)

ইলেক্ট্রা (Electra) গ্রিক পুরাণের এক নারীচরিত্র; গ্রিক ভাষায় উচ্চারণ 'ইলেক্ত্রা'। ট্রয়ের যুদ্ধের গ্রিক সেনানায়ক রাজা আগামেম্‌নন্‌ ও তাঁর পত্নী ক্লিতেম্‌নেস্ত্রার কন্যা। মায়ের চক্রান্তে বাবা নিহত হলে মেয়ে ইলেক্ত্রা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়—কাহিনীর মর্মকথা সংক্ষেপে এমন। ফলে ইলেক্ত্রা চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ হল পিতার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা, ভক্তি–ভালবাসা এবং মায়ের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ও সমালোচনাপূর্ণ মনোভাব।

গ্রিক পুরাণের এই কাহিনীর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করে যে তত্ত্ব মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড (দ্র) প্রতিষ্ঠিত করেন তা-ই 'ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স' নামে পরিচিত। 'ঈডিপাস কমপ্লেক্স'-এর (দ্র) বিপরীত হল 'ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স'। ফ্রয়েড বিশ্লেষণ করে দেখান যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই ছেলের চেয়ে মেয়েরাই যে বেশি বাপ-ন্যাওটা হয়, বাবার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য–শান্তি ইত্যাদির দিকে বেশি মনোযোগী হয়ে থাকে, তার কারণ এই কমপ্লেক্স বা গূঢ়ৈষা। মা ও মেয়ের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাতও এই কারণেই দেখা দেয়।

হা. মা.

ইলেক্ট্রিক আর্ক বাতি দ্র

ইলেক্ট্রিসিটি বিদ্যুৎ দ্র

ইলেক্ট্রোপ্লেটিং/তড়িৎপ্রলেপন

ইলেক্ট্রোপ্লেটিং বা তড়িৎপ্রলেপন হল তড়িৎবিশ্লেষণ-প্রক্রিয়ায় কোনো ধাতব জিনিসের উপর অন্য ধাতুর (দ্র) সূক্ষ্ম আস্তরণ বা প্রলেপ দেওয়ার রাসায়নিক পদ্ধতি। সাধারণ কথায় একে গিল্‌টি করা বলে। সাধারণত কোনো নিকৃষ্ট বা সস্তা ধাতু (যেমন তামা (দ্র), লোহা (দ্র), ব্রোঞ্জ (দ্র) ইত্যাদি) দিয়ে তৈরি জিনিসকে জলবায়ুর (দ্র) প্রকোপ থেকে রক্ষা করা, চকচকে করা অথবা সুন্দর দেখানোর জন্য এদের উপর উৎকৃষ্ট বা মূল্যবান ধাতুর (যেমন সোনা (দ্র), রূপা (দ্র), নিকেল (দ্র) ইত্যাদি) প্রলেপ দেওয়া হয়। এদেরকে গোল্ড প্লেটিং বা সিলভার প্লেটিং বা নিকেল প্লেটিং করা বলে। যে বস্তুতে প্রলেপ দিতে হবে তাকে ভোল্টামিটারে (দ্র) ক্যাথোড (দ্র) বা ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আর যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হবে তাকে ব্যবহার করা হয় অ্যানোড (দ্র) বা ধনাত্মক তড়িৎদ্বার হিসাবে। যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হবে সে ধাতুর লবণের দ্রবণকে ইলেক্ট্রোলাইট বা তড়িৎদ্রব হিসাবে ব্যবহার করা হয়। লোহার পাত্রে রূপার প্রলেপ দিতে হলে লোহার পাত্রকে ক্যাথোড এবং বিশুদ্ধ রূপার পাতটিকে অ্যানোড (দ্র) এবং সিলভার নাইট্রেটকে তড়িৎদ্রব হিসাবে ব্যবহার করতে হয়। ইলেক্ট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়ায় লোহার উপর দস্তার (দ্র) প্রলেপ দেওয়াকে গ্যালভানাইজ করা বলে। থালা-বাসন, পাতিল, চামচ ইত্যাদিকে চকচকে, উজ্জ্বল ও সুন্দর দেখানোর জন্য ইলেক্ট্রোপ্লেটিং করা হয়।

শা. ত.

ইসমাইল হোসেন সিরাজী [১৮৮০ — ১৯৩১]

মুসলিম জাগরণবাদী সমাজহিতৈষী, গদ্য-শিল্পী, কবি ও বাগ্মী। জন্ম সাবেক পাবনা জেলার মহকুমা শহর সিরাজগঞ্জে, ১৮৮০ সালে।

দারিদ্র্যের কারণে তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভের সুযোগ না পেলেও আপন সাধনাবলে 'স্বশিক্ষিত' হয়ে ওঠেন। বাংলা ভাষা (দ্র) ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে শৈশব-কৈশোরকাল থেকেই। তিনি সমাজহিতৈষী ও অসাধারণ বাগ্মীও ছিলেন। বলকান (দ্র) যুদ্ধের সময় ভারতীয় মুসলমানদের তরফ থেকে যে মেডিক্যাল মিশন প্রেরণ করা হয়, তিনি তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে তুরস্কে (দ্র) যান।

গদ্য ও কবিতা (দ্র) রচনায় তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজ জ্ঞানে-গরিমায়, শিল্পে ও সভ্যতায় বিশ্বের অন্য সমস্ত উন্নত জাতির সমপর্যায়ে উন্নীত হোক তাঁর লেখনী-অভিযানের এই ছিল মূল লক্ষ্য।

ইসমাইল হোসেন সিরাজীর উল্লেখযোগ্য রচনাকর্ম—প্রবন্ধ : 'আদবকায়দা শিক্ষা', 'স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা', 'সুচিন্তা', 'তুর্কী নারীজীবন' ও 'স্ত্রীশিক্ষা'; উপন্যাস :

'রায়নন্দিনী', 'ফিরোজা বেগম', 'তারাবাঈ' ও 'নুরুদ্দীন'; এবং কাব্যগ্রন্থ 'অনলপ্রবাহ' ও 'প্রেমাঞ্জলি'।

সিরাজীর রচনাকর্ম আবেগভারাক্রান্ত ও উচ্ছ্বাসময়। মতবাদের তীব্রতা তাঁর উপন্যাসের (দ্র) লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কবিমানস ছিল রোম্যান্টিকতার অনুসারী।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী ১৯৩১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়

ইসমাইলিয়া সম্প্রদায় শিয়া মুসলমান সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত একটি শাখার নাম।

উল্লেখ্য, মুসলমানগণ দু'টি মযহাব বা ধর্মীয় গোষ্ঠিতে বিভক্ত—শিয়া (দ্র) ও সুন্নি। বাংলাদেশের সিংহভাগ মুসলমান সুন্নি। ইরান, পাকিস্তান (দ্র), ভারত (দ্র), আফগানিস্তানসহ অন্যান্য দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিয়া মতাবলম্বী মুসলমানদের বসবাস।

শিয়া সম্প্রদায় আবার তিনটি উপদলে বিভক্ত—ইমামিয়া, যাইদিয়া ও কিসানিয়া।

শিয়াদের দ্বাদশ ইমামের মধ্যে ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদিকের (৭০০—৭৫৬) সময় ইমামিয়া উপদল দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়। এরই একটির নাম জাফর সাদিকের এক পুত্র ইসমাইলের নামানুসারে হয় ইসমাইলিয়া দল বা সম্প্রদায়। বর্তমানে এই সম্প্রদায়ের প্রায় দু'কোটি মানুষ পৃথিবীর (দ্র) বিভিন্ন দেশে বসবাস করে। এরাই মিশরের বিখ্যাত ফাতেমি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের সামান্য আগে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে।

ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতার উপাধি 'আগা খান' (দ্র)। বর্তমানে প্রিন্স করিম আগা খান এই সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বে আসীন। এই সম্প্রদায়ের অর্থানুকূল্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা জনহিতকর কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাদের নিজস্ব পরিচালনায় একটি ব্যাংকও আছে।

মু. মা.

ইসলাম খান

মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর (দ্র) ১৬০৮ সালে সেনাপতি ইসলাম খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করে পাঠান। ইসলাম খান ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসক ও দুর্ধর্ষ সেনাপতি। তিনি ফতেহপুর সিক্রির বিখ্যাত দরবেশ শেখ সলিম চিশ্‌তীর পৌত্র।

ইসলাম খানের আগমনের পূর্বে বাংলাদেশের বারো জন ভূস্বামী মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এঁরা বারো ভূঁইয়া (দ্র) নামে পরিচিত।

ইসলাম খান বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করে বারো ভূঁইয়া এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদের দমন করেন।

১৬২২ সালে ইসলাম নাম রাজমহল থেকে ঢাকায় (দ্র) রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং সম্রাটের নামানুসারে রাজধানীর নাম জাহাঙ্গীরনগর রাখেন। তিনি আরাকানি মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি একটি দুর্গ ও অনেক রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। ঢাকার ইসলামপুর সড়ক তাঁরই স্মৃতি বহন করছে।

খু. জা.

ইসলাম ধর্ম

আরবি 'সালাম' ক্রিয়াপদ থেকে ইসলাম শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ দ্বিবিধ—বিরোধ-সংঘাত পরিহার করে শান্তি স্থাপন করা ও পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র (দ্র) নিকট পরিপূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করা।

ইসলামী ধর্মবিধানের প্রধান উৎস পবিত্র কুরআন (দ্র); দ্বিতীয় উৎস হযরত মুহম্মদ (স.)(দ্র)-এর বাণী, কাজকর্ম ও আচার-আচরণ।

তাওহীদ (দ্র) বা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস স্থাপন ইসলামী শরীয়তের মূল ভিত্তি। এর পাশাপাশি রয়েছে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও পরকালের অনন্ত জীবনে বিশ্বাস এবং 'আ'মলে সালেহ্' বা সৎকর্ম করা।

ইসলামের 'রুকন' বা স্তম্ভ পাঁচটি—ঈমান (দ্র), নামায

(দ্র), রোজা (দ্র), হজ্ব (দ্র) ও যাকাত (দ্র)।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে সুখ-শান্তি ও কল্যাণময় করাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। পার্থিব জীবন যদি সুন্দর, পবিত্র ও কল্যাণময় হয়, তা হলে পারলৌকিক জীবনও হবে সুন্দর, সফল ও শান্তিময়। পবিত্র কুরআন ও রসূল (স.)(দ্র)-এর মাধ্যমে এই মর্মবাণীই নানাভাবে উচ্চারিত হয়েছে। এ কারণেই ইসলামে যেমন আছে নামায, রোজা, হজ্ব, পাপ-পুণ্য, বেহেশ্‌ত্‌-দোজখ ও তাওহীদের কথা, তেমনি আছে মানুষের ইহকালীন জীবনকে সুখময়, শান্তিময়, সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে নানা দিঙ্‌নির্দেশনা।

ইসলাম বিশ্বমানবকে ন্যায়, সত্য, কল্যাণ, ভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও উদারতার দিকে আহ্বান করেছে; ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে রচনা করেছে এক মঙ্গলময় সেতুবন্ধন।

মু. মা.

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

১৯৭৫ সালের ২৮শে মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান (দ্র) এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে 'বায়তুল মোকাররম সোসাইটি' এবং 'ইসলামী একাডেমী' নামে দু'টি সংস্থার বিলোপসাধন করে প্রতিষ্ঠা করেন এই ফাউণ্ডেশন। ফলে বিলুপ্ত দু'টি সংস্থার সমুদয় সম্পদ ও দায়দায়িত্ব নবগঠিত সংস্থাটির অধিকারে আসে ও নিয়ন্ত্রণভুক্ত হয়। এটি বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছে।

১৯৮৩ সালে এক সরকারি সংশোধিত অধ্যাদেশ জারি করা হলে এর প্রশাসনিক কাঠামোর ক্ষেত্রে বেশ কিছু রদবদল সাধিত হয়, এর হস্তগত হয় বায়তুল মোকাররম সোসাইটি স্থাপিত যাবতীয় বিপণিকেন্দ্রের আয়। বর্তমানে ফাউণ্ডেশনের নির্বাহী প্রধান এর মহাপরিচালক। চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে) ধর্ম-বিষয়ক মন্ত্রী।

ফাউণ্ডেশনের প্রকাশনাকর্মকাণ্ড বেশ গতিশীল। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে এর উদ্যোগে কয়েক খণ্ডের 'ইসলামী বিশ্বকোষ'-এর রচনা ও মুদ্রণ-কাজের সমাপ্তি, নিজস্ব ছাপাখানার সম্প্রসারণ এবং বেশ কিছু গবেষণাধর্মী গ্রন্থের প্রকাশনা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই সংস্থার উদ্যোগে ১৯৭৯-৮০ সালে ৪টি বিভাগীয় ও ৩টি জেলা সদরে ইসলামী সংস্কৃতিকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে এ জাতীয় আরো ১৩টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয় জেলা সদরে। ১৯৮৮ সালের জুন পর্যন্ত ফাউণ্ডেশনের শাখার সংখ্যা ৪১টি দাঁড়ায়। এগুলো এর বিভাগীয় ও জেলা দফতর হিসাবে পরিচিত ও কর্মতৎপর।

ফাউণ্ডেশনের ৪টি ভ্রাম্যমাণ যানের সাহায্যে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে নিয়মিত ইসলামী গ্রন্থের পরিবেশন ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়ে থাকে। সম্প্রতি 'ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র'গুলোর নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন শাখা' করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে ৪১টি জেলায় গঠন করা হয়েছে ৪১টি পাঠাগার ও ৪৬২৩টি 'বুক ক্লাব'। দেশের ৫টি জেলা সদরে খোলা হয়েছে ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

ফাউণ্ডেশনের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি খুবই সমৃদ্ধ। দেশী-বিদেশী ৭৫ হাজারেরও বেশি গ্রন্থ এর সংগ্রহে রয়েছে। মসজিদভিত্তিক পাঠাগার গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ফাউণ্ডেশন এ যাবৎ দেশের ৬৪টি জেলায় ৫ হাজার ৩শ' ৩৮টি মসজিদে গড়ে তুলেছে ইসলামী পাঠাগার।

ফাউণ্ডেশনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত। বিভিন্ন স্মরণীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সেমিনার, ওয়াজ মাহফিল, সাহিত্যসভা, শিশু-কিশোর, মহিলা ও যুব সমাবেশ, কেরাত ও আযানসহ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুষ্পপ্রদর্শনী, গ্রন্থমেলার আয়োজন ও অনুষ্ঠান প্রায় নিয়মিত ঘটনা।

এর উদ্যোগে ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী মিশন দেশের দুস্থ মানুষের সেবায় নিয়োজিত। এই সংগঠনটি দরিদ্রদের চিকিৎসা করে।

ফাউণ্ডেশনের তরফ থেকে মোট ৭টি সাময়িকী (এগুলোর মধ্যে ১টি আরবি ভাষায়) প্রকাশিত হয়। ইসলামের ও মুসলিম সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য

অবদান রেখেছেন, এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে স্বীকৃতি দিতে ১৯৮২ সাল থেকে প্রবর্তন করা হয়েছে 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পুরস্কার'।

আ. হু.

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৮৫ সালে গাজীপুরে স্থাপিত হয় এবং পরে ১৯৯০ সালের ১৪ই মে কুষ্টিয়ার শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে স্থানান্তরিত হয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টি অনুষদ এবং ১২টি বিভাগ রয়েছে। অনুষদ দুটির নাম : 'ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামিক স্টাডিজ' এবং 'মানবিকী ও সমাজবিজ্ঞান'। ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের অধীনে রয়েছে ৪টি বিভাগ : আল কুরআন ও ইসলামিক স্টাডিজ, ২. দাওয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ, ৩. আইন ও মুসলিম বিধান, ৪. আল হাদিস ও ইসলামিক স্টাডিজ। মানবিকী ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের আওতা-ভুক্ত রয়েছে বিভাগ : ১. হিসাববিজ্ঞান, ২. ব্যবস্থাপনা, ৩. অর্থনীতি, ৪. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ৫. রাষ্ট্র-নীতি ও লোকপ্রশাসন, ৬. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ৭. ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, এবং ৮. আরবি ভাষা ও সাহিত্য। ১৯৯৫ সালে ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে মোট ৩৩৭১ জন এখানে অধ্যয়নরত এবং ১০৭ জন তাদের পাঠদানে নিয়োজিত আছেন।। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ৩ শতাধিক। আবাসিক হল ৩টি : ছাত্রদের জন্য ২টি এবং ছাত্রীদের জন্য ১টি।

মে. খা.

ইস্কাইলাস ঈস্কাঈলাস দ্র

ইস্ট ইণ্ডিজ

ইস্ট ইণ্ডিজ (East Indies) -কে বাংলায় পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বলা হয়। এশিয়া (দ্র) ও অস্ট্রেলিয়া (দ্র) মহাদেশ (দ্র) দু'টির মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের (দ্র) ভিতরে যেসব দ্বীপ রয়েছে 'ইস্ট ইণ্ডিজ' হল তাদের সাধারণ নাম। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া (দ্র), ফিলিপাইনকে মোটামুটিভাবে এর অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়।

হা. মা.

ইস্পাত

লোহার (দ্র) সঙ্কর ধাতু (দ্র)। এতে আয়রন কার্বাইড অথবা সিমেণ্টাইট রূপে প্রায় ২% কার্বন থাকে। কার্বন (দ্র) এবং অন্যান্য ধাতুর পরিমাণের ভিত্তিতে ইস্পাতের গুণাগুণের তারতম্য ঘটে। ধাতুর মধ্যে ইস্পাতের ব্যবহার খুবই বেশি। পেটা লোহা গলিয়ে তাতে কার্বন মিশিয়ে বেঞ্জামিন হাণ্টস্ম্যান (Benjamin Huntsman : ১৭০৪–১৭৭৬) প্রথম ১৭৪০ সালে ইস্পাত তৈরি করেন। এর পর স্যার হেনরি বেসেমার (Sir Henry Bessemer : ১৮১৩–১৮৯৮) ১৮৫৬ সালে ইস্পাত তৈরির একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। বেসেমার কনভার্টারে ঢালাই লোহা গলানো অবস্থায় রেখে তাতে বাতাস চালিয়ে খুব কম খরচে ইস্পাত তৈরি করা যায় এ পদ্ধতিতে। হেনরি বেসেমার এ পদ্ধতি ব্যবহার করে এক সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ ইস্পাত উৎপাদনে সক্ষম হন।

সু. ব.

ইহুদিধর্ম

ইহুদিধর্মের কোনো সুনির্দিষ্ট প্রবর্তক নেই। বাইবেলের (দ্র) 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' অংশে এবং 'তালমুদ' গ্রন্থে ইহুদিধর্মের কথা লেখা আছে। সম্ভবত আব্রাহামের (ইসলামী মতে হযরত ইবরাহিম) একেশ্বরবাদী মতবাদের অনুসারীদের নিয়েই ইহুদিধর্মের যাত্রা শুরু। পরে হযরত মুসা (দ্র)-এর কাছে প্রেরিত ঐশ্বরিক বাণী প্রচারের মাধ্যমে ইহুদিধর্মের প্রসার ঘটে। ইহুদিদের অন্যান্য ধর্মগুরুর মধ্যে রয়েছেন হযরত দাউদ (দ্র) ও হযরত সুলাইমান (দ্র)।

ইহুদিদের বিশ্বাস— ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তাঁরা মনে করেন, জিহোবা বা ঈশ্বর শুধুমাত্র ইহুদিদেরকে ভালবাসেন। কিন্তু খ্রিস্টানদের বিশ্বাস, পৃথিবীর (দ্র) প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র।

বর্তমানে ইসরায়েল ইহুদিদের রাষ্ট্র। পূর্বে তাঁদের ধর্মভিত্তিক নির্দিষ্ট কোনো রাষ্ট্র ছিল না। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করতেন। তাই তাঁরা যখন যেখানে থাকতেন, সেখানকার ধর্মীয় প্রভাব ইহুদিধর্মে

এসে পড়ত। সে জন্য ইহুদিরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করতে করতে কখনো হয়তো অন্য দেব-দেবীর পূজাও শুরু করে দিতেন।

'অন্য দেব-দেবীর পূজা না করে এক ঈশ্বরকে মেনে চলো'—এই বাণী নিয়ে ইহুদিধর্মে একাধিক মহাপুরুষের আগমন ঘটেছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মোজেস (Moses) বা হযরত মুসা।

টি. কি.

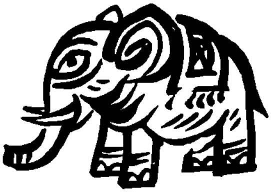

ঈ

ঈগল

ঈগল শ্রেষ্ঠ শিকারি পাখি। বৈজ্ঞানিক নাম *Accipirridae*। বিশ্বে এর ৪৮টি প্রজাতি আছে। সব দেশেই ঈগল দেখা যায়। রাজকীয় পাখি। উদ্ধত। ধূর্ত শিকারি। আমেরিকার (দ্র) কণ্ডর শকুন উড়তে পারা পাখিদের ভেতর বৃহত্তম; ঈগল দ্বিতীয়। এর বাঁকানো ঠোঁট শক্ত এবং ধারালো। পায়ের নখরও বড়শির মতো ধারালো।

ঈগলদের কারো আকার মাঝারি, কেউ-বা বড়। দৃষ্টিশক্তি প্রখর। শক্তিশালী পা। ওড়ার ভঙ্গিমা চমৎকার। রঙের বিভিন্নতা আছে। হলুদ, বাদামি ও সাদার ভাগ বেশি। ডাইভ দিতে ওস্তাদ।

সোনালি ঈগল (Golden Eagle) সবচেয়ে বড়। ৮৯ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। একে পাখির রাজা বলা হয়। ওজন ৬ কিলোগ্রাম। পাখার বিস্তার প্রায় ২ মিটার। ঠোঁট ৫ সেন্টিমিটার। বল্ড ঈগল (Bald Eagle) ও সাদা-লেজ ঈগল (White Tailed Eagle) প্রায় ওরকমই। সোনালি ঈগলের পা ঘন লোমে আবৃত। রোমান যোদ্ধারা একে 'প্রতীক' হিসাবে ব্যবহার করত। রাশিয়া (দ্র) ও অস্ট্রেলিয়ার (দ্র) রাজারাও করত। বল্ড ঈগল আমেরিকার জাতীয় পাখি।

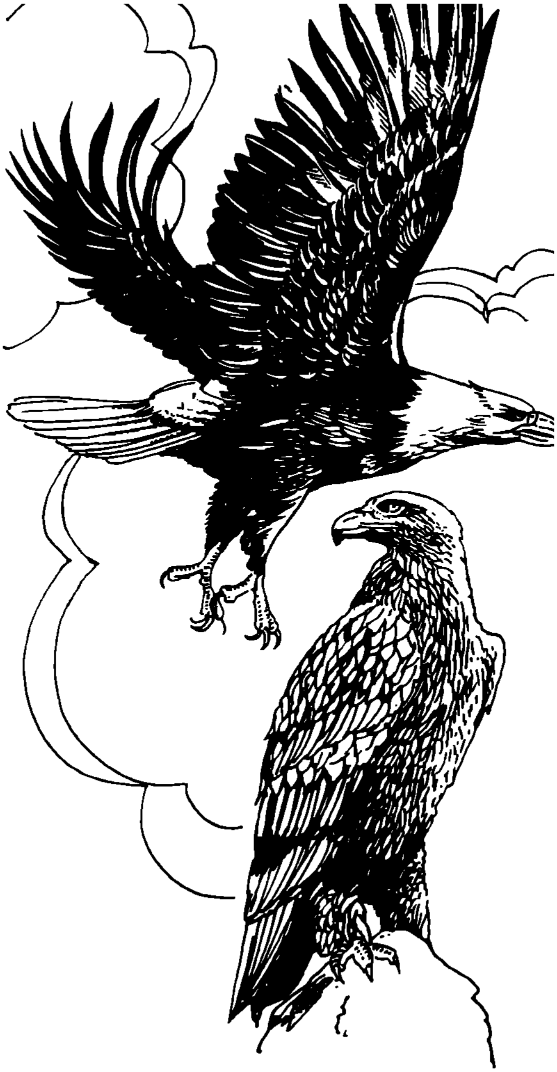

বসে আছে সোনালি ঈগল এবং উড়ে যাচ্ছে বল্ড ঈগল

এরা মাছ (দ্র), খরগোশ (দ্র), সাপ (দ্র), ব্যাঙ (দ্র), ছোট পাখি, ছোট বন্য জন্তু, বানর (দ্র), টিকটিকি (দ্র), গিরগিটি ইত্যাদি খায়। এরা ডাইভ মেরে শিকার ধরে। অধিকাংশের ডিম হয় ১ থেকে ৩টি। শর্ট টোড ঈগল (Short-toed Eagle) একটিমাত্র ডিম পাড়ে। কেউ কেউ মেরামত করে একই বাসায় থাকে। মাটি, পাহাড়-পর্বতের চুড়ো, বড় গাছে এরা বাসা তৈরি করে। সোনালি ঈগলের দু'টি বাসা থাকতে পারে। এর বেড় ৯১ সেন্টিমিটার এবং গভীরতা ৬ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এর ডিম ৮ সেন্টিমিটার।

বেড় হয় ৫ সেন্টিমিটার। ৩০/৪০ দিন পরে ডিম ফোটে। ডিমের রঙ প্রজাতিভেদে সাদা, হলুদ, লালচে, বাদামি ইত্যাদি হয়। ঈগল ২০-৩০ বছর বাঁচে।

বাংলাদেশে (দ্র) এর ৮টি প্রজাতি আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বুটেড হক ঈগল, সাদা ঈগল, ফিশিং ঈগল।

শ. খা.

ঈডিপাস

শব্দটির গ্রিক উচ্চারণ অয়দিপাউস্। কিন্তু ইংরেজি বানানে Oedipus লেখা হয় বলে এর উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেছে ঈডিপাস/ইডিপাস। বাংলায় অনেকে ইদিপাস/ঈদিপাস লিখে থাকেন। সম্প্রতি মূল গ্রিক উচ্চারণের ধাঁচে অনেকে অয়দিপাউস/ওইদিপৌস ইত্যাদি লিখছেন।

গ্রিক নাট্যকার সোফোক্লেস্ (দ্র) 'অয়দিপাউস তুরান্নোস' (অর্থাৎ রাজা অয়দিপাউস) নামে বিশ্ববিখ্যাত একটি ট্র্যাজেডি (দ্র) লিখেছিলেন এবং ঈডিপাসের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মনোবিজ্ঞানী জিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড (দ্র) তাঁর বিখ্যাত 'ঈডিপাস্ কমপ্লেক্স'(দ্র) তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রাজা অয়দিপাউস্ গ্রিক পুরাণের একটি চরিত্র। নিজের দুরদৃষ্ট ও দেবদেবীদের চক্রান্তে ইনি নিজের অজান্তে বাবাকে হত্যা ও মা-কে বিবাহ করেন। মর্মান্তিক এই কাহিনীর যে অনির্বচনীয় নাট্যরূপ সোফোক্লেস্ দিয়েছেন তা সুপ্রাচীন কাল থেকে এখন পর্যন্ত সাহিত্যরসিক ও নাট্যকলারসিক সকলকে সমানভাবে মুগ্ধ করে রাখছে।

হা. মা.

ঈডিপাস্ কমপ্লেক্স (Oedipus complex)

ঈডিপাস্ কমপ্লেক্স বিষয়টি মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত। বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানী জিগ্‌মুণ্ড্ ফ্রয়েড্ (দ্র) এই তত্ত্বের উদ্ভাবক। 'ঈডিপাস' আসলে গ্রিক নাট্যকার সোফোক্লেসের ট্র্যাজেডির (দ্র) নায়ক অয়দিপাউস। ঈডিপাস নিজের অজান্তে ও দেবতাদের চক্রান্তে নিজের পিতাকে হত্যা ও মাতাকে বিবাহ করেছিলেন। ফ্রয়েড এই অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য ও মর্মান্তিক কাহিনী বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে মা ও ছেলের মধ্যে যে স্নেহের ও ভক্তি-ভালবাসার টান দেখা যায়, তার মূলে রয়েছে ঈডিপাস কমপ্লেক্স। বাবা ও ছেলে যে অনেক সময় একে অপরকে অপছন্দ করে, পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, তারও কারণ ঐ কমপ্লেক্স বা গূঢ়ৈষা।

হা. মা.

ঈ-ৎসিঙ [৬৩৫–৭১৩]

বৌদ্ধ ভিক্ষু (দ্র), চীনদেশীয় ধর্ম-পরিব্রাজক এবং বৌদ্ধধর্মের (দ্র) প্রাচীন পুঁথি সংগ্রাহক। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে ভারত পর্যটন করেন। পর্যটক হিসাবে তিনি ছিলেন ফা-হিয়েন (দ্র) ও হিউএন্-ৎসাঙের (দ্র) অনুসারী। ৬৩৫ সালে চীনের চি-লি প্রদেশে তাঁর জন্ম। খুব কম বয়সে তিনি ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা লাভ করেন। গভীরভাবে বৌদ্ধশাস্ত্র অনুশীলনের জন্য তাঁর মনে বৌদ্ধধর্মের জন্মস্থান ভারত পর্যটনের আকাঙ্ক্ষা জাগে। তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিখ্যাত ভারতবর্ষীয় উপনিবেশ শ্রীবিজয় (সুমাত্রা দ্বীপের পালেমবাং) ছিল বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চার প্রাণকেন্দ্র। ৬৭১ সালে সমুদ্রপথে তিনি প্রথম বারের মতো শ্রীবিজয়ে আসেন। ৬৭৩ সালে আসেন পূর্ব-ভারতের বিখ্যাত বাণিজ্যনগরী তাম্রলিপ্তে (পরিবর্তিত নাম তমলুক)। এ সময় তিনি পায়ে হেঁটে নালন্দা (দ্র), রাজগৃহ (দ্র), বুদ্ধগয়া, বৈশালী, কুশীনগর, সারনাথসহ ভারতের বিভিন্ন বৌদ্ধ তীর্থস্থান পরিদর্শন করেন। পরে নালন্দায় এসে বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের চার শ' পুঁথি সংগ্রহ করেন। ভারতে একটানা পঁচিশ বছর প্রবাস জীবন যাপন করে তিনি ৬৯৫ সালে দেশে ফিরে যান। দেশে গিয়ে তাঁর সংগৃহীত যাবতীয় বৌদ্ধশাস্ত্র তিনি চীনা ভাষায় অনুবাদের (দ্র) কাজ শুরু করেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সমগ্র বিনয়পিটক তিনি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। ৭১৩ খ্রিস্টাব্দে ৭৯ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তিনি এক জন স্মরণীয় ব্যক্তি।

সুজ. ব.

ঈদুল আয্‌হা

ঈদুল আয্‌হা অর্থ কুরবানির উৎসব। 'আয্‌হা' আরবি শব্দ অর্থ কুরবানি, উৎসর্গ।

ঈদুল আয্‌হা বা কুরবানির উৎসবটি এক মহান আত্মত্যাগের স্মৃতিবাহী ঘটনা। নবী হযরত ইবরাহিম (আ.) (দ্র) স্রষ্টা কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে প্রাণপ্রিয় কিশোর পুত্র ইসমাইল (আ.)-কে কুরবানি করতে উদ্যত হয়েছিলেন। স্রষ্টার সন্তুষ্টি বা অভিপ্রায়ের নিকট আত্মসমর্পণ করে হযরত ইবরাহিম (আ.) যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তারই স্মরণে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রতি বছর জিলহজ্ব মাসের ১০ তারিখে এই উৎসব পালিত হয় গরু (দ্র), ছাগল, উট (দ্র), দুম্বা প্রভৃতি পশু কুরবানির মাধ্যমে।

মু. মা.

ঈদুল ফিত্‌র্

'ঈদ' আরবি শব্দ। এর অর্থ খুশি। আর ফিত্‌র্ শব্দের অর্থ ভেঙে দেওয়া; অন্য অর্থ বিজয়। দীর্ঘ এক মাস রোজা (দ্র) রাখা বা উপবাস করার পর যে উৎসব পালন করা হয়, তা-ই ঈদুল ফিতরের উৎসব। 'বিজয়' অর্থটি ব্যঞ্জনাময়। পুরো রমজান মাস রোজা রেখে মানুষ তার কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে এক ধরনের বিজয় অর্জন করে এ অর্থে তা বিজয়-উৎসবও বটে। তবে 'ঈদুল ফিত্‌র্' উপবাস ত্যাগের উৎসব হিসাবেই সাধারণভাবে প্রচলিত। এই উৎসব শাওয়াল মাসের পয়লা তারিখে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

ঈদ উৎসব উদ্‌যাপন শুরু হয় হিজরি (দ্র) ২য় সালে। বদরের যুদ্ধে (দ্র) 'চূড়ান্ত মীমাংসাকারী' বিজয় সে বছরই অর্জিত হয়েছিল। হয়তো এই বিজয়ের স্মৃতিকে আরো আনন্দমুখর করে তোলার উদ্দেশ্যেই হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র) ঐ বছর রমজান মাসের শেষে ঈদ উৎসব পালনের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

ঈদ উৎসব পালনের আরো একটি ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। তা হল—আরবের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারকম উৎসবের প্রচলন ছিল। উকাজের (দ্র) মেলা ছিল এ ধরনের একটি বর্ণাঢ্য আয়োজন। এ সব উৎসব প্রায়শই নানা অশ্লীল ও রুচিহীন আনুষ্ঠানিকতায় পূর্ণ থাকত।

অন্য দিকে মুসলমানদের জন্য তখন পর্যন্ত কোনো উৎসবের প্রচলন হয় নি। তাদের নিষ্কলুষ বিনোদনের বিষয়টি রসূলুল্লাহ্ (সা.) (দ্র) গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করে হিজরির ২য় সালে রমজানশেষে ঈদুল ফিত্‌র্ উৎসব উদ্‌যাপনের সূচনা করেন।

ঈদুল ফিত্‌র্ সাম্য ও মৈত্রীর স্মারক এবং তা ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সাদা-কালো, অভিজাত-অনভিজাত সকলকে এক সঙ্গে মেলানোর শিক্ষা দেয়, প্রেরণা দেয় ভেদাভেদহীন সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের।

মু. মা.

ঈনীদ (Aeneid)

ভার্জিল

মহাকবি ভার্জিল (দ্র) রচিত প্রাচীন কালের অন্যতম মহাকাব্য (দ্র)। তাঁর পূর্ণ নাম পুব্লিউস্ ভের্গিলিউস মারোনিস (Publius Vergilius Maronis)। আমাদের কাছে সাধারণত 'ভার্জিল' নামেই পরিচিত। তিনি ৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং ১৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মারা যান। 'ঈনীদ' তাঁর সর্বাধিক খ্যাত মহাকাব্য। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০ থেকে ১৯ অব্দে এই মহাকাব্য রচিত হয়েছিল। এই মহাকাব্যে ঈনীস (Aeneas) ছিলেন ট্রোজান বীর। গ্রিকেরা ট্রয়ের যুদ্ধে (দ্র) জয়ী হয়ে যখন ট্রয় নগরী পুড়িয়ে দেয়, তখন অনেক ট্রয়বাসী রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যায়। ঈনীস তাঁর স্ত্রী, শিশুপুত্র ও বুড়ো বাবাকে নিয়ে ট্রয় নগরী থেকে বেরিয়ে পড়েন। চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে স্ত্রী হারিয়ে গেলে ঈনীস শিশুপুত্রকে কোলে ও বাবাকে পিঠে করে নিরাপদ স্থানে চলে যান। জাহাজে চড়ে তার পর ভাগ্যান্বেষণে পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করলে পথে তাঁর জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়। বহু কষ্টে তিনি কার্থেজ নগরীতে উপস্থিত হন এবং সেখানে কার্থেজের রানী দিদোর (Dido) আশ্রয় লাভ করেন। হোমারের (দ্র) আদর্শে লিখিত এই মহাকাব্যে কবি

রোমের ঐশ্বর্য ও বীরত্বের বর্ণনা প্রদান করেছেন। রোমের প্রথম সম্রাট আউগুস্তুস্ (Augustus) তাঁর আদর্শ সম্রাট। অবশেষে ঈনীস বহু বিপর্যয় ও সংগ্রাম শেষে ইতালিতে ফিরে আসেন।

ঈনীদ ১২ সর্গে বিভক্ত মহাকাব্য। প্রতীক, রূপক ও উপমাসমৃদ্ধ এই মহাকাব্যে বীরের আত্মোৎসর্গের জয়গান গাওয়া হয়েছে। আধুনিক সমালোচকেরা মনে করেন, ভার্জিল রোমসম্রাটের সভাকবি ছিলেন।

বি. ব.

ঈমান

ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস। ইসলামী পরিভাষায় ঈমানের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এর সাতটি অঙ্গ বা ভাগ রয়েছে। এগুলো হল : ১. আল্লাহ এক, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র) তাঁর বান্দা ও রসূল— এ কথায় বিশ্বাস; ২. ফিরিশতাদের (দ্র) প্রতি বিশ্বাস; ৩. সমস্ত ঐশী গ্রন্থের ওপর বিশ্বাস; ৪. সকল নবী ও রসূলের নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস; ৫. পরকালে বিশ্বাস; ৬. তক্দীর বা ভাগ্যে বিশ্বাস; এবং ৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও শেষ বিচারে বিশ্বাস। এই সাতটি বিষয়ের ওপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন এক জন মুসলমানের জন্য ফরজ বা অবশ্যকর্তব্য।

ঈমান ইসলামের (দ্র) পঞ্চ স্তম্ভের প্রথম স্তম্ভ।

মু. মা.

ঈল (eel)

ঈল এক বিশেষ আকৃতির মাছ (দ্র)। দেখতে সাপের মতো। দেখলে সাপ বলে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। মাছের মতো ঈল মাছের দেহে নানা ধরনের পাখনা থাকে, কিন্তু এসব পাখনা খুবই ছোট। ফলে এগুলো তেমন একটা কাজে আসে না। ঈল মাছ সাপের মতো এঁকে-বেঁকে চলাচল করে। এ ধরনের চলাকে সর্পগতি বা সর্প-চলা (serpentine movement) বলা হয়।

ঈল মাছ কয়েক প্রকার হতে পারে। যেমন– কাঁটাযুক্ত ঈল, মোরে ঈল, কাদা ঈল, বৈদ্যুতিক ঈল। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং ভয়ঙ্কর ঈল মাছ প্রধানত গুহাবাসী। জলের গভীরে যেসব পাহাড় বা টিলা রয়েছে, তার ভেতরের গুহায় এরা বাস করে। ঈল মাছের মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ জাতের ঈল হল কাদা ঈল। এরা স্বভাবের দিক দিয়ে খুব শান্ত প্রকৃতির। ঈল মাছের শিকার ধরার পদ্ধতি অনেকটা সাপের মতোই। হঠাৎ করে ছোবল মেরে এরা শিকার ধরে। তবে ঈল মাছের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত হল বৈদ্যুতিক ঈল

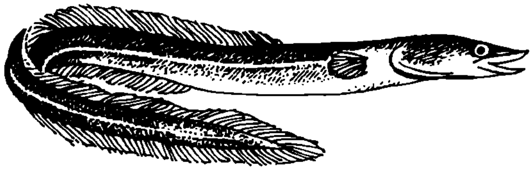

মাছ। এদের দেহে এক ধরনের বিশেষ বিদ্যুৎউৎপাদী অঙ্গ রয়েছে। বিদ্যুৎঅঙ্গ প্রায় ৬৬০ ভোল্টের মতো বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারে। অবশ্য এদের বিদুৎ উৎপাদনক্ষমতা এক সঙ্গে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। অর্থাৎ মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে এরা বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশেও তিন প্রজাতির ঈল মাছ রয়েছে। স্থানীয়ভাবে এরা বাইন মাছ বা বান মাছ নামে পরিচিত। এরা মাংসাশী।

ত. চ.

ঈশপ [আনু. ৬২০-৫৬০ খ্রি. পূ.]

ঈশপ বা ঈসপ (Aesop) উপদেশমূলক গল্পের রাজা বলে খ্যাত। তাঁর জীবনকাল আনুমানিক ৬২০ থেকে ৫৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। তিনি গ্রিস দেশের ফ্রিজিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি সামোস দ্বীপবাসী ইয়াদ্মন নামে এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন বলে জানা যায়। লিদিয়ার রাজা ক্রেসাস তাঁকে মুক্ত করেন এবং সম্মানজনক কর্মে নিয়োগ করেন।

ঈশপ দেখতে মোটেও আকর্ষণীয় ছিলেন না, কিন্তু অসাধারণ বাক্পটু ও রসিক ছিলেন। লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না, অথচ মুখে মুখে নীতিকথামূলক আশ্চর্য চমকপ্রদ গল্প বানিয়ে বলতে পারতেন। তাঁর কাছে গল্প

শোনার জন্য দলে দলে লোক আসত। এভাবে তাঁর গল্পগুলো জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

ঈশপ সম্ভবত তাঁর গল্পগুলো লিখিতভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে যান নি। তাই মুখে মুখে প্রচলিত তাঁর গল্প নানা দেশের গল্পের সঙ্গে মিশে অপূর্ব এক সাহিত্যসম্পদে পরিণত হয়েছে।

গ্রিক ভাষায় বাব্রিয়াস (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দী) ও লাতিন ভাষায় ফিদ্রুস (Phaedrus : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১ম শতাব্দী) ঈশপের গল্প প্রথম ছন্দোবদ্ধরূপে পরিবেশন করেন। কালক্রমে সে গল্পগুলোই ঈশপের নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ব্রিটেনে ক্যাক্সটন (William Caxton : ১৪২২-৯১) ঈশপের গল্প ছেপে প্রথম প্রকাশ করেন। লা ফঁত্যান (Jean de La Fontaine : ১৬২১-৯৫) ফরাসি ভাষায় কিছু গল্প পুনর্লেখন করেন। বাংলায় বিষ্ণুশর্মা রচিত 'পঞ্চতন্ত্রে'র (দ্র) উপকথাগুলোর সঙ্গে লা ফঁত্যানের পুনর্লিখিত গল্পগুলোর বেশ মিল পাওয়া যায়। বাংলায় বিদ্যাসাগরের (দ্র) 'কথামালা' (১৮৫৬) ঈশপের গল্প অবলম্বনে রচিত।

সুজ. ব.

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত [১৮১২ – ১৮৫৯]

কবি, লোকসাহিত্য সংগ্রাহক ও সম্পাদক। জন্ম পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়ায়, ১৮১২ সালে। তাঁকে পুরাতন যুগের 'শেষ খাঁটি বাঙালি কবি' বলেও অভিহিত করা হয়।

প্রথম জীবনে তিনি কবিওয়ালাদের দলে গান বাঁধতেন। বাংলার প্রাচীন কবি-গীতিকারদের প্রতি তিনি ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধাবান। ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে তিনি বাংলায় এই সব কবি-গীতিকারের জীবনী ও রচনা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। এ জাতীয় প্রয়াসের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকেই বলা চলে পুরোধা।

'সংবাদ-প্রভাকর' নামে একটি সাময়িক পত্রেরও তিনি ছিলেন খ্যাতিমান সম্পাদক। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দ্র) ও দীনবন্ধু মিত্রের (দ্র) মতো বেশ কয়েক জন দিক্‌পাল লেখক ও কবির সাহিত্যচর্চার সূচনা হয় এই পত্রিকার মাধ্যমেই।

তাঁর প্রধানতম সাহিত্যকীর্তি কাব্যগ্রন্থ 'বোধেন্দুবিকাস' নাটক (দ্র) আকারে রচিত। 'হিতপ্রভাকর' নামে গদ্য-পদ্যে রচিত আরেকটি গ্রন্থেরও জনক তিনি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর সমকালীন বাঙালি সমাজের বাস্তব চিত্র কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কখনো হাস্যরসমণ্ডিত করে সহজ ছন্দ (দ্র) ও বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার (দ্র) মাধ্যমে তুলে ধরতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

উনিশ শতকের যুগসন্ধিক্ষণের এই কবি স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতার (দ্র) জন্যও বিশেষ স্মরণীয় হয়ে আছেন।

তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৮৫৯ সালে।

আ. হ.

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [১৮২০ – ১৮৯১]

সমাজসংস্কারক, সাহিত্যস্রষ্টা ও মানবপ্রেমিক।

বিদ্যাসাগর তাঁর উপাধি। পিতৃপুরুষের পদবি বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে, হুগলি জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ (বর্তমানে মেদিনীপুর জেলায়) গ্রামে।

শৈশব ও বাল্যজীবন চরম দারিদ্র্যের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষাজীবন কৃতিত্বের সঙ্গে সমাপ্ত করার পর উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি কলিকাতায় (দ্র) আসেন। ১৮২৯ সালের ১লা জুন ভর্তি হন সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ বিভাগের তৃতীয় শ্রেণীতে। ১৮৪১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁর উচ্চতর

শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন এবং সংস্কৃত কলেজের তরফ থেকে তাঁর অসাধারণ মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ লাভ করেন 'বিদ্যাসাগর' উপাধি।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের (দ্র) প্রধান পণ্ডিতরূপে এর পর শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন (১৮৪১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর থেকে)। পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদেও (১৮৫১) অধিষ্ঠিত হন। অসাধারণ মেধাবলে শুধু সংস্কৃত নয়, ইংরেজি (দ্র) ও হিন্দি ভাষাতেও তিনি অসামান্য ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

বিদ্যাসাগরকে বলা হয় বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী। গদ্যেরও যে একটা নিজস্ব ছন্দ আছে, তিনিই প্রথম তা আবিষ্কার করেন। গদ্যভাষায় যতি-চিহ্নাদির যথাযথ প্রয়োগ ও প্রচলনের কৃতিত্বও তাঁর।

সমাজসংস্কারক হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্রের দৃঢ় ভূমিকার কথা ইতিহাসবিদিত। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রচলন ও বহুবিবাহ প্রথা নিবারণে তাঁর অকুতোভয় ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা বাংলা তথা উপমহাদেশের সমাজসংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক দৃষ্টান্তস্থানীয় ঘটনা।

পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা (দ্র) ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা সুবিদিত। 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সোমপ্রকাশ' ও ইংরেজি 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এর মতো পত্রিকাসমূহ তৎকালীন বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। বিদ্যাসাগর এসব পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে এই অধ্যায়ের ওতপ্রোত সহচর হন।

শিক্ষাবিস্তার ও যুগপ্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের লক্ষ্য থেকে ছোট-বড় বহু নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের ছিল অগ্রণী ভূমিকা। এ সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'হিন্দু মেট্রোপলিটন স্কুল'-এর প্রতিষ্ঠা, যা তাঁরই একান্ত উদ্যোগে অচিরেই রূপান্তরিত হয়েছিল কলেজে।

দারিদ্র্যপীড়িত অসহায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে কবি ও শিল্পী-সাহিত্যিকবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রেও ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন উদার। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের (দ্র) সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি এর অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ। এই মহাপুরুষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের (দ্র) মন্তব্য: "দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান গৌরব ছিল তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।" মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, প্রতিভা ও বৈদগ্ধ্যে তিনি ছিলেন প্রাচীন ঋষিদের মতো, কর্মোদ্যমে ইংরেজের মতো এবং হৃদয়বত্তায় বাঙালি জননীর মতো। দানশীলতার জন্য তাঁর খ্যাতি এতখানিই ছিল যে লোকে তাঁকে 'দয়ার সাগর' বলত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উল্লেখযোগ্য রচনাকর্ম: 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭), 'বাংলার ইতিহাস' (১৮৪৮), 'জীবনচরিত' (১৮৪৯), 'বোধোদয়' (১৮৫১), 'উপক্রমণিকা' (১৮৫১), 'ঋজুপাঠ' (১৮৫১), 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' (১৮৫৩), 'শকুন্তলা উপাখ্যান' (১৮৫৪), 'বিধবাবিবাহ' (১৮৫৫), 'বর্ণপরিচয়' (১ম ও ২য় ভাগ)' (১৮৫৫), 'কথামালা' (১৮৫৬), 'আখ্যানমঞ্জরী' (১৮৬৩) ও 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯)।

১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

ঈসা (আ.) যিশুখ্রিস্ট দ্র

ঈসা খাঁ [? — ১৫৯৯]

পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত বারো ভূঁইয়ার (দ্র) মধ্যে সর্বপ্রধান। তিনি হিন্দু বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতামহ অযোধ্যাবাসী রাজপুত কালিদাস গজদানী ইসলাম ধর্ম (দ্র) গ্রহণ করেন। ঈসা খাঁর পিতার নাম সুলাইমান খাঁ।

ঢাকা (দ্র) ও কুমিল্লা জেলার অধিকাংশ এলাকা, ময়মনসিংহ জেলা (সুসং ছাড়া) এবং পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলার কিছু কিছু অংশ ঈসা খাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজ্যবিস্তার অভিযানকালে তিনি কলাগাছিয়া, হাজীগঞ্জ,

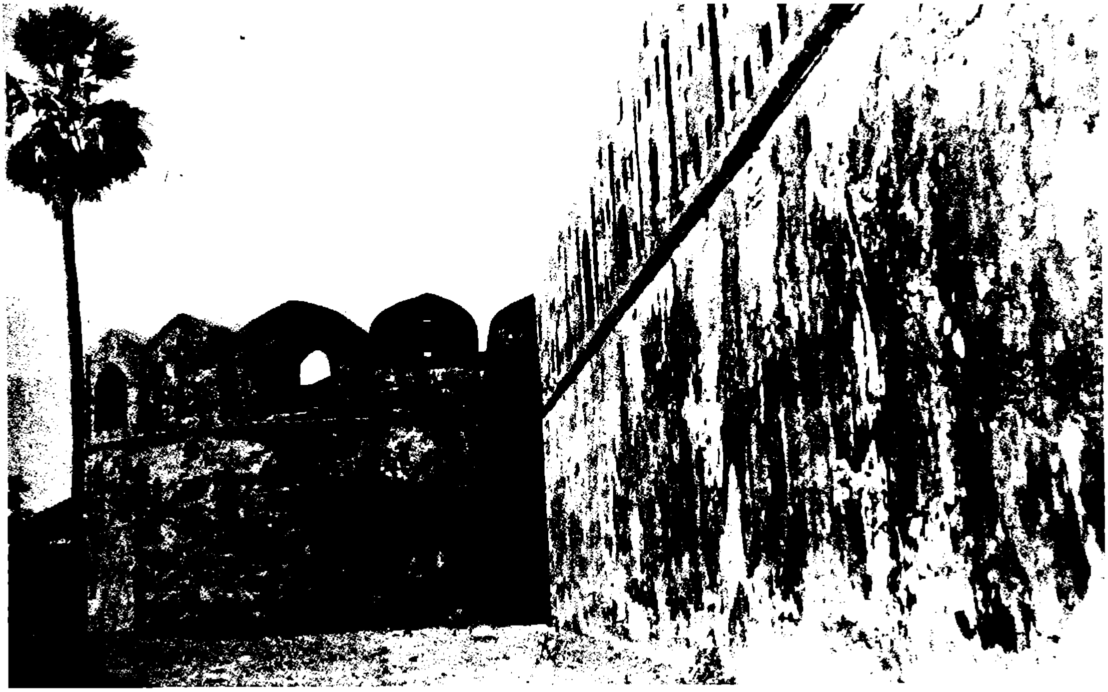

হাজীগঞ্জ দুর্গ

ত্রিবেণী ও ময়মনসিংহ-শেরপুরের দশকাহনিয়ায় দুর্গ নির্মাণ করেন এবং একডালা ও এগারসিন্দুর দুর্গ মেরামত করেন।

১৫৭৬ সালে সম্রাট আকবরের (দ্র) বাহিনীর নিকট আফগান নেতা দাউদ খাঁ পরাজিত ও নিহত হলে বঙ্গদেশে মোগলদের প্রধান বিরোধীরূপে ঈসা খাঁর আবির্ভাব ঘটে। আকবরের পক্ষত্যাগকারী সেনাপতি মাসুম খাঁ কাবুলী এবং বারো ভূঁইয়ার অন্যান্য সদস্যও মোগলদের বিরুদ্ধে ঈসা খাঁর সঙ্গে যোগ দেন। ১৫৮৪ সালে ঢাকা আক্রমণ করে তিনি মোগল সেনাপতি শাহবাজ খাঁকে বঙ্গদেশ থেকে বিতাড়িত করেন। ১৫৮৬ সালে মোগলেরা তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হয়।

কিন্তু মোগল সেনাপতি মানসিংহ ঈসা খাঁর রাজ্য অধিকারের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করলে তিনি পুনরায় মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৫৯৫ সালে তিনি কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া থানার এগারসিন্দুর দুর্গে মানসিংহ কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। ১৫৯৭ সালে তিনি সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন বলে জানা যায়। লোকশ্রুতি আছে যে আকবর তাঁকে দেওয়ান ও মসনদ-ই আলী উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৫৯৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সুজ. ব.

ঈস্কাইলাস [আনু. ৫২৫–৪৫৬ খ্রি. পূ.]

প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রিক নাট্যকার। Aeschylus নামটির আসল গ্রিক উচ্চারণ এস্খুলোস্। ৫২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে জন্ম, ৪৫৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৃত্যু। ৪৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি পারসিকদের বিরুদ্ধে ম্যারাথনের সংগ্রামে যোগ দেন। তিনি ট্র্যাজেডি (দ্র) বা বিয়োগান্ত নাটকের (দ্র) উদ্ভাবক। তাঁর আগে ট্র্যাজেডি ছিল কোরাস ও এক জন অভিনেতার মধ্যে বাক্যবিনিময়। কোরাস বলতে বোঝায় চরিত্র-লক্ষণযুক্ত এক দল আবৃত্তিকার ও গায়ক। তখন মহাকাব্যের (দ্র)

আবৃত্তিই ছিল প্রধান বিষয়। তিনি কোরাসের দীর্ঘ অংশ সংক্ষিপ্ত করে এক জনের বদলে দু' জন অভিনেতা সংযোজন করেন। এতে সংলাপ বেড়ে যায় এবং নাট্যরূপ প্রকাশিত হয়। এতে মনে হয়, তাঁর সময় অভিনেতাদের সাজপোশাক ও মঞ্চসজ্জারও প্রবর্তন ঘটে।

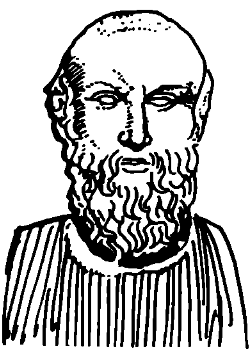

ঈস্কাঈলাস্

তাঁর ট্র্যাজেডির কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল দেবতা ও মানুষের জীবন। মানুষের জীবন ছিল তখন রহস্যময়তায় ভরা। কারণ মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে নিয়তি। এই নিয়তি শুধু মানুষের নয়, দেবতার জীবনও নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ যখন মহত্ত্বের আকাঙ্ক্ষা করে, দেবতা তখন ঈর্ষাতুর হয়ে ওঠে। তখন দেবতার অভিশাপ পড়ে মানুষের ওপর। সে সময় গ্রিসের এথেন্স ছিল রাজনীতি ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি। মানুষের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি ও পরিণামে ভয়াবহ বিয়োগান্ত হাহাকার বা ট্র্যাজেডি ছিল ঈস্কাঈলাসের বিষয়।

ঈস্কাঈলাস প্রায় ৮০টি, মতান্তরে ৯০টি, নাটক রচনা করেন। তার মধ্যে ৭টি ট্র্যাজেডি পাওয়া যায়। সেগুলোর সঠিক রচনাকাল জানা যায় না। ট্র্যাজেডিগুলো হচ্ছে : 'সাপ্লিসেস' (প্রার্থিনী), 'পেরসাই' (পারসিকবৃন্দ), 'হেপ্টা এপি থেবাস' (থেবাসের বিরুদ্ধে সাত বীর), 'প্রমিথেউস দেসমোতেস্' (বন্দি প্রমিথেউস), 'আগামেম্নন্', 'খোয়েফোরয়' (তর্পণকারী), 'ইউমেনাইদেস' (তৃপ্ত দেবীগণ)। তাঁর ট্র্যাজেডি নাটকের উজ্জ্বল চরিত্রচিত্রণ এবং অনবদ্য গীতিমাধুর্য বিশ্বসাহিত্যের অমর সম্পদ।

বি. ব.

ঈস্ট খমির (ঈস্ট) দ্র

ঈস্টার সানডে (Easter Sunday)

যিশুখ্রিস্ট (দ্র), মিথ্যা রাজদ্রোহের অভিযোগে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বিনা প্রতিবাদে মৃত্যুবরণ করে সকল মানুষের অপরাধ ও পাপের জন্য স্বেচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত করে নিজেকে উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে মৃত্যুর পরে তৃতীয় দিন পুনরুত্থিত হয়ে তিনি তাঁর বহু শিষ্যের কাছে দেখা দিয়েছিলেন এবং ৪০ দিন পরে সশরীরে স্বর্গে চলে যান।

যিশুর মুক্তিদায়ী মৃত্যু ও পুনরুত্থান খ্রিষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি। তিনি শুধুমাত্র মহাপুরুষ বা ধর্মগুরু নন, খ্রিস্টানদের মতে তিনি স্বয়ং ঈশ্বরপুত্র। প্রতি রবিবার খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা গির্জায়-গির্জায় (দ্র) সমবেত হয়ে খ্রিস্টের পুনরুত্থান স্মরণ করেন। প্রত্যেক বছরের পুণ্য-শুক্রবার বা গুড ফ্রাইডে (Good Friday) খ্রিস্টের আত্মবিসর্জন দিবস; এবং পরবর্তী রবিবার যিশুর পুনরুত্থান বিদস। সেই স্মৃতি স্মরণ করে খ্রিস্টীয় জগতে পুনরুত্থান-উৎসব বা ঈস্টার সানডে পালিত হয়। এই ঈস্টার সানডে বা পুনরুত্থান-উৎসবে তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমার কথা কীর্তিত হয়।

বি. ব.

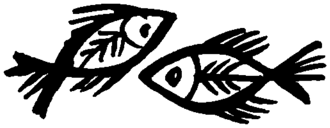

উ

উই

যে সব ছোট কীটপতঙ্গ (দ্র) সমাজবদ্ধভাবে কলোনি করে বাস করে তাদের মধ্যে উই অন্যতম। নানাভাবে আমাদের ক্ষতি করে বলে প্রধানত একটি বিড়ম্বনা হিসাবেই উই পরিচিত। উষ্ণ-আর্দ্র জায়গাতেই উইয়ের প্রাদুর্ভাব বেশি। কোনো কোনো জাতের উই মাটির গুঁড়াকে নিজেদের লালার সঙ্গে মিশিয়ে ঢিবির আকারে কলোনির বাসস্থান তৈরি করে। এ রকম উইঢিবি বেশ বড়ও হতে পারে— ৬ মিটার পর্যন্ত উচুঁ ঢিবি দেখা গেছে। ঢিবির মধ্যে থাকে বহু প্রকোষ্ঠ আর অলিন্দ পথ। বাসস্থান থেকে আর্দ্রতা ও ছায়া বজায় রেখে এদিক-ওদিক যাবার জন্য উই ঐ লালামিশ্রিত মাটির গুঁড়া দিয়ে দীর্ঘ আচ্ছাদিত পথ করে নেয়।

রানী, পুরুষ, শ্রমিক ও সৈনিক এই কয়েক রকম উই

একসঙ্গে সমাজবদ্ধভাবে একটি কলোনিতে বাস করে। প্রত্যেক কলোনিতে একটি রানী ও একটি পুরুষ থাকে। আর থাকে অনেক শ্রমিক ও কিছু সৈনিক। রানী ও পুরুষের দেহ অপেক্ষাকৃত সুগঠিত। শুরুতে পাতলা পাখাও এদের থাকে। শ্রমিক উই নরম ক্ষুদ্রদেহী, রঙ ফ্যাকাশে। এরা দৃষ্টিহীন ও পাখাবিহীন। কলোনির সব পরিশ্রমের কাজ

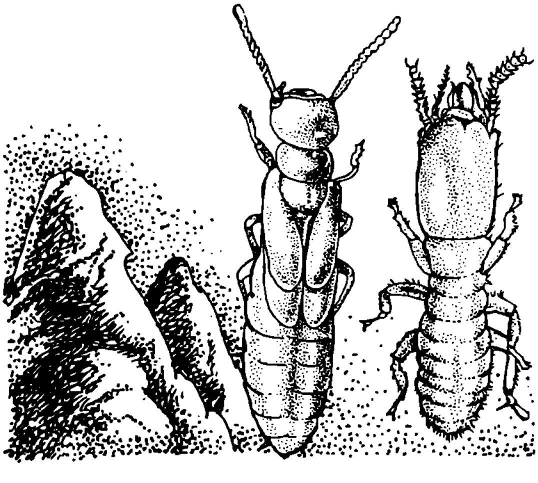

এদের—বাসা বানানো, খাবার যোগাড় করা, রানী ও বাচ্চার যত্ন, সুড়ঙ্গ কাটা— সব। সৈনিকেরা শ্রমিকের মতোই, তবে আকারে একটু বড়। মাথা ও চোয়াল শক্ত। এরা শত্রুর বিরুদ্ধে, বিশেষ করে পিঁপড়ার বিরুদ্ধে কলোনি রক্ষা করে।

শ্রমিকেরা রানী ও পুরুষ উইকে ঢিবির একটি বদ্ধ কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠে কার্যত বন্দি করে রাখে। ডিম পাড়ার সময় এলে রানী তুলনামূলকভাবে বিশাল আকার ধারণ করে, মাথা ও বুকের তুলনায় এর পেট বিরাট হয়ে পড়ে হাজার হাজার ডিমের জন্য জায়গা করতে। এ সময় সে দৈনিক কয়েক হাজার করে ডিম পাড়ে।

উই থেকে বিপদ ঘটে প্রধানত এর কাঠ, কাগজ ও উদ্ভিদ-আঁশে গড়া অন্যান্য জিনিসের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ কাটার এবং এসব জিনিস হজম করতে পারার ক্ষমতার কারণে। কাঠের থাম, আসবাব, দরজা-জানালা ও বইপত্র কেটে এবং আখ প্রভৃতি ফসলের অনিষ্ট করে উই আমাদের প্রচুর ক্ষতি করে। মাটিতে পোঁতা কাঠকে কীটনাশক দিয়ে প্রক্রিয়াকৃত করে উই থেকে বাঁচাতে হয়।

মু. ই.

উইম্বল্ডন্ চ্যাম্পিয়নশিপ

লন (lawn) টেনিসের (দ্র) সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতা। আভিজাত্য আর ঐতিহ্যে উইম্বল্ডন্ (Wimbledon) চ্যাম্পিয়নশিপ লন টেনিসের যে কোনো প্রতিযোগিতা থেকে স্বতন্ত্র। কোনো টেনিস-তারকাই উইম্বল্ডন্ জয় না করা পর্যন্ত তাঁর খেলোয়াড়জীবনকে পরিপূর্ণ মনে করেন না।

দ্য অল ইংল্যাণ্ড লন টেনিস অ্যাণ্ড ক্রোকুয়েট ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় উইম্বল্ডন্ চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতার যাত্রা শুরু ১৮৭৭ সালের জুন মাসে। প্রথম প্রতিযোগিতায় ইভেন্ট ছিল মাত্র একটি (পুরুষ একক)। ব্রিটিশ খেলোয়াড় স্পেনসার গোর (Spencer W. Gore) প্রথম শিরোপা জেতেন।

উইম্বল্ডন্ চ্যাম্পিয়নশিপের অর্থপুরস্কারের প্রচলন হয় ১৯৬৮ সালে। সে বছর পুরুষ এককের শিরোপাজয়ী রড লেভার (Rod Laver) পেয়েছিলেন ২০০০ পাউণ্ড এবং মহিলা এককের শিরোপাজয়ী বিলি-জিন কিং (Billie-Jean King) পেয়েছিলেন ৭৫০ পাউণ্ড। ধীরে ধীরে এই অর্থপুরস্কার অনেক বেড়েছে। ১৯৯৩ সালে পুরুষ একক চ্যাম্পিয়ন পিট সাম্প্রাস (Pete Sampras) পান ৩ লক্ষ ৫ হাজার পাউণ্ড এবং মহিলা একক চ্যাম্পিয়ন স্টেফি গ্রাফ (দ্র) পান ২ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউণ্ড।

অন্য সব প্রতিযোগিতা থেকে উইম্বল্ডন্ প্রতিযোগিতা আলাদা এর কোর্টের কারণে। পৃথিবীর (দ্র) সব টেনিস টুর্নামেন্ট হার্ডকোর্ট অথবা ক্লেকোর্টে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু

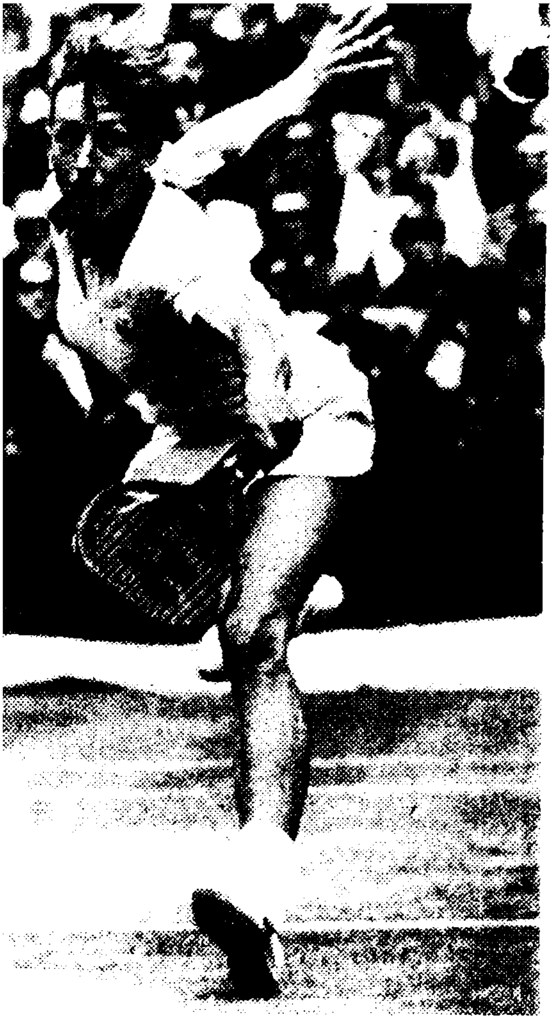

মার্তিনা নাভ্রাতিলোভা

উপরের ছবিতে স্টেফি গ্রাফ্ ও নিচে বোরিস বেকার

উইম্ব্‌ল্‌ডন্ চ্যাম্পিয়নশিপের বিশেষত্ব হল এর ঘাসের কোর্ট। ঘাসের কোর্টের কারণেই উইম্ব্‌ল্‌ডন্ চ্যাম্পিয়নশিপ সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। কারণ সারা বছর হার্ডকোর্ট অথবা ক্লেকোর্টে খেলতে অভ্যস্ত তারকারা ঘাসের কোর্টে কেমন খেলেন তা জানার আগ্রহ সকলের মধ্যে থাকে।

এই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় পুরুষ এককে সবচেয়ে বেশি—সাত বার—শিরোপা জিতেছেন ব্রিটেনের উইলিয়াম রেনশ(William Charles Renshaw), ১৮৮১ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত এবং ১৮৮৯ সালে। মহিলা এককে সবচেয়ে বেশি— নয় বার— শিরোপা জিতেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) মার্তিনা নাভ্রাতিলোভা (দ্র) ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮২ থেকে ১৯৮৭ এবং ১৯৯০ সালে। পুরুষ এককে উইম্ব্‌ল্‌ডনের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ চ্যাম্পিয়ন জার্মানির বোরিস বেকার (দ্র) (১৭ বছর ২২৭ দিন) এবং মহিলা এককে সর্বকনিষ্ঠ চ্যাম্পিয়ন ব্রিটেনের শার্লট (Charlotte) ওরফে লটি ডড (Lottie' Dod) (১৫ বছর ২৮৫ দিন)।

উইম্ব্‌ল্‌ডন্ চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ ফাইনালটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮২ সালে। পুরুষ এককের এই ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই প্রতিযোগী জিমি কনর্স (Jimmy Connors) এবং জন ম্যাকেনরো

(John Patrick McEnroe) । ৪ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে ফলাফল নিষ্পত্তি হয় । জিমি কনর্স ৩-৬, ৬-৩, ৬-৭, ৭-৬, ৬-৪ গেমে জয়লাভ করেন। ১৯১১ সালে মহিলা এককের ফাইনালে সবচেয়ে কম সময়— মাত্র ২৫ মিনিটে ব্রিটেনের এল. চেম্বার্স তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এইচ. বুথবির বিরুদ্ধে ৬-০, ৬-০ গেমে জয়লাভ করেন।

১৯৯৪ সাল পর্যন্ত উইম্বল্‌ডন্ টেনিসের মর্যাদাপূর্ণ আসর বসেছে ১০৭ বার। পুরুষ এককের শিরোপা জিতেছেন ১০টি দেশের প্রতিযোগীরা। দেশগুলো হল অস্ট্রেলিয়া (দ্র), চেকোশ্লোভাকিয়া, মিশর, ফ্রান্স, ব্রিটেন, নিউজিল্যাণ্ড, স্পেন, সুইডেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম জার্মানি (জার্মানি)। মহিলা এককের শিরোপা জিতেছেন যেসব দেশের খেলোয়াড়, সেই দেশগুলো হল— অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, ফ্রান্স, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম জার্মানি (জার্মানি)।

টি. কি.

উইলকিন্স, চার্লস [১৭৪৯—১৮৩৬]

জন্ম ১৭৪৯ বা ১৭৫০ সালে। ১৭৭০ সালে উইলকিন্স (Charles Wilkins) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'রাইটারে'র (অফিসের কেরানি) চাকুরি নিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতবর্ষে আসেন। এসে এই দেশ ও দেশবাসীকে জানার জন্য ফার্সি, বাংলা (দ্র) ও সংস্কৃত ভাষা শিখে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। সেই সঙ্গে ছাপার হরফ নির্মাণের চেষ্টা শুরু করেন এবং পঞ্চানন কর্মকারের (দ্র) সহায়তায় প্রথম বাংলা হরফ তৈরি করেন। উইলকিন্সের চেষ্টায় হ্যালহেড সাহেবের ইংরেজি ভাষায় (দ্র) লেখা বাংলা ব্যাকরণ ছাপার হরফে ১৭৭৮ সালে হুগলির ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর চেষ্টায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রেস প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৭৯ সালে এবং তিনি সেই বছরই সেখানকার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। বাংলা ছাড়াও তিনি ফার্সি ভাষার এক সেট হরফ তৈরি করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ১৭৮০ সালে ইংরেজি-ফার্সি অভিধান মালদহে মুদ্রিত হয়। পরে তিনি দেবনাগরি হরফও তৈরি করেন। হরফ নির্মাণের এই কৃতিত্বের জন্য তিনি বাংলা দেশের ছাপাখানা ও মুদ্রণ-শিল্পের জনক আখ্যায় ভূষিত হন।

সেনী দেখি সোমদত্ত ওঠিন তখন।
হুড়াহুড়ি মহা যুদ্ধ করে দুই জন ॥

তবে সেনী মহা কোপে ধরে তার চুলে।
দেখিয়া হইল হাস্য জত সভা তলে ॥

কেশে ধরি চড় মারে বজ্রের সমানে।
এক চড়ে দন্ত ভাঙ্গি করে খানে খানে ॥

তবে সভে ওঠি দ্বহা নিবারন কৈল।
অভিমানে সোমদত্ত দেশেরে চলিল ॥

সভা মধ্যে সোমদত্ত পাইয়া অভিমান।
তপস্যা করিতে বনে করিল পয়ান ॥

দ্বাদশ বৎসর সেই কৈল অনাহারে।
এক চিত্তে সোমদত্ত সেবে মহেশ্বরে ॥

তপস্যায় বস হইল দেব দিগম্বর।
বৃষভে চড়িয়া আইল বনের ভিতর ॥

শিব বলে বর মাগ সুনহ রাজন।
এত বলি সোমদত্তে ডাকে পঞ্চানন ॥

হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ। উইল্‌কিন্স এই বাংলা হরফ নির্মাণ করেন পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায়

তিনি সংস্কৃত ভাষা থেকে ভগবদ্‌গীতার (দ্র) প্রথম ইংরেজি অনুবাদ (দ্র) করেন। ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস (দ্র) স্বয়ং ঐ পুস্তকের ভূমিকা লিখে দেন। ১৭৮৫ সালে তা ইংল্যাণ্ডে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির খরচে মুদ্রিত হয়। ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি (The Asiatic Society of Bengal) প্রতিষ্ঠায় তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। এত সব কঠোর পরিশ্রমে শরীর খারাপ হয়ে গেলে তিনি ১৭৮৫ সালে স্বদেশে চলে যান। বিলেতে ১৭৯৯ সালে ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০১ সালে তিনি সেখানকার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ও আমৃত্যু ঐ পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৮৩৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর রচনাবলি হল—গীতা ও হিতোপদেশ অনুবাদ (১৭৮৫ ও ১৭৮৭ খ্রি.), স্টোরি অব শকুন্তলা ফ্রম দি মহাভারত (১৭৯৩ খ্রি.), রিচার্ডসন্‌স্ পার্সিয়ান, অ্যারাবিক

অ্যাণ্ড ইংলিশ ডিকশনারি (১৮০৬ খ্রি.) ইত্যাদি।

বি. ব.

উইলসন, হোরেস হেম্যান [১৭৮৬—১৮৬০]

জন্ম ১৭৮৬ সালে। ১৮১৬—৩২ সাল পর্যন্ত কলিকাতা (দ্র) টাঁকশালের 'এসে মাস্টার' ছিলেন। ১৮১১-৩৩ পর্যন্ত দীর্ঘ বাইশ বছর কলিকাতার 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র সেক্রেটারি ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী উইলসন (Horace Hayman Wilson) কালিদাসের (দ্র) 'মেঘদূত' ইংরেজিতে অনুবাদ (দ্র) ক রেন এবং সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধান প্রণয়ন করেন। ঐতিহাসিক, রসায়নবিদ, মুদ্রাবিদ, অভিনেতা ও সঙ্গীতজ্ঞ উইলসন 'থিয়েটার অব দি হিন্দুস' (Theatre of the Hindus) গ্রন্থে অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'মৃচ্ছকটিক', 'মালতীমাধব', 'উত্তররামচরিত', 'বিক্রমোর্বশী', 'মুদ্রারাক্ষস' ও 'রত্নাবলী' নাটকের (দ্র) অনুবাদ করেন ইংরেজিতে নাটকাকারে। এই বইয়ে তিনি সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস-প্রকরণ প্রভৃতি দিক সম্পর্কেও আলোচনা করেন। হিন্দু জাতি ও হিন্দু দর্শন সম্পর্কিত তাঁর প্রবন্ধ সঙ্কলন প্রকাশিত হয় ১৮৪০ সালে। এইগ্রন্থ অবলম্বনেই অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' রচনা করেছিলেন। উইলসন 'ঋগ্বেদে'রও ইংরেজি অনুবাদ করেন। ১৮৬০ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

মে. খা.

উকাজ আরব সভ্যতা দ্র

উগো, ভিক্তর মারি [১৮০২—১৮৮৫]

বিখ্যাত ফরাসি কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। জন্ম ১৮০২ এবং মৃত্যু ১৮৮৫ সালে।

ফরাসি সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর মতো কবি ও ঔপন্যাসিক বিরল। তাঁর পিতা ছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্টের (দ্র) সৈন্যবাহিনীর এক জন অধিনায়ক। গীতিকবিতা রচনায় উগো (Victor Marie Hugo) অমর হয়ে আছেন। তিনি ছন্দের গুরু, ফরাসি কাব্যকলাকে তিনি ছন্দোবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করেছেন। অসীম তাঁর আত্মপ্রত্যয়, শাণিত তাঁর বিদ্রূপ। তীব্র, শ্লেষপূর্ণ ও জ্বালাময় তাঁর ভাষা। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে তিনি কশাঘাতে কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন তাঁর কাব্যে। অন্ধকার ও গ্লানি থেকে আলোক ও মুক্তির অভিমুখে মানুষের অগ্রগতিকে তিনি সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। এ জন্য তাঁকে সাহিত্যিক সমাজ-সংস্কারক বলা হয়ে থাকে। তিনি ফ্রান্সকে মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। মানুষের মুক্তিসাধনার পথদ্রষ্টা তিনি। তাঁর সবগুলো উপন্যাস অসাধারণ জনপ্রিয়। তার মধ্যে 'পারী শহরের নোৎরদাম' (১৮৩১), 'লে মিজেরাব্‌ল্' (দ্র) (১৮৬২) সর্বাধিক জনপ্রিয়। নাটকের মধ্যে 'এর্নানি' (১৮৩০) ও 'রুই ব্লা' (১৮৩৮) প্রসিদ্ধ।

কাব্য-আন্দোলনের পথিকৃৎ তিনি। ১৮৫২ থেকে ১৮৭০ সালে পর্যন্ত তিনি স্বেচ্ছায় দেশত্যাগী হয়ে নির্বাসনে ছিলেন। তারপর দেশে ফেরার পর তিনি বীরের আসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৫ সালে তাঁর মৃত্যুতে দেশবাসী তাঁকে বিপুল সম্মান দিয়ে সমাহিত করেন। বিশ্বসাহিত্যে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

বি. ব.

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত

উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত এই অর্থে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কথার ব্যবহার। অঙ্গ বলতে এখানে সঙ্গীতের কয়েকটি উপাদান বোঝায়, যেমন— পরিবেশিত সঙ্গীতের গঠন, পরিবেশন-রীতি, অলঙ্কার রচনার কৌশল, তালের প্রয়োগ, শ্রোতার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করা প্রভৃতি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বলতে রাগ-সঙ্গীত বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে বোঝায়। সে জন্য ধ্রুপদ (দ্র), খেয়াল (দ্র), টপ্পা (দ্র), ঠুমরি (দ্র), রাগ-সঙ্গীতের এই চারটি প্রধান রীতিকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বলা হয়ে থাকে। কোনো কোনো সঙ্গীতবিদ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বলতে ধ্রুপদ ও খেয়ালকে নির্দেশ করার পক্ষপাতী। রাগ-সঙ্গীতকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বলার কারণ, এই সঙ্গীতের অঙ্গ বা উপাদানসমূহ লোক-সঙ্গীতের অঙ্গ অপেক্ষা অধিকতর নিয়মবদ্ধ ও মার্জিত।

ক. গো.

উট

পিঠে কুঁজবিশিষ্ট বৃহদাকার চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী (দ্র) জন্তু। এর উচ্চতা ২ মিটার বা ৭ ফুটের মতো এবং ওজন ৭২৫ কেজির ওপর পর্যন্ত হয়ে থাকে। উট ক্যামেলিডি (camelidae) পরিবারভুক্ত আর্টিওডাক্টাইলা (artiodactyla) বর্গের প্রাণী।

উট সচরাচর দু' ধরনের হয়ে থাকে। এক কুঁজবিশিষ্ট আরবি উট (Arabian camel) এবং দু' কুঁজবিশিষ্ট বাক্ট্রিয় উট (Bactrian camel)। এক কুঁজবিশিষ্ট উট উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় এবং দু' কুঁজবিশিষ্ট উট মধ্য-এশিয়ার শীতল মরুঅঞ্চলে পাওয়া যায়। এক কুঁজবিশিষ্ট

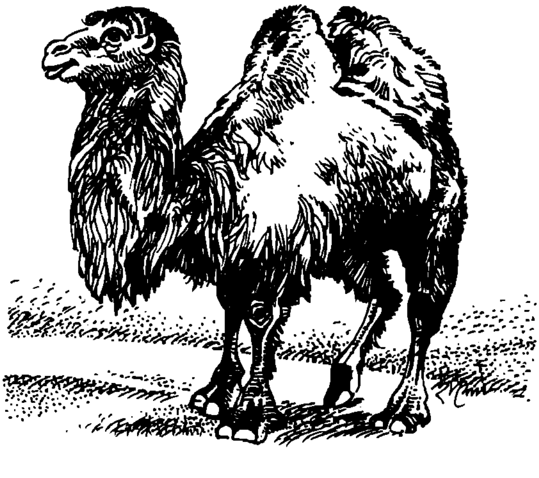

উট লম্বা ও হালকা-পাতলা গড়নের হয় বলে দু' কুঁজবিশিষ্ট উটের চেয়ে দ্রুত হাঁটাচলা করতে পারে।

মরুভূমিতে যাতায়াত এবং মালামাল বহনের জন্য মানুষ প্রাচীন কাল থেকে উট ব্যবহার করে আসছে। এই বিশেষ ব্যবহারের কারণে উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয়। চার থেকে মোটামুটি ত্রিশ বছর পর্যন্ত উট বাহন হিসাবে কাজ করতে পারে। স্বল্প দূরত্বে এরা ১,০০০ পাউণ্ড ওজনের মালামাল পর্যন্ত বহন করে।

উটের শারীরিক গঠন ও জীবনপ্রণালী মরু-পরিবেশের খুব উপযোগী। পিঠের কুঁজের মধ্যে এরা প্রচুর পরিমাণে চর্বি জমা করে রাখে। মরু অঞ্চলের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার সময় যখন এরা নিয়মিত খেতে পায় না, তখন কুঁজের জমানো চর্বিই খাবার ও পানির অভাব পূরণ করে। পানি পান না করে উট তিন সপ্তাহ পর্যন্ত বাঁচতে পারে। উটের পায়ের খুর দু' ভাগে বিভক্ত। পায়ের তলা গদির মতো নরম, যা প্রয়োজন অনুসারে সম্প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয়। এতে উট খুব সহজে শুকনো বালুপথে হাঁটতে এবং দৌড়াতে পারে। চোখের পাতাগুলো বেশ চওড়া বলে এর সাহায্যে উট মরুঝড় এবং প্রখর রোদ থেকে নিজেকে রক্ষা করে। নাকের ছিদ্র দু'টিও ইচ্ছেমতো খুলতে আর বন্ধ করতে পারে। কানে বড় বড় রোম থাকায় এদের কানের ভিতরেও বালি ঢুকতে পারে না। উট মরুভূমির ক্যাকটাসজাতীয় গাছ, লতাপাতা, তৃণ খেয়ে জীবনধারণ করে।

প্রত্যেক বসন্তে উটের পুরনো পশম ঝরে গিয়ে আবার নতুন পশম গজায়। কাপড় বা কম্বল তৈরির কাজে এই পশম ব্যবহৃত হয়।

সুজ. ব.

উটপাখি (ostrich)

পৃথিবীর (দ্র) সবচেয়ে বড় আকারের পাখি। এর শারীরিক গড়ন বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও তাগড়া, দেখতে অনেকটা টাট্টু ঘোড়ার মতো। কোনো কোনো উটপাখি ৮ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। তখন এর ওজন দাঁড়ায় ২০০ থেকে ৩০০ পাউণ্ড।

ডানা আছে, নামেও পাখি, তবু উটপাখি কিন্তু উড়তে পারে না। কারণ শরীরের তুলনায় এদের পাখা দুটো বেশ

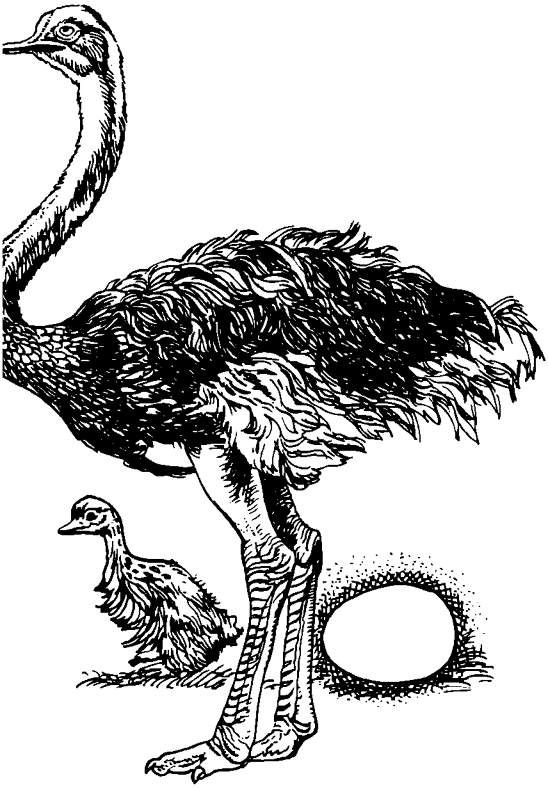

ছোট। তবে পা-জোড়া খুব শক্ত গড়নের। আর তাই এরা দৃঢ় ভঙ্গিতে ও দ্রুত গতিতে দৌড়াতে পারে। দৌড়ানোর সময় দু' পাশের ছোট পাখা দুটো মেলে দিয়ে এরা শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে। এরা ঘণ্টায় ৫৬ কিলোমিটার পর্যন্ত দৌড়াতে পারে।

উটপাখির মাথা, গলা এবং উরুতে তেমন পালক গজায় না। তবে পাখার শেষ ভাগে সুদৃশ্য বড় বড় পালক গজায়। পুরুষ উটপাখি মসৃণ ও চকচকে কালো রঙের হয়। স্ত্রী উটপাখির রঙ হয় হালকা ধূসরাভ ও পিঙ্গল। সাধারণত একটি পুরুষ পাখির সঙ্গে দু' থেকে ছ'টি স্ত্রী পাখি দল বেঁধে বাস করে। পুরুষ পাখি ডিম রাখার গর্ত তৈরি করে দেয় আর স্ত্রী পাখি ডিম পাড়ে। এদের একেকটি ডিমের ওজন হয় প্রায় সোয়া কেজি। দিনের বেলা স্ত্রী পাখি ডিমে তা দেয় আর রাতে তা দেয় পুরুষ পাখি।

আফ্রিকা (দ্র) ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় উটপাখি পাওয়া যায়। 'রীয়া,' 'ইমু' এবং 'মোয়া' পাখির সঙ্গে উটপাখির আকৃতি-প্রকৃতির যথেষ্ট মিল রয়েছে। সবচেয়ে বড় মিল হল, এই তিন ধরনের পাখিও উড়তে পারে না।

আগের দিনে কোনো কোনো দেশে মহিলারা উটপাখির পালক দিয়ে বানানো টুপি ব্যবহার করত। এ ছাড়াও আগে 'নাইট' উপাধিপ্রাপ্ত সম্মানিত ব্যক্তিদের টুপি এই পালক দিয়ে আকর্ষণীয়ভাবে সাজানো হত।

সুজ. ব.

উত্তমকুমার [১৯২৬—১৯৮০]

বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা। কলিকাতা (দ্র) মহানগরীতে ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃত নাম অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়।

উত্তমকুমারের অভিনয়জীবনের সূচনা ১৯৫৩ সালে 'শ্যামলী' নামে একটি নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে। তিনি সঙ্গীতশিল্পীও ছিলেন।

উত্তম চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন হিন্দি চলচ্চিত্র 'মায়াডোর'-এ (১৯৪৭) একটি ছোট্ট চরিত্রে অভিনয় করে। বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করার পর প্রথম 'উত্তমকুমার' নাম ব্যবহার করেন ১৯৫২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'সঞ্জীবনী' ছবিতে। ঐ একই বছর 'বসু পরিবার' ছবিতে অভিনয় করে দর্শকনন্দিত হন। 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে

(১৯৫৩) নায়িকা সুচিত্রা সেনের বিপরীতে তিনি প্রথম অভিনয় করেন। এর পর থেকে উত্তম-সুচিত্রা জুটি জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকাতে পরিণত হয়। এই জুটির অভিনীত ছবি মানেই ছিল বিরাট ব্যবসায়িক সাফল্য।

জনপ্রিয় জুটি উত্তম ও সুচিত্রা

উত্তমকুমার বেশ কিছু ছবি প্রযোজনা ও পরিচালনা করা ছাড়াও কয়েকটি ছবির সঙ্গীত পরিচালনা ও নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীর দায়িত্বও পালন করেন। তাঁর প্রথম প্রযোজিত ও অভিনীত ছবি 'হারানো সুর' (১৯৫৭) ভারতের রাষ্ট্রপতির 'সার্টিফিকেট অব মেরিট' লাভ করে। উত্তমকুমার সেরা অভিনেতা হিসাবে 'ভরত পুরস্কার'ও লাভ করেন। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কারও পান বেশ কয়েক বার।

হিন্দি ছবি 'অমানুষ'-এ অভিনয় করে তিনি সর্বভারতীয় অভিনেতা হিসাবে স্বীকৃতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

১৯৮০ সালের ২৪শে জুলাই উত্তমকুমার কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

আ. হ.

উত্তর আমেরিকা

পৃথিবীতে (দ্র) ৭টি মহাদেশের একটি উত্তর আমেরিকা। পশ্চিম গোলার্ধের অন্তর্গত। কানাডা (Canada), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (United States of America) (দ্র), মেহিকো (Mexico) এবং মধ্য-আমেরিকার (অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী অংশ) কয়েকটি ছোটখাটো দেশ, তা ছাড়া ডেনমার্কের অধীনস্থ গ্রিনল্যাণ্ড দ্বীপ ও ফরাসিদের অধীনস্থ স্যাঁ পিয়ের্‌ ও মিক্যুলঁ (Saint Pierre & Miquelon) নিয়ে উত্তর আমেরিকা গঠিত। অর্থাৎ তিনটি বড় বড় স্বাধীন দেশ (কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেহিকো) এবং অনেকগুলি ছোট দেশ মিলে এই মহাদেশ।

উত্তর আমেরিকার আয়তন পৃথিবীর স্থলভাগের ১৬.৫% ভাগ। আর জনসংখ্যা পৃথিবীর লোকসংখ্যার প্রায় ৯% ভাগ।

হা. মা.

উত্তরা অতুলপ্রসাদ সেন দ্র

উৎপল দত্ত [১৯২৯—১৯৯৩]

বিখ্যাত বাঙালি নাট্যনির্দেশক, অভিনেতা, নাট্যকার, নাট্যতত্ত্বজ্ঞ ও সম্পাদক। জন্ম কলিকাতায় (দ্র) ১৯২৯ সালে। এখানকার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়নকালেই তাঁর অভিনয়জীবনের সূচনা হয়। তিনি প্রথম অভিনয় করেন উইলিয়াম শেক্সপীয়রের (দ্র) 'হ্যামলেট' (দ্র) নাটকে (দ্র) গোরখনকের ভূমিকায়। ছাত্রাবস্থাতেই 'সৌখিন শেক্সপীয়র দল'-এ অনেকগুলো ইংরেজি নাটকেও অভিনয় করেন।

১৯৪৯ সালে তিনি গড়ে তোলেন নিজস্ব নাটকের দল 'লিট্‌ল্‌ থিয়েটার গ্রুপ'। তাঁর পরিচালিত এই গ্রুপের উল্লেখযোগ্য নাটক হল— 'ওথেলো', 'নীচের মহল', 'ম্যাকবেথ', গিরিশ ঘোষের (দ্র) 'সিরাজদ্দৌলা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) 'তপতী', 'অচলায়তন' এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের (দ্র) প্রহসন 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'।

উৎপল দত্ত পরে তৈরি করেন আরেকটি নাট্যদল 'পি এল টি' অর্থাৎ 'পিপল্‌স্‌ লিট্‌ল্‌ থিয়েটার'। তাঁর নির্দেশিত ও রচিত প্রায় প্রতিটি নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনয়ক্ষমতা ছিল অননুকরণীয়।

সরাসরি বামপন্থী রাজনীতির অনুসারী উৎপল দত্তের নাটকে নিপীড়িত মানুষের সংগ্রাম, অন্যায়ের প্রতিরোধে তাদের দুর্জয় শপথ বারবার ঘোষিত হয়েছে। রাজনৈতিক নাটক করার অপরাধে তাঁকে জেল খাটতে হয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের নির্যাতনেরও শিকার হয়েছেন তিনি। প্রতিবাদে মঞ্চের পরিবর্তে করেছেন পথনাটক।

তাঁর রচিত ও নির্দেশিত সাড়া জাগানো ও ব্যাপক দর্শকনন্দিত অন্যান্য নাটক হল 'অঙ্গার', 'কল্লোল', 'অজেয় ভিয়েৎনাম', 'মানুষের অধিকার', 'ফেরারি ফৌজ', 'টিনের তলোয়ার', 'ব্যারিকেড' ও 'নটী বিনোদিনী'।

'ঝড়' ছবিতে উৎপল দত্ত

উৎপল দত্ত যাত্রাসহ বহু বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেও ব্যাপক খ্যাতির অধিকারী হন। তিনি বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রও পরিচালনা করেন।

নাট্যবিষয়ক বহু প্রবন্ধ ও একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। বাংলায় অনুবাদ করেছেন বেশ কিছু বিদেশী ভাষার নাটক। 'শেক্সপিয়ারের সমাজ চেতনা' (১৩৭৯ ব.) তাঁর লেখা গুরুত্বপূর্ণ এক গ্রন্থ।

'এপিক থিয়েটার' নামক একটি সাময়িকী তিনি দীর্ঘকাল ধরে সম্পাদনা করেছেন। তিনি দেশ-বিদেশের নাট্যবিষয়ক বহু সভা-সেমিনারেও অংশ গ্রহণ করেছেন।

উৎপল দত্ত ১৯৯৩ সালের ১৯শে আগস্ট কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

উদবিড়াল/ভোঁদড়

মূলত তিন ধরনের উদবিড়াল (ভোঁদড়) আছে। ইউরেশিয়ান, আফ্রিকান ও জায়ান্ট অটার। বৈজ্ঞানিক নাম মাস্টেলিডি *(Mastelidae)*।

জলের কাছাকাছি থাকে। দক্ষ সাঁতারে ও 'ডাইভ' দিতে। একনাগাড়ে ৩/৪ মিনিট জলের তলায় থাকতে পারে। মাটিতেও হাঁটতে পারে।

ওজন ৪.৫—১৪ কিলোগ্রাম। লম্বায় ০.৯—১.৪ মিটার। সবচেয়ে বড় (আফ্রিকান) জাত হচ্ছে ১২ মিটার।

ঘাড় ও লেজ পুরু। জলের তলায় কান ঢেকে রাখে। পায়ে ইলাস্টিকের মতো মাংসপেশি ও চামড়া আছে। দ্রুত ডুব-সাঁতারে ওস্তাদ। হেয়ার গার্ড (চুল-লোম রক্ষাকারী) জল থেকে রক্ষা করে। হেয়ার গার্ড শীত থেকে বাঁচায়। ফারের মতো লোম মসৃণ। শরীর তাড়াতাড়ি শুকোয়।

বাদামি, গ্রে, সাদাটে রঙ হয়। গোঁফ অ্যান্টেনার (দ্র) কাজ করে। পা-কে হাতের মতো ব্যবহার করে। পা হাঁসের মতো জোড়া লাগানো। কেউ কেউ রেকুন (raccoon) পর্যন্ত

শিকার করে। সাপ, মাছ, কাঁকড়া, ব্যাঙ ইত্যাদি খায়।

খেলতে ভালবাসে। নানান রকম শব্দ করে।

গর্ত করে বাসা বানায়। গুহা, পরিত্যক্ত অন্য প্রাণীর গর্তেও থাকে। ওয়াটারপ্রুফ চামড়া ও লোম। পায়ে-মুখে শক্ত খাড়া লোম হয়। মাংসল লেজ। তেলতেলে গা। মাছের মতো পিচ্ছিল প্রাণীকেও সহজে পাকড়াও করে। এক যাত্রায় ১৫ কিলোমিটার পাড়ি দিতে পারে। কেউ কেউ দলবদ্ধভাবে হাঁস, ইঁদুর ও খরগোশের বাচ্চা শিকার করে। ৬০ ফুট পানির তলায় যেতে পারে।

২/৩টি বাচ্চা হয়। কয়েক মাস না হলে সাঁতার কাটতে পারে না। উদবিড়াল ১০ থেকে ১৫ বছর বাঁচে।

কমন অটার (Common otter), মসৃণ (smooth), ক্ললেস (clawless) বা নখরবিহীন উদবিড়াল বাংলাদেশে আছে।

শ. খা.

উদয়শঙ্কর পরিচালিত 'কল্পনা' ছবিতে নৃত্যে উদয়শঙ্কর ও স্ত্রী অমলাশঙ্কর

উদয়শঙ্কর [১৯০০—১৯৭৭]

উদয়শঙ্কর সুবিখ্যাত নর্তক, নৃত্যসংগঠক ও নবনৃত্য রচয়িতা। পৈতৃক নিবাস যশোর। রাজস্থানের উদয়পুরে তাঁর জন্ম। পিতা শ্যামশঙ্কর চৌধুরী। ছোটবেলা থেকেই আঁকার প্রতি ঝোঁক ছিল উদয়শঙ্করের। তিনি ষোলো-সতেরো বছর বয়সে বোম্বাইয়ের এক আর্ট স্কুলে ভর্তি হন ও সেখানকার পাঁচ বছরের শিক্ষাক্রম মাত্র দুই বছরে সমাপ্ত করে চিত্রকলায় উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য লণ্ডনের 'রয়াল কলেজ অব আর্টস'-এ ভর্তি হন। সেখানেও পাঁচ বছরের পাঠ তিনি সমাপ্ত করেন দুই বছরে। এর পরে উদয়শঙ্করের মনোনিবেশ ঘটে নৃত্যে। বিখ্যাত রুশ নর্তকী আনা পাভ্‌লোভার প্রেরণায় তিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য অনুশীলন শুরু করেন এবং লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে 'রাধাকৃষ্ণ' নৃত্যনকশা মঞ্চস্থ করেন। আনা পাভ্‌লোভার সঙ্গে উদয়শঙ্কর আমেরিকার নানা স্থানেও নৃত্য পরিবেশন করে বেড়ান। নৃত্যকলায় উদয়শঙ্কর প্রায় স্বশিক্ষিত। শঙ্করণ নাম্বুদ্রির কাছে তিনি কথাকলির পাঠ নিয়েছিলেন। এ ছাড়া যাবতীয় নৃত্যধারায়ই তিনি অধিকার অর্জন করেছিলেন নিজের অক্লান্ত চেষ্টায়। পাশ্চাত্য নৃত্যের পরিবেশে দীর্ঘকাল কাজ করলেও উদয়শঙ্করের নৃত্যরচনায় পাশ্চাত্য প্রভাব সামান্য। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যকলাকেই তিনি নানাভাবে তাঁর কাজে ব্যবহার করেছেন।

উদয়শঙ্কর একটি বিশিষ্ট নৃত্যধারার স্রষ্টারূপে খ্যাত। এর নাম শঙ্করনৃত্য। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের নানা ধারার সঙ্গে লোকনৃত্যের কিছু ঢঙ মিশেছে শঙ্করনৃত্যে। এর সঙ্গে মিশেছে উপস্থাপনা বিষয়ে কিছু পাশ্চাত্য ধারণা। উদয়শঙ্করের নৃত্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে নৃত্যনাট্য রচনায় ও পরিচালনায়। ছায়ানৃত্য পরিকল্পনায়ও তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। নৃত্যকেন্দ্র স্থাপন করে নৃত্যশিক্ষা প্রচারেও তিনি ব্রতী হয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে আলমোড়ায় তাঁর নৃত্যকেন্দ্র খোলার ব্যাপারটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শঙ্করণ নাম্বুদ্রি, আমোবা সিং, আলাউদ্দিন খাঁ প্রমুখ বিখ্যাত গুণী এই কেন্দ্রে যোগ দিয়েছিলেন।

'ইনস্টিটিউট অব্ ওরিয়েণ্টাল ডান্সেস্' প্রতিষ্ঠা তাঁর এক স্মরণীয় কীর্তি। বিশ্বসভায় ভারতীয় নৃত্যের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় উদয়শঙ্কর অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

ক. গো.

উদরাময় ডায়রিয়া দ্র

উদ্ভিদ

কঠিন খাদ্য গ্রহণে অক্ষম ও জড় কোষপ্রাচীরসম্পন্ন জীবের নাম উদ্ভিদ। প্রায় ৪ লক্ষ প্রজাতি নিয়ে উদ্ভিদজগৎ গঠিত। তাই উদ্ভিদজগৎ বিশাল ও বিচিত্র এক জগৎ। এদের কোনোটি সবুজ, কোনোটি অসবুজ। কোনোটির ডালপালা আছে, আবার কোনোটির নেই। কোনো উদ্ভিদের চলার ক্ষমতা আছে, আবার কোনোটির নেই। কোনো উদ্ভিদ এতই ছোট যে খালিচোখে দেখা যায় না। আবার কোনোটি বিশালাকার এবং তার উচ্চতা ৮৮ মিটার পর্যন্তও হয়ে থাকে। উদ্ভিদের কোনো স্নায়ুতন্ত্র (দ্র), রেচনতন্ত্র (দ্র) ও শ্বসনতন্ত্র (দ্র) নেই। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এদের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকতে পারে। সাধারণত শাখা-প্রশাখায় এর বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ থাকে।

উদ্ভিদজগতের শ্রেণীবিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি—

ক. স্বভোজী ও পরভোজী উদ্ভিদ :

দেহে ক্লোরোফিল (দ্র) থাকায় কোনো কোনো উদ্ভিদ নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করতে পারে। তাই এগুলোকে স্বভোজী উদ্ভিদ বলা হয় (যেমন আমগাছ, কাঁঠালগাছ)। যেসব উদ্ভিদ নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না তারা পরভোজী উদ্ভিদ। পরভোজী উদ্ভিদেরা পরজীবী (স্বর্ণলতা), মৃতজীবী (ব্যাঙের ছাতা) ও পতঙ্গভোজী (কলস উদ্ভিদ)—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

খ. বীরুৎ, উপগুল্ম, গুল্ম ও বৃক্ষ :

কাণ্ডের আকৃতি, গঠন ও উচ্চতার দিক থেকে উদ্ভিদজগৎ উক্ত চার শ্রেণীতে বিভক্ত। ছোট ও নরম কাণ্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদকে বীরুৎ বা ওষধি বলা হয়। যেমন ধানগাছ। আয়ুর দিক থেকে উদ্ভিদজগৎ বর্ষজীবী, দ্বি-বর্ষজীবী ও বহু-বর্ষজীবী—এ তিন ভাগে বিভক্ত।

গ. অপুষ্পক উদ্ভিদ ও সপুষ্পক উদ্ভিদ :

যেসব উদ্ভিদের ফুল হয় না সেগুলো অপুষ্পক উদ্ভিদ। অপুষ্পক উদ্ভিদ সমাঙ্গবর্গ, মস্‌বর্গ ও ফার্ন্‌বর্গ—এ তিন ভাগে বিভক্ত। সমাঙ্গবর্গের যেসব উদ্ভিদের দেহে ক্লোরোফিল (এক ধরনের সবুজ কণিকা) থাকে সেগুলোকে শৈবাল বা শেওলা (দ্র) বলা হয়। অপর দিকে এ বর্গের যেসব উদ্ভিদের দেহে ক্লোরোফিল নেই সেগুলোকে ছত্রাক (দ্র) বলা হয়।

যেসব উদ্ভিদের ফুল হয় সেগুলো সপুষ্পক উদ্ভিদ।

ঘ. আবৃতবীজী ও নগ্নবীজী উদ্ভিদ :

আবৃতবীজী ও নগ্নবীজী— এ দুই ভাগে বিভক্ত সপুষ্পক উদ্ভিদ। আবৃতবীজী উদ্ভিদ দু'ভাগে বিভক্ত। এর একটি একবীজপত্রী ও অপরটি দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদ।

ঙ. জলজ উদ্ভিদ, স্থলজ উদ্ভিদ, মরু-উদ্ভিদ ও লোনামাটির উদ্ভিদ :

পরিবেশভেদে উৎপন্ন বিভিন্ন উদ্ভিদকে মোটামুটিভাবে উক্ত চার ভাগে ভাগ করা যায়।

মানুষের জীবনে উদ্ভিদের গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্ভিদ মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন (দ্র) সরবরাহ করে। মানুষ উদ্ভিদ থেকে সংগ্রহ করে খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র এবং লেখাপড়া, চিকিৎসা ও অবসর বিনোদনের অজস্র সামগ্রী। তাই উদ্ভিদের প্রতি যত্নবান হওয়া আমাদের কর্তব্য।

মু. আ.

উদ্ভিদ, পতঙ্গভুক

কিছু কিছু উদ্ভিদের (দ্র) পত্রফলক পরিবর্তিত হয়ে বিশেষ ধরনের ফাঁদে রূপান্তরিত হয়। এ ফাঁদের সাহায্যে উদ্ভিদগুলো তখন ক্ষুদ্রাকৃতির পতঙ্গ ধরে তাদেরকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। এ কারণে এসব উদ্ভিদকে পতঙ্গভুক উদ্ভিদ বা ইনসেক্টিভোরাস উদ্ভিদ (Insectivorous plant) বলা হয়। পতঙ্গ ধরার ফাঁদগুলো নিম্নরূপ হতে পারে।

ক. কলস উদ্ভিদ :

নেপেন্থিস্ (Nepenthes) নামক এক প্রকার উদ্ভিদের পত্রফলক পরিবর্তিত হয়ে কলসের আকৃতি ধারণ করে এবং পতঙ্গ ধারার ফাঁদে রূপান্তরিত হয়। এ কারণে এ উদ্ভিদকে 'কলস উদ্ভিদ' বলা হয়। এ উদ্ভিদের ইংরেজি নাম পিচার প্ল্যান্ট (pitcher plant)। এ উদ্ভিদের পত্রফলকের শীর্ষভাগ কলসের ঢাকনা হিসাবে কাজ করে। অপর দিকে এর পত্রবৃন্তটি চ্যাপ্টা ও সবুজ হয়ে ফলকের মতো কাজ করে। ক্ষুদ্রাকৃতির কোনো পতঙ্গ সেই কলসের মধ্যে কোনোভাবে ঢুকে পড়লে ঢাকনাটি আস্তে করে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পতঙ্গ সেখানে আটকা পড়ে মরে যায়। বিবিধ প্রকার এনজাইমের

(দ্র) প্রভাবে উদ্ভিদ ক্রমে তা হজম করে ফেলে এবং পতঙ্গের দেহ থেকে নাইট্রোজেন (দ্র) সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে।

খ. থলি :

ঝাঁঝি নামক উদ্ভিদের পানিতে নিমজ্জিত পত্রফলক থলিতে রূপান্তরিত হয়। এর ইংরেজি নাম ব্লাডার ওআর্ট (Bladder wort) এবং বৈজ্ঞানিক নাম *ইউট্রিকুলারিয়া স্টিলারিস, এল (Utricularia stelaris, L)*। থলির এক প্রান্তে এমন একটি কপাটিকা (valve) থাকে যা কেবল ভেতরের দিকে খোলে। অতি ক্ষুদ্র জলজ কীটপতঙ্গ থলিটির কপাটিকা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে পারে ঠিকই কিন্তু বাইরে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। পরে থলির গা থেকে এনজাইম নিঃসৃত হয়ে পতঙ্গকে দ্রবীভূত করে এবং পরে ঐ প্রোটিন-ঘটিত পদার্থ শোষণ করে। ঝাঁঝি বাংলাদেশের (দ্র) প্রায় সব অঞ্চলেই জন্মে।

গ. সূর্যশিশির :

ড্রসেরা (Drosera) নামক উদ্ভিদের গোলাকার পত্রফলকের প্রান্তে কতকগুলো লাল বর্ণের কর্ষিকা আছে। প্রত্যেক কর্ষিকার অগ্রভাগ গোলাকার ও স্ফীত। কর্ষিকার অগ্রভাগ থেকে এক প্রকার চকচকে আঠালো পদার্থ নিঃসৃত হয়। ভোরবেলা তাতে সূর্যরশ্মি পতিত হলে তা চকচকে

দেখায়। ফলে কীটপতঙ্গ (দ্র) আকৃষ্ট হয়ে সেই পাতার উপরে বসলে আঠালো পদার্থে আটকে যায়। তখন কর্ষিকাগুলো বাঁকা হয়ে পতঙ্গের উপর আসে এবং তাকে ধরে ফেলে। পরে কর্ষিকা থেকে এনজাইম নির্গত হয়ে পতঙ্গকে দ্রবীভূত করে এবং আমিষ-ঘটিত তরল পদার্থ ক্রমেই শোষণ করে থাকে।

ঘ. ডাইওনিয়া :

ডাইওনিয়া উদ্ভিদের পত্রফলকের প্রান্তভাগ দাঁতের মতো। কোনো পতঙ্গ যখন ফলকের গাত্র স্পর্শ করে তখন অতি দ্রুত এর প্রান্ত দু'টি বেঁকে এসে মধ্যশিরা বরাবর সংযুক্ত হয়ে যায়। ফলে ডিম্বকের মতো একটি ফাঁদের সৃষ্টি হয় এবং তাতে পতঙ্গ আটকে যায়। শেষ পর্যন্ত পতঙ্গটি ডাইওনিয়া উদ্ভিদ কর্তৃক হজম হয়ে যায়।

মু. আ.

উনিশ দফা

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (দ্র) ঘোষিত উন্নয়নের কর্মসূচিসমূহ ১৯-দফা নামে পরিচিত। ১৯৭৭ সালের ২১শে মে তিনি ১৯-দফা ঘোষণা করেন। দফাসমূহ নিম্নরূপ :

১. সর্বতোভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

২. শাসনতন্ত্রের চারটি মূলনীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত করা।

৩. সব দিক থেকে নিজেদের আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসাবে গড়ে তোলা।

৪. প্রশাসনের সর্বস্তরে, উন্নয়নকার্যক্রমে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫. সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ তথা জাতীয় অর্থনীতিকে জোরদার করা।

৬. দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং কেউ যেন ভুখা না থাকে তার ব্যবস্থা করা।

৭. দেশে কাপড়ের উৎপাদন বাড়িয়ে সকলের জন্য অন্তত মোটা কাপড় সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৮. কোনো নাগরিক যেন গৃহহীন না থাকে তার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা।

৯. দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।

১০. দেশবাসীর জন্য ন্যূনতম চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা।

১১. সমাজে নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং যুবসমাজকে সুসংহত করে জাতিগঠনে উদ্বুদ্ধ করা।

১২. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দান।

১৩. শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সাধন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে সুস্থ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

১৪. সরকারি চাকুরিজীবীদের জনসেবা ও দেশগঠনে উৎসাহিত করা এবং তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করা।

১৫. জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা।

১৬. সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা।

১৭. প্রশাসন এবং উন্নয়নব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা।

১৮. দুর্নীতিমুক্ত ন্যায়নীতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা।

১৯. ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার পূর্ণ সংরক্ষণ করা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা।

পরবর্তী কালে এই ১৯-দফাই বি এন পি-র অর্থাৎ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (দ্র) যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার মূলসূত্রে পরিণত হয়।

সুজ. ব.

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গণশিক্ষাসহ সর্বস্তরের শিক্ষাকে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর কাছে বিশেষ করে অবহেলিত (যেমন— গ্রামীণ মহিলা, যুবক, কৃষি-কর্মী, স্বাস্থ্য ও

পরিবার পরিকল্পনা-কর্মী, সেবিকা) জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং কর্মরত জনশক্তিকে প্রগতিশীল প্রযুক্তিগুলোর আধুনিক উন্নয়নের সঙ্গে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে ঢাকার কাছে গাজীপুরে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। দেশের বৃহত্তম এবং ভিন্নধর্মী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল চত্বর ছাড়াও সারা দেশে ১০টি আঞ্চলিক কেন্দ্র (regional centre) এবং ৮১টি শিক্ষাকেন্দ্র (study centre) থাকবে। দেশের আর্থ-সামাজিক চাহিদা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্মমুখী (job oriented) স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী সার্টিফিকেট/ ডিপ্লোমা / ডিগ্রি প্রদান করা হবে। প্রাথমিক অবস্থায় যেসব প্রতিষ্ঠান (স্কুল) নিয়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম চালু করা হচ্ছে সেগুলো হল : ১. স্কুল অব এডুকেশন, ২. স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট, ৩. স্কুল অব হিউম্যানিটিজ অ্যাণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, ৪. স্কুল অব হেল্‌থ্ সায়েন্সেস, ৫. স্কুল অব এগ্রিকাল চার অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, ৬. স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেকনোলজি, ৭. স্কুল অব সায়েন্সেস, এবং ৮. স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্সেস অ্যাণ্ড উইমেন্স স্টাডিজ। এইসব স্কুলের অধীনে সার্টিফিকেট ইন মাস এডুকেশন, সেকেণ্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট, ব্যাচেলর ইন এডুকেশন, সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন, ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট, ডিপ্লোমা ইন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, সার্টিফিকেট ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, সার্টিফিকেট ইন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ, সার্টিফিকেট ইন হেল্‌থ্ অ্যাণ্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং, ডিগ্রি ইন এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন, সার্টিফিকেট ইন ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং, ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, সার্টিফিকেট ইন অটোমোবাইল্‌স্ ইত্যাদি কোর্স প্রদান করার কর্মসূচি রয়েছে। ইতোমধ্যে ব্যাচেলর ইন এডুকেশন কোর্সে পাঠপ্রদান শুরু হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে পোস্ট অফিস, রেডিও, টেলিভিশন এবং অন্যান্য প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত এলাকার আগ্রহী শিক্ষার্থীরা অল্প খরচে শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে।

মে. খা.

উপগ্রহ, কৃত্রিম

মানুষের মহাশূন্য অভিযানের যুগ শুরু হয় ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুৎনিক্-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে। কৃত্রিম উপগ্রহ হল মানুষনির্মিত ব্যবস্থা যা শক্তিশালী রকেটের (দ্র) মাধ্যমে উৎক্ষিপ্ত হয়ে কক্ষে স্থাপিত হয় এবং পৃথিবীকে (দ্র) প্রদক্ষিণ করে যায় চাঁদের (দ্র) মতো। স্পুৎনিক্-১-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত বহু কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে। এরকম অনেক উপগ্রহ আজ নিত্য আমাদেরকে বহু রকম কাজে সহায়তা করছে। এদের আকার, আয়তন, কাজ

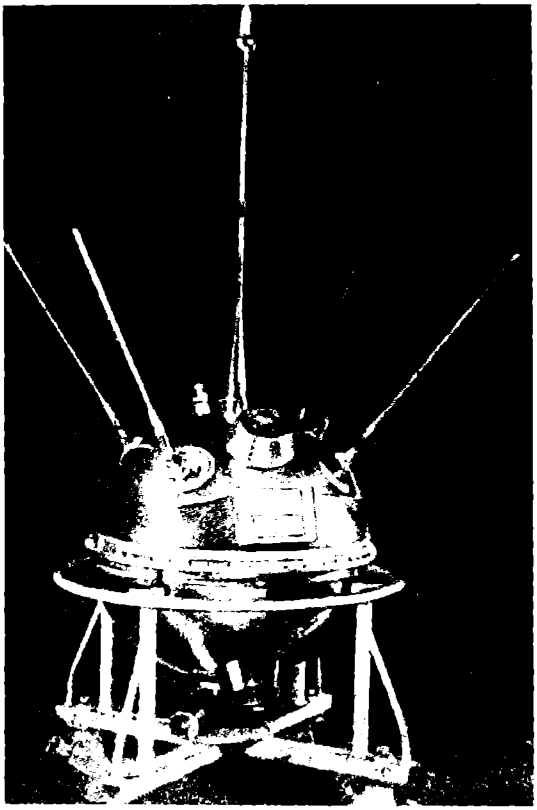

প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুৎনিক-১

বিচিত্র রকমের। এদের কার্যকাল শেষে এক পর্যায়ে নিজেদের যন্ত্রপাতি, ব্যাটারি ইত্যাদি ক্ষয় হয়ে যায়। মহাশূন্যে নানা রকম কণিকার সঙ্গে সংঘাতে গতি মন্থর হয়ে এক সময় এদেরকে ক্রমে পৃথিবীর কাছে চলে আসতে হয়। কক্ষপথে থাকার ন্যূনতম গতি বজায় না রাখতে পেরে এরা তখন

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়ে এবং তার ঘর্ষণে জ্বলে উঠে ধ্বংস হয়ে যায়।

নিজ নিজ কাজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কৃত্রিম উপগ্রহে থাকে। সবগুলোকেই পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য এবং পৃথিবীতে নিজেদের অবস্থান ঘোষণার জন্য বেতারব্যবস্থা বহন করতে হয়। কাজ অনুসারে বর্তমান কৃত্রিম উপগ্রহগুলোকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করা যায়।

যোগাযোগ উপগ্রহগুলো পৃথিবীর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় টেলিফোন (দ্র) আলাপ, অন্যান্য টেলি সঙ্কেত, টেলিভিশন (দ্র) প্রোগ্রাম ইত্যাদি পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রে, এমনকি বাড়ির ছাদে ডিশ অ্যান্টেনা (দ্র) দিয়ে আমরা এদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে সমলয়ে চলার ব্যবস্থা করলে এদের অনেকগুলোকে পৃথিবী থেকে স্থির দেখায়। এরা ভূ-স্থির উপগ্রহ।

আবহাওয়া উপগ্রহগুলো পরিক্রমাপথে বায়ুমণ্ডলে মেঘ (দ্র), ঘূর্ণি ইত্যাদির ছবি তুলে প্রেরণ করে অন্যান্য আবহাওয়া-তথ্যও দেয়, যার ফলে বিশাল জায়গার আবহাওয়া (দ্র) সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয়।

দূর-অনুধাবন উপগ্রহগুলো ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবর্তন, কৃষি, বন, মৎস্য ইত্যাদির তথ্য নিয়মিত পাঠায় যা টেলিভিশনের মতো পর্দায় বিস্তারিত মানচিত্রে ফুটে ওঠে।

অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ছাড়াও এরকম উপগ্রহ বহু ধরনের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানও চালিয়ে থাকে। কৃত্রিম উপগ্রহের পক্ষে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ সহজ হয় বলে জ্যোতির্বিদ্যার (দ্র) কাজেও কোনো কোনো উপগ্রহ ব্যস্ত রয়েছে। বিমান চালনা ও সমুদ্রে জাহাজ চালনার সুবিধার্থে কিছু দিগ্‌দর্শক উপগ্রহ রয়েছে। আর কিছু উপগ্রহ রয়েছে যেগুলো যথেষ্ট গোপনে কাজ করে, সেগুলো সামরিক কাজে ব্যবহৃত হয়।

মু. ই.

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী (দ্র) বা উপজাতীয়দের যুগপ্রাচীন সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও তার পুনরুজ্জীবন ও বিকাশ সাধনের লক্ষ্য থেকে রাঙ্গামাটিতে ১৯৭৮ সালে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এক জন পরিচালক এই সংস্থার যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকেন, অর্থাৎ তিনিই এর প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের ৪টি শাখা রয়েছে। শাখাগুলো হচ্ছে: ক. সংস্কৃতি শাখা; খ. গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা; গ. জাদুঘর শাখা; এবং ঘ. প্রশাসনিক শাখা। প্রত্যেকটি শাখার পরিচালনায় নিযুক্ত রয়েছেন সর্বমোট ৪ জন সহকারী পরিচালক।

ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক শাখার সংখ্যা ২টি। এর একটি খাগড়াছড়িতে এবং অপরটি কক্সবাজারে অবস্থিত। এগুলো এই সংস্থার সাংস্কৃতিক উপকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত।

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও প্রকাশনাকাজের অন্তর্ভুক্ত ষান্মাসিক 'উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা' ও ত্রৈমাসিক 'গিরিনির্ঝর' নামের ২টি সাময়িকীসহ উপজাতীয় বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ এবং চাকমা, মার্‌মা ও ত্রিপুরা ভাষা শিক্ষাদান ইত্যাদি।

সাংস্কৃতিক শাখার কাজের অন্তর্ভুক্ত নিয়মিত বাংলা ও উপজাতীয় ভাষায় সঙ্গীত শিক্ষাদান, বাদ্যযন্ত্রের প্রশিক্ষণ, উপজাতীয় ভাষায় নাটক (দ্র) ইত্যাদির মঞ্চায়ন এবং নৃত্যসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

ইনস্টিটিউটে 'উপজাতীয় জাদুঘর' নামে একটি সংগ্রহশালা রয়েছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজাতির ব্যবহৃত ও তৈরি ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী, মুদ্রা, পাণ্ডুলিপি (দ্র), পোশাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র, ফাঁদ এবং বেতের তৈরি সামগ্রীসহ অলঙ্কার ইত্যাদি সংরক্ষণপূর্বক প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে।

আ. হু.

উপন্যাস

সাহিত্যের একটি শাখা। এর বাঁধাধরা সন্তোষজনক কোনো সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। একটা সহজ সংজ্ঞা হল 'গদ্যে লিখিত দীর্ঘ গল্প'। উপন্যাসে সাধারণত নানা চরিত্র, ঘটনা, সমাজ-জীবন ও পটভূমির বর্ণনা থাকে। কার্যকারণের সূত্র ধরে সাধারণত এর গল্প বা কাহিনী পরিবেশিত হয়। ইংরেজি নভেল (novel) শব্দের বাংলা উপন্যাস। কথাটি এসেছে ইতালীয় নোভেল্লা (novella) থেকে। নোভেল্লা ছিল গদ্যে

রচিত ছোট কাহিনী। বর্তমানে ছোটগল্পের (দ্র) চাইতে আকারে বড় কিন্তু উপন্যাসের চাইতে ছোট রচনাকে নভেলেট (novelette) বা উপন্যাসিকা বলা হয়।

বিষয়বস্তু, শৈল্পিক উদ্দেশ্য, গুরুত্ব বা ঝোঁক প্রভৃতির বিচারে উপন্যাসকে নানা উপশাখায় ভাগ করা হয়। যেমন—ক. ঐতিহাসিক উপন্যাস : বঙ্কিমচন্দ্রের (দ্র) 'রাজসিংহ' (১৮৮২) ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে স্বীকৃত। আবু জাফর শামসুদ্দীনের (দ্র) 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান (১৯৬৩)-এ ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপাদান আছে। সত্যেন সেন (দ্র) -এর 'আলবেরুনী'কে (১৯৬৯) ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায়। ইংরেজি সাহিত্যে ওয়াল্টার স্কটের (দ্র) 'আইভান হো', চার্লস ডিকেন্সের (দ্র) 'এ টেইল অব টু সিটিজ' (দ্র) সুপরিচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস।

খ. সামাজিক উপন্যাস : সমাজ, সমাজের মানুষের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, সমস্যাদি, তার জীবনের আদর্শ, বিশ্বাস, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতি নিয়ে সামাজিক উপন্যাস গড়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের (দ্র) শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের (দ্র) 'গোরা' (১৯১০), শরৎচন্দ্রের (দ্র) 'গৃহদাহ' (১৯২০), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (দ্র)-র 'লালসালু' (১৯৪৮) শওকত ওসমানের 'জননী' (১৯৬১), শহীদুল্লা কায়সারের (দ্র) 'সংশপ্তক' (১৯৬৫) প্রভৃতি।

গ. আঞ্চলিক উপন্যাস : এখানে কাহিনী ও চরিত্রাবলি একটি বিশেষ অঞ্চলের পটভূমিতে পরিবেশিত হয়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি, তাদের সমস্যা, মুখের ভাষা প্রভৃতি এ জাতীয় উপন্যাসে তুলে ধরা হয়। মহৎ আঞ্চলিক উপন্যাস আঞ্চলিকতাকে ছাড়িয়ে সর্বজনীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম হয়ে ওঠে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (দ্র) 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' (১৯৪৭), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (দ্র) 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), অদ্বৈত মল্লবর্মণের (দ্র) 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬), মহাশ্বেতা দেবীর 'অগ্নিগর্ভ' (১৯৭৮) আঞ্চলিক উপন্যাসের দৃষ্টান্ত।

আধুনিক কালে আমরা আরো নানা ধরনের উপন্যাস দেখি, যেমন—চেতনাপ্রবাহের উপন্যাস, রূপক-প্রতীকী উপন্যাস, অস্তিত্ববাদী উপন্যাস ইত্যাদি।

উপন্যাস প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলা যায়। পৃথিবীর সব ভাষার সাহিত্যেই উপন্যাস এসেছে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে। মহাকাব্য (দ্র), কবিতা (দ্র), কাহিনী-কাব্য প্রভৃতির পরে উপন্যাস-সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছে। সমাজ একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছুবার আগে উপন্যাসের সৃষ্টি সম্ভব হয় নি।

ক. চৌ.

উপবৃত্ত

এটি এক ধরনের কণিকচ্ছেদ (conic section) অর্থাৎ একটি সমবৃত্তীয় শঙ্কুকে (right circular cone) একটি সমতল যদি ছেদ করে, তবে একটি উপবৃত্ত তৈরি হয়।

সমবৃত্তীয় কোণকে ভূমির সমান্তরালভাবে কোনো সমতল ছেদ করলে বৃত্ত তৈরি হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো বিন্দুর সঞ্চারপথ (locus) যদি এমনভাবে চলমান হয় যে দু'টি স্থির বিন্দু থেকে এর দূরত্বদ্বয়ের যোগফল সর্বদাই ধ্রুব থাকে, তাহলে সেই সঞ্চারপথকে 'উপবৃত্ত' বলে। অথবা, কোনো বিন্দুর সঞ্চারপথ যদি এমনভাবে চলমান হয় যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে এর দূরত্ব ও একটি প্রদত্ত রেখার অনুপাত সর্বদাই ধ্রুব থাকে এবং এই ধ্রুব অনুপাত ১-এর কম হয় তখন তাকে উপবৃত্ত বলে।

হো. আ.

উপসাগর সাগর দ্র

উপহ্রদ লেগুন্ / উপহ্রদ দ্র

উপালি

উপালি হলেন গৌতম বুদ্ধের (দ্র) বিশিষ্ট শিষ্য। তাঁর বাবা ছিলেন কপিলবাস্তুর রাজকুলের নাপিত।

শাক্য রাজবংশের রাজপুত্রেরা ছিলেন উপালির সমবয়সী। উপালি সব সময় তাঁদের সঙ্গেই থাকতেন এবং তাদের সেবা-কর্ম করতেন।

অনিরুদ্ধ, আনন্দ (দ্র), দেবদত্ত প্রমুখ রাজপুত্রেরা যখন প্রব্রজ্যাগ্রহণ করবার জন্য যাত্রা করেন তখন তাঁরা উপালিকেও সঙ্গে নেন। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর রাজপুত্রেরা নিজেদের শরীরের মূল্যবান বসন-ভূষণ খুলে উপালির হাতে দিয়ে তাঁকে কপিলবাস্তুতে ফিরে যেতে বলেন। কিন্তু কপিলবাস্তুতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে রাজপুত্রদের পথ অনুসরণ

করাই উপালির কাছে শ্রেয় মনে হয়। তিনিও বুদ্ধের নিকট গমন করেন। বুদ্ধদেব (দ্র) রাজপুত্রদের সঙ্গে তাঁকেও প্রব্রজ্যা প্রদান করে ভিক্ষু-ধর্মে দীক্ষা দেন। উপালি ক্রমে অর্হত্ব (দ্র) লাভ করেন।

ত্রিপিটকের (দ্র) দ্বিতীয় অংশ বিনয়পিটকে ভিক্ষুসংঘের যে নিয়মকানুন এবং তাঁদের দৈনন্দিন করণীয় আচার-ব্যবহার-বিধি লিপিবদ্ধ আছে, উপালি সে বিষয়ে ছিলেন অসামান্য পণ্ডিত। এই পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'বিনয়ধর' উপাধি পেয়েছিলেন। বিনয় বিষয়ে যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য ভিক্ষুরা তাঁর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর রাজগৃহের সপ্তপর্ণীগুহায় রাজা অজাতশত্রুর সমর্থনে স্থবির মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে প্রথম যে মহাসঙ্গীতি (ধর্মীয় মহাসম্মেলন) হয়, তাতে উপালির সাহায্যেই বিনয়পিটকের সঙ্কলন (দ্র) প্রণয়ন সুসম্পন্ন হয়।

সুজ. ব.

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী [১৮৬৩—১৯১৫]

বাংলা শিশুসাহিত্যের অগ্রণী পুরুষ, সঙ্গীত-বিদ, চিত্রশিল্পী এবং বাংলা মুদ্রণশিল্পের (দ্র) অন্যতম পথিকৃৎ। ১৮৬৩ সালের ১০ই মে ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা কালীনাথ রায়। মুন্সী শ্যামসুন্দর নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর মাতা জয়তারা দেবী। পিতা-মাতার আট সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। তাঁর পূর্বনাম ছিল কামদারঞ্জন। কিন্তু পাঁচ বছর বয়সে পিতা কালীনাথ রায়ের দূর সম্পর্কের এক কাকা হরিকিশোর রায়চৌধুরী তাঁকে পোষ্যপুত্র বা দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করলে তাঁর নতুন নাম রাখা হয় উপেন্দ্রকিশোর।

হরিকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন সুপণ্ডিত জমিদার।

বাঘের পিঠে জোলা

কানা খানা গানা গানা
কেমন লাগে কুমির ছানা

ঘি টি ফেলে
সবাই পালাচ্ছে

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর নিজের লেখা গল্পের জন্য নিজের আঁকা ছবি

তাঁরই ঔদার্যপূর্ণ স্নেহে উপেন্দ্রকিশোর লালিতপালিত হন। ১৮৮০ সালে ময়মনসিংহ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি নিয়ে পাশ করে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে (দ্র) ভর্তি হন। ১৮৮৪ সালে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট থেকে তিনি বি. এ. পাশ করেন। এ সময় তিনি ব্রাহ্মসমাজে (দ্র) যোগ দেন।

উপেন্দ্রকিশোর বালক বয়স থেকেই তৎকালীন শিশু-কিশোর পত্রিকা 'সখা' (দ্র), 'বালক', সাথী', 'সখা ও সাথী', 'মুকুল' ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৩ সালে 'সখা' পত্রিকায় তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। তখন তিনি ছিলেন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। এর পর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর সাহিত্যচর্চা চলতে থাকে। ছড়া, উপকথা (দ্র), রূপকথা (দ্র), পৌরাণিক কাহিনী ও বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী রচনাসহ শিশুসাহিত্যের নানা শাখায় বিচরণ করে তিনি বাংলা শিশুসাহিত্যের দিঙ্‌নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেন।

১৯১৩ সালে উপেন্দ্রকিশোর শিশু-কিশোরদের জন্য 'সন্দেশ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় দেশ-বিদেশের গল্প, হাস্য-কৌতুক কাহিনী, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা ইত্যাদি লেখার পাশাপাশি তিনি নিজের আঁকা নানা বুদ্ধিদীপ্ত ছবি সংযোজন করতে থাকেন। এভাবে 'সন্দেশ' পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমে তিনি বাংলা শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেন।

উপেন্দ্রকিশোরের উল্লেখযোগ্য বই হল— 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছোটদের মহাভারত', 'মহাভারতের গল্প', 'ছোট্ট রামায়ণ', 'টুনটুনির বই', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' এবং 'সেকালের কথা'। এসব বইয়ে ছোটদের মনস্তত্ত্ব সংলগ্ন এক আশ্চর্য আকর্ষণীয় প্রকাশভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ভাষা যেমন সুষমামণ্ডিত, তেমনি বিষয়োপযোগী। তাঁর এই বইগুলোর প্রচ্ছদ এবং ভেতরের ছবিও আঁকেন তিনি নিজে। এ ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের (দ্র) উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদে এবং রবীন্দ্রনাথের (দ্র) 'নদী' কবিতার সঙ্গে সংযোজিত তাঁর অঙ্কন বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

উপেন্দ্রকিশোর তাঁর প্রথম বই 'ছেলেদের রামায়ণ'-এর চিত্রমুদ্রণমানে অসন্তুষ্ট হয়ে ১৮৯৫ সালে বিলেত থেকে তখনকার দিনের আধুনিকতম যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে নিজেই প্রেস খুলে বসেন। ১৮৯৬ সালের দিকে স্টুডিও, ডার্ক-রুম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে হাফটোনমুদ্রণ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। এভাবে তিনি সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় সেকালে ইউরোপে (দ্র) প্রচলিত নিয়মগুলো আয়ত্ত করে তার আরো উন্নতিসাধনের চেষ্টা চালাতে থাকেন। হাফটোন-ব্লক চর্চার সেই আদি যুগে নানা ধরনের ডায়াফ্রাম তৈরি এবং রে-স্ক্রিন অ্যাডজাস্টার যন্ত্র ও ব্লক তৈরির ক্ষেত্রে ডুয়োটাইপ আর রে-টিন্ট পদ্ধতির নতুন দিক উন্মোচন তাঁরই অন্যতম মৌলিক অবদান। এ বিষয়ে তিনি বিলেতের বিখ্যাত পেনরোজ অ্যানুয়েলে অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ ও হাতে-কলমে কাজের বিবরণ অর্থাৎ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রবন্ধ লিখে পাঠান। তাঁর সেই প্রবন্ধগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে সেখানে ছাপা হয় এবং তাঁর উদ্ভাবিত নতুন নিয়মগুলো সেখানেও গৃহীত হয়। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'তে উপেন্দ্রকিশোরের এই অবদানের কথা উল্লেখ আছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ইউ. রায় এণ্ড সন্স' দেশীয় প্রসেস-শিল্প মুদ্রণের ক্ষেত্রে একটি অগ্রপথিক প্রতিষ্ঠান।

উপেন্দ্রকিশোর বাল্যকাল থেকে সঙ্গীতবিদ্যা চর্চার প্রতিও উৎসাহী ছিলেন। পাখোয়াজ (দ্র), হার্মোনিয়াম (দ্র), সেতার, বাঁশি (দ্র) এবং বেহালাবাদনে তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্পর্কেও তিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। 'বেহালা শিক্ষা' (১৯০৪) এবং

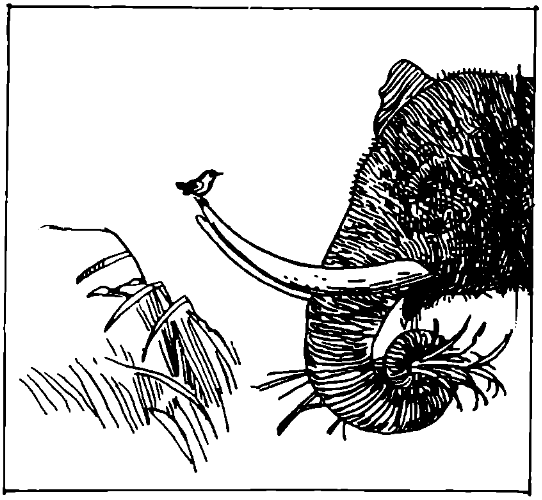

'হার্মোনিয়াম শিক্ষা' (১৯০৫) নামে তিনি দু'টি পুস্তিকাও রচনা করেছিলেন।

উপেন্দ্রকিশোরের ছয় সন্তানের প্রায় সকলেই বাংলা শিল্প-সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে কন্যা সুখলতা রাও (দ্র) ও পুণ্যলতা চক্রবর্তী এবং পুত্র সুকুমার রায় (দ্র) ও সুবিনয় রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী কালের বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় (দ্র) তাঁরই পৌত্র (সুকুমার রায়ের পুত্র)।

১৯১৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর তিপ্পান্ন বছর বয়সে উপেন্দ্রকিশোর পরলোক গমন করেন।

সুজ. ব.

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, স্যার [১৮৭৫—১৯৪৬]

বাঙালি চিকিৎসাবিজ্ঞানী। তিনি কালাজ্বরের ঔষধ 'ইউরিয়া স্টিবামিন' নামক ইনজেকশন আবিষ্কার করেন। এটি 'ব্রহ্মচারী ইনজেকশন' নামে অধিক পরিচিত। সে সময় কালাজ্বরের কোনো কার্যকরী ঔষধ ছিল না। তিনি ১৯২১ সালে এই ইনজেকশন আবিষ্কার করেন। তবে এর স্বীকৃতি পান আরো পরে।

উপেন্দ্রনাথ ১৮৭৫ সালের ৭ই জুন জামালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ১৮৯৩ সালে তিনি হুগলি কলেজ থেকে গণিতশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। এর পর একই সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্র ও রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করে কৃতিত্বের সঙ্গে এম.বি. এবং এম.এ. পাশ করেন। এম.বি.পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তিনি 'গুডিভ' ও 'ম্যাকলাইড' পদক পান। ১৯০২ সালে তিনি এম.ডি. এবং ১৯০৪ সালে শারীরতত্ত্বে (দ্র) পি.এইচডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবনের শুরুতে উপেন্দ্রনাথ ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের প্যাথলজি ও মেটিরিয়া মেডিকার (materia medica) শিক্ষক এবং ১৯০৫ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে মেডিসিনের শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। কারমাইকেল কলেজেও কিছু দিন অধ্যাপনা করেন। এর পর ম্যালেরিয়া (দ্র), ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার এবং রসায়নশাস্ত্র (দ্র) বিষয়ে ব্যাপক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৪ সালে উপেন্দ্রনাথ তৎকালীন ভারত সরকার কর্তৃক 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৩৬ সালে তিনি ইন্দোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি ছিলেন বিলেতের 'রয়্যাল সোসাইটি অব মেডিসিনের' সদস্য। দেশীয় ঔষধ তৈরির ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান 'ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর অবদান উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে লেখা তাঁর 'ট্রিটিজ অন কালাজ্বর' বইটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি পরলোকগমন করেন।

সুজ. ব.

উপোসথ

'উপোসথ' শব্দের সাধারণ অর্থ উপবাস। বৌদ্ধেরা বিশেষ অনুষ্ঠান হিসাবে এটি পালন করে থাকে। এটি তাদের অবশ্যপালনীয় একটি অনুষ্ঠান।

মাসের নির্দিষ্ট চার দিন উপোসথব্রত পালন করা হয়। এই চার দিন হল—পূর্ণিমা, কৃষ্ণা-অষ্টমী, অমাবস্যা ও শুক্লা-অষ্টমী। উপোসথ দিনে পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে পবিত্র মনে বিহারে সমবেত হয়ে উপোসথ পালনকারীকে ভিক্ষুর (দ্র) সামনে প্রতিজ্ঞা করতে হয় যে তিনি বুদ্ধের (দ্র) নির্দেশিত অষ্টশীল (দ্র) বা আটটি নিয়ম রক্ষা করে চলবেন। এই দিন দুপুর বারোটা থেকে পরদিন আনুষ্ঠানিকভাবে উপোসথব্রত ত্যাগ না করা পর্যন্ত উপোসথ পালনকারীকে অন্ন জাতীয় খাবার পরিহার করে চলতে হয়। তবে তিনি নির্দিষ্ট কিছু পানীয় গ্রহণ করতে পারেন। এ ছাড়া তাঁকে ঐ দিন চিন্তায় ও বাক্যে সংযমী হতে হয় এবং সংসারের বিষয়কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়।

বৌদ্ধধর্মের (দ্র) প্রথম দিকে এই অনুষ্ঠান ছিল না। রাজা বিম্বিসারের (দ্র) পরামর্শে বুদ্ধদেব এই অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন বলে জানা যায়।

সুজ. ব.

উপ্পলবন্না

উপ্পলবন্না বুদ্ধের (দ্র) অন্যতম শিষ্যা। শ্রাবস্তীনগরের সম্ভ্রান্ত এক শ্রেষ্ঠীর অর্থাৎ ব্যবসায়ীর ঘরে তার জন্ম হয়। তিনি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। তাঁর দেহের বর্ণ ছিল উৎপল বা

নীলপদ্মগর্ভের মতো। তাঁকে এ জন্য উৎপলবর্ণা বলা হত। সংস্কৃত 'উৎপলবর্ণা' শব্দটিই পালি ভাষায় (দ্র) পাল্টে গিয়ে হয়েছে 'উপ্পলবন্না।'

নগরের অনেক যুবরাজ এবং ধনবান ব্যক্তি তাঁকে বিয়ে করবার প্রস্তাব পাঠান। তাঁদের এক জনের সঙ্গে বিয়ে দিলে উপ্পলবন্না অন্যদের কোপ-দৃষ্টিতে পড়বেন— এই আশঙ্কায় তাঁর পিতা তাঁকে বিয়ে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁকে ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ে সমর্পণ করেন।

এক দিন একটি দীপ জ্বালিয়ে তার শিখা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে করতে উপ্পলবন্না অর্হত্ব (দ্র) লাভ করেন। সিদ্ধিপ্রাপ্ত ভিক্ষুণীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্যা। শ্রাবস্তীর অদূরে অন্ধবনের একটি গুহায় তিনি ধ্যানমগ্না থাকতেন। এমনি একটি দিনে নন্দ নামে তাঁর এক মাতুলপুত্র তাঁকে অসম্মান করে। সেই থেকে বৌদ্ধধর্মে ভিক্ষুণীদের বনবাস নিষিদ্ধ হয়।

সুজ. ব.

উফশী ফসল

উফশী কথাটি 'উচ্চ ফলনশীল' কথার সংক্ষিপ্ত রূপ। ষাটের দশকের শুরু থেকে আমাদের দেশসহ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বিরাট উন্নতি সাধিত হয়। তারও কয়েক বছর আগে গমের ক্ষেত্রেও এরকম পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। এগুলো সম্ভব হয়েছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারায় উচ্চফলনশীল ফসল উদ্ভাবনের মাধ্যমে। এগুলো উন্নয়নশীল বিশ্বে গম ও ধানের ফলন অবিশ্বাস্যরকম বাড়িয়ে সবুজ বিপ্লবের সূচনা করেছে। এ রকম বেশ কিছু দেশ থেকে দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া সরে গিয়ে তারা খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। কেউ কেউ শস্য রপ্তানিকারক দেশেও পরিণত হয়েছে। এ সাফল্যে অবদানের জন্য মার্কিন কৃষিবিদ নর্ম্যান বর্লাউগ্ (Norman E. Borlaug)-কে ১৯৭০ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। তিনি চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে মেহিকো (Mexico)-তে উফশী গমের উদ্ভাবনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। ধানের ক্ষেত্রে গবেষণার নেতৃত্ব এসেছে ফিলিপাইনের ম্যানিলার কাছে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ইরি' (দ্র)-র বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে।

উফশী ফসলের সাফল্যের মূলে কাজ করেছে বর্তমান জাতগুলো থেকে বাছাইয়ের যথাযথ জাতের মধ্যে কৃত্রিম সঙ্করায়ণ ঘটিয়ে নতুন গুণসম্পন্ন জাত উদ্ভাবন। এসব জাত অধিক হারে সার (দ্র) গ্রহণ করে তাকে অধিক ফসলে পরিণত করতে সক্ষম। সাধারণত এরা বেঁটে জাত হয়ে থাকে যা ফসল বহনে অধিক সক্ষম এবং ঝড়-বৃষ্টিতে সহজে নুয়ে পড়ে না। উৎপাদনশক্তি অধিকাংশ ব্যয়িত হয় ফসলের জন্য, খড়ের জন্য নয়। তা ছাড়া ফলনকাল কম বলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই জমিতে বছরে তিনটি ফসলও সম্ভব হয়েছে।

উফশী ফসল সবুজ বিপ্লব এনেছে বটে, কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে এর কিছু কুফলও স্পষ্ট হয়ে উঠছে—যা কালক্রমে আরো গুরুতর পরিণতি আনতে পারে। উচ্চ ফলন আসে অধিক পরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োগের মাধ্যমে। রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা আরো বাড়ছে কম খড় উৎপাদন, জমির বিশ্রাম না পাওয়া, শস্য আবর্তন না ঘটা ইত্যাদি কারণে জমির স্বাভাবিক উর্বরতা বজায় না থাকার কারণে। উফশী ফসল সাধারণত কীটপতঙ্গ, রোগ-বালাইয়ের দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয়। তাই এতে প্রচুর পরিমাণে কীট ও রোগ-নাশক প্রয়োগ করতে হয়। রাসায়নিক সার ও কীট-বালাই-নাশক দ্রব্যাদি গুরুতর পরিবেশদূষণের কারণ ঘটাচ্ছে। উফশী প্রবর্তনের ফলে লাভজনক একই ফসল এবং সে ফসলের মাত্র কয়েকটি জাত সর্বত্র ফলানোর প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কৃষিতে তাই ভারসাম্য থাকছে না, হাজার বছরে গড়ে ওঠা প্রাকৃতিক জাত-বৈচিত্র্যও চিরতরে হারিয়ে আমরা এক সময় অসহায় হয়ে পড়তে পারি। উফশীর গবেষণাকে তাই এসব দিকে মনোযোগী হতে হবে।

মু. ই.

উমর ইবনে আবদুল আজিজ [৬৮২—৭১৯]

উমর ইবনে আবদুল আজিজকে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ধর্মনিষ্ঠা ও খাঁটি ইসলামী চরিত্রের জন্য ইসলামের (দ্র) পঞ্চম খলিফা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। 'খুলাফা-ই-রাশেদীন' (দ্র) নামে পরিচিত চার খলিফার পর উমর ইবনে আবদুল আজিজ অসামান্য দক্ষতায় তাঁর শাসনামলকে খিলাফতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা

খিলাফতপরবর্তী আর কোনো মুসলিম শাসকের আমলে দেখা যায় নি।

তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশীয় অষ্টম খলিফা। তাঁর জন্ম ৬৮২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায়। তাঁর পিতা ছিলেন মিশরস্থ উমাইয়া গভর্নর। সেই সূত্রে তিনি সেখানেই লালিতপালিত হন এবং শিক্ষালাভ করেন। তিনি ইসলামী বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ ৭১৭ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হিসাবে দায়িত্বগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বসূরি সুলাইমান মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে খলিফা মনোনীত করে গেলেও তিনি প্রকাশ্য জনসমর্থন নিয়েই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁর সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং বিচক্ষণতা সর্বজনবিদিত। তিনি সমাজের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান নানা কুপ্রথা তিনি রহিত করেন। তিনি নও-মুসলিমদের নিকট থেকে জিজিয়া কর আদায়ের প্রথা বিলুপ্ত করেন। প্রভাবশালী উমাইয়া আমির-ওমরাহ এবং ব্যক্তিরা জনসাধারণের যে সকল সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছিল, তিনি তা প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এসব কারণে তিনি প্রবল বিরোধিতা এবং শত্রুতার মুখোমুখি হলেও অকুতোভয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অটল ছিলেন।

তিনি খুলাফা-ই-রাশেদীনের মতো সাদাসিধে জীবন-যাপন করতেন, কোনো রকম অপচয় দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন নি। খলিফা হিসাবে সরকারি তহবিল থেকে তিনি কোনো ভাতা নিতেন না। তাঁর মাত্র দু' বছরের শাসনকাল (৭১৭—৭১৯) ছিল প্রকৃতপক্ষে উমাইয়া শাসনের স্বর্ণযুগ। ৭১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করেন।

মু. মা.

উমর ফারুক (রা.), হযরত [৫৯২-৬৪৪]

হযরত উমর (রা.) মুসলিম জগতের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। তাঁকে 'আমিরুল মোমেনিন' বা বিশ্বাসীদের নেতা বলা হত। ৫৯২ খ্রিস্টাব্দে (দ্র) মক্কায় তাঁর জন্ম হয়।

জীবনের প্রথম দিকে তিনি ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। কিন্তু এক আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়ে তিনি ইসলাম (দ্র) গ্রহণ করেন। এবং ইসলাম প্রচারে এক বিশিষ্ট শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

তাঁর খিলাফতের সময় মুসলমান সাম্রাজ্যের ঈর্ষণীয় বিস্তার ঘটে। তিনি পারস্য, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিশর জয় করেন। জেরুজালেমে (দ্র) হযরত উমরের (রা.) তৈরি মসজিদ এখনো তাঁর স্মৃতি বহন করছে।

উমর (রা.) অত্যন্ত খোদাভীরু ও উন্নত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। রাজ্যশাসন, ন্যায়বিচার, সাহস, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং অসহায় ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর সুখ্যাতি ছিল প্রবাদতুল্য। মুসলিম জগতের খলিফা হিসাবে তিনি ছিলেন এক জন সুবিবেচক শাসক।

তিনি সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভের উদ্দেশ্যে প্রায়ই রাত্রিবেলা একাকী বিভিন্ন জনপদে ভ্রমণ করতেন।

হযরত উমর (রা.) ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের (২২ হিজরি) ৩রা নভেম্বর এক ক্রীতদাসের ছুরিকাঘাতে শহীদ হন।

মু. মা.

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৪১—১৯০৬]

রাজনৈতিক নেতা, আইনজীবী এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (দ্র) প্রথম সভাপতি। তাঁর জন্ম কলিকাতার (দ্র) খিদিরপুরে ১৮৪১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর।

১৮৬৪ সালে তিনি একটি বৃত্তি পেয়ে ইংল্যাণ্ডে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে যান। অবিভক্ত ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতির স্বার্থে ১৮৬৫ সালে লণ্ডনে (দ্র) 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে যে সংগঠনটি গড়ে ওঠে, তিনি ছিলেন তাঁর মূল উদ্যোক্তা ও প্রথম সম্পাদক।

১৮৬৮ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করে উমেশচন্দ্র স্বদেশে ফিরে এসে আইনব্যবসা শুরু করে। ১৮৭১ সালে তাঁর সম্পাদনায় 'হিন্দু উইলস্ অ্যাক্ট ১৮৭০' প্রকাশিত হয়। ১৮৮৩ সালে ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হলে তিনি তাঁর পক্ষ সমর্থন করেন।

১৮৮৫ সালে বোম্বাইয়ে ও ১৮৯২ সালে এলাহাবাদে (দ্র) অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের (দ্র) প্রথম ও অষ্টম অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন।

কর্মজীবনে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বপালন করেন। ১৯০২ সাল থেকে তিনি লণ্ডনে

স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। আমৃত্যু তিনি ব্রিটেনের প্রিভি কাউন্সিলে আইনব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন।

মধ্যপন্থী ও রাজনৈতিক সংস্কারপন্থী এই নেতা ১৯০৬ সালে লণ্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

উম্মত

আভিধানিক অর্থ দল, গোত্র, জাতি। ইসলামী পরিভাষায় 'উম্মত' বলতে এমন দল, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা আল্লাহর অনুগত, তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী এবং তাঁর বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করে। যেমন নূহ (দ্র), ইবরাহিম (দ্র), ইসমাইল (দ্র), মুসা (দ্র), ঈসা (দ্র) প্রমুখ নবী-রসূলের অনুসারীরা তাঁদের 'উম্মত' নামে পরিচিত। মুসলমানগণ শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (স.)-এর উম্মত। বর্তমানে তাঁদের সম্পর্কেই এই শব্দটি বহুল ব্যবহৃত।

পবিত্র কুরআনের (দ্র) বহু স্থানে এই শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

মু. মা.

উর্দু ভাষা

'উর্দু' একটি তুর্কি (দ্র) শব্দ যার অর্থ— সেনাছাউনি, বাজার। মুসলমানেরা বাইরে থেকে ভারতে (দ্র) এসে দিল্লিকে (দ্র) কেন্দ্র করে শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করে। তখন বিদেশী সৈনিক, রাজপুরুষ ইত্যাদির সঙ্গে দেশীয় লোকজনদের অসমধর্মী কথাবার্তার মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে মিশ্রিত যে ভাষা তৈরি হয়ে ওঠে তা-ই 'উর্দু'। দিল্লি ও মীরাটের আশেপাশে যে হিন্দি ভাষা চালু ছিল উর্দুকে তারই শাখা হিসাবে গণ্য করা হয়। দক্ষিণ-ভারতে বিশেষ করে নিজাম-শাসিত অঞ্চলে উর্দুচর্চা অভিজাত্য অর্জন করে।

উর্দু ভাষার শব্দভাণ্ডারে হিন্দুস্থানি, আরবি (দ্র), ফার্সি, তুর্কি (দ্র) শব্দ প্রচুর আছে। উর্দু ও হিন্দির মধ্যে শব্দসম্ভারগত এবং লিপিগত পার্থক্য যতটা লক্ষ করা যায়, বাক্যগঠনগত পার্থক্য ততটা লক্ষ করা যায় না। সে জন্য একই ভাষা লিপিগত কারণে দ্বিধা-বিভক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত হিসাবে উর্দু-হিন্দির নাম উল্লেখ করা হয়।

আরবি ও ফার্সি ভাষার লিপির ন্যায় উর্দু লিপিও ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লিখতে হয়। এর বর্ণমালার সংখ্যা ৩৬টি। বচন দু' প্রকার এবং লিঙ্গ দু' প্রকার। উর্দু, বর্তমানে পাকিস্তানের (দ্র) রাষ্ট্রভাষা।

হা. মা.

উর্বশী

অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী স্বর্গের অপ্সরা। এই অপ্সরার জন্ম সম্পর্কে নানা মতভেদ আছে। কারো মতে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের উরু ভেদ করে জন্মগ্রহণ করেন। কারো মতে অপ্সরাদের উরু থেকে উর্বশীকে সৃষ্টি করা হয়। অন্য মতে সমুদ্রমন্থনের সময় উর্বশী সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়েছিলেন।

পৌরাণিক সাহিত্য মহাভারত (দ্র), হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে উর্বশীর কাহিনী আছে। পরবর্তী কালে 'কথাসরিৎসাগরে' (দ্র)-ও উর্বশীর কাহিনী পাওয়া যায়। উর্বশী ও পুরূরবার কাহিনী প্রথমে পাওয়া যায় ঋগ্বেদে (দ্র)। তারপর 'শতপথব্রাহ্মণে' বিস্তৃত কাহিনী পাওয়া যায়। উর্বশী স্বর্গের অপ্সরা আর পুরূরবা মর্তের রাজা।

পুরূরবা ও উর্বশীর মিলনের কাহিনী নিয়ে মহাকবি কালিদাস (দ্র) 'বিক্রমোর্বশী' নাটক রচনা করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (দ্র) রচনা করেন 'পুরূরবার প্রতি উর্বশী' নামক পত্রকাব্য। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (দ্র) রচনা করেন 'উর্বশী' কবিতা। এঁদের সবার কাহিনীর উৎস পুরাণ হলেও এসব রচনা নতুন ভাবনা ও দীপ্তিতে ভাস্বর।

বি. ব.

উর্স্টিড্, হান্স্ ক্রিস্টিয়ান্ [১৭৭৭–১৮৫১]

দিনেমার বিজ্ঞানী। উর্স্টিডের (Hans Christian Oersted) জন্ম ১৭৭৭ সালে ডেনমার্কে, মৃত্যু ১৮৫১ সালে। তড়িৎ-চুম্বকের আবিষ্কারক। ১৮২০ সালে উর্স্টিড্ লক্ষ করেন, একটি বিদ্যুৎবাহী তারের পাশে একটি চুম্বক-কম্পাস স্থাপন করলে কম্পাস (দ্র) কাঁটাটি নড়ে ওঠে। এই পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি মন্তব্য করেন তড়িৎপ্রবাহ চুম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করে। এভাবে তিনিই সর্বপ্রথম তড়িৎ এবং চুম্বকের (দ্র) মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। পরবর্তী সময়ে মাইকেল ফ্যারাডে (দ্র), জোসেফ হেনরি, অঁদ্রে মারি অঁপ্যার (দ্র) এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন।

হান্স্ ক্রিস্টিয়ান্ কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

১৭৯৯ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। হান্স্ ক্রিস্টিয়ান্ উর্স্টিড্ পদার্থবিজ্ঞান ছাড়া রসায়নেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তিনি গ্যাস (দ্র) এবং তরল পদার্থ নিয়ে গবেষণা করেন। তিনিই প্রথম অ্যালুমিনিয়াম (দ্র) মৌল (দ্র) নিষ্কাশন করেন, যদিও তা বিশুদ্ধ ছিল না। পরিবাহীর (দ্র) মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহের ফলে উৎপন্ন চৌম্বকক্ষেত্রের শক্তি পরিমাপের (দ্র) একক-এর 'উর্স্টিড্' নাম তাঁরই নামানুসারে দেওয়া হয়েছে।

স. রা.

উল্কা (meteoroid)

রাতের আকাশে মাঝে মাঝে দেখা যায় কোনো জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড যেন মহাশূন্যে ছুটে চলেছে, কিংবা নিচের দিকে নেমে আসছে। মহাকাশে নিত্য পরিভ্রমণরত ছোট পাথর বা ধাতবখণ্ড পৃথিবীর (দ্র) বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে বায়ুর (দ্র) সংঘর্ষে জ্বলে ওঠে ও জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হয়। এই ঘটনাকে উল্কাপাত (meteor) বলে। যেসব বস্তু এই উল্কাপাতের জন্য দায়ী, সেগুলোকে বলা হয় উল্কা (meteoroid)। অধিকাংশ উল্কাই বায়ুমণ্ডলে ভস্মীভূত হয়ে যায়। তার পরও কিছু সংখ্যক উল্কা ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম হয়। এগুলোকে বলা হয় উল্কাপিণ্ড (meteorite)।

উল্কা মহাকাশে পরিভ্রমণ করতে করতে পৃথিবীর নিকটবর্তী হলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে ভূপৃষ্ঠের দিকে আকর্ষিত হয়। প্রচণ্ড গতিতে উল্কা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে বায়ুকণার সঙ্গে সংঘর্ষে প্রচণ্ড তাপের উদ্ভব হয়। তাপমাত্রা

রাতের আকাশে উল্কাপাত

ভূপৃষ্ঠে উল্কাপাতের ফলে গভীর গর্ত

এতই বৃদ্ধি পায় যে উল্কার উপাদানগুলোকে গলিয়ে একেবারে গ্যাসে পরিণত করে। প্রচণ্ড উত্তাপে গ্যাস (দ্র) ও বায়ুকণা আয়নিত হয়। ফলে বায়ুমণ্ডলের ঐ এলাকাটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সচরাচর ভূপৃষ্ঠে ৮৫ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছানোর আগেই উল্কা বাষ্পে পরিণত হয়।

পৃথিবী প্রতিনিয়ত কয়েক হাজার উল্কার সংস্পর্শে এলেও এর মধ্যে গুটি কয়েক মাত্র ভূপৃষ্ঠে পৌঁছয়। উল্কাপিণ্ডের আকার ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ গ্রহাণুর সমান হতে পারে।

মু. হা.

উসমান (রা.), হযরত [৫৭৬—৬৫৬]

হযরত উসমান (রা.) ছিলেন মুসলিম সাম্রাজ্যের তৃতীয় খলিফা। তাঁর জন্ম মক্কায় (দ্র), ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে (দ্র)। ইসলামের (দ্র) দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) (দ্র) আততায়ীর হাতে শহীদ হওয়ার পর ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সর্বমোট বারো বছর খলিফা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবা (দ্র) এবং তাঁর জামাতা। পর্যায়ক্রমে রসূলুল্লাহ্ (স.) (দ্র)-এর দুই কন্যা—রোকাইয়া ও কুলসুমকে হযরত উসমান (রা.) বিবাহ করেছিলেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর পবিত্র কুরআনের (দ্র) একটি সর্বজনগ্রাহ্য, নির্ভুল সঙ্কলন (দ্র) প্রণয়ন তাঁর অমর কীর্তি। এ ছাড়া নানাবিধ জনহিতকর কাজেও তিনি অবদান

রাখেন। এভাবে প্রথম ছ'টি বছর তাঁর শাসনকাল ছিল শান্তিপূর্ণ, গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁর খিলাফতের পরবর্তী ছ' বছর ছিল অশান্তি আর বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। এই অশান্তি আর বিশৃঙ্খলার অনেকগুলো কারণ ইসলামের ইতিহাস পাঠে জানা যায়। তার মধ্যে প্রধান কারণ ছিল বিভিন্ন প্রদেশে গুরুতর অর্থনৈতিক সঙ্কট, নিজ গোত্র বনি উমাইয়ার লোকদের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে নিয়োগ, চাচাতো ভাই মারওয়ানকে নির্বাচন থেকে ফিরিয়ে এনে নিজ উপদেষ্টা হিসাবে বহাল করা, মারওয়ানের নানাবিধ হটকারী কার্যকলাপ ও তাঁকে প্রশ্রয় দান ইত্যাদি। এ ছাড়াও ছিল শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় কঠোর ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের অভাব।

এই অন্তর্কলহ ও বিরোধ পরিণামে বিদ্রোহের রূপ নেয় এবং নিজের ঘরে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় হযরত উসমান (রা.) ঘাতকের ছুরিকাঘাতে শহীদ হন (৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ /৩৪ হিজরি)। এ সময় তিনি পবিত্র কুরআন পাঠরত অবস্থায় ছিলেন।

মু. মা.

উহুদ যুদ্ধ

উহুদ যুদ্ধ মদিনায় (দ্র) সদ্য-হিজরত (দ্র)-কারী মুসলমান এবং মক্কার (দ্র) অবিশ্বাসীদের মধ্যে সংঘটিত দ্বিতীয় সম্মুখ-যুদ্ধ। মদিনার নিকটস্থ উহুদ নামক পর্বতের পার্শ্ববর্তী প্রান্তরে এই যুদ্ধ হয় বলে এর নাম উহুদ যুদ্ধ।

হিজরতের দ্বিতীয় বছরে সংঘটিত বদরের যুদ্ধে (দ্র) পরাজিত মক্কার অবিশ্বাসীগণ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। অহঙ্কারী ও আভিজাত্য-সচেতন কুরাইশ সর্দারগণ আরেকটি সর্বাত্মক যুদ্ধে মুসলমানদের মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা বিপুল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উহুদ পর্বতের সন্নিকটস্থ প্রান্তরের এক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। এটা ছিল হিজরতের তৃতীয় বছর।

মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ও শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়। রসূলুল্লাহ (স.) (দ্র) পঞ্চাশ জন দক্ষ তীরন্দাজকে উহুদ পর্বতের একটি গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথে পাহারায় নিযুক্ত করে যে কোনো অবস্থায় তাদের সেখান থেকে সরে না যাওয়ার নির্দেশ দেন, যাতে সেই পথে শত্রুরা মুসলমানদের শিবির আক্রমণ করতে না পারে।

এই যুদ্ধে মক্কার কুরাইশ বাহিনীতে ছিল তিন হাজার সুসজ্জিত সৈন্য; অপরপক্ষে মুসলমান বাহিনীতে ছিল সাত শ' সৈন্য—অস্ত্রশস্ত্রও ছিল অপর্যাপ্ত। তবু কুরাইশ-বাহিনী মুসলিমবাহিনীর আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পালিয়ে যেতে শুরু করে।

এ সময় গিরিপথের প্রহরায় নিযুক্ত তীরন্দাজ-বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই রসূলুল্লাহ (স.)-এর নির্দেশ বিস্মৃত হয়ে মূল বাহিনীর সঙ্গে শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন শুরু করে। এই সুযোগে কুরাইশ বাহিনী পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে গিরিপথ দখল করে নেয়। কুরাইশদের প্রবল আক্রমণে সত্তর জন মুসলমান সৈন্য নিহত হয়। রসূলুল্লাহ্ (স.)-ও গুরুতরভাবে আহত হন।

এই অবস্থায় কিছুসংখ্যক অকুতোভয় মুসলমান যোদ্ধার প্রবল প্রতিরোধের মুখে কুরাইশ বাহিনীর অগ্রযাত্রা বন্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি মুসলমানদের এই শিক্ষাই দিয়েছে যে যুদ্ধক্ষেত্রে নেতার আদেশ অমান্য করার পরিণাম কখনই ভাল হয় না।

মু. মা.

ঊর্মি শিশু-কিশোর পত্রিকা, বাংলাদেশের দ্র

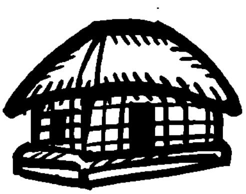

ঋ

ঋগ্বেদ অক্ষর দ্র

ঋতু

ভূপৃষ্ঠের জলবায়ুর (দ্র) বিশেষ বিশেষ তারতম্য অনুসারে বছরের বিভাগকে ঋতু বলা হয়। তাপের (দ্র) আধিক্য বা স্বল্পতার কারণে পর্যায়ক্রমে জলবায়ুর যে অবস্থান্তর ঘটে তাকে 'ঋতু-পরিবর্তন' বলে। পৃথিবীর (দ্র) কক্ষপথ কিছুটা ডিম্বাকার হওয়ায় পৃথিবীতে ঋতুর বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে। আর সূর্যরশ্মি সারা পৃথিবীতে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে না বলে

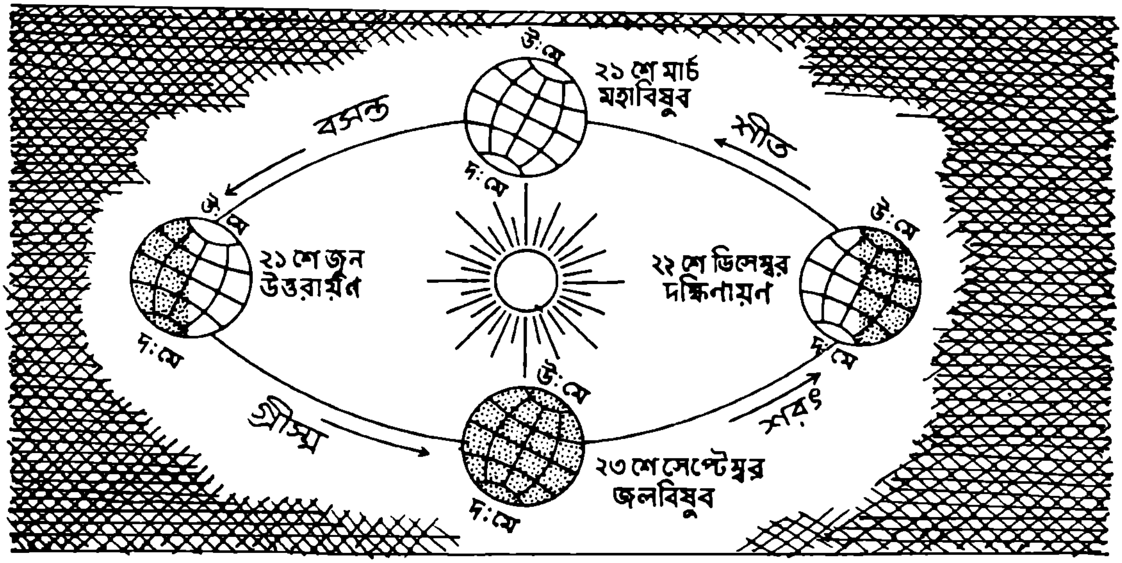

পৃথিবীর বার্ষিক গতি

সব জায়গায় ঋতুও এক হয় না। ঋতু প্রধানত চার প্রকার—বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীত।

পৃথিবী নিজ অক্ষে সূর্যের (দ্র) চারদিকে ঘুরবার সময় কক্ষতলের সঙ্গে প্রায় ৬৬$\frac{১}{২}$° কোণ করে নিয়মিত স্থান পরিবর্তন করে। এভাবে সূর্যকে প্রদক্ষিণের ফলে উত্তর বা দক্ষিণ গোলার্ধ কখনো সূর্যের দিকে হেলে পড়ে। আবার কখনো-বা দূরে সরে যায়। এতে সূর্য এক বার আলো ছড়ায় উত্তর গোলার্ধে, আরেক বার দক্ষিণ গোলার্ধে। উত্তর গোলার্ধে যখন সূর্যের আলো পড়ে, তখন সেই অঞ্চলের দেশগুলোতে গ্রীষ্মকাল; আর দক্ষিণ-অঞ্চলের দেশগুলোতে শীত। আবার খাড়া সূর্যরশ্মির ফলে দক্ষিণ অঞ্চলের দেশগুলোতে যখন গ্রীষ্মকাল, তখন উত্তর অঞ্চলে শীত। প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর এই পরিবর্তন ঘটে। এর মধ্যে সূর্যকে দু' বার বিষুবরেখা (equator) (দ্র) পার হতে হয়। ২১শে মার্চ এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্য সরাসরি বিষুবরেখার ওপর অবস্থান করে। এই দুই বিশেষ তারিখে পৃথিবীর সর্বত্র দিন ও রাত সমান হয়। এর ফলে ২১শে মার্চ থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাস উত্তর মেরুতে সব সময় দিন এবং দক্ষিণ মেরুতে সব সময় রাত হয়। আবার ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে ২১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাস উত্তর মেরুতে অবিরত রাত এবং দক্ষিণ মেরুতে অবিরত দিন থাকে।

উত্তর গোলার্ধে ২১শে মার্চ পর্যন্ত বসন্তকালের মাঝামাঝি অবস্থা থাকে। এ জন্য ২১শে মার্চকে বাসন্তবিষুব বা মহাবিষুব (spring or vernal equinox) বলে। আবার ২৩শে সেপ্টেম্বর উত্তর গোলার্ধে শরৎকালের মাঝামাঝি অবস্থা থাকে। এ জন্য ২৩শে সেপ্টেম্বরকে শারদবিষুব বা জলবিষুব (autumnal equinox) বলে।

২১শে মার্চ থেকে ২১শে জুন পর্যন্ত সূর্যের উত্তর অয়নান্ত চলে। এ সময় উত্তরগোলার্ধে সূর্যকিরণ লম্বা বা খাড়াভাবে পড়ে এবং দিনের দৈর্ঘ্যও সবচেয়ে বেশি হয়। এই কারণে উত্তর গোলার্ধে এ সময় গ্রীষ্মকাল থাকে। ২১শে জুন তারিখে উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় ও গরম এবং রাত সবচেয়ে ছোট হয়। আবার দক্ষিণ গোলার্ধে এর বিপরীত অর্থাৎ দিন সবচেয়ে ছোট হয় এবং সেখানে তখন খুব শীত পড়ে। ২১শে জুন মধ্যাহ্নে ২৩$\frac{১}{২}$° উত্তর অক্ষাংশে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। এই অক্ষাংশ সূর্যের উত্তরায়ণের শেষ সীমা বলে ২১শে জুনকে উত্তর অয়নান্ত দিন বা উত্তরায়ণ দিন (summer solstice) বলা হয়।

২১শে জুন থেকে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সূর্যের দক্ষিণ-অয়নান্ত। ২২শে ডিসেম্বর তারিখে দক্ষিণ গোলার্ধে

দিন সবচেয়ে বড় এবং রাত সবচেয়ে ছোট হয়। আবার উত্তর গোলার্ধে এর ঠিক উল্টোটি ঘটে। ২২শে ডিসেম্বর ২৩$\frac{১}{২}^{\circ}$ দক্ষিণ অক্ষাংশে মধ্যাহ্ন-সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। দক্ষিণায়নে এটাই সূর্যের শেষ অবস্থান। তাই ২২শে ডিসেম্বরকে দক্ষিণায়ন দিন বা দক্ষিণ-অয়নান্ত দিন (winter solstice) বলে। এ সময় উত্তর গোলার্ধে শীতকাল থাকে।

পৃথিবীর জলবায়ু ও তাপ পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বৎসরকে ৪টি ঋতুতে ভাগ করা হলেও বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষে ৬টি ঋতুর নিয়ম প্রচলন আছে। এখানে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠকে গ্রীষ্ম, আষাঢ়-শ্রাবণকে বর্ষা, ভাদ্র-আশ্বিনকে শরৎ, কার্তিক-অগ্রহায়ণকে হেমন্ত, পৌষ-মাঘকে শীত এবং ফাল্গুন-চৈত্রকে বসন্ত বলা হয়।

পৃথিবীতে এমন দেশও আছে, যেখানে বৎসরে দু'টি বা তিনটি ঋতু রয়েছে।

সুজ. ব.

ঋত্বিক ঘটক [১৯২৫—১৯৭৬]

বিখ্যাত বাঙালি চলচ্চিত্র (দ্র) পরিচালক। ভারতীয় চলচ্চিত্রে নব্য বাস্তববাদের পুরোধা পুরুষদের অন্যতম। তিনি ১৯২৫ সালের ৪ঠা নভেম্বর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সুরেশচন্দ্র। কল্লোল যুগের (দ্র) বিখ্যাত সাহিত্যিক মনীশ ঘটক এঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

ঋত্বিক ঘটক ১৯৪৮ সালে বি. এ. পাশ করেন এবং ঐ একই বছরে যোগ দেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘে। রচনা ও পরিচালনা করেন বেশ ক'টি নাটক (দ্র)। নাট্য-অভিনেতা হিসাবেও নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

ঋত্বিক ঘটক বহু গুণে গুণান্বিত ছিলেন। চূড়ান্ত সাহিত্যিক মানসম্পন্ন কয়েকটি নাটক, ৪০টির মতো ছোটগল্প (দ্র), ২টি উপন্যাস (দ্র), চলচ্চিত্র ও শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেন। পাশাপাশি সম্পাদনা করেন 'অভিধারা' ও 'অভিনয়দর্পণ' নামের দু'টি শিল্পসম্মত পত্রিকাও। বেতারনাটক প্রযোজনা ও পরিচালনা করেও খ্যাতির অধিকারী হন। শেষে ১৯৫০ সালে চলচ্চিত্রে

উপরের ছবিতে ঋত্বিক ঘটক এবং নিচে তাঁর পরিচালিত 'অযান্ত্রিক' ছবিতে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য

যোগ দেন সহকারী পরিচালক হিসাবে। এর পর থেকে তার জীবন মূলত আবর্তিত হতে থাকে চলচ্চিত্রকে ঘিরেই।

তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রকর্ম : কাহিনীচিত্র 'নাগরিক' (১৯৫২-৫৩, অবশ্য মুক্তি পায় পরে), 'অযান্ত্রিক' (১৯৫৮), 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' (১৯৫৯), 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০), 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১), 'সুবর্ণরেখা' (১৯৬৫), 'তিতাস

একটি নদীর নাম' (১৯৭৩) এবং 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' (১৯৭৪)।

১৯৭৬ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি ঋত্বিক ঘটক মারা যান।

আ. হু.

ঋষি

স্রষ্টা, জ্ঞানী ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে প্রাচীন কালে এই উপমহাদেশে ঋষি বলা হত। এঁদের কাছে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদ প্রকাশিত হয়েছিল। এরূপ সাত জন প্রাচীন ঋষিকে 'সপ্তর্ষি' বলে বিশেষভাবে সম্মান করা হয়। তাঁদের নাম : গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও অত্রি। 'মহাভারতে' এঁদের নাম মরীচি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ। এই সাত জন ঋষি আকাশে (দ্র) সাতটি তারারূপে অবস্থান করেছেন। জ্যোতির্বিদ্যায় (দ্র) এর নাম সপ্তর্ষিমণ্ডল বা ইংরেজিতে Great Bear। এই সপ্তর্ষিমণ্ডল ধ্রুবতারার চারদিকে আবর্তিত হয়। ধ্রুব তপস্যার বলে সকল তারা ও গ্রহগণের আশ্রয়স্বরূপ হয়েছেন।

ঋষি সাত প্রকার—'শ্রুতর্ষি' যেমন সুশ্রুত, 'কাণ্ডর্ষি' যেমন জৈমিনি, 'পরমর্ষি' যেমন ভেল, 'মহর্ষি' যেমন ব্যাস, 'দেবর্ষি' যেমন নারদ, 'রাজর্ষি' যেমন বিশ্বামিত্র ও জনক, 'ব্রহ্মর্ষি' যেমন বশিষ্ঠ। এ ছাড়া আরো চব্বিশ প্রকার ঋষি আছেন।

কালে কালে ঋষি ও মুনি (বা কৃচ্ছ্রসাধনরত তপস্বী) দুইটি পদ সমার্থবাচক হয়ে যায়।

বি. ব.

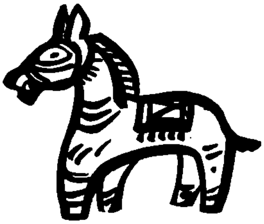

এ

এ. এফ. রহমান, স্যার [১৮৮৯—১৯৪৫]

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) উপাচার্য। তাঁর পুরো নাম আহমদ ফজলুর রহমান। তিনি ১৮৮৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৮ সালে শহরের জেলা স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স পাশ করে ইংল্যাণ্ড গমন করেন। ১৯১২ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসশাস্ত্রে অনার্সসহ বি. এ. পাশ করার পর লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ ভর্তি হন এবং সেখানে দুই বছরকাল রাজনৈতিক অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা শেষ করে স্বদেশে ফিরে আসেন।

এ. এফ. রহমান ১৯১৪ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার-এর দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়সীমার মধ্যেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) কমিশন অর্থাৎ 'স্যাডলার কমিশন'-এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯২১ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্টের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৩ ও ১৯২৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য হন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অর্থাৎ ভাইস-চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৭ সালে এ. এফ. রহমান ভারতীয় (কেন্দ্রীয়) পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হন। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেন।

তাঁর নামানুসারেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্যার এফ রহমান হল'-এর নামকরণ করা হয়েছে।

১৯৪৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

এ টেইল অব টু সিটিজ (A Tale of Two Cities)

ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস্ ডিকেন্স (দ্র) রচিত উপন্যাস। ১৮৫৯ সালে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ফরাসি বিপ্লবের (দ্র) পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসে যে দু'টি শহর চিত্রিত হয়েছে সে দু'টি হল লণ্ডন ও প্যারিস।

হা. মা.

এইড্স্

এইড্স্ (AIDS) একটি ভয়াবহ ঘাতক ব্যাধি। এর পুরো নাম 'একয়আর্ড ইমিউন ডেফিশিয়েন্সি সিণ্ড্রোম' (Acquired Immune Deficiency Syndrome)। হিউম্যান ইমিউনোডেফিশিয়েন্সি ভাইরাস (Human Immunodeficiency Virus), সংক্ষেপে এইচ আই ভি (HIV) সংক্রমণের (দ্র) কারণে এইড্স্ দেখা দেয়। নানাভাবে এই সংক্রমণ ঘটতে পারে, যেমন—এইড্স্ ভাইরাস দ্বারা দূষিত সূচ দিয়ে ইনজেকশান নেওয়া, ঐ ভাইরাসদুষ্ট রক্ত পরিভরণ কিংবা ভাইরাসবাহক নর-নারীর দৈহিক মিলন।

এ রোগের (দ্র) সুনির্দিষ্ট লক্ষণ নেই। তবে জ্বর, দ্রুত ওজন হ্রাস, অত্যধিক দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণের মাধ্যমে রোগের প্রকাশ ঘটতে পারে। এতে দেহের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা একেবারে নষ্ট হয়ে যায় বলে রোগীর নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে। এইড্স্বিরোধী কার্যকর ঔষধ বা টিকা এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। তাই এর কারণ থেকে দূরে থাকাই এই ভয়াবহ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়।

আ. র.

এউরিপিদেস্ [খ্রি.পূ. ৪৮০—৪০৬-৭]

গ্রিক মহান নাট্যকার, ট্র্যাজেডি (দ্র)-প্রণেতা এউরিপিদেস্ (Euripides)-কে বাংলায় অনেকে অনেকভাবে লিখে থাকেন—যেমন ইউরিপিডিস্, ইউরিপিডেস্, য়ুরিপিদিস্, উরিপিদেস্ ইত্যাদি।

গ্রিক ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠ তিন জন নাট্যকার এস্খুলোস্ (দ্র), সোফোক্লেস্ (দ্র) ও এউরিপিদেস্-এর মধ্যে বয়সে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন এউরিপিদেস্। এঁর জন্মসাল নিয়ে কিছু বির্তক আছে, অনেকে মনে করেন খ্রি. পূ. ৪৮০ অব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর সালামিস্ দ্বীপে তিনি জন্মেছিলেন। পিতা ম্নেসার্কাস ছিলেন বিত্তবান্ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, মা ক্লিতো-ও ছিলেন উচ্চবংশের সম্ভ্রান্ত মহিলা। ব্যঙ্গ-নাট্যকার আরিস্তোফানেস্ অবশ্য বলেছেন এউরিপিদেসের বাপ ছিল মুদি আর মা ফেরিওয়ালী; তবে পণ্ডিতেরা এসব কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেন নি। এউরিপিদেস্ খুব ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ছিলেন : তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন দার্শনিক সোক্রাতেস্ (Socrates) যিনি আমাদের কাছে সক্রেটিস্ (দ্র) নামে পরিচিত। তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অন্যদের ম্লান করে দিয়েছিল। পণ্ডিতবর্গের ধারণা অনুযায়ী তিনি ৯২টি নাটক (দ্র) লিখেছিলেন; কিন্তু পাওয়া গেছে মাত্র ১৭টি ট্র্যাজেডি। তাঁর প্রথম নাটক 'পেলিয়াসের মেয়েরা' ৪৫৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এবং শেষ নাটক 'বাক্খাই' ৪০৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অভিনীত হয়েছিল। তাঁর প্রধান নাটক ছিল 'হেরাক্লেস্', 'মিদিয়া', 'আন্দ্রোমাখে', 'ইলেক্ত্রা', 'হেকুবা', 'বাক্খাই', 'ওরেস্তেস্', 'আইওন্' ইত্যাদি।

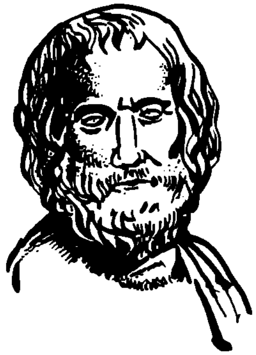

গ্রিক নাটমঞ্চেও তিনি তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করে অনেক উন্নতি সাধন করেন।

হা. মা.

একজিমা চর্মরোগ দ্র

একতারা

এক প্রকার তার-বাদ্য। একটি মাত্র তারকে ধ্বনিত করার উদ্দেশ্যে এই যন্ত্র (দ্র) ব্যবহৃত হয়। 'এক তারের যন্ত্র' এই অর্থে একতারা কথাটি হয়েছে। একটি লাউ-এর খোলের মুখের দিকটা কেটে চামড়ায় ছাওয়া হয় এবং এর সঙ্গে এক টুকরো চিকন বাঁশ যুক্ত করা হয়। বাঁশের ওপরের দিকে লাগানো হয় একটি 'কান'। লাউয়ের ছাউনির মাঝখানে একটি সওয়ারি বসিয়ে তার ওপর দিয়ে একটি তার টেনে

কানের সঙ্গে পেঁচিয়ে দেওয়া হয়। ডান হাতে বাঁশের দণ্ডটি ধরে এই হাতেরই তর্জনী দিয়ে তারে আঘাত করে একতারা বাজানো হয়। একতারায় একটিমাত্র স্বর ধ্বনিত হয়ে থাকে। বাউলসহ বিভিন্ন প্রকার লোকসঙ্গীতে (দ্র) একতারা বাজানো হয়। একতারাকে সকল প্রকার বীণাযন্ত্রের উৎসরূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সম্ভবত এর প্রাচীন নাম ছিল একতন্ত্রী বীণা।

ক. গো.

একনায়কতন্ত্র (totalitarianism)

এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা, যাতে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকবে এবং সেই দলের সর্বপ্রধান ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে দল ও দেশ পরিচালিত হবে।

পূর্বে রাজরাজড়ারা দেশ চালাতেন নিজেদের খেয়ালখুশি মতো, রাজার ইচ্ছাই ছিল আইন। রাষ্ট্রশাসনযন্ত্রের একমাত্র প্রধান ব্যক্তি (অর্থাৎ একনায়ক) ছিলেন রাজা। সে দিক থেকে এ ধরনের শাসনও একনায়কতন্ত্রী শাসন। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে এই শব্দের একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

নাৎসি (দ্র)-বাদ, ফ্যাসিবাদ (দ্র), সোভিয়েত কমিউনিজ্‌ম (দ্র) ইত্যাদি মতাদর্শের পেছনে যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ কাজ করেছিল তা হল এই একনায়কতন্ত্রের ধারণা। রাষ্ট্র পরিচালনার এই পদ্ধতিতে ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি বা দলকে দমন করা হয়ে থাকে। একনায়কতন্ত্রীকে সে জন্য 'ডিক্টেটর' বলা হয়। একনায়কতন্ত্র স্বৈরাচারের জন্ম দেয় এবং গণতন্ত্র (দ্র) ধ্বংস করে। তবে ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে মার্ক্সবাদ (দ্র)-প্রচারিত সর্বহারার একনায়কত্বের যথেষ্ট গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান। ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব ব্যক্তি ও দলবিশেষের শাসন, অন্য দিকে সর্বহারার একনায়কত্বের অর্থ জনগণ তথা সর্বহারার শ্রেণীগত শাসন।

হা. মা.

একলব্য

আদর্শ গুরুভক্ত একনিষ্ঠ শিষ্য। ব্যাধদের রাজা হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য। 'মহাভারতে' (দ্র) বর্ণিত শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর দ্রোণাচার্যের ভাবশিষ্য। দ্রোণ তাঁকে নীচ জাতি বিধায় শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে দুঃখিত একলব্য দ্রোণের মাটির মূর্তি তৈরি করেন এবং তাঁকেই গুরুরূপে কল্পনা করে বনের মধ্যে একা একা ধনুর্বিদ্যা শিখতে থাকেন। ক্রমে এই বিদ্যায় তিনি অসামান্য নৈপুণ্যলাভ করে দ্রোণের শিষ্য শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ অর্জুন অপেক্ষা তিনি বড় অস্ত্রকুশলী হয়ে ওঠেন। এক দিন পাণ্ডবেরা মৃগয়ায় গেলে তাঁদের কুকুর ঘুরতে ঘুরতে জটাধারী একলব্যকে দেখে চিৎকার করতে থাকে। একলব্য তখন এক সঙ্গে সাতটি তীর নিক্ষেপ করে কুকুরের মুখ ও স্বর বন্ধ করে দেন। রুদ্ধমুখ কুকুর পাণ্ডবদের কাছে ফিরে গেলে তাঁরা কুকুরের মুখে শর প্রয়োগের কৌশল দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েন। তাঁরা একলব্যের কাছে গেলে তাঁকে দ্রোণাচার্যের শিষ্য বলে জানতে পারেন। অর্জুন তাতে অত্যন্ত ক্ষুণ্ন হন। কারণ দ্রোণ তাঁকে বলেছিলেন, দ্রোণের আর কোনো শিষ্য অর্জুনের সমকক্ষ হবে না। অর্জুন ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভে সেই পূর্বকথা স্মরণ করিয়ে দিলে দ্রোণ একলব্যের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। একলব্য তাঁকে গুরুদেব বলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন। নিষ্ঠুর দ্রোণ বললেন, যদি তুমি আমার শিষ্য হও তবে আমাকে তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুল গুরুদক্ষিণা দাও। একলব্যও খুশি মনে কোনো কিছু বিচার না করে বুড়ো আঙুল কেটে গুরুকে

দান করেন। এতে তাঁর শরনিক্ষেপের দক্ষতা হ্রাস পায় এবং অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা হয়। আর্য দ্রোণ ও অর্জুনের সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে অনার্য একলব্যের প্রতিভার বিনাশ হয়। অর্জুন সম্পর্কে দ্রোণাচার্যের উক্তি সার্থক হয়। একলব্য গুরুভক্তির প্রতীক হিসাবে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

বি. ব.

একাদশী

পুণ্যতিথি ও একাদশীর চাঁদের (দ্র) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এক চান্দ্রমাসে দু' বার একাদশী হয়—শুক্লপক্ষে শুক্লা, কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণা একাদশী। শুক্লপক্ষের যে সময় চাঁদের কলার একাদশ দিনে পড়ে তখন শুক্লা একাদশী, আর যে সময় কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের একাদশ দিন কেটে যায় এবং চাঁদ ছোট হয়ে দেখা যায় তাকে বলে কৃষ্ণা একাদশী। অর্থাৎ শুক্লপক্ষে চাঁদের একাদশ কলা দেখা যায় আর কৃষ্ণপক্ষে চাঁদের একাদশ কলা অন্ধকারে ডুবে থাকে।

একাদশীর দিনে উপবাস বিধেয়। বিশেষ করে হিন্দু বিধবারা এই দিনটি পালন করে থাকেন। এর অপর নাম হরিবাসর। হিন্দু উচ্চবর্ণের বিধবার পক্ষে এই দিনে উপবাস অবশ্যকর্তব্য। যাঁরা অসুস্থ বা অন্য কারণে অসমর্থ হন, তাঁদের পক্ষে ফলমূল আহার বা রাতে আমিষ ছাড়া আতপ চালের ভাত ঘি দিয়ে খাওয়া চলে। শুক্লা একাদশী বছরের ১২টি, কৃষ্ণা একাদশীও ১২টি। আবার কোনো বছর মল-মাস (অর্থাৎ লিপ্-ইয়ার : leap year) হলে আরো দু'টি একাদশী হয়। একাদশীর মধ্যে আষাঢ়ী ভাদ্রী, কার্তিকী ও মাঘী শুক্লা একাদশীর গৌরব বেশি। একাদশীর পুণ্য বা মাহাত্ম্য সম্পর্কে প্রাচীন গ্রন্থে (বা পুরাণে) অনেক কাহিনী আছে। এসব কাহিনী কাশীরাম দাসের মহাভারত (দ্র), পাঁচালি (দ্র) ও যাত্রার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে (দ্র) বহুল প্রচলিত।

বি. ব.

একুশ দফা

১৯৫৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর পূর্ব-বাংলায় মুসলিম লীগ (দ্র) শাসনের অবসানকল্পে আওয়ামী লীগ (দ্র) সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (দ্র), কৃষক-শ্রমিক পার্টির সভাপতি শের-এ-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (দ্র) এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দি (দ্র) মিলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য যুক্তফ্রন্ট (দ্র) নামে এক নির্বাচনী মোর্চা গঠন করেন। হক-ভাসানী-সোহ্‌রাওয়ার্দি নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচিই '২১-দফা' নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। ২১-দফার কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ :

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ এবং খাজনা হ্রাস ও সার্টিফিকেট মারফত খাজনা আদায় রহিত করা হবে।

৩. পাট ব্যবসা জাতীয়করণ এবং তা পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় আনা এবং লীগ শাসনামলের পাট-কেলেঙ্কারি তদন্ত ও অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা।

৪. কৃষিতে সমবায় প্রথা প্রবর্তন এবং সরকারি সাহায্যে কুটিরশিল্পের উন্নয়ন।

৫. পূর্ববঙ্গকে লবণশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং লবণ-কেলেঙ্কারির তদন্ত ও শাস্তির ব্যবস্থা।

৬. কারিগর শ্রেণীর গরিব মোহাজেরদের কর্মসংস্থানের আশু ব্যবস্থা।

৭. খাল খনন ও সেচব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ রোধ।

৮. পূর্ববঙ্গে কৃষি ও শিল্প খাতের আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশকে স্বাবলম্বী করা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) মূলনীতি মাফিক শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা।

৯. দেশের সর্বত্র অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষকদের ন্যায্য বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা।

১০. শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের ভেদাভেদ বিলোপ করে সকল বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি সকল প্রতিক্রিয়াশীল আইন বাতিল এবং উচ্চশিক্ষা সহজলভ্য

করা।

১২. শাসনব্যয় হ্রাস, যুক্তফ্রন্টের কোনো মন্ত্রীর এক হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ না করা।

১৩. দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ-রিশ্‌ওয়াত বন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৪. জননিরাপত্তা আইন, অর্ডিন্যান্স ও অনুরূপ কালাকানুন বাতিল, বিনাবিচারে আটক বন্দির মুক্তি, রাষ্ট্রদ্রোহিতায় অভিযুক্তদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার এবং সংবাদপত্র ও সভাসমিতি করার অবাধ অধিকার নিশ্চিত করা।

১৫. বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে পৃথক করা।

১৬. বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে কম বিলাসের বাড়িতে যুক্তফ্রন্টের প্রধান মন্ত্রীর অবস্থান করা এবং বর্ধমান হাউসকে প্রথমে ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা।

১৭. রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে শহীদ মিনার নির্মাণ করা এবং শহীদদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া।

১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস এবং সরকারি ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করা।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত সকল বিষয় পূর্ববঙ্গ সরকারের অধীনে আনয়ন, দেশরক্ষাক্ষেত্রে স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে এবং নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্বপাকিস্তানে স্থাপন এবং পূর্বপাকিস্তানে অস্ত্রনির্মাণ কারখানা স্থাপন ও আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা।

২০. কোনো অজুহাতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কর্তৃক আইন পরিষদের আয়ু না বাড়ানো এবং আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বে মন্ত্রিসভার পদত্যাগপূর্বক নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

২১. যুক্তফ্রন্টের আমলে সৃষ্ট শূন্য আসনে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং পর পর তিনটি উপ-নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট-প্রার্থী পরাজিত হলে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করা।

আ. র.

একুশে পদক

রাষ্ট্রীয় পদক। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা-শহীদদের আত্মত্যাগের মহিমা চিরজাগ্রত রাখার উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালে এই পদকের প্রবর্তন করে।

প্রতি বছর দেশের কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে শিক্ষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতাসহ সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও প্রতিভার স্বীকৃতি দান করে 'একুশে পদক' প্রদান করা হয়। পদকপ্রাপ্তদের প্রত্যেককে নগদ বিশ হাজার টাকা, একটি স্বর্ণপদক ও একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়।

ম. র.

এক্সপ্রেশনিস্ট আর্ট (Expressionist Art)

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জার্মানিতে গোড়াপত্তন ঘটে এক্সপ্রেশনিস্ট আর্টের অর্থাৎ অভিব্যক্তিবাদী শিল্পকলার। এটি একটি বিশেষ ধারার শিল্প-আন্দোলন যার লক্ষ্য হল শিল্পে বাস্তবের অথবা প্রকৃতি ও সমাজ-পরিবেশের দৃশ্যমান রূপের প্রতিফলন নয়, বরং এক স্বাধীন শিল্প-রচনার রীতি প্রবর্তন। এই শিল্পধারা শিল্পীদের আগ্রহী করে তুলেছে মানুষের মনের অনুভূতি, উপলব্ধি ও তার দুঃখ-বেদনা চাওয়া-পাওয়া তারই প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে। শিল্পীর মানসিক অবস্থা অর্থাৎ তার অনুভূতি-উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ ঘটে এক্সপ্রেশনিস্ট আর্টে।

রেখা ও রঙের অতিরঞ্জন বা বিকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ-আঙ্গিকের অনুসন্ধান করতে গিয়ে শিল্পীরা আবিষ্কার করেন এই অভিব্যক্তিবাদী শিল্পধারার চাবিকাঠি। এই কারণে ইম্প্রেশনিস্ট আর্টের (দ্র) মধ্যেও যেটুকু প্রকৃতিবাদের ছায়া অবশিষ্ট ছিল তা-ও তাঁরা বিসর্জন দেন। তার জায়গায় অধিকতর সচেতনতার মধ্য দিয়ে শিল্পস্রষ্টার আবেগ-অনুভূতির ছাপ পড়ে চিত্রশিল্পে। এক জন দর্শক এ জাতীয় শিল্পকর্মের মধ্যে নিজের অনুভূতির স্বাদ বা পরিচয়ও খুঁজে পান। ঐ কাজের মাধ্যমে শিল্পী তাঁর নিজের আনন্দ-সুখ, দুঃখ-বেদনা, হতাশা ও প্রতিবাদ-বিক্ষোভ প্রভৃতি দর্শকমনে সঞ্চারিত করেন। চিত্রকলায় রঙ ও রেখার নিরীক্ষাধর্মী প্রয়োগ-আঙ্গিকে শিল্পী তাঁর এই মনোভাব ফুটিয়ে তোলেন।

মহাশিল্পী ভিনসেণ্ট ভান্ গখের (দ্র) অতি সহজ-সরল প্রান্তরেখা এবং বলিষ্ঠ বর্ণ-বিন্যাসের সূত্র ধরেই এই অভিব্যক্তিবাদী চিত্রশিল্পের অগ্রযাত্রা। কিন্তু দিনেমার শিল্পী ভান গখ্‌কে পথিকৃৎ হিসাবে চিহ্নিত করলেও যাঁর মাধ্যমে এই শিল্পধারার প্রথম সফল প্রকাশ ঘটে তিনি হচ্ছেন নরওয়ের চিত্রশিল্পী এড্‌ভার্ড্ মুঙ্ক্ (Edvard Munch : ১৮৬৩—১৯৪৪) যিনি প্যারিস ও বার্লিনে তাঁর কর্মজীবনের অনেকগুলি বছর ব্যয় করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত শিল্পকর্ম 'চিৎকার' এই ধারার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মুঙ্ক্-এর চিত্রালি আর ছাপাইছবি জার্মান-পেইণ্টিংয়ে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। যন্ত্রণা, দৈন্য, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা ও ক্রোধ প্রভৃতি মানবিক বিষয়াবলি অভিব্যক্তিবাদী শিল্পের অঙ্গ—যার প্রকাশ অত্যন্ত দক্ষতা ও নৈপুণ্যের মধ্য দিয়ে মুঙ্ক্ তাঁর চিত্রকর্মে ঘটিয়েছিলেন।

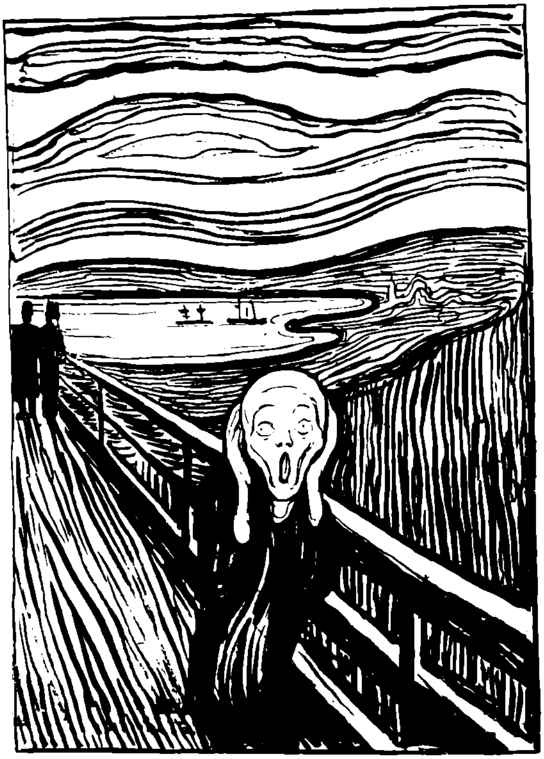

'চিৎকার' : এডভার্ড মুঙ্ক

১৯১০ সালে এই অভিব্যক্তিবাদী শিল্পধারার সার্থক রূপায়ণ ঘটে জার্মানদেশীয় শিল্পী এমিল নোল্ডে (Emil Nolde : ১৮৬৭—১৯৬৫)-র কাজে। এর পরেই যাঁদের নাম উল্লেখ করতে হয় তাঁরা হলেন নেতৃস্থানীয় জার্মান শিল্পী মাক্স্ বেক্‌মান্ (Max Beckmann : ১৮৮৪—১৯৫০), বেলজিয়ান শিল্পী জেম্‌স্ এন্সর (James Ensor : ১৮৬০—১৯৪৯), অস্ট্রিয়ার ওস্কার্ কোকোশ্‌কা (Oscar Kokoschka : ১৮৮৬—১৯৮০), ফ্রান্সের জর্জ্ রুও (Georges Rouault : ১৮৭১—১৯৫৮), শ্যাঁ সুতিন্ (Chaim Soutine : ১৮৯৩—১৯৪৩)। চিত্রশিল্প অর্থাৎ 'পেইণ্টিং' এবং ছাপাইছবি বা 'প্রিণ্টমেকিং' দু'টি ক্ষেত্রেই এই এক্সপ্রেশনিজ্‌ম্ বিকশিত হয়।

ভাস্কর্যসহ অন্যান্য শিল্পমাধ্যমেও অভিব্যক্তিবাদের প্রতিফলন রয়েছে। এর্নস্ট্ বার্লাক্ (Ernst Barlach : ১৮৭০—১৯৩৮) অন্যতম খ্যাতনামা অভিব্যক্তিবাদী ভাস্কর—ভিক্ষুক রমণীর অসহায়তার প্রতিচ্ছবি তাঁর বিখ্যাত ভাস্কর্যকর্ম 'পিটি' বা করুণা।

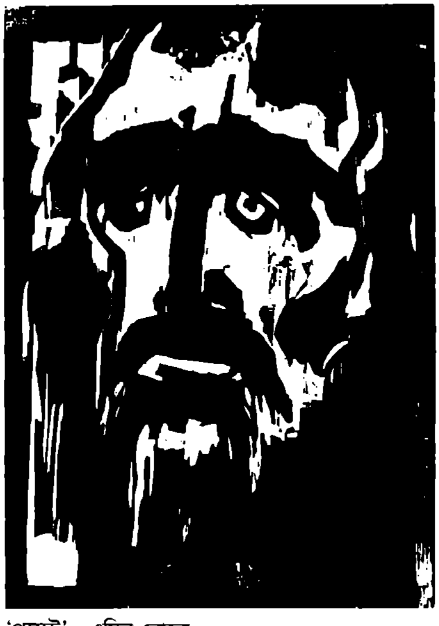

'প্রফেট' : এমিল নোল্ডে

১৯০৫ সালে 'সাঁকো' এবং ১৯১২ সালে 'নীল অশ্বারোহী' নামে যে দু'টি শিল্পীগোষ্ঠী জার্মানির মিউনিখে আত্মপ্রকাশ করে তাদের চিত্রধারাও অভিব্যক্তিবাদী চিত্রশিল্পের মূলধারার সঙ্গে সম্পর্কিত। আজও সারা বিশ্বে এই অভিব্যক্তিবাদী শিল্প বা এক্সপ্রেশনিস্ট আর্টের প্রভাব ও কদর লক্ষণীয়।

ম. আ.

এগারো দফা

পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আওয়ামী লীগ (দ্র) নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের (দ্র) নেতৃত্বে সারা দেশে যখন ব্যাপক সরকারবিরোধী আন্দোলন শুরু হয় সে সময় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৯৬৯ সালের ৬ই জানুয়ারি তাঁদের ঐতিহাসিক ১১-দফা কর্মসূচি পেশ করেন।

এই ১১-দফা দাবি হচ্ছে :

১. শিক্ষা সমস্যার আশু সমাধান,

২. প্রাপ্তবয়স্ক ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা,

৩. পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন,

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে একটি ফেডারেল সরকার গঠন,

৫. ব্যাংক, বীমা, পাটকলসহ সকল বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ,

৬. কৃষকদের উপর থেকে কর ও খাজনা হ্রাস এবং পাটের সর্বনিম্নমূল্য ধার্য করা,

৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং শ্রমিক আন্দোলনে অধিকার দান,

৮. পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও জল-সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ,

৯. নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার,

১০. সিয়াটো (দ্র) (SEATO), সেন্টো (CENTO)-সহ সকল পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল এবং জোট-বহির্ভূত নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ,

১১. আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিসহ দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি ও অন্যান্যদের উপর থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার।

খু. জা.

এঙ্গেল্‌স্, ফ্রিড্‌রিশ্ [১৮২০—১৮৯৫]

জার্মান সমাজতন্ত্রী, সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক। পরবর্তী কালে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে স্বীকৃত। কার্ল্ মার্ক্সের (দ্র) সঙ্গে যৌথভাবে 'মার্ক্সবাদ' (দ্র) হিসাবে পরিচিত বিপ্লবী সমাজতাত্ত্বিক দর্শনের উদ্ভব, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা অনন্য।

বামে : মার্ক্স ও ডানে : এঙ্গেল্‌স্

১৮২০ সালের ২৮শে নভেম্বর এক ধনাঢ্য জার্মান পরিবারে এঙ্গেল্‌স্ (Friedrich Engles) জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪২ সালে ইংল্যাণ্ডে যান পৈতৃক ব্যবসা দেখাশোনা করতে। এর পাশাপাশি সাংবাদিকতার কাজও চালিয়ে যেতে থাকেন।

মার্ক্সের সঙ্গে এঙ্গেল্‌সের পরিচয় ঘটে ১৮৪৪ সালে প্যারিসে। এই পরিচয় পরে এক কিংবদন্তিতুল্য নিবিড় বন্ধুত্বে রূপ নেয়। ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'দ্য কণ্ডিশান অব দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যাণ্ড'। মার্ক্স ও তাঁর যৌথ প্রচেষ্টার ফসল 'জার্মান আইডিওলজি' (১৮৪৫), যা প্রকাশিত হয় তাঁদের মৃত্যুর পর। তাঁদের যৌথ মেধার আরেকটি যুগান্তকারী ফসল 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' (দ্র) (১৮৪৮)। এর ভেতর দিয়েই তাঁরা প্রথম তুলে ধরেন ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকার কথা, ধনতন্ত্রবাদের (দ্র) গর্ভ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্মের কথা।

মার্ক্সের মৃত্যুর পর 'ডাস কাপিটাল' (দ্র)-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড সম্পাদনা (দ্র) ও প্রকাশ করার কৃতিত্ব এঙ্গেল্‌সের।

সাধারণভাবে কার্ল্ মার্ক্সের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে পরিচিত হলেও ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, বিপ্লব ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চিন্তাও অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ বলে পরিগণিত। মার্ক্সবাদ প্রকৃতপক্ষে মার্ক্স ও এঙ্গেল্সের যৌথ চিন্তা ও শ্রমের ফসল।

এঙ্গেল্সের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ রচনাকর্ম 'এন্টিডুরিং' এবং 'দ্য ওরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি, প্রপার্টি অ্যাণ্ড দ্য স্টেট'।

১৮৯৫ সালের ৫ই আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

এটলি, ক্লিমেণ্ট রিচার্ড [১৮৮৩—১৯৬৭]

ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিবিদ ও প্রধানমন্ত্রী। আইনশাস্ত্র ও সমাজবিজ্ঞানে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল।

১৮৮৩ সালে ইংল্যাণ্ডের পাটনিতে এটলির (Clement Richard Attlee) জন্ম। হেইলিবেরি কলেজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেন। 'লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স' নামক প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেন কিছুকাল।

১৯২২ সালে শ্রমিক দলের প্রার্থী হয়ে সংসদ সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং নির্বাচনে জয়লাভ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি সংসদে বিরোধী দলের নেতা হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সময় স্যার উইনস্টন চার্চিল (দ্র) যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন, এটলি তাতে যোগ দেন। ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে এটলির দল লেবার পার্টি জয়লাভ করে এবং এটলি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৫০ সালে দ্বিতীয় বারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন তিনি। অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করে এটলি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালেই 'কেবিনেট মিশন' ভারতে (দ্র) আসে এবং উপমহাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত হয়।

১৯৬৭ সালে এটলি মৃত্যুবরণ করেন।

টি. কি.

এটিপি (ATP)

উচ্চ-শক্তি-সম্পন্ন ফসফেটযুক্ত যৌগ। জীবদেহে শক্তি যোগানোর সরাসরি প্রধান উৎস। কোষের বৃদ্ধি, কোষ বিভাজন, মাংসপেশির সঙ্কোচন এবং আরো অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এটিপি এবং এর সমগোত্রীয় উপাদানসমূহ শক্তি যোগায়। এমনকি জোনাকি পোকার মতো অনেক প্রাণীর আলোকপ্রভা তৈরি করায় এর ভূমিকা রয়েছে। অ্যাডেনিন (একটি নাইট্রোজেন যৌগ) এবং রাইবোজ (একটি চিনি জাতীয় যৌগ) যুক্ত হয়ে অ্যাডেনোসিন তৈরি হয়। অ্যাডেনোসিনের সঙ্গে শিকলের মতো পর পর তিনটি ফসফেটমূলক যুক্ত হয়ে এটিপি তৈরি হয়। এই ফসফেটমূলক একের পর এক বিযুক্ত হয়ে এডিপি (*adenosine diphosphate*—এতে দুটো ফসফেটমূলক আছে) এবং এএমপি (*adenosine monophosphate*—এতে একটি ফসফেটমূলক আছে) তৈরি হয়। প্রতিটি ফসফেটমূলক বিযুক্ত হওয়ার সময় প্রচুর শক্তি বিমুক্ত হয় এবং তা কোষের কাজে ব্যবহৃত হয়।

সা. এ.

এডিসন্, টমাস্ আল্ভা [১৮৪৭—১৯৩২]

বিদ্যুৎ-শক্তিকে মানুষের দৈনন্দিন নানা কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ বিজ্ঞানী। এডিসনের (Thomas Alva Edison) জন্ম আমেরিকায়, ১৮৪৭ সালে। ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত কৌতূহলী। নানা ধরনের যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে উৎসাহ বোধ করতেন। ১৮৬৮ সালে আবিষ্কার করেন ভোট রেকর্ড করার যন্ত্র। এর নয় বছর পর ১৮৭৭ সালে আবিষ্কার করেন ফোনোগ্রাফ। এই ফোনোগ্রাফই পরে 'গ্রামোফোন' (দ্র) নামে পরিচিত হয়। তাঁর সবচেয়ে

বিখ্যাত আবিষ্কার হচ্ছে বৈদ্যুতিক বাল্ব। দীর্ঘদিন গবেষণা চালিয়ে তিনি এতে সাফল্যলাভ করেন। কার্বন টেলিফোন ট্রান্সমিটার আবিষ্কার করে তিনি টেলিফোন (দ্র) আবিষ্কারের সূচনা করেন। চলন্ত ছবি অর্থাৎ আজকের সিনেমার ক্যামেরা (দ্র) আবিষ্কারও তাঁর অন্যতম কীর্তি। ১৯৩২ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

সু. ব.

এণ্টনি ফিরিঙ্গি [? —১৮৩৬]

কবিয়াল। তাঁর আসল নাম এণ্টনি হেন্সম্যান। কবিগানের জগতে তিনি এণ্টনি ফিরিঙ্গি (দ্র) নামে সুপরিচিত। আঠারো শতকের শেষ ভাগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান নিয়ে বিতর্ক আছে। কারো কারো মতে পশ্চিম বাংলার ফরাসডাঙা (চন্দননগর) তাঁর জন্মস্থান। আবার কারো মতে এটি তাঁর প্রথম আবাস। তিনি ছিলেন পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত। জন্মসূত্রে খ্রিস্টান হলেও বেশভূষা আহার-বিহারে তিনি বাঙালির মতো জীবনযাপন করতেন। তিনি এক হিন্দু বিধবাকে বিবাহ করেন।

প্রথম দিকে তাঁর গানের বাঁধনদার বা গীতিকার ছিলেন গোরক্ষনাথ। পরে তিনি নিজেই গান বাঁধতেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গান—'আমি ভজন সাধন জানি নে মা, নিজে তো ফিরিঙ্গি/যদি দয়া করে কৃপা কর, হে শিবে মাতঙ্গী।'

তিনি কলিকাতার (দ্র) বৌবাজার অঞ্চলে অবস্থিত 'ফিরিঙ্গি কালী মন্দির'-এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৮৩৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

সুজ. ব.

এণ্টিসেপটিক নির্বীজন দ্র

এণ্টিবায়োটিক্স্ (antibiotics)

নির্দিষ্ট কোনো অণুজীবের বংশবৃদ্ধিতে অন্য কোনো অণুজীবের বাধা দেওয়ার শক্তি ও প্রক্রিয়ার নাম 'এণ্টিবায়োসিস্' (গ্রিক শব্দটির অর্থ জীবন-বিরোধিতা তথা অণুজীব (দ্র) বিরোধিতা)। জীবাণু (দ্র), ছত্রাক (দ্র) বা অন্য কোনো অণুজীবে উপস্থিত এ জাতীয় অণুজীব-বিরোধী উপাদানের নাম দেওয়া হয়েছে এণ্টিবায়োটিক্। এণ্টিবায়োটিকের কাজ জীবাণু, ছত্রাক বা ভাইরাসের্ বংশবৃদ্ধি ব্যাহত করা অথবা তাদের বিনাশ করা।

প্রথম এণ্টিবায়োটিক আবিষ্কারের গৌরব ইংরেজ চিকিৎসক আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (দ্র)-এর। ১৯২৯ সালে আকস্মিকভাবে তিনি পেনিসিলিয়াম গ্রুপের ছত্রাকের মধ্যে জীবাণুনাশক পেনিসিলিনের (দ্র) অস্তিত্ব শনাক্ত করেন। কিন্তু তখন বিশুদ্ধ ও মানবদেহে ব্যবহারযোগ্য নিরাপদ রূপে এর নিষ্কাশন সম্ভব হয় নি।

এর পর ১৯৪০ সালে হাওয়ার্ড ফ্লোরি (Sir Howard Walter Florey : ১৮৯৮–১৯৬৮) এবং আর্নেস্ট চেইন (Ernst Boris Chain : ১৯০৬–১৯৭৯) পেনিসিলিয়াম নোটেটাম নামক ছত্রাক থেকে বিশুদ্ধ পেনিসিলিন নিষ্কাশন করতে সক্ষম হন এবং ১৯৪১ সাল থেকে জীবাণু-ঘটিত রোগের বিরুদ্ধে পেনিসিলিনের ব্যবহার শুরু হয়।

পেনিসিলিন (penicillin) আবিষ্কারের পথ ধরে শুরু হল ব্যাপক গবেষণা এবং একের পর এক এণ্টিবায়োটিক আবিষ্কার। ১৯৪৪ সালে ওয়াক্সম্যান্ (Selman Abraham Waksman : ১৮৮৮–১৯৭৩) স্টেপ্টোমাইসিস্ গ্রিসিয়াস নামক ছত্রাক থেকে যক্ষ্মার চিকিৎসায় কার্যকর স্ট্রেপ্টোমাইসিন (streptomycin) আবিষ্কার করেন। এর পর ১৯৪৭ সালে টাইফয়েড জ্বরে ব্যবহার্য ক্লোরামফেনিকল এবং ১৯৪৮ সালে ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন, ১৯৫২ সালে টেট্রাসাইক্লিনের আবিষ্কার। এখন আমরা ইরিথ্রোমাইসিন, জেণ্টামাইসিন, সেফালোস্পোরিন গ্রুপের একাধিক এণ্টিবায়োটিক, এমনকি ছত্রাক ও ভাইরাস-বিরোধী এণ্টিবায়োটিকও ব্যবহৃত হতে দেখছি। এক দিকে অণুজীব এণ্টিবায়োটিক আত্মরক্ষার তাগিদে এণ্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে সহনশীলতা অর্জন করছে, অন্য দিকে বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় ক্রমাগত নতুন নতুন এণ্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হয়ে অণুজীবের বিরুদ্ধে লড়াই নিশ্চিত করছে।

যদিও জীবাণু-বিরোধী ঔষধ কেমোচিকিৎসা-উপাদান এবং এণ্টিবায়োটিক—এই দুই নামে বিন্যস্ত, তবু মৌল কার্যকারিতার প্রকৃতি বিচারে এরা একই গোষ্ঠীর। এদেরকে অনায়াসে অণুজীব-বিরোধী ঔষধ (এণ্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগ্স্) নামে চিহ্নিত করা চলে। বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের প্রবণতাও সেই দিকে।

রু. হা.

এণ্ডারসেন্, হান্স্ ক্রিস্টিয়ান্ [১৮০৫—১৮৭৫]

বিশ্ববিখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক। জন্ম ডেনমার্কের ফুনেন দ্বীপের ওডেন্সে শহরে ১৮০৫ সালের ২রা এপ্রিল। তাঁর পিতা ছিলেন এক জন সাধারণ জুতো প্রস্তুতকারক।

১৮১৬ সালে পিতার মৃত্যু হলে এণ্ডারসেন্ (Hans Christian Andersen) চরম দারিদ্র্যের মুখোমুখি হন। ১৮১৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর মাত্র ১৪ বছর বয়সে বিখ্যাত হওয়ার আশায় রাজধানী কোপেনহেগেনে আসেন। এবং এখানকার রয়্যাল থিয়েটারে নৃত্য ও সঙ্গীতকলা বিদ্যালয়ে নাচ-গানের তালিম নিতে থাকেন (১৮২০—২২)। পরে এই থিয়েটার বোর্ডের সুপারিশক্রমে তিনি স্লাগেল্‌সে ও এলসিনোরের গ্রামার স্কুলের ছাত্র হন (১৮২২—২৭) এবং ১৮২৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় পাশ করেন। এর পর তাঁর শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটে।

তাঁর ব্যাপক সাহিত্যিক সাফল্য আসে ১৮৩৫ সালে। এই সময় প্রকাশিত হয় নিজের জীবনের উপাদান নিয়ে রচিত তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ইম্প্রোভিসাটোরেন'। এ বৎসরই বের হয় 'শিশুদের জন্য বলা কিস্‌সা'—চারটি রূপকথার একটি সঙ্কলন (দ্র)। এতেই তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন এবং ক্রমান্বয়ে আরো রূপকথা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 'রূপকথার জাদুকর' হিসাবে বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেন। সব মিলিয়ে এ ধরনের ১৬৮টি গল্প তিনি লিখেছিলেন।

এণ্ডারসেন্ এক জন আগ্রহী পর্যটকও ছিলেন। ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেন ২৯ বারের মতো। এই সব সফরের সময় তিনি ইউরোপের (দ্র) দিক্‌পাল সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিত হন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— বাল্‌জাক (দ্র), দ্যুমা (দ্র), হাইনরিশ্ হাইনে, ভিক্তর উগো (দ্র), চার্লস ডিকেন্স (দ্র) প্রমুখ।

১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনী 'আমার জীবনের রূপকথা'। এ ছাড়াও রয়েছে তাঁর ভ্রমণ-বিষয়ক বেশ কয়েকটি গ্রন্থ, কিছু কবিতা (দ্র), ছ'টি উপন্যাস (দ্র)ও বিভিন্ন মেজাজের কয়েকটি নাটকও (দ্র)। তবে বিশ্বসাহিত্যে তিনি অমর হয়ে আছেন তাঁর অপরূপ রূপকথাগুলোর জন্য। বিশ্বের দেড় শতাধিক ভাষায় এগুলো অনূদিত ও বহুলপঠিত।

১৮৬৭ সালে ওডেন্সের সম্মানিত নাগরিকের মর্যাদা

কোপেনহেগেনে নিজের বাড়িতে এণ্ডারসেন্, ১৮৭৪। ক্যামেরায় ছবি তুলতে এণ্ডারসেন্ খুব পছন্দ করতেন

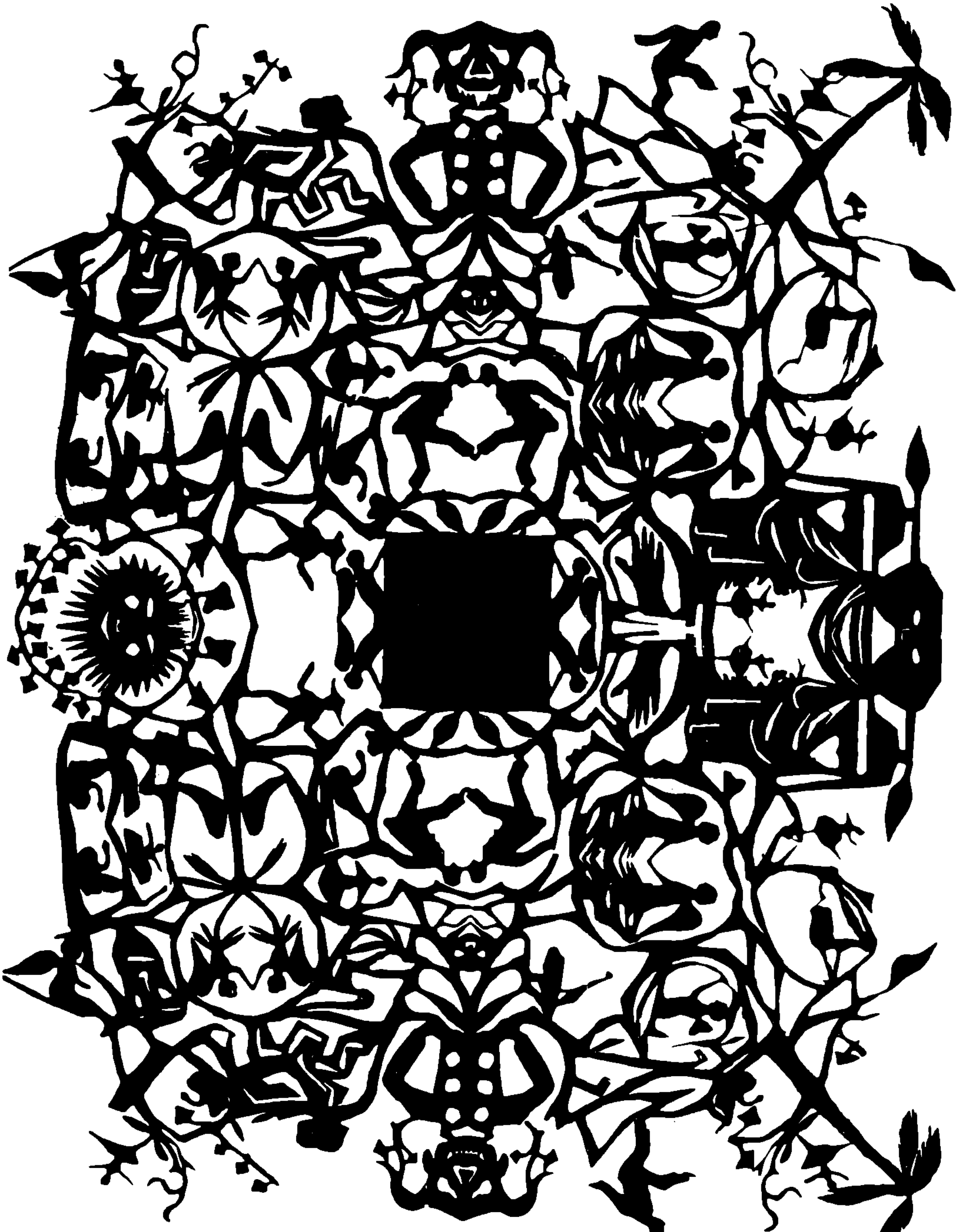

এণ্ডারসেন শুধু মজার মজার গল্প ও নাটকই লিখতেন না, সুন্দর ছবিও আঁকতেন। মজার গল্প ও উদ্ভট কাহিনী এসব ছবির বিষয়। উপরের ছবিটি কাগজ কেটে তৈরি করেছেন

এণ্ডারসেনের অনেক বিখ্যাত গল্পের একটি
'The Steadfast Tin Soldier' গল্প অবলম্বনে
শিল্পী আর্থার রাখামের আঁকা ছবি।

লাভ করেন এবং ১৮৭৪ সালে ভূষিত হন ডেনমার্কের সর্বোচ্চ খেতাবে।

হান্স ক্রিস্টিয়ান এণ্ডারসেন্ মৃত্যুবরণ করেন লিভার ক্যান্সারে ১৮৭৫ সালের ৪ঠা আগস্ট কোপেনহেগেনের নিকটবর্তী মেলচিওরের একটি ভিলায়।

এই মহান লেখকের রূপকথাগুলোর বৈশিষ্ট্য হল—মানুষের জগতে যা আছে, এখানে তার সবই বিদ্যমান। তফাত শুধু এই যে গল্পের শেষে মন্দেরা হয় ভাল হয়ে যায়, নয়তো পায় উপযুক্ত শাস্তি। চিরকাল তাদের অসৎ কাজ করতে দেওয়া হয় না। এখানেই তাঁর রূপকথাগুলোর চিরকালীন আবেদন।

আ. হু.

এত্রুস্কান শিল্পকলা (Etruscan art)

এত্রুস্কান আর্ট গড়ে উঠেছে ইতালির তাস্‌কানিতে। খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০ থেকে ১০০ অব্দ (দ্র) পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে এই শিল্প বিকাশ লাভ করে। ধারণা করা হয় যে নিকটপ্রাচ্য থেকে এই ভাসমান মানবগোষ্ঠী ইতালির এত্রুরিয়া (Etruria) অঞ্চলে এসে বসবাস করতে শুরু করেছিল যিশু খ্রিস্টের (দ্র) জন্মের প্রায় আট শ' বছর আগে। এত্রুস্কান বলেই তারা পরিচিত ছিল।

ঐ স্থানে প্রাচীন গ্রিস দেশের শিল্পীদের আগমন ঘটেছিল, যারা এত্রুস্কান শিল্পীদের শিল্পগুরুর ভূমিকা পালন করে। এই কারণে তাদের শিল্পকর্মের উপর গ্রিক আর্টের প্রভাব দেখা যায়। এ ধরনের প্রভাব-প্রতিফলন সত্ত্বেও এত্রুরিয়া-তাস্‌কানির মানুষ মধ্য-ইতালিতে তাদের নিজস্ব ধারার শিল্প-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড জিইয়ে রেখেছিল দীর্ঘদিন। এখনো তাদের বহু নিদর্শন আমেরিকা (দ্র) ও রোমসহ বিভিন্ন দেশের বড় বড় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

এত্রুস্কান স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন সমাধিসৌধ বা মন্দিরগুলি গ্রিক-স্থাপত্যের মতো মনে হলেও, তাতে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও অবশ্যই রয়েছে। পোড়ামাটি ও পোড়ামাটির ফলকের চমৎকার ব্যবহার করত তারা স্থাপত্যে—পোড়ামাটির আস্তরণ দিয়ে ঢাকত মন্দিরের থাম, তার উপরে রঙিন প্রলেপ দিত। এ ছাড়াও এত্রুস্কান স্থপতিদের উদ্ভাবিত তাস্‌কান্ রীতি নামে চিহ্নিত বিশেষ ধরনের স্তম্ভের ব্যবহার তারা করত।

প্রকৃতপক্ষে সমাধিসৌধকে উপলক্ষ করেই এত্রুস্কান শিল্প বিকশিত হয়। তাদের বেশির ভাগ স্থাপত্যকীর্তিই আজ ধ্বংস হয়ে গেছে, তবু নমুনা বা নিদর্শন যা রয়েছে তা থেকেই তাদের শিল্পের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে পাহাড় কেটে তৈরি সমাধিসৌধের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। তার্কুনিয়ার পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাংশে এ ধরনের সমাধিসৌধ ছিল—যার স্থানে স্থানে ছিল নকশার ও মূর্তির আদলে খোদিত কারুকাজ। এত্রুস্কান শিল্পের সম্ভারে ভাস্কর্য ও চিত্রকলা নানাভাবে এসেছে। সমাধির মধ্যে দেয়ালে দেয়ালে নানা ধরনের যুদ্ধাস্ত্র, ঢাল-তলোয়ার, পানপাত্র ইত্যাদির নকশা অঙ্কন করত শিল্পীরা। এত্রুস্কান দেয়ালচিত্র তার প্রকাশ-আঙ্গিকে ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে প্রকৃতপক্ষে একটি নতুন ধারার শিল্প-নিদর্শন; তাদের বিষয়বস্তু ছিল পাখিশিকার, নৌকাবিহার, মাছধরা, ভোজনোৎসব, নাচ-গান, মল্লযুদ্ধ,

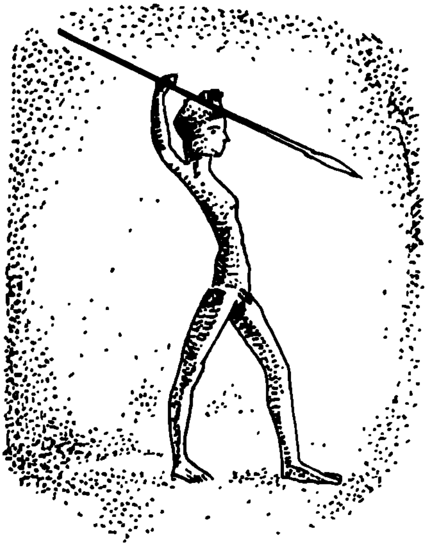

ঘোড়া ও রথের দৌড় এবং অন্যান্য ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রভৃতি—এর সবই অবশ্য ধর্মীয় শিল্প বলে চিহ্নিত হয়েছে। লাল, নীল, সবুজ, গাঢ় বাদামি, ঘন প্রলেপে কালো ও কালচে নীল প্রভৃতি রঙ তারা ব্যবহার করত।

পোড়ামাটির পাত্রের এক ধরনের ঢাক্না তারা তৈরি করত যার আকৃতি হত মানুষের মুখের মতো—ঠিক যেন মুখোশ। আবার কোনো কোনোটা করা হত মানুষের দেহাবয়বের আদলে, ছোট ছোট হাতের আকৃতিও জুড়ে দেওয়া হত পাত্রের গায়ে।

ব্রোঞ্জ-শিল্পের ক্ষেত্রে এক্রস্কান শিল্পী-ভাস্করদের অবদান স্মরণীয়, এগুলো বিকাশলাভ করে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে।

তার্কুনিয়া, অর্ভিক্তো ও ভাল্সি প্রভৃতি স্থানে এক্রস্কান শিল্পের নিদর্শন রয়েছে। নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে এই শিল্পের অনেক নমুনা সংরক্ষিত হচ্ছে।

ম. আ.

এনজাইম (enzyme)

জীবদেহে এমন কিছু প্রোটিন অণু (দ্র) সৃষ্টি হয় যার কাজ হল দেহের জরুরি কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দ্রুততর করা। এই অণুগুলোকে বলা হয় এনজাইম। এনজাইম রাসায়নিক অণুঘটক হিসাবে কাজ করে এইসব বিক্রিয়াকে হাজার গুণ এমনকি লক্ষ গুণ দ্রুততর করে, অথচ শেষ অবধি নিজে বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না। বরং একই এনজাইম অণু এভাবে বারবার হাজার বার পর্যন্ত একই কাজ পুনরাবৃত্তি করতে পারে। এর অভাবে বহু বিক্রিয়া যথেষ্ট দ্রুততায় সম্পন্ন হত না বা একেবারেই সংঘটিত হত না। ফলে জীবনপ্রক্রিয়াই সম্ভব হত না।

মানবদেহে প্রায় হাজার রকমের বিভিন্ন এনজাইম আছে, যার প্রত্যেকটি কোনো না কোনো সুনির্দিষ্ট কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের পরিপাকতন্ত্রের (দ্র) মধ্যেই কাজ করে অনেকগুলো এনজাইম। এদের মধ্যে মুখের লালাগ্রন্থিতে তৈরি অ্যামাইলেজ নামক এনজাইম শর্করা জাতীয় খাদ্যের অণুকে সরলতর অণুতে ভেঙে ফেলে। পাকস্থলীর (দ্র) দেয়াল থেকে নিঃসৃত এনজাইম পেপ্সিন্ আমিষ জাতীয় খাদ্যের অণুর উপর কাজ করে। অগ্ন্যাশয় (দ্র) থেকে নিঃসৃত লাইপেজ ক্ষুদ্রান্ত্রে গিয়ে চর্বির পরিপাকে সাহায্য করে। এমনিভাবে শরীরের প্রায় প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ায় এন্জাইম অংশগ্রহণ করে।

১৯২৬ সালে জীবকোষ থেকে প্রথম বিশুদ্ধ এনজাইম নিষ্কাশন সম্ভব হয়। ১৯৬৯ সালে প্রথম কৃত্রিমভাবে এনজাইম তৈরি করা হয়। এনজাইমের অভাব নানারকম উপসর্গ সৃষ্টি করে বলে ঔষধে এনজাইমের ব্যবহার রয়েছে। তা ছাড়া রোগনির্ণয়ে এবং কিছু ব্যতিক্রমী চিকিৎসার কাজেও এনজাইমের ব্যবহার রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ক্ষত পরিষ্কার, রক্তনালীতে জমাট রক্ত সরানো ইত্যাদি। শিল্পক্ষেত্রেও এনজাইমের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে; যেমন—এণ্টিবায়োটিক (দ্র), রুটি, পনির (দ্র), ভিনিগার (দ্র), ভিটামিন (দ্র) ইত্যাদি তৈরিতে, মাংস নরম করতে, ঘাম প্রভৃতি জৈব দাগ পরিষ্কার করতে ডিটারজেণ্টে।

মু. ই.

এনামুল হক, মুহম্মদ [১৯০২—১৯৮২]

যে কয়েক জন চিন্তাশীল গবেষকের ভাবনা ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের (দ্র) প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে, মুহম্মদ এনামুল হক ছিলেন তাঁদের এক জন।

মুহম্মদ এনামুল হক ১৯০২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের (দ্র) ফটিকছড়ি থানার বক্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মওলানা মুহম্মদ আমিনুল্লাহ

(১৮৪২—১৯১৮)। গ্রামে পারিবারিক বিদ্যালয়ে মুহম্মদ এনামুল হকের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। আরবি, ফার্সি, উর্দু ও বাংলা শেখার সাময়িক পাঠ তিনি এখানেই শুরু করেন। তিনি নানুপুর মাইনর হাইস্কুল থেকে মধ্য ইংরেজি বৃত্তি পরীক্ষা সাফল্যজনকভাবে পাশ করে ১৯১৫ সালে রাউজান উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই স্কুলে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন প্রখ্যাত বাগ্মী ও সাহিত্যিক ইসমাইল হোসেন সিরাজী (দ্র)। তরুণ মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। 'আবাহন' শীর্ষক তাঁর একটি স্বদেশপ্রেমের কবিতার বইও প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি সরকার বাজেয়াপ্ত করে। মুহম্মদ এনামুল হক লেখাপড়ায় খুবই মনোযোগী ছিলেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে মহসীন বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২৩ সালে আই. এ. পড়ার জন্য তিনি চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। কৃতিত্বের সঙ্গে কলেজের পাঠ শেষ করে তিনি আরবিতে অনার্স পড়ার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) ভর্তি হন। আরবিতে উপযুক্ত দক্ষতা অর্জন করার পর তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা (দ্র) ও সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষা দেন। তিনি ১৯২৯ সালে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পুরস্কার হিসাবে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (দ্র) লাভ করেন। তাঁর এই কৃতিত্ব তখনকার সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

উজ্জ্বল শিক্ষাজীবনের অধিকারী মুহম্মদ এনামুল হক গবেষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুসলিম সমাজে তখন গবেষণার আগ্রহ প্রবল ছিল না। যে মুষ্টিমেয় কয়েক জন গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন তিনি তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় তিনি বাংলার সুফিবাদ (দ্র) সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেন, এই গবেষণার সূত্রে তিনি বাংলাদেশের (দ্র) বিভিন্ন মসজিদ (দ্র), দরগা ও মাজারের শিলালিপি পাঠ করেন। মধ্যযুগের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি (দ্র) পাঠ করেন। মুসলিম সমাজের অন্যতম পুঁথিসংগ্রাহক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের (দ্র) সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। মুহম্মদ এনামুল হক ও সাহিত্যবিশারদ যৌথভাবে গবেষণা করে আরাকানের রাজসভায় যে বাংলা সাহিত্যচর্চা করা হত তার ইতিবৃত্ত উদ্ধার করেন। এই গবেষণা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করে। তাঁর অভিসন্দর্ভ (দ্র) সুফি মতবাদের গবেষণার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা। তাঁর এই অভিসন্দর্ভ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (দ্র) থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

মুহম্মদ এনামুল হক এক জন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তিনি কলিকাতার ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বি. টি. পাশ করেন (১৯৩৬)। প্রথম জীবনে তিনি জোরারগঞ্জ হাইস্কুল, বারাসাত সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, হাওড়া জেলা স্কুল, মালদহ জেলা স্কুল ও ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি রাজশাহী সরকারি কলেজে বাংলার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তিনি দৌলতপুর কলেজ, জগন্নাথ কলেজ ও চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। ফলে তাঁকে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করার জন্য নিয়োগ করা হয়। ১৯৫১ সালে তাঁকে পূর্ব পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডে সভাপতি হিসাবে বদলি করা হয়। ১৯৫৭ সালে বাংলা একাডেমীর (দ্র) পরিচালকের পদে নিয়োগ করা হয়। তার পর তিনি ১৯৬০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ হিসাবে তিনি প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি নব প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় বাঙ্‌লা উন্নয়ন বোর্ডের (দ্র) পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৬৮ সালে তিনি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

অবসরজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) বাংলা বিভাগের সুপারনিউমারি বা সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের (দ্র) সময়ে তিনি হানাদার বাহিনীর ভয়ে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এতে টিক্কা খানের সরকার তাঁকে চাকুরিচ্যুত করে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করার পর ১৯৭৩ সালে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য মনোনীত করা হয়। ১৯৭৫ সালে তাঁকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (দ্র) উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করে মুহম্মদ এনামুল হক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে কর্মজীবন শেষ করেন। সকল কাজে তিনি সমান যোগ্যতা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ১৯৮২ সালের ১৮ই জানুয়ারি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অল্প কয়েক দিন রোগভোগের পর ১৬ই ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার ঢাকার পি. জি. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কবি হিসাবে সাহিত্যজীবন শুরু করলেও গবেষণাকেই তিনি পরবর্তী কালে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল : 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' (১৯৫৭), 'চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্যভেদ' (১৯৩৫), 'বঙ্গে সূফী প্রভাব' (১৯৩৫), 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' (১৯৪৮), 'বুলগেরিয়া ভ্রমণ' (১৯৭৮), 'মনীষা মঞ্জুষা' (১৯৭৫-৮৪, তিন খণ্ড)।

ম. মু.

এনেস্থেসিয়া অবেদন দ্র

এপ (ape)

মানবজাতির খুব কাছাকাছি এক ধরনের প্রাণী। এ রকম প্রধান প্রাণী আছে চারটি : শিম্পাঞ্জি, গিবন, গরিলা (দ্র) এবং ওরাংওটাং। এদের দেহ লোমে ভরা। লেজ নেই। পায়ের চেয়ে হাত দীর্ঘ। হাত ও পায়ের আঙুল লম্বা লম্বা। মস্তিষ্ক বেশ বড়। বুদ্ধিতে মানুষের কাছাকাছি। বানর (দ্র) ও বেবুন কিন্তু এপ-শ্রেণীভুক্ত নয়।

শারীরিক দিক দিয়ে এরা অনেকটা মানুষের মতো। অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা এদের এবং মানবজাতির পূর্বপুরুষ ছিল একই কোনো জীব, কিন্তু এরা মানুষের মতো সোজা হয়ে হাঁটতে পারত না। মানুষের পা হাতের চেয়ে দীর্ঘ। দেহে লোম অনেক কম।

বানরের সঙ্গেও এদের বেশ মিল রয়েছে, কিন্তু এপ-এর মতো বুদ্ধি বানরের নেই। বানর চার হাত-পা এপ-এর চেয়ে আরো স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করে গাছে গাছে ঝাঁপাঝাঁপি, ঝোলাঝুলি এবং মাটিতে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে। উপরন্তু, বানরের লেজ আছে।

(ক) শিম্পাঞ্জি
(খ) ওরাং ওটাং
(গ) গরিলা
(ঘ) গিবন

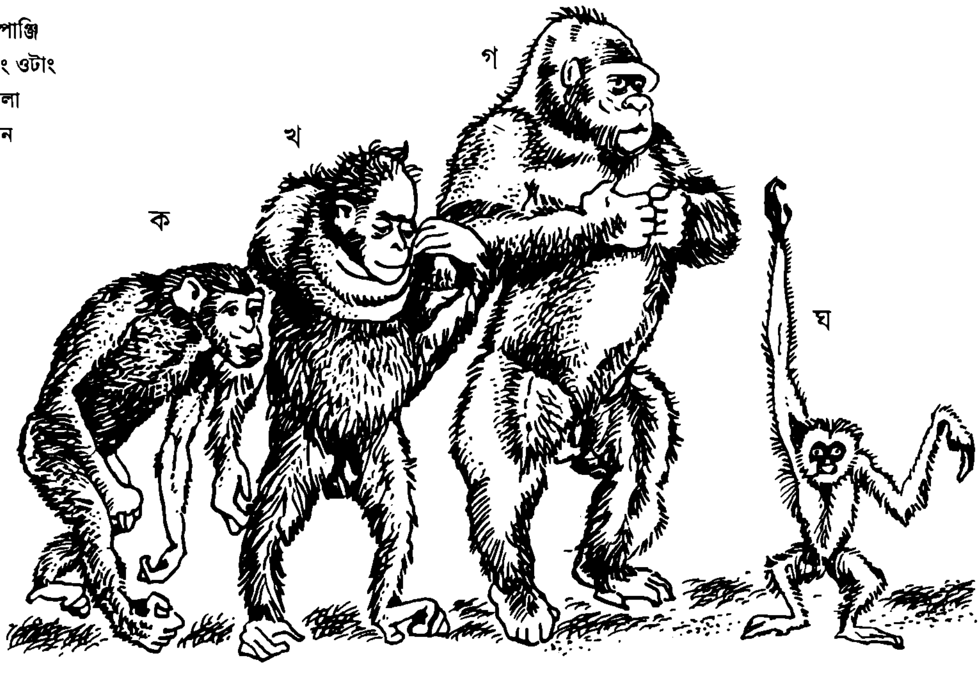

আকারে গরিলা সবচেয়ে বড়, তারপর ওরাংওটাং এবং তারপর শিম্পাঞ্জি। সবচেয়ে ছোট হল গিবন। খাদ্য হিসাবে গরিলা লতাগুল্ম ও চারাগাছ এবং অন্যেরা গাছের ফল খেয়ে থাকে।

গিবন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বনে-জঙ্গলে পাওয়া যায়। শিম্পাঞ্জি দেখা যায় পশ্চিম এবং পূর্ব আফ্রিকায়। গরিলা পাওয়া যায় পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকার জঙ্গলে এবং পূর্ব আফ্রিকার পার্বত্য বনাঞ্চলে। ওরাংওটাং এশিয়া (দ্র) মহাদেশের (দ্র) বোর্নিও এবং সুমাত্রার জঙ্গলে বাস করে।

গিবন পুরুষ ও মেয়েরা বাচ্চাসহ পরিবারের মতো বসবাস করে। শিম্পাঞ্জি বিশ থেকে চল্লিশটি পর্যন্ত একত্রে থাকে। ওরাংওটাং সাধারণত একা থাকে, তবে মেয়েরা সন্তানাদি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বয়স্ক পুরুষ গরিলাদের পিঠে সাদা লোম গজায় এবং এদেরই এক জনকে দলনেতা হিসাবে নিয়ে বিশটি পর্যন্ত এক সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

সৈ. আ. ই.

এপিকিউরাস [খ্রি. পূ.৩৪১—২৭০]

প্রাচীন গ্রিক বস্তুবাদী দার্শনিক ও নীতিশাস্ত্রবিদ। তাঁর জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৩৪১ অব্দে (দ্র) এবং মৃত্যু ২৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

এপিকিউরাস (Epicurus) সুখবাদের প্রবক্তা হিসাবে পরিচিত এবং তাঁর এই মতবাদ 'এপিকিউরানিজম' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এথিক্স বা নীতিজ্ঞানই তাঁর দর্শনের প্রধান বিষয়। তাঁর মতে, জ্ঞান অন্বেষণ ও অর্জনের মূল উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রার নীতিবোধে পৌঁছানো। দর্শনের দায়িত্বও তাই। কর্মের উদ্দেশ্য দুঃখকে পরিহার করে সুখ অর্জনের চেষ্টা। তবে জ্ঞান ও বিচক্ষণতার সাহায্যে যথার্থ সুখের অন্বেষণই মানুষের কাম্য হওয়া উচিত। সব সুখের উৎস দেহ, দৈহিক সুখেই মনের সুখ, যেমন— ক্ষুধার নিবৃত্তি মনে শান্তি এনে দেয়। তবে, সুখভোগে পরিমিতি রক্ষা করা দরকার। আবার সুখের প্রকৃতিও বিচার্য বিষয়। তাই অপরিহার্য ও স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতেই যথার্থ সুখ মেলে। এপিকিউরাসের প্রচারিত সুখবাদ নির্বিচার ইন্দ্রিয়সুখের তত্ত্ব নয়, অথচ ভুল করে এমনটাই মনে করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর বস্তুবাদী দর্শন ও যুক্তিবাদের সাহায্যেই সুখতত্ত্বের দর্শন তৈরি করেছেন।

সত্য, বস্তুসত্তা, আত্মা ইত্যাদি সম্পর্কেও এপিকিউরাসের মতামত সেই প্রাচীন যুগেও যথেষ্ট মৌলিক ও আকর্ষণীয় ছিল। তাঁর মতে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ হবার কারণে তা জ্ঞানের যথার্থতা বা সত্যের পরিমাপক। মানুষের মন হল ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভবের সঞ্চয়গৃহ। ডেমোক্রিটাসের (দ্র) মতো এপিকিউরাসও মনে করতেন, বস্তুর মূলে রয়েছে সংখ্যাতীত অণুর (দ্র) উপস্থিতি। অণুর সংযোজন ও বিয়োজনে বস্তুর সৃষ্টি ও বিনাশ। তিনি ছিলেন নাস্তিক্যবাদী। তাঁর মতে— ভূত, ভগবান ও পরকালের ভীতি থেকে মুক্ত হতে পারলে মানুষের পক্ষে শান্তিলাভ সম্ভব। তিনি আরো মনে করতেন, যুক্তি এবং অযুক্তির সমন্বয়ে মানুষ। মৃত্যুর পর দেহের অন্যান্য অংশের মতো আত্মারও আণবিক বিয়োজনের মাধ্যমে বিলোপ ঘটে।

আ. র.

এফ ডি সি

এফ ডি সি শব্দটি ইংরেজি Film Development Corporation-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) নানা পর্যায়ে চলচ্চিত্র (দ্র) স্টুডিও নির্মাণের একাধিক উদ্যোগ গৃহীত হয়। কিন্তু তা বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে নি তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকদের নানা রকম ঔদাসীন্যের কারণে।

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের (দ্র) এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে বাংলাদেশে (দ্র) চলচ্চিত্র নির্মাণের পুরোধা ব্যক্তিত্ব নাজীর আহমদ (দ্র) পরিচালিত 'সালামত' ছবিটি মুক্তি পেলে ঢাকায় (দ্র) একটি চলচ্চিত্র স্টুডিও গড়ে তোলার দাবি ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। এরই পরিণামে ১৯৫৫ সালের ১৯শে জুন ঢাকায় সরকারি ফিল্ম ডিভিশন ল্যাবরেটরি উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু এতে পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র নির্মাণের কোনো সুবিধা ছিল না।

১৯৫৬ সালে সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে অত্যন্ত সীমিত সুযোগসুবিধা সম্বল করে এদেশের প্রথম বাংলা ছায়াছবি 'মুখ ও মুখোশ' মুক্তি পেলে ঢাকায় একটি চলচ্চিত্র স্টুডিও নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি করে অনুভূত হতে থাকে। এ বছরই (১৯৫৬) তৎকালীন পাকিস্তান সরকার চলচ্চিত্র নির্মাণ ও এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য ৫ বছর

এফ ডি সি'র ৯নং ও ১০নং স্টুডিও
মাঝখানের ছবি : এফ ডি সি'র
কালার ল্যাবরেটরি ও নিচে :
সম্পাদনার কাজ চলছে
এডিটিং মেশিনে

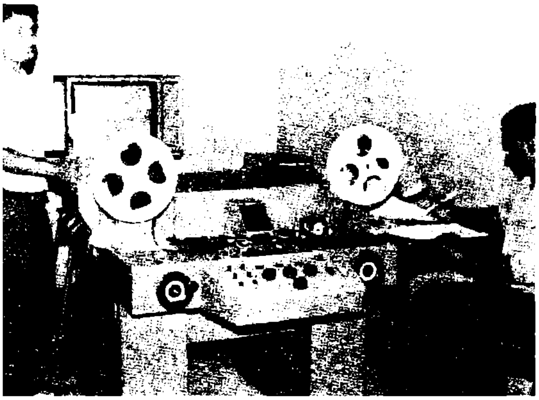

মেয়াদী একটি পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। ১৯৫৭ সালে সরকারি উদ্যোগে একটি সংস্থা গঠন করে পশ্চিম পাকিস্তানের চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলে, পূর্ব-পাকিস্তানেও একই খাতে সম পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের দাবি তোলা হয়। সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান তথা পূর্ববঙ্গে তখন ক্ষমতাসীন যুক্তফ্রন্ট (দ্র) সরকার। সমস্যাটি এই সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের (দ্র) গোচরে আনা হলে ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল প্রাদেশিক আইন পরিষদের শেষ অধিবেশনের দিন (সকালে) তিনি 'পূর্ব-পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন বিল' উত্থাপন করেন। বিলটি সামান্য সংশোধনীর পর বিনা বাধায় আইন পরিষদে পাশ হয়। এবং এর এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইস্ট পাকিস্তান ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন' (EPFDC)। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানটির নাম পাল্টে গিয়ে হয় 'বাংলাদেশ ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন'।

১৯৫৭ সালের ১লা ডিসেম্বর তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের জনসংযোগ বিভাগের ক্ষুদ্র স্টুডিও ও ল্যাবরেটরির কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে এফ ডি সি। পূর্ণাঙ্গ চিত্র নির্মাণের জন্য যে ধরনের স্টুডিও, ফ্লোর বা ল্যাবরেটরির প্রয়োজন, প্রথম দিকে সেটা ছিল না। এ সময় প্রতিষ্ঠানটির ছবির মুদ্রণ ও পরিস্ফুটনের কাজ সম্পন্ন হত এখনকার বি জি প্রেসের (B.G. Press = Bangladesh Government Press) একটি অপরিসর কক্ষে। এর ল্যাবরেটরিও ছিল এখানে।

প্রশাসনিক কাজকর্ম চলত সেগুনবাগিচার একটি বাড়িতে। ১৯৫৯ সালে তেজগাঁ'র বর্তমান জায়গায় স্থানান্তর করা হয়।

এফ ডি সি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে শুরু করে ১৯৬০ সালের পর থেকে। ১৯৮৩ ও ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পের দুই কৃতী পুরুষ জহির রায়হান(দ্র) ও নাজীর আহমদের স্মরণে প্রতিষ্ঠা করা হয় যথাক্রমে 'জহির রায়হান কালার ল্যাব' ও 'নাজীর আহমদ সাউণ্ড কমপ্লেক্স'।

১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠানটি মাত্র একটি শুটিং ফ্লোর, সাদা-কালো ল্যাবরেটরি ও স্বল্পসংখ্যক যন্ত্রপাতি নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এর আধুনিক কারিগরি সুযোগ-সুবিধার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বায়ত্তশাসিত এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয় একটি বোর্ড অব ডিরেক্টর্‌স্ দ্বারা। বর্তমানে ৮ সদস্যের এই বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকেন পদাধিকার বলে তথ্যসচিব। ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ৪৩৮ (১৯৯৩ সালের হিসাব অনুযায়ী)। বর্তমানে দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণে কারিগরিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধা দিচ্ছে মোট ৬টি প্রতিষ্ঠান। এগুলোর মধ্যে ২টি সরকারি—এফ ডি সি এবং ডি এফ পি (ডিপার্টমেণ্ট অব ফিল্ম অ্যাণ্ড পাবলিকেশ্‌ন্স) বা চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তর (দ্র)। বেসরকারি ৪টি চলচ্চিত্র স্টুডিও হল : পপুলার স্টুডিও, বেঙ্গল স্টুডিও, বারী স্টুডিও এবং সিনেতান স্টুডিও। শেষোক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ পৌর এলাকার মধ্যে অবস্থিত।

আ. হু.

এভারেস্ট

এভারেস্ট (Mount Everest) পৃথিবীর (দ্র) সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। হিমালয় (দ্র) পর্বতমালার পূর্বাংশে, নেপাল (দ্র) ও তিব্বতের মধ্যে এর অবস্থান। নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডু থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৬০ কিমি। এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গটি চুনাপাথর (দ্র) দ্বারা গঠিত হয়েও সারা বছর বরফাচ্ছাদিত থাকার কারণে ক্ষয়ের হাত থেকে মুক্ত রয়েছে।

১৮৫২ সালে ভারতীয় জরিপ বিভাগের বাঙালি অফিসার

হিলারি ও তেনজিং

রাধানাথ শিকদার হিমালয়ের এই সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি আবিষ্কার করেন এবং তিনিই প্রথম এর উচ্চতা পরিমাপ করেন ৮,৮৩৯·৮ মিটার (২৯০০২ ফুট)। ব্রিটিশ-ভারতের তখনকার জরিপ বিভাগের প্রধান স্যার জর্জ এভারেস্টের নামানুসারে শৃঙ্গটির নামকরণ হয় 'এভারেস্ট'। তিব্বতীয়রা একে বলে 'চোমোলংমা', নেপালিরা বলে 'সগরমাতা'। ১৯৮০ সালের জরিপ অনুসারে এভারেস্ট শৃঙ্গের উচ্চতা ৮,৮৮২ মিটার।

শৃঙ্গটি আবিষ্কারের পর থেকেই পর্বতারোহীরা অভিযান চালিয়েছেন একে পদানত করতে। দুর্গম বরফ, হিমবাহ এবং তুষারঝড়ে অনেক অভিযান ব্যর্থ হয়েছে, অনেক অভিযাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। অবশেষে সর্বপ্রথম এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করেন তেনজিং এবং হিলারি (দ্র) নামের দু' জন অভিযাত্রী। ১৯৫৩ সালের ২৯শে মে নেপালি শেরপা তেনজিং নোরগে প্রথম পা রাখেন পর্বত চূড়ায়। তার কয়েক মিনিট পরে শৃঙ্গে ওঠেন তাঁর সঙ্গী নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসী এডমণ্ড হিলারি।

স. রা.

এম. এন. রায় মানবেন্দ্রনাথ রায় দ্র

এয়াকুব আলী চৌধুরী [১৮৮৮—১৯৪০]

এয়াকুব আলী চৌধুরী এক জন খ্যাতনামা গদ্যলেখক। ১৮৮৮ সালে (১২৯৫ সনের ১৮ই কার্তিক) রাজবাড়ি জেলার পাংশা থানার মাগুরাডাঙা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবের লেখাপড়া সম্পন্ন করেন পাংশা স্কুলে। রাজবাড়ির সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি কলিকাতার (দ্র) প্রেসিডেন্সি কলেজে (দ্র) ভর্তি হন। এখানে তিনি যখন বি. এ. শ্রেণীতে পড়ছিলেন তখন চোখের অসুখের কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দেন। তাঁর বড় ভাই মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরীও ছিলেন এক জন বিখ্যাত সাহিত্যিক। তিনি 'কোহিনূর' নামক একটি সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এয়াকুব আলী চৌধুরীকে তিনি ঐ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক করে নেন। এয়াকুব আলী জীবিকার জন্য প্রথমে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। তিনি কিছু দিন চট্টগ্রাম (দ্র) জেলার মিরসরাই থানার জোরারগঞ্জ হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন (১৯১৪—১৫)। তখন ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (দ্র) ছিলেন তাঁর সহকর্মী। এর পরে তিনি রাজবাড়ির সূর্যকুমার ইনস্টিটিউশনে এবং পাংশা হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ঐ সময়ে ব্রিটিশবিরোধী খিলাফত আন্দোলন (দ্র) ও অসহযোগ আন্দোলন (দ্র) চলছিল। এয়াকুব আলী চৌধুরী এ দু'টি আন্দোলনে শরিক হন এবং এর জন্য তিনি এক বার জেলও খাটেন (১৯২০—২১)। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর তিনি পুরানো চাকুরি আর ফিরে পান নি। তখন তিনি কলিকাতা চলে যান এবং তাঁর মেজো ভাই আওলাদ হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে থেকে কলিকাতায় সাংবাদিকতার কাজ শুরু করেন। এই সূত্রে কলিকাতার মুসলমান সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। মুসলমান সাহিত্যিকেরা তখন কলিকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি' নামে একটি সাহিত্যসংঘ গড়ে তোলেন। এয়াকুব আলী এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন এবং পরে তিনি কিছু দিন এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন। কবি গোলাম মোস্তফার (দ্র) সঙ্গে যুগ্মভাবে তিনি সমিতির পত্রিকা 'সাহিত্যিক' সম্পাদনা (দ্র) করেন। পত্রিকাটি মাত্র এক বছর চলেছিল।

এয়াকুব আলী চৌধুরী অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর বড় দুই ভাই অল্প বয়সে মারা যাওয়াতে তাঁদের সংসারের ভার তাঁর উপর এসে পড়েছিল। এদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বলে হয়তো তিনি বিয়ে করেন নি। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। তিনি চোখের অসুখে ভুগেছেন সব সময় এবং শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যান। ১৯৪০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর নিজের গ্রামের বাড়িতে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চুয়ান্ন বছর। তিনি এক জন ভাল রাজনৈতিক কর্মী ও সুবক্তা ছিলেন।

লেখক হিসাবে এয়াকুব আলী চৌধুরীর হাতেখড়ি হয় পারিবারিক পত্রিকা 'কোহিনূরে'। 'মোহাম্মদী' (দ্র) ও 'সওগাত' পত্রিকাতেও তিনি লিখেছেন। ধর্ম (দ্র)বিষয়ে লিখতে তিনি খুব আনন্দ পেতেন, ছোট বেলা থেকে তিনি ধর্মপ্রাণ ও ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। শোনা যায়, তিনি 'ধর্মের কাহিনী' বইটি লিখেছেন স্কুলে পড়ার সময়। তিনি তাঁর লেখায় ইসলাম (দ্র) ধর্মের সৌন্দর্য এবং হযরত মুহম্মদের(স.) (দ্র)পুণ্যজীবনের মহিমা অতি লালিত্যপূর্ণ ভাষায় তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, ইসলামের সৌন্দর্য উপলব্ধি করলে এবং মহানবীর (স.) জীবনাদর্শ অনুসরণ করলে ইহলোকে ও পরলোকে পরম শান্তি লাভ করা যায়। এতে জীবনের উৎকর্ষও বোঝা যায়। ধর্মবিষয়ক লেখার লেখক হলেও এয়াকুব আলী চৌধুরী সামাজিক কল্যাণের কথা বলেছেন, মানুষের চরিত্র গড়ে তোলার আদর্শ দেখিয়েছেন। খুব নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন এয়াকুব আলী চৌধুরী।

'শান্তিধারা' এয়াকুব আলী চৌধুরীর সবচেয়ে পরিচিত গ্রন্থ। তাঁর অন্য বইগুলোর নাম 'মানব মুকুট', 'নূরনবী', 'ধর্মের কাহিনী'। এই সবগুলো বইয়ে তিনি ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য খুব আবেগপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এয়াকুব আলী চৌধুরীর গদ্য সুন্দর, কবিত্বময়। 'নূরনবী' শিশুদের জন্য রচিত। এ বইতে হযরত মুহম্মদের (স.) জীবনী রূপকথার ভঙ্গিতে রচিত হয়েছে।

আ. ক.

এয়ার-কণ্ডিশনিং (air-conditioning)

বাতাসের (দ্র) উত্তাপ, আর্দ্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং দালানের ভেতরে এর সঞ্চারণকে এয়ার-কণ্ডিশনিং বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। সাধারণত শরীরের জন্য আরামপ্রদ ও স্বাস্থ্যকর বাতাসের পরিবেশ সৃষ্টি করতে অথবা গবেষণাগার, সূক্ষ্ম কাজের শিল্প-কারখানা ইত্যাদিতে এরকম নিয়ন্ত্রণ দরকার হয়। উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে এয়ার-কণ্ডিশনিং-এর কাজ হল বাতাসকে পরিষ্কার করা, ঠাণ্ডা করা এবং এর থেকে কিছু আর্দ্রতা দূরীভূত করা। শীতল ও শুষ্ক অবস্থায় পরিষ্কার করা ছাড়া বাকি কাজগুলো করতে হয় উল্টো—উত্তপ্ত করা আর আর্দ্রতা যোগ করা। এই সঙ্গে সব অবস্থায় বাতাস সঞ্চালনের কিছু ব্যবস্থা থাকে।

বাতাসের ময়লা ধুলাবালি ইত্যাদি দূর করা হয় একরকম ফিল্টার বা ছাঁকনির মধ্য দিয়ে বাতাসকে নিয়ে গিয়ে। সাধারণত কাচতন্তু বা ধাতবতন্তুতে গড়া উলের মতো জিনিসকে চটচটে তরলে ডুবিয়ে এ ছাঁকনি তৈরি করা হয়। কোনো কোনো ব্যবস্থায় পানির ফোয়ারা অথবা স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণকেও বাতাসের ধুলাবালি সরাতে ব্যবহার করা হয়। বাতাসকে ঠাণ্ডা করা হয় শীতলীকৃত পানি বা অন্য তরলের উপর দিয়ে তা নিয়ে গিয়ে। তরলকে ঠাণ্ডা করার প্রক্রিয়ায় যে কোনো হিমায়কের (দ্র) মতোই। সাধারণত বৈদ্যুতিক মোটরের (দ্র) সাহায্যে বিশেষ গ্যাস (দ্র)-কে সঙ্কুচিত করে এবং পরে একে প্রসারিত হতে দিয়েই শীতলতা সৃষ্টি করা হয়। একই প্রক্রিয়া বাতাসের আর্দ্রতাও কমে যায়। কারণ শীতল বাতাস অপেক্ষাকৃত কম আর্দ্রতা ধারণ করতে পারে। বাতাসকে উত্তপ্ত করার প্রয়োজন হলে তাকে উত্তপ্ত পানি অথবা স্টিম ভরা নলের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় পানির ফোয়ারার মধ্য দিয়ে উত্তপ্ত বাতাসকে নিয়ে গিয়ে কিছু আর্দ্রতা যোগ করা হয়। সরাসরি কক্ষের মধ্যে অথবা ঘরে ঘরে হাওয়া বিশেষ বায়ু-চ্যানেলের ভেতর দিয়ে পাখার সাহায্যে সঞ্চালিত করাও এয়ার-কণ্ডিশনিং-এর একটি কাজ। কারণ, গতিহীন বাতাস আরামপ্রদতার সহায়ক নয়। এয়ার-কণ্ডিশনিং ছোট একটি যন্ত্র, জানালার সঙ্গে লাগিয়ে একটি কামরার জন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আবার পুরো একটি বাড়ি বা বিশাল দালানের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবেও এর আয়োজন করা যেতে পারে বৃহত্তর ব্যবস্থার মাধ্যমে।

মু. ই.

এল গ্রেকো [১৫৪১—১৬৪১]

ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয় চিত্রকরদের অন্যতম। পুরো নাম দোমিনিকোস থিওতোকোপুলি। এল গ্রেকো (El Greco) সম্ভবত ছদ্মনাম। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ক্রিটের কান্দিয়ায় ১৫৪১ সালে। সম্ভবত তিনিই প্রথম গ্রেকো-বাইজান্টাইন রীতিতে ধর্মীয় চিত্রাবলি অঙ্কনের চেষ্টা করেন। ক্রিটে ছিল ভেনিসের উপনিবেশ। তরুণ এল গ্রেকো তাই ১৫৭০ সালের দিকে রোমে আসেন। ইচ্ছা, চিত্রকর হবেন। অচিরেই তাঁর সেই বাসনা পূর্ণ হয়। তিনি চিত্রকর তিশানের

এল গ্রেকো : সেন্ট মার্টিন ও ভিখারি

(Titian : ১৪৭৭-১৫৭৬) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

১৫৭২ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি রোমের পেইন্টার্স্ গিল্ডে ভর্তি হন। রোমের সিস্তিন্ চ্যাপেলে মিকালাঞ্জেলো (দ্র) অঙ্কিত 'শেষ বিচার' ছবি পুনরায় অঙ্কনের দায়িত্ব লাভ করেন তিনি। কিন্তু তাঁর কাজ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনঃপূত না হওয়ায় তিনি সমালোচনার শিকার হন এবং রোম ত্যাগ করে স্পেনে চলে যেতে বাধ্য হন। এল গ্রেকো ১৫৭৭ সালে মাদ্রিদ থেকে তোলেদোতে চলে যান। সেখানে নতুন করে তাঁর শিল্পীজীবনের শুরু হয় এবং অক্লান্তভাবে কাজ করে যান। তাঁর শ্রম ও প্রতিভারও স্বীকৃতি পান তিনি এবং বিত্তেরও মুখ দেখেন।

তোলেদোতে মূলত যেসব ছবি এঁকে তিনি খ্যাতি লাভ করেন এবং বিশ্ব-চিত্রশিল্পের ইতিহাসে যেগুলো অমর সৃষ্টি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'খ্রিস্টের বস্ত্রত্যাগ' (১৫৭৭-১৫৭৯), 'সন্ত মরিসের আত্মবিসর্জন' (১৫৮০-১৫৮২), 'কোন্দে দে ওর্গাথ-কে সমাহিতকরণ' (১৫৮৬), 'সন্ত লুই' (১৫৮৭-১৫৯৭), 'উদ্যানে যন্ত্রণা' (১৫৯৭-১৬০৩) ইত্যাদি।

এল গ্রেকোকে বলা হয়ে থাকে ষোড়শ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক 'ম্যানারিজ্‌ম্' রীতির শেষ শিল্পী। তাঁর শিল্পকর্ম দীর্ঘকাল অবহেলা ও অবজ্ঞার শিকার হয়েছিল। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর চিত্রকরেরা তাঁকে শুধু নতুন করে আবিষ্কারই করেন না, তাঁর কাছে তাঁরা ঋণীও হন ব্যাপক ও বহুভাবে। চিত্রাঙ্কন রীতিতে ভাঙচুর, আবেগী অভিব্যক্তিবাদ (দ্র) ও বিমূর্ততা, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর চিত্রাঙ্কনরীতির যা প্রধানতম ধারা হয়ে ওঠে, তার সব কিছুরই ছাপ আছে এল গ্রেকোর প্রধান চিত্রকর্মে।

এই নেতৃস্থানীয় স্পেনীয় শিল্পী মৃত্যুবরণ করেন ১৬৪১ সালে।

বিশ্বের নামকরা সব চিত্রসংগ্রহশালাতেই এল গ্রেকোর চিত্রকর্ম রয়েছে।

আ. হ.

এল দোরাদো (El Dorado)

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে (দ্র) এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে দক্ষিণ আমেরিকা (দ্র) মহাদেশের (দ্র) কোনোখানে 'এল দোরাদো' নামে একটি শহর আছে, যেখানে সর্বত্র সোনার ছড়াছড়ি।

আসলে এল দোরাদো সম্পর্কে এই অলীক বিশ্বাস চিব্‌চা ইণ্ডিয়ান্‌দের মধ্যে চালু ছিল। এরা এখন বাস করে কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোতায় পাহাড়ী অঞ্চলে। স্পেনীয়রা যখন ইন্‌কা (দ্র) ও আজটেকদের (দ্র) বাসভূমি দখল করে নেয়, তখন তাঁরা এই কিংবদন্তি শোনে এবং তা ইউরোপে ছড়ায়।

এর ফলে বিভিন্ন সময়ে দলে দলে অভিযাত্রী স্বর্ণময় এই নগরী খুঁজে বেড়াতে থাকেন। কিন্তু তাঁরা এই জায়গা আবিষ্কার করতে পারেন নি। কাব্যে, সাহিত্যে এখন পরম

ঐশ্বর্যময় স্বপ্নের নগরী বোঝাতে 'এল দোরাদো' কথাটি প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মার্কিন কবি ও গাল্পিক এডগার্ অ্যালান্ পো (দ্র) এই নামে একটি বিখ্যাত কবিতা লিখেছিলেন। ইংরেজ কবি জন্ মিল্টনের (দ্র) মহাকাব্য (দ্র) 'প্যারাডাইস লস্ট' (দ্র) এবং ফরাসি দার্শনিক ভল্‌ত্যারের (দ্র) 'কাঁদিদ্' গ্রন্থেও এল দোরাদোর উল্লেখ আছে।

হা. মা.

এল পি জি (LPG)

LPG-র পুরো নাম liquefied petroleum gas বা তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস।

অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম (crude petroleum) হল হাইড্রোকার্বন (দ্র) (হাইড্রোজেন ও কার্বনের জৈব যৌগ)-এর এক জটিল মিশ্রণ। এই পেট্রোলিয়ামের উপাদান হাইড্রোকার্বন (দ্র)-সমূহের স্ফুটনাঙ্ক বিভিন্ন। এ কারণে পেট্রোলিয়াম বিশোধনের একটি প্রধান উপায় হল আংশিক পাতন। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়ামের গ্যাসীয় ও তরল—উভয় অংশ রয়েছে। পাতনের শুরুতে গ্যাসীয় অংশ গ্যাস (দ্র) আকারে বের হয়ে আসে। এসব গ্যাসের মধ্যে রয়েছে মিথেন (দ্র), ইথেন, প্রোপেন ও বিউটেন হাইড্রোকার্বন এবং কিছুটা খাদ হিসাবে নাইট্রোজেন (দ্র), অক্সিজেন (দ্র) ও সালফার (দ্র)। গ্যাস ছাড়া অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম (দ্র) থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য পদার্থগুলো হল—পেট্রোল, কেরোসিন (দ্র), ডিজেল (দ্র), ফার্নেস তেল এবং টার বা আলকাতরা (দ্র)।

গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে মিথেন ও ইথেন বাদে প্রোপেন ও বিউটেনকে তরলীকরণ করার ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এভাবে তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এল পি জি পাওয়া যায়। কিছুটা ইথেন ও মিথেনসহ এল পি জি-তে ৭০-৪০ শতাংশ প্রোপেন ও ৩০-৬০ শতাংশ বিউটেন থাকে।

এল পি জি-র জ্বালানি ক্ষমতা প্রাকৃতিক গ্যাসের কাছাকাছি, তাই গৃহকর্ম ও হালকা শিল্পকারখানায় জ্বালানি (দ্র) হিসাবে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

এল পি জি-র সবচেয়ে বড় সুবিধা হল একে ধাতব বোতলে ভরে বিভিন্ন স্থানে বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়।

বাংলাদেশের (দ্র) একমাত্র তেল-শোধনাগারে বর্তমানে গড়ে প্রতিবছর ৬,০০০ টন এল পি জি উৎপাদিত হয়।

মু. হা.

এলার্জি (allergy)

বিশেষ কোনো উপাদানের প্রতি শারীরিক সংবেদনশীলতার কারণে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার নাম এলার্জি। এলার্জি-সৃষ্টিকারী কোনো উপাদান এক জনের শরীরে এলার্জি সৃষ্টি করলেও অন্যের শরীরে তা এলার্জি (দ্র) নাও ঘটাতে পারে।

দেহে এলার্জি দেখা দিলে তা বিভিন্ন রকম শারীরিক লক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যেমন—হাঁপানি (দ্র), সর্দি, চুলকানি, ত্বক (দ্র) লাল হয়ে ফুলে যাওয়া, মাথাব্যথা (দ্র), হজমের ব্যাঘাত ইত্যাদি। যে সকল উপাদানের প্রভাবে এলার্জি দেখা দিতে পারে সেগুলো হল—ধুলাবালি, ফুলের রেণু, গৃহপালিত প্রাণীর পশম, বিভিন্ন রকম খাবার (যেমন—ডিম (দ্র), চিংড়ি (দ্র), ইলিশ (দ্র) মাছ, গরুর (দ্র) মাংস, পাকা কলা (দ্র), কচু (দ্র), বেগুন (দ্র), ফুলকপি (দ্র) এবং অনুরূপ শাকসব্জি) ইত্যাদি। মানসিক উত্তেজনা এবং বংশগত কারণেও এলার্জি দেখা দিতে পারে।

এলার্জির সম্পূর্ণ নিরাময় সব সময় নাও ঘটতে পারে। তবে এর তীব্রতা ও উপসর্গগুলো নিয়ন্ত্রণযোগ্য। তীব্র এলার্জির ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসাগ্রহণ বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় তা গুরুতর শারীরিক উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে। এলার্জির লক্ষণ নিরাময়ের জন্য প্রধানত 'অ্যান্টিহিস্টামিন' (antihistamine) জাতীয় ঔষধ ব্যবহৃত হয়। গুরুতর অবস্থায় কর্টিসোন (cortisone) (দ্র) জাতীয় ঔষধের (দ্র) প্রয়োজন হতে পারে।

সি. না. হ.

এলাহাবাদ প্রয়াগ দ্র

এলিজাবেথ, ১ম [১৫৩৩—১৬০৩]

ইংল্যাণ্ডের রানী (১৫৫৮—১৬০৩)। অষ্টম হেনরি ও অ্যান বোলিন্-এর কন্যা। প্রথম জীবনেই তিনি পারিবারিক বিপর্যয়ের শিকার হন—তাঁর মাতার প্রাণদণ্ড হয় এবং তিনি মাতার অবৈধ সন্তান বলে ঘোষিত হন।

কিন্তু ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট (দ্র) তাঁকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের রানীরূপে বরণ করে নেয়। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সময় ইংল্যাণ্ডের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। এক দিকে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে চরম পরাজয়, অন্য দিকে সরকারের বিরাট ঋণের বোঝা ও ধর্মীয় অন্তর্বিরোধ দেশকে নানা সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। এই দুঃসময়ে রানী শক্ত হাতে দেশের হাল ধরেন। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি ক্যাথলিকদের (দ্র) বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন এবং প্রোটেস্ট্যান্ট (দ্র) মতবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করেন। তাঁর কূটনীতির ফলে স্পেন পরাজিত হয় এবং ফ্রান্সের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। স্কটদের রানী মেরি সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য হলে তিনি তাঁকে

আশ্রয় দেন এবং বন্দি করে রাখেন। এদিকে মেরিকে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসানোর জন্য ষড়যন্ত্র শুরু হলে তিনি মেরিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তিনি স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন (১৫৫৯)। ব্রিটিশ জলদস্যুরা স্পেনের বাণিজ্যজাহাজ লুণ্ঠন করলে এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ফিলিপ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে স্পেনে আর্মাডা (রণতরীবহর) প্রেরণ করেন। ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে এই আর্মাডা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। ফলে খর্ব হয় স্পেনের ক্ষমতা।

এলিজাবেথ অনেকটা দাম্ভিক, অস্থিরচিত্ত, পক্ষপাতদুষ্ট এবং কোপনস্বভাবের মহিলা বলে কোনো কোনো মহল থেকে অভিযোগ করা হলেও বিদগ্ধ জনদের বিবেচনায় তিনি শাসনকার্যে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন এবং অসামান্য সাহসের অধিকারী। তিনি বিয়ে করেন নি ; কিন্তু কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে একাধিক বিয়ের প্রস্তাব ঝুলিয়ে রেখে প্রচুর রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করেছিলেন।

এলিজাবেথের শাসনকাল ইংল্যাণ্ডের 'স্বর্ণযুগ' বলে বিবেচিত হয়। তাঁর সময়েই ইংল্যাণ্ডে শেক্সপীয়র (দ্র), স্পেন্সার (দ্র), ফ্রান্সিস বেকন (দ্র), স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে প্রমুখ মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর শাসনামলে সমগ্র ইংল্যাণ্ড ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং এক শক্তিশালী নৌবাহিনীর অধিকারী হয়ে বৃহত্তম ইউরোপীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। এ সময়ে ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং উত্তর আমেরিকায় (দ্র) ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের সূচনা ঘটে।

মো. ই.

এলিয়ট, টি. এস. [১৮৮৮—১৯৬৫]

ইংরেজি ভাষার কবি, সমালোচক, নাট্যকার ও সম্পাদক। জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) সেণ্ট লুইসে, ১৮৮৮ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর। কবিতায় (দ্র) আধুনিকতাবাদী আন্দোলনের প্রভাবশালী পুরোধা পুরুষ। পুরো নাম টমাস স্টার্ন্স্ এলিয়ট (Thomas Stearns Eliot)।

১৯০৬ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এলিয়ট সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড, ফ্রান্সের সর্বোন ও ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) শুরু হলে তিনি ইংল্যাণ্ডে থেকে যান এবং গ্রহণ করেন ব্রিটিশ নাগরিকত্ব।

এলিয়ট প্রথমে শিক্ষকতা ও ব্যাংকের কেরানি হিসাবে তাঁর পেশাগত জীবন শুরু করেন। পরে 'দ্য ক্রাইটেরিয়ন' (The Criterion) নামে সাময়িকী সম্পাদনা (দ্র) করেন। মার্কিন কবি এজরা পাউণ্ডের (Ezra Pound : ১৮৮৫-১৯৭২) সঙ্গে লণ্ডনে এই সময় তাঁর পরিচয় ঘটে। এলিয়টের কবিতা পড়ে মুগ্ধ পাউণ্ড কবিতা রচনায় তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেন।

এলিয়ট ও তাঁর স্ত্রী ভ্যালেরি

এলিয়টের কবিতা ব্যাপক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে তাঁর বিখ্যাত কবিতাসঙ্কলন 'দ্য ওয়েস্টল্যাণ্ড' (১৯২২) প্রকাশিত হবার পর। ১৯৪৮ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার (দ্র.) লাভ করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের তথা বিশ্ব-সমাজব্যবস্থার আমূল ওলটপালট আর ভাঙনে মানবতার হাহাকার এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের চরম নৈরাশ্যকে চিত্রিত করেছেন এলিয়ট। বিশ শতকের বিশ্ব-কাব্যআন্দোলন তাঁর কাব্যাদর্শ দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত।

টি. এস. এলিয়টের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম 'প্রুফ্রোক অ্যাণ্ড আদার অবজারভেশন্স' (কবিতা, ১৯১৭), 'অ্যাশ ওয়েন্স্‌ডে' (কবিতা, ১৯৩০), 'ফোর কোয়ার্টেট্‌স্‌' (কবিতা, ১৯৪৩), 'দ্য সেক্রেড্ উড্' (সমালোচনা, ১৯২০), 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল' (কাব্যনাটক, ১৯৩৫), 'দ্য ফ্যামিলি রিইউনিয়ন' (কাব্যনাটক, ১৯৩৯), 'দ্য ককটেল পার্টি' (কাব্যনাটক, ১৯৫৩) এবং 'দ্য কন্‌ফিডেনশিয়াল ক্লার্ক' (কাব্যনাটক, ১৯৫৩) ইত্যাদি।

মৃত্যু ১৯৬৫ সালের ৪ঠা জানুয়ারি, লণ্ডনে।

আ. হ.

এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড

লিউইস ক্যারোল

ইংরেজি শিশুসাহিত্যের বিখ্যাত বই 'এলিসেস অ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'। সংক্ষেপে 'এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' (Alice in Wonderland) নামেই বিশ্ব জুড়ে বইটি পরিচিত। লেখকের নাম লিউইস ক্যারোল্ (দ্র)। এটি ছদ্মনাম।

অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক চার্ল্‌স্ লাট্‌উইজ ডজ্‌সন্ (Charles Lutwidge Dodgson : ১৮৩২-৯৮) 'লিউইস ক্যারোল্' ছদ্মনামে বইটি প্রকাশ করেন। রচনাকাল ১৮৬৫ সাল।

ডজ্‌সন্ ব্যক্তিজীবনে খুব মজার মানুষ ছিলেন। শিশুদের তিনি খুব ভালবাসতেন। শিশুরা ছিল তাঁর প্রিয় বন্ধু। তাঁর এরকম ক্ষুদে তিন বন্ধু—লরিনা, এলিস আর এডিথ। এরা তিন বোন ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের ডীন হেনরি জর্জ লিডেলের মেয়ে।

ক্যারোল্ এই তিন বোনকে নিয়ে মজার মজার গল্প বানাতেন আর ওদের শোনাতেন। এক বড়দিনের উৎসবে শোনানো মজার কাহিনীটি তিনি নিজ হাতে লিখে মধ্যম

'এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' বইয়ের নানারকম ঘটনা ও চরিত্রের ছবি—লিউইস ক্যারোলের আঁকা ছবির অনুকরণে আঁকা

বোন এলিস লিডেলকে উপহার দেন। তখনো তাঁর চিন্তায় ছিল না যে এটা বই আকারে প্রকাশিত হতে পারে।

দু'জন বিখ্যাত লেখক পাণ্ডুলিপিটি (দ্র) দেখে লেখাটি ছেপে বৃহত্তর পাঠক সমাজে সম্প্রচারের জন্য ডজ্‌সন্‌কে পরামর্শ দেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাই করলেন। পাণ্ডুলিপিটির সঙ্গে আরো দুটো অধ্যায় যোগ করে প্রকাশ করলেন। তখনকার সেরা শিল্পী স্যার জন টেনিয়েল বইটির অলঙ্করণ করেন। বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

এ বইতে এলিস নামের ছোট একটি মেয়েকে লেখক নানান ঘটনার মধ্য দিয়ে নিয়ে যান এক আশ্চর্য পৃথিবীতে। সে রাজ্যের বাসিন্দারা বিভিন্ন শ্রেণীর জীবজন্তু। সেখানে নতুন নতুন ঘটনার জন্ম দিতে থাকে ছোট্ট এলিস। তার শরীরের আকার–আকৃতিও হঠাৎ হঠাৎ পরিবর্তন হতে থাকে। এভাবেই এলিসের কাহিনী এক পর্যায়ে গিয়ে পরিণতি পায়। শুধু শিশুসাহিত্য হিসাবেই নয়, 'এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' বিশ্বসাহিত্যের একটি সেরা সম্পদ হিসাবেও সমাদৃত হচ্ছে। বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত হওয়ায় সারা পৃথিবীর (দ্র) ছেলেমেয়েরা এলিসের আজব কাহিনী পড়ে আসছে যুগ যুগ ধরে।

লিউইস ক্যারোলের মৃত্যুর প্রায় তিরিশ বছর পর, ১৯২৮ সালে এলিস লিডেল (তখন মিসেস হারগ্রীভ্‌স্‌) উপহার হিসাবে প্রাপ্ত এই বইটির মূল কপিটি বিশেষ কারণে আমেরিকার এক জন দুষ্পাপ্য গ্রন্থের সংগ্রাহকের নিকট ১৫,৪০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রি করে দেন।

ফা. ন.

এলুয়ার, পল [১৮৯৫—১৯৫২]

বিশিষ্ট ফরাসি কবি। স্যুররিয়ালিজ্‌মের (দ্র) অন্যতম প্রবক্তা হিসাবে তাঁর কবিজীবনের শুরু। এই সাহিত্য– আন্দোলনে তাঁর অন্যতম দুই সহযোগী ছিলেন লুই আরাগঁ (দ্র) ও অঁদ্রে ব্রেতঁ (André Breton)।

পল এলুয়ার (Paul Èluard) প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৯৫ সালে। এলুয়ার অবশ্য তাঁর আসল নাম নয়। তাঁর পুরো নাম অঁজ্যান্ এমিল–পল গ্রাঁদেল। পারিবারিক পদবি গ্রাঁদেল।

অবস্থাপন্ন পরিবারে জন্মেছিলেন তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (দ্র) চলাকালে বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হলেও শেষ পর্যন্ত বেঁচে ওঠেন তিনি। কোনো কিছু নিয়ে মেতে ওঠার প্রবল তাড়না পেয়ে বসে তাঁকে। সেই তাড়না থেকেই তিনি প্রথমে যুক্ত হন দাদাবাদ (দ্র) আন্দোলনের সঙ্গে। অবশ্য এ আন্দোলনের সঙ্গে বেশি দিন যুক্ত থাকেন নি তিনি। অচিরেই স্যুররিয়ালিস্ট বা পরাবাস্তববাদী আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। পরিশেষে তিনি চিত্রশিল্পী বন্ধু পাবলো পিকাসোর (দ্র) সঙ্গে মিলে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) সূচনায় হিটলারের নাৎসি (দ্র) বাহিনী ফরাসি দেশ জবরদখল করে নিলে যে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয় তাতেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই সময় এলুয়ারের কবিতা মুক্তিকামী ফরাসি জনগণের হৃদয়ে প্রভূত আলোড়ন তোলে।

মুক্তিপিয়াসী মানুষের প্রতি এলুয়ারের সমর্থন যেহেতু সহজাত জীবনধর্ম ছিল, সেহেতু স্পেনের গৃহযুদ্ধে (দ্র) পীড়িত ও স্বাধীনতাকামী জনগণের স্মরণে তিনি লেখেন 'গের্নিকার জয়' শীর্ষক একটি কালজয়ী কবিতা। এটি রচনা করেন তিনি ১৯৩৬ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি বাহিনীর পরাজয়ের পর বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি চিত্রপরিচালক আল্যাঁ র‍্যনে 'গের্নিকা' নামে যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, তার ধারাভাষ্য রচনা করেন পল এলুয়ার।

এই ফরাসি কবির কবিতা চড়া সুরের নয়। জীবন ও মানুষের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম তাঁর কাব্যজীবনের মূল আদর্শ। যা-কিছু জীবন-বিরোধী তার বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধ ও বিক্ষোভ যেমন শান্ত সমাহিত, তেমনি আশ্চর্য পরিশীলিত। তাঁর সৃষ্ট কাব্যশৈলী তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের বহু কবিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

পল এলুয়ার ১৯৫২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হ.

এশিয়া

পৃথিবীর (দ্র) সবচেয়ে বড় মহাদেশ (দ্র) এশিয়া। পৃথিবী নামক গ্রহের তিন ভাগের এক ভাগ ভূপৃষ্ঠ দখল করে আছে এই মহাদেশ। সারা পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের বাস এখানে। রাশিয়ার (দ্র) উরাল পর্বতমালা দিয়ে ইউরোপের (দ্র) সঙ্গে

এশিয়ার সীমান্ত তৈরি হয়েছে।

এশিয়া মহাদেশের আয়তন ৪,৪৩,৮৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৯০ সালে লোকসংখ্যা ছিল প্রায় তিন শ' কোটি। এটি এত বড় যে এর কোনো কোনো অংশ সাগর থেকে ২,৫০০ কিলোমিটার দূরে। শীতকালে মহাদেশটির মধ্যভাগ থেকে ঠাণ্ডা ভারি বাতাস বয়। আবার গ্রীষ্মকালে বিপরীত দিক থেকে বাতাস বয়। এ সময়ে বাতাস খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে উপরে উঠে যায় এবং সমুদ্র থেকে আর্দ্র বাতাস মহাদেশটির ভেতরে প্রবেশ করে। ফলে এই অঞ্চলে মৌসুমি বায়ু (দ্র) ও বৃষ্টিপাত দেখা দেয়।

এশিয়া মহাদেশের বেশির ভাগ লোকই ভারত (দ্র), চীন (দ্র) ও রাশিয়ায় বাস করে। আয়তনের দিক দিয়ে ইউরোপীয় অংশ বাদ দিয়ে রাশিয়া সবচেয়ে বড় দেশ এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে চীন সবচেয়ে বড়। জাপান (দ্র), সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়া সমৃদ্ধিশালী দেশ। জাপান পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম শিল্পসমৃদ্ধ দেশ। এশিয়ার অন্তর্গত অধিকাংশ দেশের প্রধান জীবিকা কৃষি। ভারত, চীন, বাংলাদেশ (দ্র) ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান খাদ্যশস্য ধান (দ্র)। অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত হিমালয় (দ্র) এই মহাদেশে অবস্থিত। এভারেস্ট (দ্র) গিরিশৃঙ্গের সর্বোচ্চ উচ্চতা ৮,৮৮২ মিটার। এখানকার সবচেয়ে বড় হ্রদ কাস্পিয়ান হ্রদ, আয়তন ৩,৭১,০০০ বর্গকিলোমিটার। দীর্ঘতম নদী চ্যাং জিয়াং (ইয়াঙ্গি)। এছাড়া এই মহাদেশে রয়েছে গঙ্গা (দ্র), সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্রের (দ্র) মতো বড় বড় নদ-নদী।

সে. শা.

এশিয়া মাইনর (Asia Minor)

এশিয়া (দ্র) মহাদেশের (দ্র) সর্ব পশ্চিম সীমান্তে এবং ইউরোপ (দ্র) মহাদেশের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত একটি উপদ্বীপ। এর অন্য নাম আনাতোলিয়া (Anatolia)। গ্রিক শব্দ আনাতোলে (anatole) থেকে আনাতোলিয়ার উৎপত্তি। এর অর্থ পূর্ব দিক বা সূর্যোদয়। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা (দ্র) মহাদেশের মধ্যে সংযোগস্থল হিসাবে বিশ্ব-ইতিহাসে এই অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম।

এশিয়া মাইনর দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার পার্বত্য উপদ্বীপের অংশ এবং উচ্চ আর্মেনীয় মালভূমির পশ্চিম অংশ নিয়ে গঠিত। এর আয়তন ৭,৫৬,৯৫৪ বর্গ কিলোমিটার (২,৯২,২৬০ বর্গ মাইল)। এই বিশাল ভূখণ্ডের উত্তরে কৃষ্ণসাগর, পশ্চিমে ঈজিয়ান সাগর এবং দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর (দ্র)। বস্‌ফরাস প্রণালী ও মর্মরা সাগর আর দার্দেনালিস প্রণালী এই ভূখণ্ডকে ইউরোপ মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত তুরস্ক (দ্র) প্রজাতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত।

এশিয়া মাইনর অঞ্চলের শাসনক্ষমতার হাতবদল ঘটেছে বহুবার। হিটাইটদের পতনের পর গ্রিকবাসীরা লিডিয়া, ফ্রিজিয়া ও ট্রয়ের সহযোগিতায় আইওনিয়ার উপকূল হিসাবে এই অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রিক সম্রাট আলেকজাণ্ডার (দ্র) এশিয়া মাইনরকে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর দায়াদোচির যুদ্ধে এই বিশাল ভূখণ্ডটি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৩শ শতকে এই অঞ্চল উসমানীয় শাসকদের (Ottoman Turks) অধিকারভুক্ত হয়। ১৯১৯ সাল পর্যন্ত এটি ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (দ্র) পর ১৯২৩ সালে এই অঞ্চলে তুরস্ক (দ্র) প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়।

প্রাচীন কালে এশিয়া মাইনর প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান সংযোগস্থল ছিল। ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস নদী দ্বারা পশ্চিম এশিয়া মেসোপটেমিয়ার (দ্র) (বর্তমান ইরাক) সঙ্গে এবং উপকূল দ্বারা গ্রিসের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সুমেরীয় সভ্যতার (দ্র) যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার এই আদানপ্রদান শুরু হয়।

এশিয়া মাইনর উত্তরে পন্টিক ও দক্ষিণে টরস পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। টরসের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এরসিয়াস দাগি ৩,৯১৬ মিটার উঁচু। এটিই এশিয়া মাইনরের সর্বোচ্চ উচ্চতা। পর্বতবেষ্টিত মধ্যভাগের মালভূমি শুষ্ক, অনুর্বর। মালভূমি ও পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া ভূখণ্ডের উপকূল অঞ্চলে সংকীর্ণ সমভূমি রয়েছে। এই সমভূমি বেশ উর্বর। ভূমির ঢাল অনুযায়ী অঞ্চলের নদীগুলো উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ এই তিন দিকে প্রবাহিত। সাকারিয়া, কিজিলা, ইর্‌মাক এবং ইয়েসিন ইর্‌মাক কৃষ্ণসাগরে পতিত উত্তরমুখী প্রধান নদী।

পশ্চিমে ও দক্ষিণ—পশ্চিমে গিদিজ, বুজুকমেণ্ডার্স আর কোসা ঈজিয়ান সাগর ও ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে। উপকূলের দিকে পর্বতের ঢালে অরণ্য আছে।

এ অঞ্চলের জলবায়ু (দ্র) ভূমধ্যসাগরীয়। সর্বনিম্ন মাসিক তাপমাত্রা ৭.৭° সেলসিয়াস (৪৬° ফারেনহাইট)। উপকূলে শীতকালেও বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিপাতের মোট পরিমাণ ৫০৫ মিলিমিটার (১৯.৯ ইঞ্চি)। নভেম্বর থেকে মার্চে সাধারণত বৃষ্টিপাত বেশি হয়।

অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা কৃষি। মালভূমির লোকেরা পশুচারণও করে থাকে। উপকূলে গম (দ্র), আখ (দ্র), তুলা (দ্র), তামাক (দ্র), তুঁত (রেশম) আর ফল উৎপন্ন হয়। তামাক, তুলা, শুষ্ক ফল, ছাগলের লোম, ক্রোম, তামা (দ্র), লোহা (দ্র) প্রভৃতি এই অঞ্চলের রপ্তানিদ্রব্য। খনিজ পদার্থের মধ্যে এমেরি, ক্রোম, তামা এবং সামান্য কয়লা (দ্র) পাওয়া যায়।

তুরস্কের রাজধানী এবং প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র আঙ্কারা মালভূমির মাঝখানে অবস্থিত। কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত সাইনোপ, ত্রাবজোন আর সামসুন তিনটি উল্লেখযোগ্য বন্দর। ভূমধ্যসাগরের তীরে ইস্কেন্দারুনও প্রসিদ্ধ বন্দর।

এশিয়া মাইনর অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৬ কোটি (১৯৯০)। অধিবাসীদের প্রধান ভাষা তুর্কি (দ্র)।

সুজ. ব.

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

এটি একটি গবেষণাধর্মী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। এশিয়ার 'মানুষ ও প্রকৃতি' বিষয়ে নিবেদিতপ্রাণ গবেষক, বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের পীঠস্থানস্বরূপ এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি রেজিস্ট্রি করা হয় 'সোসাইটিজ রেজিস্ট্রি অ্যাক্ট ১৮৬০'-এর অধীনে। জাতি, গোত্র, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল গবেষক ও গবেষণামনস্ক বুদ্ধিজীবীর জন্য এই অরাজনৈতিক ও দলীয় রাজনীতি বহির্ভূত সংস্থার সদস্যপদ উন্মুক্ত।

এশিয়াটিক সোসাইটির এক দীর্ঘ ইতিহাস বর্তমান। কলিকাতা হাই কোর্টের জজ স্যার উইলিয়াম জোন্সের (Sir William Jones : ১৭৪৬-১৭৯৪) উদ্যোগে ১৭৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'। অল্পকিছু কালের মধ্যেই এটি প্রাচ্য সংক্রান্ত গবেষণার একটি অন্যতম বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৮৫৭ সালে ভারতের শাসনভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশরাজের কাছে হস্তান্তরিত হলে এশিয়াটিক সোসাইটি 'রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' নাম ধারণ করে। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হলে কলিকাতায় অবস্থিত এই সোসাইটির দফতর স্বাভাবিকভাবেই ভারতের ভাগে পড়ে। তাই এই জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান তৎকালীন পাকিস্তানে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলে ১৯৫২ সালের ৩রা জানুয়ারি কতিপয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তির উদ্যোগে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান'। ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের (দ্র) জন্ম হলে এর নাম আরো এক বার পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ'। এর দফতর পুরাতন জাদুঘর সংলগ্ন একটি ভবনে। ঠিকানা— ৫ পুরাতন সেক্রেটারিয়েট রোড, নিমতলি, ঢাকা।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির লোগো

এটি পরিচালিত হয় প্রতি দুই বছর অন্তর নির্বাচিত একটি কার্যনির্বাহী পরিষদের (এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল) দ্বারা। এই পরিষদের গঠন প্রণালী নিম্নরূপ : ১ জন সভাপতি, ২ জন সহসভাপতি, ১ জন কোষাধ্যক্ষ, ১ জন সাধারণ সম্পাদক, ১ জন যুগ্ম-সম্পাদক, ১০ জন সদস্য এবং কাউন্সিল কর্তৃক কো-অপ্ট্ করা ২ জন ফেলো। সাধারণ সম্পাদক এই পরিষদ বা কাউন্সিলের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে সোসাইটির প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন।

ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালনা ও গবেষণায় সহায়তা করা (বিশেষত এশিয়ার 'মানুষ ও প্রকৃতি' বিষয়ে) এর গঠনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ অন্যতম মূল লক্ষ্য। এ ছাড়াও,

গবেষণামূলক কোনো প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকতা ও পথ-নির্দেশ করা, সমিতির সদস্যদের জন্য আগ্রহোদ্দীপক ও সুচিন্তিত বিষয়ভিত্তিক সেমিনারের আয়োজন, প্রতি মাসে এর সাধারণ সভায় বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থা করা, মাঝে মাঝে সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান করা এবং দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম. ফিল. ও পিএইচ. ডি. করছেন এমন তরুণ শিক্ষাবিদদের ফেলোশিপ দেওয়াও এর তৎপরতার অংশ।

আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও সুনির্বাচিত গ্রন্থে এর পাঠাগারটি সমৃদ্ধ। সোসাইটির সদস্যদের জন্য এর দ্বার উন্মুক্ত। শুধু তাই নয়, এর সংগ্রহে রয়েছে দুর্লভ গ্রন্থের পাশাপাশি কিছু মুদ্রা ও পাণ্ডুলিপিও।

সোসাইটির আরো একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের অনারারি ফেলোশিপ ও পদকে সম্মানিত করা।

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রমের অংশ হচ্ছে প্রকাশনা। এই লক্ষ্য অর্জন ও বাস্তবায়নে সোসাইটির তরফ থেকে মাঝে মাঝে তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অতি সম্প্রতি সমিতি ইংরেজি (দ্র) ও বাংলা (দ্র) উভয় ভাষাতেই প্রকাশ করেছে ৩ খণ্ডে বাংলাদেশের (দ্র) ইতিহাস।

এ ছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটি নিয়মিত ৩টি সাময়িকপত্রও প্রকাশ করে থাকে। এর সদস্যবৃন্দ বিনামূল্যে এগুলো পেয়ে থাকেন এবং এখান থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলি তাঁদের কাছে বিশেষ স্বল্পদামে বিক্রি করা হয়।

আ. হ.

এশিয়ান গেম্‌স্

এশিয়ার অধিবাসীদের জন্য এশিয়ান গেম্‌স্ নামক বহুমুখী ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি ১৯৫১ সালের ৪ঠা মার্চে ৮টি বিষয়ে খেলার প্রতিযোগিতা দিয়ে ১১টি এশীয় দেশের মধ্যে নতুন দিল্লিতে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে প্রতিযোগিতার খেলার বিষয় ২১টিরও বেশি। আর অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা ৪০-এর উপর। এ থেকেই বোঝা যায় যে এশিয়ান গেম্‌স্ কেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ১৯৫১ সালের পর থেকে প্রতি ৪ বৎসর অন্তর এই খেলা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১৯৭৪ সালে চীন (দ্র) ৭ম এশিয়ান গেম্‌সে প্রথম অংশ গ্রহণ করে এই খেলাকে আরো কার্যকরী করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ (দ্র) নিয়মিতভাবে এশিয়ান গেম্‌সে অংশগ্রহণ করে আসছে, কোনো কোনো প্রতিযোগিতায় রৌপ্য (দ্র) ও ব্রোঞ্জ (দ্র) পদক লাভ করেছে। এশিয়ান গেম্‌স্ নিম্নলিখিত দেশসমূহে অনুষ্ঠিত হয়েছে :

১৯৫১ সালে ভারতে (দ্র), ১৯৫৪ সালে ম্যানিলায়, ১৯৫৮ সালে টোকিওতে (দ্র), ১৯৬২ সালে জাকার্তায়, ১৯৬৬ ও ১৯৭০ সালে ব্যাঙ্ককে, ১৯৭৪ সালে তেহ্‌রানে,

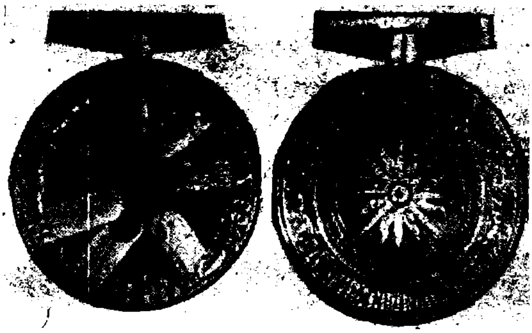

উপরে : দ্বাদশ এশিয়াডের পদকের দুই পৃষ্ঠার ছবি।
নিচে : জাপানি মেয়েরা উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছে।

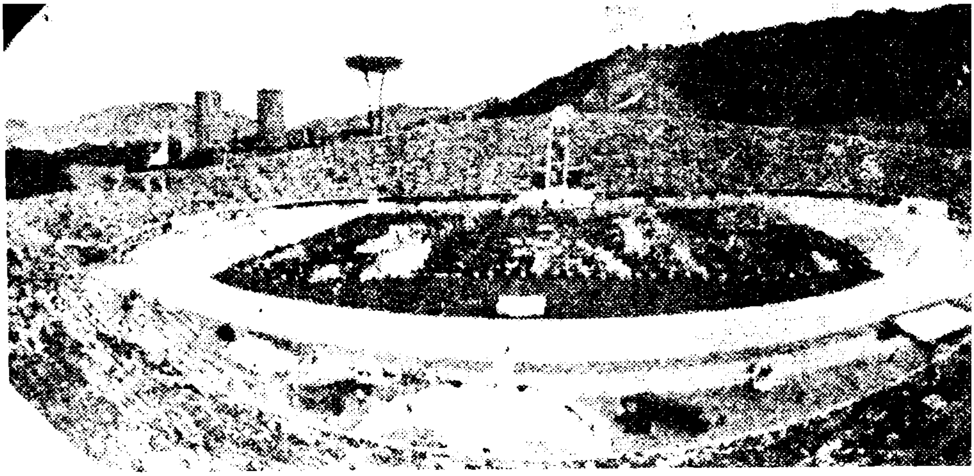

উপরে : জাপানের হিরোশিমায় দ্বাদশ এশিয়াডের উদ্বোধন—২রা অক্টোবর ১৯৯৪ এবং
নিচে : নবম এশিয়াডে (ভারতে) বাস্কেট বল প্রতিযোগিতায় চীন ও জাপান, ১৯৮২।
ছবির কোণায় এশিয়াডের প্রতীক ও মাসকট ছোট্‌ট হাতি আপ্পু

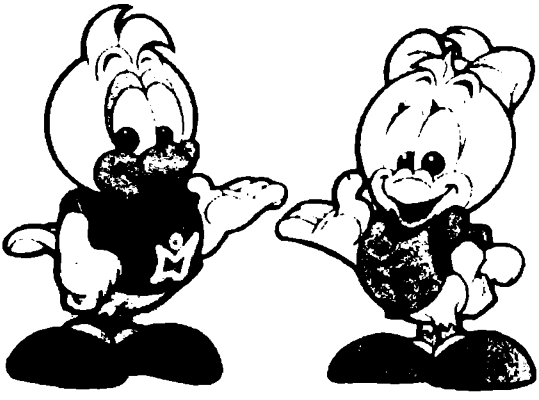

উপরে : নবম এশিয়াডে হার্ডল রেসে বিজয়ী জাপানের তাকাশি নাগাও ও নিচে : দ্বাদশ এশিয়াডের মাসকট জোড়া ঘুঘু পাপ্পু (পুরুষ) ও কাক্কু (মেয়ে)—শান্তি ও বন্ধুত্বের প্রতীক। এরূপ জোড়া মাসকট এই প্রথম

১৯৭৮ সালে ব্যাঙ্ককে, ১৯৮২ সালে দিল্লিতে (দ্র), ১৯৮৬ সালে সিউলে, ১৯৯০ সালে বেইজিংয়ে (দ্র) এবং ১৯৯৪ সালে জাপানের (দ্র) হিরোশিমাতে (দ্র) অনুষ্ঠিত হয়েছে। হিরোশিমাতে ৩৮ জাতির প্রায় ৭০০০ খেলোয়াড় খেলায় অংশ নিয়েছে।

কা. আ. আ.

এস. এম. সুলতান [১৯২৩—১৯৯৪]

শিল্পী এস. এম. সুলতান বাংলাদেশের (দ্র) প্রথম সারির অন্যতম চিত্রশিল্পী। তাঁর চিত্রকর্ম, জীবনযাত্রা, চিন্তা ও দর্শনের জন্য তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। তাঁর চিত্রের বেশির ভাগ বিষয় বাংলার কৃষক ও বাংলার গ্রাম। তাঁর চিত্রের মানুষেরা সবাই পেশিবহুল ও শক্তিশালী। পরিবেশ বাংলার নিসর্গ হলেও মানুষ দেখে প্রথমে অবাক হতে হয়—পেশিবহুল এমন শক্তিশালী কৃষক এখন কোথায়? কিন্তু পরিবেশের উপস্থাপনায়, রঙ-রেখার সমন্বয়ে ছবিতে তিনি এমন একটি আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ আবহ সৃষ্টি করেন, যা হৃদয়কে আন্দোলিত করে। ছবির বিষয় ও শিল্পীর বক্তব্য দর্শকের চিন্তা ও চেতনাকে শাণিত করে। শিল্পী তাঁর চিত্রের মানুষকে ব্যাখা করেন এভাবে—যে কৃষককুলকে সচরাচর দেখা হয়, শারীরিকভাবে দুর্বল, হাড়-জিরজিরে, রোগে ও অভাবে আক্রান্ত, আসলে কি তারা তাই? সুবিধাবাদীরা তাদের অর্জিত সম্পদ থেকে বঞ্চিত রেখে এমন দুরবস্থার সৃষ্টি করেছে। এই যে দেশের সম্পদ-বৈভব, তা বহুদিন ধরে অর্জন করেছে আমাদের এই কৃষককুল মাটিকে কর্ষণ করে, উর্বরা করে, ফসল ফলিয়ে। যুগ যুগ ধরে একই ধারা বয়ে চলেছে। যে জমিকে অবহেলার চোখে দেখা হয়, কৃষককুল ও শ্রমজীবী মানুষকে যেমন দুর্বলদেহ দেখা হয় তা তো বাইরের দেখা—তাঁর মতে তা তো সত্যি নয়, আমাদের মাটি উর্বর এবং কৃষককুল শক্তিশালী। আগামী প্রজন্ম ঐতিহ্যের এই শক্তি দেখে উৎসাহিত হোক, সামনের দিকে এগিয়ে চলুক—এই আকুতিই অভিব্যক্ত হয় তাঁর ছবিতে।

১৯২৩ সালের ১০ই আগস্ট শিল্পী সুলতানের জন্ম যশোরের নড়াইলে মাছিমদিয়া গ্রামে। বাবা মেছের আলী ছিলেন একজন রাজমিস্ত্রি। স্কুলে পড়ার সময়ই দেখা যায় তিনি ছবি আঁকতে ভালবাসেন। ১৯৩৮ থেকে তিন বছরের জন্য তিনি কলিকাতা আর্ট কলেজে পড়েন। এ সময়ে উপমহাদেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও শিল্পসমালোচক অধ্যাপক হাসান শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দির (দ্র) একান্ত সান্নিধ্য

লাভ করে শিল্পকলাচর্চায় প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু প্রথাগত শিল্পশিক্ষায় তাঁর উৎসাহে ভাটা পড়ে। আর্ট কলেজের শিক্ষা শেষ হওয়ার আগেই তিনি কলিকাতা থেকে বেরিয়ে যান ১৯৪৪ সালে। তারপর প্রায় দশ বছর ভারত (দ্র) ও পাকিস্তান (দ্র) এবং পরে আমেরিকা (দ্র) ও ইউরোপের (দ্র) অনেক দেশ তিনি ঘুরে বেড়ান, ছবি আঁকেন আর প্রদর্শনী করেন। পাবলো পিকাসো (দ্র), সালভাদোর দালি (দ্র), পল ক্লী, ব্রাক-এর মতো খ্যাতিমান শিল্পীদের সঙ্গে এক যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করার গৌরব অর্জন করেন তিনি। ১৯৫৩ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং নড়াইলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এর পরেও চালচুলোহীন ছন্নছাড়া ভবঘুরে জীবনযাপন করেন প্রায় বাইশ বছর। তার পর ১৯৭৬ সালে ছোট-বড় অনেক ছবি নিয়ে রীতিমত নাটকীয়ভাবেই বাংলাদেশ শিল্পকলার বিরাট প্রদর্শনী করে শিল্পরসিক ও শিল্পবেত্তাদের চমকে দেন। এর পর আর থেমে থাকেন নি। একের পর এক ছবি এঁকে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছে ১০ই অক্টোবর ১৯৯৪। তাঁর পুরো নাম শেখ মুহম্মদ সুলতান।

সুলতানের আঁকা একটি তেলরঙ ছবি এবং নিচে : সুলতানের সঙ্গে হাসি-খুশি এক দল শিশু

শিশুদের নিয়ে তিনি খুব ভাবতেন। শিশুরা যাতে প্রকৃতি থেকে শিখতে পারে, সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে, সে জন্য শিশুদের শিক্ষা ও ছবি আঁকার প্রতিষ্ঠান 'নন্দনকানন' ও 'শিশুস্বর্গ' তৈরি করেছেন।

বাংলাদেশ সরকার সুলতানকে 'আর্টিস্ট ইন রেসিডেন্স'-এর সম্মানে ভূষিত করে এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ম্যান অব এশিয়া' পদকে ভূষিত করে। সুলতানের চিত্রের সংগ্রহ রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর (দ্র), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী (দ্র) ও দেশে-বিদেশে অনেক প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে।

হা. খা.

এস্কিমো (Eskimo)

এস্কিমো একটি জাতি। উত্তর আমেরিকা (দ্র) ও পূর্ব সাইবেরিয়া আর্কটিক (দ্র) অঞ্চলের অধিবাসীদের এস্কিমো বলে। এরা গ্রিনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড ও অন্যান্য সুমেরু (দ্র) অঞ্চলেও বাস করে। ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদগণ মনে করেন, এরা এশিয়ার (দ্র) মঙ্গোলীয় জাতির বংশোদ্ভূত এবং বহু বছর আগে এশিয়া থেকে এসব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এস্কিমোরা ছোট ছোট দলে বাস করে। দলে এক জন দলপতি বা প্রধান থাকে। দলের লোকের ভাল-মন্দ দেখা থেকে শুরু করে জীবিকা সংগ্রহে সাহায্য করে থাকে এই দলপতি। অধিকাংশ সম্পত্তিই এরা দলীয়ভাবে ভোগ করে; ব্যক্তিগত সম্পত্তি খুবই সামান্য থাকে। এস্কিমোরা খুব কঠিন জীবনযাপনে অভ্যস্ত। এরা সমুদ্রের সীল (দ্র), তিমি (দ্র) ইত্যাদি শিকার করে নিজেদের খাবার, ঘরবাড়ি, তেল, জ্বালানির (দ্র) ব্যবস্থা করে। এরা কাঁচা মাংস খেতে অভ্যস্ত, তাই রেড ইণ্ডিয়ানেরা (দ্র) 'এস্কিমো' শব্দটির অর্থ করেছে 'কাঁচা মাংস ভক্ষণকারী'। গরমকালে এরা বলগা হরিণ ও সীলের চামড়ায় তৈরি তাঁবুতে বাস করে। শীতকালে বরফ খুঁড়ে পাথর বা কাঠের ঢাকনা দিয়ে ঘর তৈরি করে। এই ঘরকে ইগ্‌লু (দ্র) বলে। স্থলপথে চলাচলের জন্য এরা কুকুরে টানা 'স্লেজ' গাড়ি এবং জলপথে ভ্রমণের জন্য 'কায়াক্' নামে পরিচিত চামড়ার তৈরি ছোট নৌকা ব্যবহার করে। এস্কিমোদের ধর্ম (দ্র) গড়ে উঠেছে তাদের ঐতিহ্যগত পুরাতন বিশ্বাস আর পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে। গ্রিনল্যাণ্ডে বর্তমান সভ্যতার লোকজন বাস করতে আরম্ভ করায় এস্কিমোদের শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে আধুনিক সভ্যতার ছাপ পড়েছে। এদের মধ্যে কিছু আবার খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। এস্কিমোদের আনুমানিক জনসংখ্যা ৫৫ হাজার। যুক্তরাষ্ট্র (দ্র) ও কানাডার সরকার এস্কিমোদের জনসংখ্যা ও অর্থনীতির সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে চেষ্টা চালাচ্ছে।

সে. শা.

এস্খুলোস ঈস্কাঈলাস্ দ্র

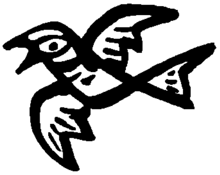

ও

ও. হেনরি [১৮৬২—১৯১০]

বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন ছোটগল্পকার। তাঁকে 'মার্কিন সাহিত্যের মোপাসাঁ' বলেও অভিহিত করা হয়। ও. হেনরি (O. Henry) তাঁর ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম উইলিয়াম সিড্‌নি পোর্টার।

ও. হেনরির জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) উত্তর ক্যারোলিনার গ্রিন্‌স্‌বরোতে, ১৮৬২ সালে। জীবনে বহু বিচিত্র পেশা বদলের পর শেষে

ব্যাংকের কেরানির পদে নিযুক্ত হন। এই দায়িত্ব পালনকালে তিনি প্রতিষ্ঠানের অর্থঘাটতি ও হিসাবের গরমিলের দায়ে অভিযুক্ত হন। ফলে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয় তাঁর বিরুদ্ধে। কিছু দিন পলাতক থাকার পর ধরা পড়লে তাঁর তিন বছরের জেল হয়। জেলখানাতেই শুরু হয় তাঁর প্রকৃত সাহিত্যজীবন।

ও. হেনরির ছোটগল্প (দ্র) চূড়ান্ত মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ বলেই তা চিরকালীন এবং ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়।

তাঁর বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ 'দ্য ফোর মিলিয়ন্' (১৯০৬), 'দ্য ট্রিম্‌ড্ ল্যাম্প্' (১৯০৭), 'হার্ট অব দ্য ওয়েস্ট' (১৯০৭) ও 'স্ট্রিক্টলি বিজনেস' (১৯১০) ইত্যাদি। সারা জীবনে তিনি ৬ শ'রও বেশি গল্প লিখেছেন।

যক্ষ্মা (দ্র) রোগে ১৯১০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

আ. হ.

ওংকার/ওম্/ওঁ

হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী এই পবিত্র শব্দটির প্রাচীন অর্থ 'তথাস্তু' বা 'তাই হোক'। বেদ-এ এর অর্থ আরো ব্যাপক ও গভীর। সৃষ্টির প্রথমে স্রষ্টা প্রজাপতির সঙ্কল্প থেকে তিনটি ধ্বনির উৎপন্ন হয়—অ(অর্থাৎ বিষ্ণু) + উ (অর্থাৎ মহেশ্বর) + ম (অর্থাৎ ব্রহ্মা)। এই তিনটি বর্ণকে এক করলেন স্বয়ং প্রজাপতি। তাতে 'ওম্' হল। কালে কালে ওংকারের উৎপত্তির কথা আরো ব্যাপক হল। প্রজাপতির তিন অংশে আছেন বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মা। ওম্—এই একটি অক্ষর উচ্চারণ করলে সমস্ত বেদ পাঠের ফল লাভ হয়। ওম্ পরম কল্যাণকর। যে কোনো কাজের আরম্ভে ও শেষে এই মঙ্গলকর অক্ষর উচ্চারণ করতে হয়। এটি শুধু অক্ষর নয়, শব্দ বা বাক্যও। ওংকার ছাড়া মন্ত্রপাঠ ও ধর্মকাজ নিষ্ফল হয়ে যায়। ওম্ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা বা আশীর্বাদের বাক্য।

ওংকার-এর বর্ণবিশ্লেষণ ও উচ্চারণবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বেদে বহুল বর্ণনা আছে। উচ্চারণের নিয়মও আছে। কোনো প্রার্থনার আরম্ভে, পূজা-অর্চনার প্রারম্ভে ওম্ অবশ্য উচ্চারণ করতে হয়। আবার পুস্তকের প্রারম্ভে, চিঠিপত্রের শুরুতেও এই শব্দ লেখা বিধেয়। মন্ত্র-তন্ত্র সাধনায় ওম্ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

ওংকারের আর এক নাম 'প্রণব'। পুরাণগ্রন্থে ওংকারের এক হাজার নাম আছে। প্রণব ও ঈশ্বর সমার্থক শব্দ। এ জন্য এই ওম্ জপ করা বিধেয়।

বি. ব.

ওজোন (ozone)

অক্সিজেন (দ্র) গ্যাসের প্রতিটি অণু (দ্র) দু'টি পরমাণু (দ্র) সমবায়ে গঠিত (O_2)। তিনটি অক্সিজেন-পরমাণু মিলিত হয়ে সৃষ্টি হয় ওজোন গ্যাস (O_3)। প্রকৃতিতে অক্সিজেনের (দ্র) উপর অতিবেগুনি রশ্মির (দ্র) ক্রিয়ায় গঠিত হয় ওজোন গ্যাস (দ্র)। ওজোন গ্যাসের গলনাঙ্ক ১৯৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং স্ফুটনাঙ্ক ১১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ওজোন গ্যাস সামান্য নীলাভ। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ব্যাপারে এটি খুবই সক্রিয়। বায়ুমণ্ডলে ওজোনের পরিমাণ অতি সামান্য। সমুদ্রতীরের বায়ুতে ওজোনের পরিমাণ বেশি। তাই সমুদ্রের বায়ু স্বাস্থ্যকর। পানির জীবাণু বিনাশ এবং পানি (দ্র) বিশুদ্ধ করার জন্য ওজোন গ্যাস ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

ভূপৃষ্ঠের ১৫–২৫ কিলোমিটার উঁচুতে অপেক্ষাকৃত ঘন ওজোন গ্যাসের স্তর রয়েছে এই স্তর সূর্যের তীব্র অতিবেগুনি রশ্মির (দ্র) হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে।

সু. ব.

ওদন্তপুরী বিহার

বৌদ্ধশাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকেন্দ্র। এটি নালন্দা (দ্র), সোমপুর (দ্র) ও বিক্রমশীলা বিহারের মতোই একটি সুপ্রসিদ্ধ বিহার (দ্র)। বর্তমান বিহার শরীফ এবং নালন্দার কাছে এই বিহার অবস্থিত ছিল। দশম শতকের শেষ বা একাদশ শতকের সূচনাতে এই বিহারের আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে অতীশ দীপঙ্কর (দ্র) ভিক্ষুদীক্ষা গ্রহণ করেন এবং এখানে শিক্ষালাভ করেই তিনি 'শ্রীজ্ঞান' উপাধি পান। পরে তিনি এই বিহারের প্রধান আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত হন।

ওদন্তপুরী বিহারটির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তিব্বতি ঐতিহাসিক তারানাথের মতে, রাজা গোপাল (শা. আনু. ৭৫০-৭৭৫) বা দেবপাল (শা. আনু. ৮১০-৮৫০) ওদন্তপুরী বিহার নির্মাণ করেন। আবার ঐতিহাসিক বুতোনের মতে, ধর্মপাল (শা. আনু.

৭৭৫-৮১০) বিহারটি প্রতিষ্ঠা করেন। পর্যটক সুমপার বিবরণ উল্লেখ করে শরচ্চন্দ্র দাস বলেছেন, ওদন্তপুরী বিহারটি বিহার শহরের কাছে একটি পাহাড়ের ওপর নির্মিত হয়েছিল। দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত ওদন্তপুরী বিহারটিকে দুর্গ মনে করে বখতিয়ার খলজির (দ্র) সৈন্যরা তা গুঁড়িয়ে দেয়। এই বিহার ধ্বংসের পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে বখতিয়ার খলজি মগধের নাম পরিবর্তন করে বিহার প্রদেশ নামকরণ করেন।

তিব্বতের রাজা খ্রি-স্রং-ল্দে-বৎ-সন বৌদ্ধ আচার্য শান্তরক্ষিতের পরামর্শে মগধের ওদন্তপুরী বিহারের অনুকরণে রাজধানী লাসায় ব্সম-য়া (বা সামিয়ে) নামক একটি বিহার নির্মাণ করেন।

সুজ. ব.

ওদিসি (Odyssey)

মহাকবি হোমারের (দ্র) লেখা প্রাচীন গ্রিক মহাকাব্য (দ্র)। খ্রিস্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীর শেষ দিক এর রচনাকাল বলে ধারণা করা হয়। এই মহাকাব্যে বর্ণিত গ্রিক ও ট্রোজান বা ট্রয়বাসীদের মধ্যে যুদ্ধের শেষে গ্রিকরা জয়ী হয়। ওদিসিউস (Odesseus) গ্রিক পক্ষের বীর ও ইথাকার রাজা। যুদ্ধশেষে ওদিসিউস তাঁর মাতৃভূমি ইথাকা দ্বীপে ফেরার পথে যেসব রোমাঞ্চকর ঘটনার মুখোমুখি হন, এই মহাকাব্যে তার বর্ণনা আছে। এই মহাকাব্যে ১০ বছরব্যাপী যুদ্ধ বর্ণিত হয়। ওদিসিউসের ইথাকা দ্বীপে ফিরতে আরো দশ বছর সময় লাগে। দেবী আথেনার কোপে পড়ে তাঁর এই দুর্ভোগ হয়। ইথাকা দ্বীপ গ্রিসের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত।

ইথাকার যোদ্ধৃগণ বারোটি জাহাজে চড়ে উপকূল ছেড়ে দেশের পথে পাড়ি দেয়। তখনো ট্রয় নগরীর আগুন সম্পূর্ণ নিভে যায় নি। এদিকে হিমেল উত্তর বায়ুর দেবতা প্রচণ্ড ঝড় সৃষ্টি করার ফলে গ্রিকগণ পথ হারিয়ে ফেলে। দু' বার ওদিসিউস ও তাঁর সঙ্গীরা দৈত্যদের দ্বীপে আটকা পড়ে। দৈত্যরা বড় বড় পাথরের আঘাতে এগারোটি জাহাজ চুরমার করে দেয় এবং তাদের সব যোদ্ধাকে মেরে ফেলে। শুধুমাত্র ওদিসিউসের জাহাজ দূর-সমুদ্রে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ওদিসিউসের সঙ্গীরা বজ্র ও বিদ্যুতের দেবতা জিউসকে রুষ্ট করায় তিনি বিদ্যুৎঝলকে জাহাজ ধ্বংস করে দেন। ওদিসিউস জাহাজের ভাঙা মাস্তুল ধরে কোনো মতে তীরে এসে পৌছন। দেশে ফিরে প্রথমেই এক শুয়োর চারণরত দাসের সঙ্গে দেখা হয়। সে জন্য ওদিসিউস ভিক্ষুকবেশে নিজের প্রাসাদে প্রবেশ করেন তারপর যুদ্ধ করে সবাইকে পরাজিত ও হত্যা করেন। এভাবে ওদিসিউস ইথাকায় আবার রাজত্ব করতে থাকেন।

ওদিসি মহাকাব্যে ওদিসিউসের অদ্ভুত সব ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। এই মহাকাব্যে বর্ণিত দুঃসাহসিক ভ্রমণের প্রভাব পড়ে ভার্জিলের (দ্র) 'ঈনীদ' (দ্র) মহাকাব্যে ও আধুনিক কালে ঔপন্যাসিক জেম্‌স্ জয়েসের (দ্র) 'ইউলিসিস' উপন্যাসে। হোমারের মহাকাব্য বিশ্বসাহিত্যে এক অমর সৃষ্টি। গভীর ভাবসমৃদ্ধ ও সুমধুর কাব্যভাষায় এই মহাকাব্য রচিত।

বি. ব.

ওমর খৈয়াম [আনু. ১০৫০—১১২৪]

পারস্যের মরমী কবি। ইউরোপীয়দের কাছে তিনি 'জ্যোতির্বিজ্ঞানী কবি' বলে অভিহিত। তাঁর পুরো নাম গিয়াসউদ্দিন আবুল ফাতাহ্ ওমর বিন্ ইবরাহিম আল খৈয়াম ওরফে খৈয়ামি। তাঁর জন্ম খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে, কারো কারো মতে একাদশ শতকের শেষভাগে। অতি সাধারণ এক পেশাজীবী ঘরের সন্তান ছিলেন তিনি।

পারস্যের খোরাসান রাজ্যের নিশাপুরের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম মোয়াফিকের তত্ত্বাবধানে তাঁর শিক্ষাজীবনের সূচনা হয়। তাঁর মেধার পরিচয় পেয়ে খোরাসানের রাজদরবার থেকে তাঁকে বার্ষিক ১২০ সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করা হতে থাকে। তা দিয়েই খৈয়াম তাঁর জীবন নির্বাহ করতেন। তাঁর সম্পর্কে এমন কথাও প্রচলিত আছে যে তিনি একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন 'জালাল'। শুধু তাই নয়, পরবর্তী কালে আরবি ভাষায় (দ্র) প্রণীত তাঁর বীজগণিতের জন্য তাঁকে পথিকৃৎ বিজ্ঞানী ইবনে সিনার (দ্র) সমকক্ষ হিসাবেও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

খৈয়াম বিখ্যাত তাঁর 'রুবাইয়াৎ'-এর জন্য। চার পঙ্ক্তির সমিল সুরেলা ফার্সি কবিতাকে 'রুবাই' বলে,

ওমর খৈয়াম

'রুবাই' শব্দের বহুবচন হল 'রুবাইয়াৎ'। এ জাতীয় এক হাজারেরও বেশি কবিতা (দ্র) তিনি রচনা করেন। ১৮৫৯ সালে ইংরেজিতে তাঁর রুবাই-এর অনুবাদ (দ্র) প্রকাশ করেন এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড। এই অনুবাদের ফলেই ইংরেজিসহ ইউরোপের (দ্র) অন্যান্য ভাষাভাষী অঞ্চলে খৈয়ামের কাব্যখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা ভাষাতেও (দ্র) তাঁর কবিতার অনুবাদ (দ্র) হয়েছে।

তাঁর কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে মানব-মানবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনকে শান্তি ও মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলা অথবা তার সার্থকতার সন্ধান করা। গোঁড়া ও বকধার্মিকদের তিনি প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। শুধু তাই নয়, রাজতন্ত্রের (দ্র) প্রতাপের মধ্যেও সুলতানদের প্রশস্তি তাঁর কাব্যে স্থান পায় নি।

ওমর খৈয়ামের মৃত্যুর সাল ও তারিখ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দুর্লভ, মতভেদও বর্তমান। কারো মতে, তাঁর মৃত্যু হয় ১১২৪ সালে, কারো কারো মতে ১১২১ সালে।

আ. হ.

ওযু

ওযু আরবি শব্দ। প্রকৃত উচ্চারণ উযু। বাংলায় ওযু উচ্চারণই সমধিক প্রচলিত। এর অর্থ প্রক্ষালন বা ধৌতকরণ। মুসলমানেরা নামাজের পূর্বে নির্দেশিত নিয়মে হাত, পা, মুখ, নাক প্রভৃতি ধৌত করেন; ইসলামী পরিভাষায় একে ওযু বলা হয়। নামাজের পূর্বে শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাই ওযুর উদ্দেশ্য।

মু. মা.

ওয়াইল্ড, অস্কার অস্কার ওয়াইল্ড দ্র

ওয়াক্ফ্

ওয়াক্ফ্ আরবি শব্দ। এর অর্থ বাধা দেওয়া বা সংযত করা। মুসলিম আইনে এর অর্থ হল—কোনো জিনিসকে রক্ষা করা এবং তা যাতে অন্য কারো সম্পত্তি না হয়, সে জন্য বাধা দেওয়া। ওয়াক্ফ্ দুই প্রকার—ওয়াক্ফ্ খায়রি এবং ওয়াক্ফ্ আহ্লি। ওয়াক্ফ্ খায়রির উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মীয় কল্যাণ এবং জনগণের মঙ্গল সাধন করা। এই ধরনের ওয়াক্ফের মধ্যে পড়ে মসজিদ (দ্র), মাদ্রাসা, হাসপাতাল, পুল নির্মাণ, পানি (দ্র) সরবরাহব্যবস্থা স্থাপন করা ইত্যাদি। ওয়াক্ফ্ আহ্লি বা পারিবারিক ওয়াক্ফ্ (ওয়াক্ফ্ আলা আল-আওলাদ) করা হয় ওয়াকিফ্ (যিনি ওয়াক্ফ্ করেন)-এর নিজের, তাঁর পরিজনের, বংশধরের অথবা আত্মীয়-স্বজন বা যে কোনো লোকের ভরণ-পোষণের জন্য। এই জাতীয় ওয়াক্ফেরও আয়ের কিছু অংশ গরিব-মিসকিনদের সাহায্যের জন্য বরাদ্দ রাখতে হয়।

যে কোনো সাবালক ও মানসিকভাবে সুস্থ মুসলমান ওয়াক্ফ্ করতে পারেন। নিজস্ব যে কোনো সম্পত্তি—বিশেষ করে স্থাবর সম্পত্তি ওয়াক্ফ্ করা যায়। অস্থাবর সম্পত্তির ওয়াক্ফের ব্যাপারে মতভেদ আছে। বৈধ ওয়াক্ফের জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে। যেমন- ১. ওয়াক্ফ্ করতে হয় চিরকালের জন্য; নির্দিষ্ট কোনো সময়ের জন্য ওয়াক্ফ্ করা যায় না; ২. ওয়াক্ফ্ করার সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যকর হয়, স্থগিত রাখবার জন্য শর্ত রাখা চলে না; ৩. ওয়াক্ফ্ অপরিবর্তনীয় আইনগত চুক্তি ইত্যাদি; ৪. দাতা ইসলাম ধর্ম (দ্র) ত্যাগ করলে দান বাতিল হয়ে যায় এবং ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের নিকট চলে যায়, অথবা গরিব-

মিসকিনদের ও জনগণের কল্যাণে এর আয় ব্যয় করতে হয়। ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যায় না।

মৌখিক ওয়াক্‌ফ্ সমভাবে গ্রাহ্য হলেও এর জন্য সাধারণত লিখিত দলিল সম্পাদন করা হয়ে থাকে। দলিলে দাতার ইচ্ছা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতে হয় এবং তাঁর উদ্দেশ্যও স্পষ্টভাবে লিখতে হয়। ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনার জন্য মুতাওয়াল্লি নিযুক্ত থাকেন।

বাংলাদেশে (দ্র) বহু ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তি আছে। এগুলো মসজিদ, মাদ্রাসা, মাজার প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়। এগুলো তদারকের জন্য একটি সরকারি ওয়াক্‌ফ্ দপ্তর আছে এবং সে দপ্তরের দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছেন এক জন ওয়াক্‌ফ্ কমিশনার।

শা. হ.

ওয়াজিব

ওয়াজিব আরবি শব্দ। শাব্দিক অর্থ অপরিহার্য কাজ বা বিষয়। ইসলামী বিধান মতে, শরীয়তের যে সকল বিধানের কথা পবিত্র কুরআনে (দ্র) সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নি, কিন্তু হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর বাণীতে বা হাদিসে (দ্র) উল্লিখিত রয়েছে এবং পালনের নির্দেশ রয়েছে, তা-ই ওয়াজিব। ওয়াজিব-এর ব্যত্যয় ঘটলে গোনাহ্ বা পাপ হয়। অথচ সুন্নাত (দ্র) পালন করলে পুণ্য হলেও পালন না করলে পাপ হয় না।

মু. মা.

ওয়াজেদ আলী, এস. [১৮৯০—১৯৫১]

বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী ও সম্পাদক। জন্ম ১৮৯০ সালে, পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার বড়তাজপুর গ্রামে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাশ করার পর উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি ব্রিটেনে যান এবং ১৯১৫ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করার পর স্বদেশে ফিরে আসেন। তিনি কলিকাতায় আইনব্যবসা শুরু করেন। দীর্ঘকাল নিয়োজিত ছিলেন এই মহানগরীর প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদেও।

এস. ওয়াজেদ আলী তাঁর নিরলস সাহিত্যসাধনার ভেতর দিয়ে মুসলিম ঐতিহ্য ও গৌরবকে সাবলীল প্রবন্ধ (দ্র) ও গল্পের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। প্রমথ চৌধুরী (দ্র) সম্পাদিত 'সবুজপত্র' সাময়িকীতেও সেই সময় প্রকাশিত হয় তাঁর বেশ

কিছু রচনা। তিনি 'গুলিস্তাঁ' নামের একটি মাসিক সাহিত্যপত্রও সম্পাদনা (দ্র) করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম 'বাদশাহী গল্প,' 'মাশুকের দরবার' 'দরবেশের দোয়া', 'মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ', 'গ্রানাডার শেষ বীর', 'ভবিষ্যতের বাঙালী' ও 'জীবনের শিল্প'।

তিনি কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন, ১৯৫১ সালে।

আ. হ.

ওয়াজেদ আলী, মোহাম্মদ [১৮৯৬—১৯৫৪]

গদ্যশিল্পী ও সম্পাদক। জন্ম বাংলা ১৩০৩ (খ্রি. ১৮৯৬) সনের ২৮শে ভাদ্র, বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার বাঁশদহ গ্রামে।

তিনি কলিকাতার (দ্র) বঙ্গবাসী কলেজে বি. এ. ক্লাশে অধ্যয়নকালে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে (দ্র) মাসিক 'মোহাম্মদী' (দ্র), 'দ্য মুসলমান', 'দৈনিক সেবক' ও 'সাপ্তাহিক সওগাত' ইত্যাদি পত্রিকা ও সাময়িকীর সম্পাদনা (দ্র) বিভাগে দীর্ঘকাল কর্মরত ছিলেন। ছিলেন 'বুলবুল' পত্রিকারও সম্পাদনাসহযোগী।

ওয়াজেদ আলী ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে শেষ জীবন নিজ গ্রামে অতিবাহিত করেন। চরম দারিদ্র্যের ভেতরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৫৪ সালের ৮ই নভেম্বর।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম—জীবনী: 'মরু-ভাস্কর', 'নওয়াব আবদুল লতিফ', 'সৈয়দ আহমদ', 'মওলানা মোহাম্মদ আলী', 'ছোটদের হজরত মোহাম্মদ' ও 'ছোটদের শাহনামা' ইত্যাদি।

আ. হ.

ওয়াট্, জেম্‌স্ [১৭৩৬ – ১৮১৯]

বিখ্যাত ব্রিটিশ যন্ত্রবিদ। জন্ম ১৭৩৬ সালে, স্কটল্যাণ্ডে। ছেলেবেলা থেকেই ওয়াট্ (James Watt) ছিলেন অত্যন্ত কৌতূহলী। ১৭৫৮ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে আবিষ্কার করেন বাষ্পীয় ইঞ্জিন (দ্র)। এরপর এই ইঞ্জিন আরো উন্নত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি কাজ করতেন গ্লাস্‌গো বিশ্ববিদ্যালয়ে মেকানিক হিসাবে। তাঁর দীর্ঘদিনের গবেষণায় বাষ্পীয় ইঞ্জিনের অনেক উন্নয়ন সাধন করতে তিনি সক্ষম হন। ১৮১৯ সালে জেম্‌স্ ওয়াট্ পরলোক গমন করেন।

. সু. ব.

ওয়াটার পোলো (water polo)

বহুবিধ খেলার মধ্যে বিশেষ করে জলক্রীড়ার খেলায় 'ওয়াটার পোলো' উন্নত বিশ্বের একটি জনপ্রিয় খেলা। পানিতে ফুটবলের (দ্র) মতো একটা বল দিয়ে হাত দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে এই খেলা খেলতে হয়। ৩০ মিটার x ২০ মিটার আয়তনের ও ১·৮০ মিটার গভীরতার একটি জলাশয়ে এই খেলা হয়ে থাকে। জলাশয়ের দু' দিকের দু' প্রান্তে জলের উপর দু'টি ভাসমান গোলপোস্ট থাকে, যার ভেতর বল ছুঁড়ে গোল করতে হয়। ২০ মিনিট সময়কে চার ভাগে ভাগ করে সাত জন করে প্রতি দলে খেলা হয়ে থাকে। বলে ঘুষি মারা, বল দু' হাত দিয়ে ধরা বা বল জলের নিচে নিয়ে যাওয়া আইন-বহির্ভূত। ১৮৬৯ সালে ইংল্যাণ্ডে খেলাটির উৎপত্তি হয়। ১৯০৪ সালে অলিম্পিকে (দ্র) সংযুক্ত হয় এবং ১৯৫১ সালে এশিয়ান গেম্‌সের (দ্র) অন্তর্ভুক্ত হয়।

বাংলাদেশে (দ্র) ১৯৭২ সাল থেকে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ সার্ভিসেস দল অর্থাৎ সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান-বাহিনী দল এই খেলায় বিশেষ পারদর্শী।

কা. আ. আ.

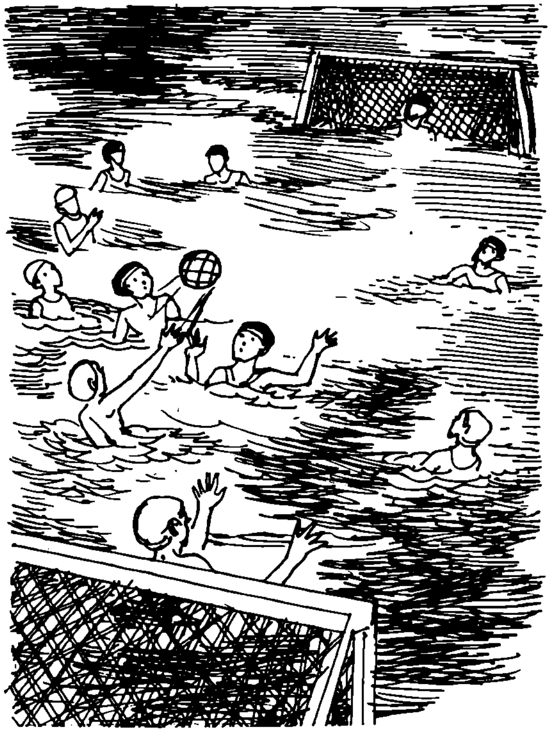

ওয়াটার পোলো

ওয়াটার্লু যুদ্ধ

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেল্‌সের দশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ওয়াটার্লু (Waterloo) নামক স্থানে ১৮১৫ সালে সংঘটিত যুদ্ধ। এটি সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ন ওরফে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের (দ্র) শেষ যুদ্ধ।

নেপোলিয়ন যখন ইউরোপের (দ্র) সকল দেশ জয় করে ফরাসি সাম্রাজ্য বিস্তার করার স্বপ্নে বিভোর, তখন ইউরোপের দেশগুলো ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ব্রিটেন, প্রুশিয়া, রাশিয়া, স্পেন ও পর্তুগালসহ প্রায় সকল ইউরোপীয় দেশ একজোট হয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেন নেপোলিয়ন নিজে এবং জেনারেল মিশেল্ নে (Michel Ney)। অপর দিকে মিত্রশক্তিবর্গের সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেন 'ডিউক অব ওয়েলিংটন' আর্থার ওয়েলেস্‌লি এবং প্রুশীয় সেনাপতি গেব্‌হার্ড লেবেরেক্ট ফন্ ব্লুকার্ (Gebhard Leberecht von Blücher)। এতে ফ্রান্সের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৭২,০০০ এবং মিত্রশক্তির সৈন্যসংখ্যা ছিল ৬৭,০০০। পরে মিত্রশক্তির সৈন্যবল আরো বাড়ানো হয়। ১৫ই থেকে ১৮ই জুন এখানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে নেপোলিয়নের বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এর পর সম্রাটকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে

ওয়াটার্লু যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রায় ৩২ হাজার এবং মিত্রশক্তির ২৩ হাজার সৈন্য প্রাণ হারায়

নির্বাসনে পাঠানো হয়। পরে সুকৌশলে খাবারে আর্সেনিক বিষ মিশিয়ে তাঁকে ধীরে ধীরে হত্যা করা হয়।

ওয়াটার্লু যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রায় ৩২,০০০ এবং মিত্রশক্তির প্রায় ২৩,০০০ সৈন্য প্রাণ হারায়।

সুজ. ব.

ওয়ারী ক্লাব ক্রীড়াসংগঠন, বাংলাদেশের দ্র

ওয়ার অ্যাণ্ড পিস্ যুদ্ধ ও শান্তি দ্র

ওয়ার্‌শ চুক্তি

১৯৫০ সালে পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে ন্যাটো (দ্র) চুক্তি সম্পাদনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯৫৫ সালে প্রধানত পূর্ব-ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলো সংঘবদ্ধ হয়ে ওয়ারশ চুক্তি সম্পাদন করে। পোল্যাণ্ডের রাজধানীর নাম Warsaw (ওয়ার্‌শ)। চুক্তিতে স্বাক্ষরদাতা দেশগুলো হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব-জার্মানি, হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ড এবং রুমানিয়া। চীন কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হলেও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নি, তবে সমর্থন জানিয়েছিল। ১৯৬৮ সালে আলবেনিয়া এই চুক্তি থেকে তার নাম প্রত্যাহার করে নেয়। স্বাক্ষরদাতা দেশের সামরিক বাহিনীগুলোকে একটি নির্দেশের আওতায় রাখাই ছিল এই চুক্তির উদ্দেশ্য। ওয়ার্‌শ চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর সম্মিলিত বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের এক জন মার্শাল-এর হাতে। এর সদর দপ্তর ছিল মস্কোতে।

আ. মা.

ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের

একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের অনুসারী এই দলটি ১৯৭২ সালে গঠিত হয়। সমাজ থেকে যাবতীয় শোষণ-বঞ্চনার অবসান ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে এই

দলটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তৎপর।

এই দলের নেতা-কর্মীবৃন্দ '৫২-র ভাষা-আন্দোলন (দ্র), '৬২-র সামরিক শাসনবিরোধী ছাত্র-আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান (দ্র), '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ (দ্র) এবং '৯০-এর গণ-আন্দোলন (দ্র) সহ এদেশের সব ক'টি উল্লেখযোগ্য শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। অমল সেন, হায়দার আকবর খান রনো, রাশেদ খান মেনন ও আবদুল মতিন প্রমুখ রাজনীতিক এই দলের মুখ্য নেতৃত্বে আছেন।

গত কয়েক বছরের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে 'মজদুর পার্টি', 'সাম্যবাদী দল' ও 'কমিউনিস্ট লীগ' নামের কয়েকটি বামপন্থী দলের নেতা-কর্মীবৃন্দ এই দলটির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত কর্মসূচি দিয়েছে এবং নতুন নাম 'ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি' গ্রহণ করেছে।

দলটির গণসংগঠনের অন্তর্ভুক্ত 'বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী', 'জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন', 'বাংলাদেশ যুবমৈত্রী', 'জাতীয় কৃষক সমিতি', 'নারীমুক্তি সংসদ' ও 'বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন' দেশব্যাপী জনগণের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনে নিয়োজিত।

আ. হু.

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, উইলিয়াম [১৭৭০—১৮৫০]

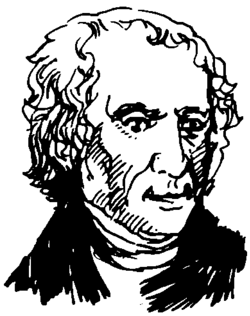

ইংরেজি সাহিত্যের (দ্র) বিশিষ্ট রোম্যান্টিক কবি ইউলিয়াম ওয়ার্ড-স্‌ওয়ার্থ (William Words worth) ১৭৭০ সালের ৭ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। বাবা জন ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ ছিলেন অ্যাটর্নি-অ্যাট্-ল। বাল্যকালেই উইলিয়াম বাবা-মা উভয়কেই হারান। হক্সহিডের গ্রামার স্কুলে পড়াশোনার পর তিনি ১৭৮৭ সালে কেম্ব্রিজের

সেন্ট জন্‌স্ কলেজে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করতে পারে নি। তাঁর এই সময়কার মানসিক অবস্থার কথা দীর্ঘ কবিতা 'দ্য প্রিলিউড্ (The Prelude)-এ উল্লিখিত হয়েছে।

১৭৯০ সালে তিনি পদব্রজে ফ্রান্স, আল্পস্ পবর্তমালা ও ইতালি সফরে বের হন। ১৭৯১ সালে ফ্রান্সে ফিরে এসে সেখানে এক বছর অতিবাহিত করেন। ফরাসি বিপ্লবের (দ্র) নানান লক্ষণ তখন সক্রিয় এবং এই বিপ্লব কবির মনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। ফ্রান্সে থাকাকালীন তিনি আনেৎ ভায়োঁ (Annette Vallon) নামে এক মহিলার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। কিন্তু এই সম্পর্ক স্থায়ী হয় নি। ১৭৯৩ সালে তাঁর কবিতা An Evening Walk এবং আল্পস্ পর্বতমালা বিষয়ে তাঁর Descriptive Sketches প্রকাশিত হয়। লণ্ডনে (দ্র) থাকার সময় তিনি কয়েকটি সনেট রচনা করেন। তাঁর কাছে প্যারিসের জীবনই বেশি পছন্দসই ছিল। কিন্তু বিপ্লবকালীন রক্তপাতে তিনি মর্মাহত হন। কবি এই সময় গভীর মানসিক কষ্টে ভোগেন। তাঁর ভগিনী ডরোথি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ এ সময় কবিকে নানাভাবে সজীব করে তোলেন। রক্তপাত ও সমাজের বিপর্যয় নিয়ে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ তখন (১৭৯৫-৯৬) একটি বিয়োগান্ত নাটক-The Borderers রচনা করেন।

১৭৯৫ সালেই তাঁর সঙ্গে আর এক অসামান্য কবি স্যামুয়েল টেলর কোল্‌রিজের (দ্র) সাক্ষাৎ ঘটে। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, ডরোথি, কোল্‌রিজ ও তাঁর স্ত্রী একত্রে সমারসেটে বসবাস করেন প্রায় এক বছর। দুই মহান কবির যৌথ রচনায় ১৭৯৮ সালে ইংরেজি সাহিত্যের ঐতিহাসিক গ্রন্থ Lyrical Ballads প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ ইংরেজি কবিতার পুনর্জাগরণের প্রতীক। এরপর কবি ও তাঁর ভগিনী কিছু কালের জন্য জার্মানিতে যান। ফিরে এসে তাঁরা ইয়র্কশায়ারের গ্রাসমেয়ার অঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন এবং এখানেই কবি তাঁর জীবনের ৫০ বছর কাটিয়ে দেন। ১৮০২ সালে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ মেরি হাচিনসনকে বিয়ে করেন। এর আগেই অবশ্য তাঁর Lucy Poems এবং Ruth রচিত হয়েছে। ১৮৪৩ সালে রবার্ট সাউদের মৃত্যুর পর তিনি রাজকবি বা Poet Laureate উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৫০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ সারা পৃথিবীর (দ্র) কাছে প্রকৃতির কবি হিসাবে পরিচিত ও সমাদৃত। তিনি মনে করতেন প্রকৃতিই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তিনি নগরের নানা কোলাহল ও অট্টালিকা ছেড়ে প্রকৃতির কোলে আশ্রয়গ্রহণের মাধ্যমে মানবজীবনের সার্থকতা খুঁজে পেতেন। তাঁর বিখ্যাত কবিতা Tintern Abbey-তে গভীর আবেগের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন কী ভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সত্তা প্রকৃতির মধ্যে মিশে গেছে। ১৮০০ সালে তাঁর বিখ্যাত কবিতা Michael প্রকাশিত হয়। ১৮০৭ সালে প্রকাশিত Ode on Intimations of Immortality কবিতায় ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ একটি বিচিত্র তত্ত্ব হাজির করেন। তিনি বলেন, জন্মের আগে আমাদের অন্যত্র একটি আবাস থাকে এবং বাল্যকালে সেই আবাসের নানা লক্ষণ আমাদের মধ্যে সক্রিয় থাকে। তাঁর রচিত বিভিন্ন সনেটে তখনকার মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। The World Is Too Much With Us (১৮০৬) সনেটে তিনি জীবনের ভারাক্রান্ত রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর দীর্ঘ কবিতা The Prelude-এ নিজের জীবন ও বহু বিষয়ে তাঁর আন্তরিক প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে লেখা এই কবিতা ১৮০৫ সালে সম্পূর্ণ হলেও তা প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর পর। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ মনে করতেন কবিতা তৈরি হয় আমাদের অনেক অনুভব ধীরে ধীরে জড়ো হবার পর এবং কবিতার ভাষা হবে সাধারণ মানুষের ভাষা।

শ. আহ.

ওয়ালীউল্লাহ, সৈয়দ [১৯২২—১৯৭১]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জন্ম চট্টগ্রামে (দ্র), ১৯২২ সালের ১৫ই জুন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আহমদউল্লাহ। তিনি এক জন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছিলেন। আট বছর বয়সে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর মা নাসিম আরা খাতুনকে হারান। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পিতার চাকরিসূত্রে বাংলাদেশের (দ্র) নানা জায়গায় যান এবং নানা জায়গায় লেখাপড়া করেন। তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৩১ সালে রংপুরের কুড়িগ্রাম হাই স্কুল থেকে। আই. এ. পাশ করেন ঢাকা কলেজ থেকে এবং বি. এ. পাশ করেন ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ থেকে ১৯৪৩ সালে। তারপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (দ্র) অর্থনীতিতে এম. এ. পড়ার জন্য ভর্তি হন, কিন্তু পড়াশোনা শেষ না করে সাংবাদিকতা পেশা গ্রহণ করেন। তিনি সেই আমলের বিখ্যাত ইংরেজি পত্রিকা 'দ্য স্টেট্‌স্‌ম্যান'-এর সাংবাদিক হন। সাংবাদিকতা করতে গিয়ে তিনি কলিকাতার সাহিত্যিকসমাজের সঙ্গে পরিচিত হন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের (দ্র) অনেক বড় বড় কবি ও লেখকের চিন্তা ও রচনারীতির পরিচয়ও পান তিনি। তিনি নিজেও আগে থেকেই লিখতেন। এবার বিস্তৃত পরিসরে এসে তিনি নতুন ভঙ্গির লেখায় মনোযোগী হন।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর তিনি রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে কাজ নেন। পরে রেডিওর করাচি কেন্দ্রে চাকরি করার সময় তিনি পাকিস্তান সরকারের বিদেশ

মন্ত্রণালয়ে কূটনীতিক হিসাবে যোগ দেন। এই চাকরির কারণে তাঁকে পৃথিবীর (দ্র) অনেক বড় বড় শহরে থাকতে হয়েছিল। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় (দ্র) তিনি প্যারিস শহরে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। প্যারিস শহরেই ১৯৭১ সালের ১০ই অক্টোবর তিনি মারা যান। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের মতো হয়েছিল।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক জন বড় লেখক। তিনি উপন্যাস (দ্র), গল্প ও নাটক (দ্র) লিখেছেন। তাঁর লেখার সংখ্যা কম, কিন্তু গুণে সেগুলো বিশিষ্ট। তিনি এক জন স্বতন্ত্র লেখক। তাঁর লেখার ভঙ্গি আলাদা। 'লাল সালু'(১৯৪৮) তাঁর সবচাইতে পরিচিত বই। আমাদের দেশে মোল্লা-মৌলবী ও পীরেরা অজ্ঞ অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের উপর কী রকম প্রভাব বিস্তার করে আছে তা এই বিখ্যাত বইটিতে তিনি দেখিয়েছেন। লেখক ধর্মের নামে কুসংস্কারের ছবি তুলে ধরেছেন সুন্দরভাবে এবং জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন খুব বাস্তবভাবে। বইটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে অসাধারণ খ্যাতি দিয়েছে। বইটি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম প্রকাশিত বইয়ের নাম 'নয়নচারা' (১৯৪৬)। এটি গল্পের বই। 'দুই তীর' (১৯৬৫) তাঁর আরেকটি গল্পের বইয়ের নাম। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর অন্য বইগুলোর মধ্যে রয়েছে উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮); এবং নাটক 'বহিপীর' (১৯৬০), 'তরঙ্গভঙ্গ' (১৩৭১/১৯৬৪) ও 'সুড়ঙ্গ' (১৯৬৪)।

আ. ক.

ওয়াশিংটন, জর্জ [১৭৩২—১৭৯৯]

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) প্রথম প্রেসিডেন্ট। আমেরিকা রাষ্ট্রের জনক নামে অভিহিত। ১৭৩২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় তাঁর জন্ম, মৃত্যু ১৭৯৯ সালে।

অল্পবয়স থেকেই ওয়াশিংটন (George Washington) তাঁর সত্যবাদিতা, সাহস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অনুন্নত এলাকায় জন্ম হওয়ায় তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারেন নি। যৌবনে রেড ইণ্ডিয়ান (দ্র) ও ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিপুণভাবে সৈন্য পরিচালনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশ নেন। সৈন্য পরিচালনায় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কারণে ১৭৭৫ সালে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে পরিচালিত আমেরিকার স্বাধীনতা

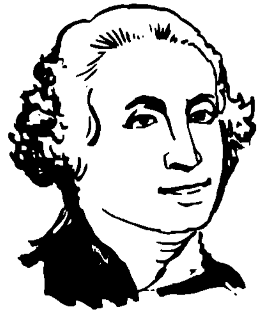

যুদ্ধে (দ্র) তাঁকে স্বদেশীয় সেনাবাহিনীর প্রধান হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। বিশৃঙ্খল বাহিনীকে সংগঠিত করে ছয় বছরের কঠিন সংগ্রামের পর তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। ১৭৮১ সালে ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড কর্নওয়ালিশ যুদ্ধে হেরে গিয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমেরিকানদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। আরো দুই বছর পর ব্রিটেন আমেরিকার স্বাধীনতা মেনে নেয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সংবিধান গৃহীত হবার পর ১৭৮৯ সালে জনগণের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে জর্জ ওয়াশিংটন দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। চার বছর পর তিনি প্রেসিডেন্ট পদে পুনরায় নির্বাচিত হন। তৃতীয় বারেও নির্বাচনে প্রার্থী হতে অনুরোধ করা হলে তিনি অসম্মত হন।

আ. মা.

ওয়াহাবী আন্দোলন [১৭৮৬—১৮৩১]

উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনের সূচনা হয়।

আবদুল ওয়াহাব নামে এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান ইসলাম ধর্মের (দ্র) সংস্কার ও বিকাশের জন্য আরবদেশে ওয়াহাবী আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় 'ওয়াহাবী' নামে পরিচিত। 'ওয়াহাবী' শব্দের অর্থ নবজাগরণ।

রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদ ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তিনি ১৮২২ সালে মক্কা (দ্র)

থেকে হজ্ব (দ্র) সম্পন্ন করে পাটনায় আসেন। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হল ইসলাম ধর্ম অনুসারে মুসলমান সমাজকে গড়ে তোলা এবং হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)-এর আদর্শকে সামনে রেখে তাদের চরিত্র গঠন করা। তাঁর দ্বারা ধর্মীয় সংস্কারের বাণী প্রচারের ফলে বহু মুসলমান ওয়াহাবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। তখন সৈয়দ আহমদ আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিলায়েত আলী, ইনায়েত আলী, শাহ্ মহম্মদ হুসেন ও ফারাত হুসেনকে 'খলিফা' নিযুক্ত করেন।

সৈয়দ আহমদ বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণ করে আন্দোলনকে বেগবান করেন। ওয়াহাবী আন্দোলন প্রথম দিকে যদিও শুধুমাত্র ধর্মীয় সংস্কারের আন্দোলন ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপলাভ করে। তিনি মুসলমান জনগণকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে সংগ্রাম করার আহ্বান জানান। এমনকি তিনি তাঁর অনুসারীদের অস্ত্রচালনারও প্রশিক্ষণ দেন।

ওয়াহাবী আন্দোলন ধীরে ধীরে ব্যাপক আকার ধারণ করে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য ওয়াহাবীরা এক বিরাট সংগঠন গড়ে তোলে। এই সংগ্রাম বাংলা, বিহার, মীরাট, হায়দ্রাবাদ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

১৮২৭ সালে সৈয়দ আহমদ পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পরে শিখদের সঙ্গে এক খণ্ডযুদ্ধে সৈয়দ আহমদ নিহত হন। সৈয়দ আহমদ শিখদের ইসলাম ধর্মের শত্রু মনে করতেন। এর ফলে কোনো কোনো অঞ্চলে তাঁর মৃত্যুর পর এই আন্দোলন শ্রেণীসংঘাতে পরিণত হয়। তবে সৈয়দ আহমদ যত দিন বেঁচে ছিলেন তত দিন তিনি ইসলাম ধর্মের সংস্কার এবং মুসলিম সমাজের উন্নয়ন সাধন করে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন।

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলার কৃষকরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। কারণ বাংলায় এই আন্দোলন জমিদারদের বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয়েছিল। তা ছাড়া এই আন্দোলন ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছিল বলে এর প্রতি হিন্দুদেরও সমর্থন ছিল।

ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে এক নবজাগরণ আসে এবং মুসলমানগণ নিজেদের মতাদর্শ ও ইসলামী রীতিনীতি সম্পর্কে সচেতন হয়। পরবর্তী কালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে ওয়াহাবী আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কা. ম.

ওয়েল্স্, এইচ. জি. [১৮৬৬—১৯৪৬]

ইংরেজ সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর পুরো নাম হার্বার্ট্ জর্জ্ ওয়েল্স্ (Herbert George Wells)। তিনি ১৮৬৬ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর কেন্টের ব্রোমলেতে জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৯৫ থেকে ১৯২০ সালে ওয়েল্স্ ছিলেন বিশ্বের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও মনীষীদের অন্যতম। ফরাসি লেখক জুল্ ভের্ন্ (দ্র) সহযোগে তিনি সায়েন্স ফিক্শান তথা কল্পবিজ্ঞান (দ্র) বিষয়ক রচনারীতির উদ্ভাবন ও প্রসার ঘটাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি চার্লস্ ডিকেন্স (দ্র)-এর ঐতিহ্য অনুসরণে হাস্যরসাত্মক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও পথিকৃৎ ছিলেন।

ওয়েল্স্ যখন তাঁর খ্যাতির শীর্ষে, তখন তাঁকে বলা হত 'স্বঘোষিত ঈশ্বর' এবং আধুনিক বিশ্ব তাঁর সময়ে ক্রমান্বয়ে যেসব তীব্র সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল, তার সমাধানে জনসাধারণের প্রতি তাঁর ভূমিকা ছিল এক জন 'জনপ্রিয় উপদেষ্টার' মতোই।

ওয়েল্স্-এর পিতা ছিলেন এক জন সামান্য জুতোর কারিগর এবং তাঁর মাতা ছিলেন জনৈকা সম্ভ্রান্ত মহিলার পরিচারিকা। ১৪ বছর বয়সে স্কুল ত্যাগ করলেও ৪ বছর পর তিনি দক্ষিণ কেন্সিংটনের নর্মাল স্কুল অব সায়েন্স-এর একটি বৃত্তি লাভ করেন। টমাস্ হেন্‌রি হাক্সলির (Thomas Henry Huxley : ১৮২৫-১৮৯৫) তত্ত্বাবধানে এখানে তাঁর অধ্যয়নের সুযোগ ঘটে। এরপর আরেকটি বৃত্তি

পাওয়ায় তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ লাভ করেন। এখান থেকেই তিনি ১৮৯০ সালে জীববিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। অবশ্য এর মধ্যেই তাঁর বেশ কিছু বিখ্যাত রচনা, বিশেষত কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক তিনটি উপন্যাস, 'দ্য ইনভিজিব্‌ল্ ম্যান' (১৮৯৭), 'দ্য টাইম মেশিন' (১৮৯৫) এবং 'দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস্' (১৮৯৮) বেরিয়ে গেছে।

এর পরপরই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম শ্রেণীর ব্যঙ্গরসাত্মক উপন্যাস 'লাভ অ্যাণ্ড মিস্টার লিউইস্‌হ্যাম' (১৯০০), 'কিপ্‌স্ : দ্য স্টোরি অব এ সিম্পল সোল' (১৯০৫) এবং 'দ্য হিস্ট্রি অব মিস্টার পলি' (১৯১০)। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'অ্যান ভেরোনিকা' (১৯০৯), 'টোনো-বুনগে' (১৯০৯) ও 'মিস্টার ব্রিট্‌লিং সিজ ইট্ থ্রু' (১৯১৬)। এই উপন্যাসগুলো খুবই জনপ্রিয় হয়।

ওয়েল্‌স্ সভ্যতার অসুস্থতা নিরাময়ে তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাধানের দিঙ্‌নির্দেশ করে যেসব গ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'এন্টিসিপেশান্স্' (১৯০১), 'এ মডার্ন্ ইউটোপিয়া' (১৯০৫), 'নিউ ওয়ার্ল্ড ফর ওল্ড্' (১৯০৮) এবং 'দ্য শেপ্ অব থিংস্ টু কাম' (১৯৩৩)। ১৯২০ সালে প্রকাশিত তাঁর 'আউটলাইন অব হিস্ট্রি' মানবজাতির ইতিহাসের এক অনন্য গ্রন্থ। এর আগে আর কখনো এ জাতীয় একটি গ্রন্থ একক কোনো লেখকের দ্বারা সম্পাদিত বা রচিত হয় নি। এরপর তিনি তাঁর পুত্র জর্জ্ ফিলিপ্ ওয়েল্‌স্ এবং জুলিয়ান হাক্সলি (Julian Huxley : ১৮৮৭-১৯৭৫) সহযোগে রচনা করেন 'দ্য সায়েন্স অব লাইফ'। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'এক্সপেরিমেন্ট ইন অটোবায়োগ্রাফি'। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর নিজের জীবনের কথা বলেছেন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে লেনিন (দ্র) ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (দ্র) সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ঘটনা ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছে।

এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ ১৯৪৬ সালের ১৩ই আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

ওয়েল্ডিং (welding)

ধাতুর (দ্র) দু'টি খণ্ডকে এদের সংযোগস্থলে গলিয়ে স্থায়ীভাবে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া দেওয়ার নাম ওয়েল্ডিং। এভাবে ধাতুখণ্ড দু'টি কার্যত একটি খণ্ডে পরিণত হয় এবং জোড়ের জায়গাটুকু ধাতুর অন্য অংশের মতোই সমান শক্ত থাকে। ওয়েল্ডিংয়ের চারটি প্রধান পদ্ধতি রয়েছে—১. আর্ক ওয়েল্ডিং : এতে বিদ্যুৎবর্তনীর ছোট্ট ব্যবধানে উচ্চ বিদ্যুৎবিভবের ফলে যে আর্ক বা জোরালো স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয় তার উত্তাপে ধাতু গলানো হয়। জুড়বার একটি ধাতুখণ্ড বিদ্যুৎবর্তনীর অংশ হয়, আর হাতে অপরিবাহী হাতলের সাহায্যে ধরে রাখা একটি ইলেক্ট্রোড ঐ খণ্ডের খুব কাছে নিয়ে আর্ক সৃষ্টি করা হয়। ২. গ্যাস ওয়েল্ডিং : এতে অ্যাসিটাইলিনের মতো একটি দাহ্য গ্যাসকে অক্সিজেন (দ্র) সহযোগে জ্বালিয়ে যে অত্যন্ত উত্তপ্ত শিখার সৃষ্টি হয় তার উত্তাপেই ধাতু গলানো হয়। হাতে ধরে কাজ করা যায় এমন একটি ওয়েল্ডিং টর্চে গ্যাস দু'টির মিশ্রণ ঘটিয়ে ছোট-বড়, সরু-মোটা, কম-বেশি উত্তপ্ত নানা রকম শিখার সৃষ্টি করা যায়। ৩. রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং : বিদ্যুৎবর্তনীর কোথাও রেজিস্ট্যান্স বা রোধ বেশি হলে বিদ্যুৎপ্রবাহ সেখানটায় স্থানীয়ভাবে প্রচুর উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারে। এই ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে জোড়া দেবার দু'টি ধাতুখণ্ডই একটি বিদ্যুৎবর্তনীর অংশ হয় এবং তাদেরকে পরস্পরের সঙ্গে চেপে ধরলে সংযোগস্থলে অতিরিক্ত রেজিস্ট্যান্স সৃষ্টি হয়ে তা উত্তপ্ত হয় ও গলে যায়। ৪. ব্রেজিং : অধিক উত্তাপ ব্যবহার করা অনুচিত হলে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এতে তৃতীয় একটি ফিলার বা পূরণকারী সরু ধাতুদণ্ড গলিয়ে জুড়বার ধাতুদ্বয়ের ফাঁকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ফিলার ধাতু উভয়ের পৃষ্ঠের সঙ্গে সঙ্কর ধাতু তৈরি করে উভয়কে জোড়া দিয়ে দেয়।

আসলে রেজিস্ট্যান্স ওয়েল্ডিং ছাড়া অন্য সব ক'টিতেই ফিলার ধাতুদণ্ড ব্যবহার করা হয় ওয়েল্ডিংয়ের সহায়ক হিসাবে। আর্ক ওয়েল্ডিংয়ে হাতে ধরা ইলেক্ট্রোডটিই ফিলার দণ্ড হয় এবং তা আর্কের তাপে একটু একটু গলে গিয়ে জোড়ায় লাগে। গ্যাস ওয়েল্ডিংয়েও একটি 'ওয়েল্ডিং রড' ফিলার হিসাবে গলিয়ে জোড়ায় লাগানো হয়। রেজিস্ট্যান্স

ওয়েল্ডিং ছাড়া অন্যগুলোতে বাতাসের নাইট্রোজেন (দ্র) ও অক্সিজেন (দ্র) ধাতুর সংযোগস্থলে পৃষ্ঠদেশে শোষিত হয়ে যেন জোড়াকে দুর্বল ও ভঙ্গুর না করতে পারে, সে জন্য ফিলার রডের সঙ্গে উপযুক্ত অধাতব 'ফ্ল্যাক্স' বস্তু দিয়ে রাখা হয়। এটি গলে গিয়ে সংযোগস্থলের পৃষ্ঠদেশকে বাতাসের বিরুদ্ধে আচ্ছাদিত রাখে।

মু. ই.

ওয়েসমুলার, জনি [১৯০৪—১৯৮৪]

বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাঁতারু। ১৯৫০ সালে তাঁকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সাঁতার ছাড়া অভিনয় করেও তিনি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন।

১৯০৪ সালের ২রা জুন জনি ওয়েসমুলার (Johnny Weissmuller) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (দ্র) পেনসিলভানিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় সব সময় তিনি অসুখে ভুগতেন। তাই পারিবারিক ডাক্তার তাঁকে নিয়মিত সাঁতার কাটতে পরামর্শ দেন। সাঁতার কাটতে কাটতে এক সময় ওয়েসমুলার দক্ষ সাঁতারু হয়ে ওঠেন। পাশাপাশি তাঁর রুগ্ণ শরীর সবল হয়ে ওঠে।

১৯২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকে (দ্র) প্রথম বারের মতো অংশগ্রহণ করেই তিনটি স্বর্ণপদক জয় করে ওয়েসমুলার সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল, ৪০০০ মিটার ফ্রি স্টাইল এবং ৪X ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে তিনি স্বর্ণপদক জয় করেন। পরের অলিম্পিকেও ওয়েসমুলার ২টি স্বর্ণপদক জয় করে অলিম্পিকে তাঁর স্বর্ণপদকের সংখ্যা পাঁচে উন্নীত করেন। ওয়েসমুলার তাঁর সাঁতারুজীবনে মোট ৬৭টি আন্তর্জাতিক এবং ৫২টি জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তিনি ১৭৪টি ব্যক্তিগত রেকর্ড ভাঙেন এবং ২১টি রিলে রেকর্ড ভাঙতেও প্রধান ভূমিকা রাখেন।

জনি ওয়েসমুলার অভিনীত প্রথম ছায়াছবি 'টারজান দ্য এপম্যান' মুক্তি পায় ১৯৩২ সালে। এরপর তিনি অভিনয় করেন 'টারজান অ্যাণ্ড হিজ মেট', 'টারজান অ্যাণ্ড দ্য মার্মেড্স্' প্রভৃতি ছায়াছবিতে। সবগুলো ছায়াছবিতেই তিনি টারজানের ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'টারজান' নামের সঙ্গে 'ওয়েসমুলার' নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

টারজান (দ্র) বলতে যেন ওয়েসমুলারকেই বোঝায়।

বিস্ময়কর প্রতিভা ওয়েসমুলার মৃত্যুবরণ করেন ১৯৮৪ সালের ২০শে জানুয়ারি।

টি. কি.

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (West Indies)-কে বাংলায় 'পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ' বলা হয়। এরকম নাম হওয়ার কারণ, ক্রিস্টোফার কলম্বাস্ (দ্র) যখন ভারতবর্ষে পৌঁছবার পথ খুঁজতে গিয়ে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে এই দ্বীপগুলোয় এসে পৌঁছেছিলেন তখন তিনি ভেবেছিলেন যে ভারতের পশ্চিম উপকূলে এসে গেছেন। তাঁর ধারণা ভুল প্রমাণিত হল বটে, তবে নামটা কিন্তু থেকেই গেল।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে অন্যভাবে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ (দ্র) বলা হয়।

হা. মা.

ওরস

আরবি শব্দ, প্রকৃত উচ্চারণ উর্‌স্। আভিধানিক অর্থ উটের (দ্র) ছোট বাচ্চা, বিবাহ, বিবাহের ভোজ। বিবাহ-অনুষ্ঠানসম্পৃক্ত উৎসব-অনুষ্ঠানাদির সমার্থক হিসাবে ওরস শব্দের ব্যবহার বেশ প্রাচীন।

আমাদের দেশে এই শব্দটি একেবারে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। এখানে ওরস বলতে ওলি-আল্লাহ্, পীর-দরবেশ ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে বোঝায়। এসব অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আলোচনাসভা, মিলাদ ও দোয়ার ব্যবস্থা থাকে। কোনো কোনো ওরস অনুষ্ঠানে ভক্তিমূলক সঙ্গীতের ব্যবস্থাও থাকে।

মু. মা.

ওর্স্‌টেড্, হান্স্ ক্রিস্টিয়ান্ উর্স্‌টিড্, হান্স্ ক্রিস্টেয়ান্ দ্র

ওরাঁও

রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও রাজশাহী জেলার বিভিন্ন স্থানে ওরাঁওদের বাস। তারা দ্রাবিড়ভাষী উপজাতি।

ওরাঁওদের সমাজে বহু গোত্র বা কুল আছে। প্রতিটি গোত্রের এক-একটি বিশিষ্ট নাম (টোটেম) আছে। যেমন—হাঁস, কচ্ছপ, ময়ূর ইত্যাদি। কোনো গোত্রের নাম যদি ময়ূর হয়, তবে তারা ময়ূরকে খুব শ্রদ্ধা করে এবং ময়ূরের মাংস তারা কোনো দিন খাবে না। সাঁওতালদের (দ্র) মতো একই গোত্রে তাদের বিবাহ হয় না।

ওরাঁওদের গ্রামের প্রধানকে 'মাহাতো' বলা হয়। মাহাতোকে তারা খুব মান্য করে।

ওরাঁওরা প্রকৃতির উপাসক। হিন্দুধর্মের (দ্র) প্রভাবও তাদের মধ্যে আছে। ওদের সৃষ্টিকর্তার নাম ধরমেশ। তিনি সর্বশক্তিমান। এ ছাড়া তাদের বহু দেব-দেবী আছে। হিন্দু ও সাঁওতালদের দেব-দেবীকেও তারা শ্রদ্ধা করে।

ওরাঁওরা সাঁওতালদের মতো গায়ে উল্কি আঁকে। বড় হওয়ার আগেই ছেলে-মেয়েদের উল্কি আঁকতে হয়। এটি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস। কেউ যদি উল্কি না আঁকে, তা হলে মৃত্যুর পর হলেও আঁকতে হয়। তারা মনে করে, উল্কি ছাড়া ইহলোক ও পরলোক কোথাও তাদের মুক্তি নেই।

কৃষি তাদের প্রধান জীবিকা। এ ছাড়া কুলির কাজ, মাটি কাটা এবং চা-বাগানের কাজ করে তারা। মাছ ও ভাত তাদের প্রধান খাদ্য।

ওরাঁওদের ভাষার নাম 'কুরুখ'। এই ভাষা যুগ যুগ ধরে এখনো অপরিবর্তিত আছে।

বি. ব.

ওরাঁও

ওরাঁও : এরা চা বাগানের শ্রমিক

কন্দজাতীয় বর্ষজীবী উদ্ভিদ (দ্র)। এশিয়া (দ্র) ও আফ্রিকায় (দ্র) এই গণের ২৫টি প্রজাতি আছে। বাংলাদেশ (দ্র), ভারত (দ্র) ও শ্রীলঙ্কায় (দ্র) ৭টি প্রজাতি পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক নাম *আমর্ফোফাল্লাস ক্যাম্পানুলাটাস (Amorphophallus campanulatus)*, গোত্র আরাসি (Araceae)। বুনো ও কৃষিজাত—দু' রকম ওল দেখা যায়। বুনো ওল অখাদ্য, বর্ষার শেষে এই ওল বনজঙ্গলে আপনাআপনি জন্মে। কৃষিজাত ওলের মধ্যে চিত এবং বাঘা প্রধান। এর কন্দ, কচি ডাঁটা ও পাতা খাবার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের হাতিশুঁড় ওল স্বাদু ও ওজনে ভারি। এই ওল দশ-পনেরো কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায় উৎকৃষ্ট ওল জন্মে। ওলের ফুল দেখতে বড় ঘণ্টার মতো। ক্যালসিয়াম অক্সালেট নামক রাসায়নিক পদার্থের সুঁচগুচ্ছ থাকায় ওল খেলে গলা কুট্‌কুট্ করে। এ সময় লেবু বা তেঁতুল খেলে ঐ সূচগুলো গলে যায়। বোম্বাই অঞ্চলে ঐ বুনো ওল চাকা চাকা করে কেটে শুকিয়ে 'মদন-মস্ত' হিসাবে বিক্রি হয়। রাসায়নিক ঔষধ হিসাবে সেটি ব্যবহৃত হয়।

কবিরাজেরা ওলকে কোষ্ঠবদ্ধতা, গেঁটে বাত, কফ-বাত, ছুলি, দাদ, মুখের ঘা, হাজা, মৌমাছি-বোলতা-ভীমরুল ও বিছার কামড়ে ঔষধ (দ্র) হিসাবে কাজে লাগায়। ওলে প্রচুর আয়রন (দ্র) আছে। তরকারি হিসাবে ওল উত্তম।

বি. ব.

ওলন্দাজ শিল্পকলা

ওলন্দাজ শিল্পকলা বা ডাচ্ আর্ট (Dutch Art) বিকশিত হয় ১৫৮০ থেকে ১৭০০ সালে। এই শিল্পকর্মের কেন্দ্রভূমি নেদারল্যাণ্ডস্, যা হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম দু'টি অঞ্চলকেই বোঝায়। 'হলো ল্যাণ্ড' অর্থাৎ 'ফাঁপা ভূমি' অর্থেই হল্যাণ্ডের নামকরণ আর নেদারল্যাণ্ডস্-এর সম্পূর্ণটাই ছিল নিচু জমিতে, যা এক সময় স্পেনের মতো প্রতাপশালী দেশের শাসনাধীন ছিল। সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেই এই দেশের বিকাশ-অগ্রগতি ঘটে। ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপের (দ্র) প্রধান বাণিজ্যনগরী নেদারল্যাণ্ডের এওণ্টয়ার্পসহ ঐ প্রসিদ্ধ নিম্নভূমিতে গড়ে ওঠা শিল্পকলাই ডাচ্ শিল্প।

ওলন্দাজ শিল্পীরা জীবিকার জন্যই প্রধানত চিত্রশিল্পের কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁদের চিত্রচর্চার মূল ধারাটি ছিল ব্যবহারিক শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত। তবু তারই পাশাপাশি সৃজনশীল কাজও তাঁরা অব্যাহত রাখেন। এসব শিল্পীর সংখ্যাও ছিল অগণিত, তাঁরা তাঁদের শ্রমনিষ্ঠ কর্মদক্ষতা ও নিপুণ রচনাশৈলীর মাধ্যমে সে দেশের সমাজ-পরিবেশকে চিত্রিত করেছেন। ওলন্দাজ শিল্পনিদর্শন তাই এ যুগেও উন্নত মানের প্রাচীন শিল্প হিসাবে গুরুত্ব সহকারে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

ওলন্দাজ চিত্রশিল্পীরা বিষয়বস্তুভিত্তিক বাস্তববাদী ধারার ছবি আঁকতেন। রঙ ও রেখার চমৎকার বিন্যাস তাঁরা করতেন চিত্রপটে। চিত্রিত বিষয়বস্তুটিকে খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষ করে অঙ্কনের মাধ্যমে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে গেছেন তাঁরা সর্বত্র। অন্য বৈশিষ্ট্য ছিল ছবিতে বাস্তবসম্মত আলোর ব্যবহার অর্থাৎ বাস্তবে ঠিক যেমনটি দেখা যায়, সেভাবে আলো-ছায়া ফুটিয়ে তোলা। মোটামুটিভাবে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায় তাঁদের শিল্পকলাকে: ১. সমাজপরিবেশ ও দৈনন্দিন জীবনভিত্তিক চিত্র, ২. আত্ম-প্রতিকৃতি এবং নগরনেতা ও আত্মীয়-পরিজনদের প্রতিকৃতি ও প্রতিচিত্র, ৩. 'স্টিল লাইফ' (still life) বা 'জড়জীবন' এবং ৪. ভূ-দৃশ্য ও সমুদ্র বিষয়ক ছবি।

ফ্লাণ্ডার্স-এর ওলন্দাজ শিল্পী বলে পরিচিত পেট্রস ক্রিস্টুস (Petrus Christus : আনু. ১৪১০-১৪৭২/৩, জন্মস্থান হল্যাণ্ড), ডার্ক বৌট্স্ (Dirk Bouts : ১৪১৫-১৪৭৫, কর্মক্ষেত্র লুভেইন) এবং গেরার্ট ডেভিড (Gerard David : ১৪৫০/৬০-১৫২৩) প্রমুখের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে চিত্রকলার জগতে। এঁদের মধ্যে ডার্ক বৌট্স্-এর একটি বিশেষ অবদানের কথা সর্বজনবিদিত। তিনিই প্রথম

তাঁর ছবিতে 'গ্রুপ পোর্ট্রেট' অর্থাৎ দলীয় প্রতিকৃতি অঙ্কন করেন। এটি ওলন্দাজ শিল্পীদের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান বলে স্বীকৃত। কারণ শিল্পকলার ইতিহাসে তাঁদের আগে আর কেউ এভাবে সম্মিলিত (অর্থাৎ একটি মুখের বা চেহারার বেশি) প্রতিকৃতি অঙ্কনের নজির প্রদর্শন করেন নি। হারলেম-এ জন্মগ্রহণকারী ফ্রান্স্ হাল্স্ (Frans Hals : ১৫৮০/৫-১৬৬৬) ডাচ্ স্বর্ণযুগের প্রথম মহান শিল্পী। তিনি শিল্পকলার অঙ্গনে বেশ কিছু মৌলিক অবদান রেখেছেন। অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও মুক্ত স্টাইলের বা 'ফ্রি ব্রাশ-স্ট্রোকের' অর্থাৎ স্বাধীনভাবে নিজের মনের মতো করে তুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছবিতে রঙ লাগানোর তিনি পথিকৃৎ। তাঁর কালের দুই শতাব্দী পর ফরাসি দেশের বিদ্রোহী শিল্পী বলে পরিচিত ইম্প্রেশনিস্ট (দ্র) ধারার শিল্পীরা তাঁদের আঙ্গিক ব্যবহার করেন সাফল্যের সঙ্গে। যুদ্ধ ও সংগ্রামের বিষয়বস্তু নিয়ে মূলত ফ্রান্স্ তাঁর চিত্রভুবন গড়ে তুলেছিলেন। বিশ্ব-শিল্পকলায় প্রতিভা ও সৃজনশক্তির প্রচণ্ড ক্ষমতা নিয়ে আর্বিভাব ঘটেছিল যাঁদের এবং যুগ যুগ ধরে যে সমস্ত শিল্পস্রষ্টা তাঁদের অসাধারণ কর্মনৈপুণ্যের জন্য আদৃত ও বরেণ্য হয়েছেন, তাঁদেরই এক জন হলেন হার্মেন্জুন ভান্ রিইন রেম্ব্রান্ট্, সংক্ষেপে রেম্ব্রান্ট্ (দ্র)। তিনি হল্যাণ্ডের লাইডেনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চিত্রাঙ্কন এবং ছাপাই ছবি (এচিং) দু'টি দিকেই তাঁর দক্ষতা ছিল তুলনাবিহীন। আনুমানিক প্রথম অঙ্কিত তাঁর সফল চিত্রটি ১৬২৭ সালে তিনি এঁকেছিলেন 'বন্দিশালায় সন্ত পল' এই শিরোনামে। অন্যান্য বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে 'পাখাসহ মহিলা', অকালপ্রয়াত স্ত্রী সাসকিয়া ছাড়াও পরিবারের সদস্যদের প্রতিকৃতি, আত্ম-প্রতিকৃতি, 'নাইট ওয়াচ' বা রাতের প্রহরা এবং 'ল্যাণ্ডস্ ডাউন মিলি' প্রভৃতি। ছাপচিত্রের মতো আলো–ছায়া নিয়ন্ত্রণ ও আলোর ব্যবহারে নাটকীয় উপস্থাপনা ও প্রয়োগ-আঙ্গিকে বলিষ্ঠতা ছিল তাঁর, সেই সঙ্গে যে চূড়ান্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি ও গভীরতার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন তা অমন সফলভাবে আর কারো চিত্রকর্মে দেখা যায় নি।

অপর শিল্পী জান ভার্মের (Jan Vermeer : ১৬৩২-১৬৭৫), যাঁকে বলা হয় অন্যতম 'প্রাচীন শিল্পগুরু'। জীবদ্দশায় এই শিল্পীর কোনো রকম পরিচিতি ছিল না। মৃত্যুর ৪০ বছর পর তাঁর কর্মসম্ভার আবিষ্কৃত হয়। তাঁর চিত্রের উজ্জ্বলতা আজকের আধুনিক শিল্পরসিকদের কাছেও আদৃত।

রেম্ব্রান্ট : শিল্পী নিজে ও তাঁর স্ত্রী সাসকিয়া

বুটস : কাঁধে ক্রুশ বহন করছেন যিশু

ভিনসেন্ট ভান্ গখ্ : আত্মপ্রতিকৃতি

ফ্রান্স্ হাল্স্ : সবাই মিলে ফূর্তি করছে

আরো বহু শিল্পী সেই সময়ে নেদারল্যাণ্ডস্ অর্থাৎ হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের শিল্পাঙ্গনকে মুখর করে রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য পল পটার (১৬২৫-১৬৫৪), এলবার্ট কুইপ (Aelbert Cuyp : ১৬২০-১৬৯১), জাকোব ভান রুইস্‌ডাল (Jacob van Ruisdael : ১৬২৮-১৬৮২), মিন্‌ডার্ট হব্বেমা (Meindert Hobbema : ১৬৩৮-১৭০৯), হেণ্ড্রিক ডাবেল্‌স (Hendrick Dubbels : ১৬২০-১৬৭৫), নুড্‌লফ র‍্যাখুইজেন (১৬০১-১৭০৮)। 'লিট্‌ল মাস্টার্স' বা কনিষ্ঠ ওলন্দাজ চিত্রশিল্পীবর্গ বলে পরিচিত সেই সময়ের খ্যাতি অর্জনকারী শিল্পী আড্রিয়ানব্রাউয়ার (Adriaen Brouwer: ১৬০৫-১৬৩৮), গেরার্ট ডৌ (Gerard Douw : ১৬১৩-১৬৭৫) ও জান স্টেন (Jan Steen : ১৬২৬-১৬৭৯) প্রমুখ ডাচ্ শিল্পীদের নাম বিশেষ স্মরণযোগ্য।

মিলানে জন্মগ্রহণকারী কারাভাজ্জিও (Michelangelo da Caravaggio : ১৫৭৩-১৬১০) নামে এক জন বিখ্যাত শিল্পীর কাজের প্রভাব পড়ে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বেশ কিছু ওলন্দাজ চিত্রশিল্পীর উপর। বিশেষ করে ঐ শিল্পীর নাটকীয় আলো-ছায়া উপস্থাপনার বিশেষ ঢংটি তাঁদের কাজকে প্রভাবিত করেছিল। ডাচ্ শিল্পীদের এই দলের নেতা ছিলেন হেণ্ড্রিক টারব্রুঘেন (Hendrick Terbrugghen : ১৫৮৮-১৬২৯)।

বিশ্বনন্দিত ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রশিল্পী ভিন্‌সেন্ট ভান্ গখ্ (দ্র) ছিলেন এক জন ওলন্দাজ পিতার সন্তান। অকালপ্রয়াত এই শিল্পীর জন্মস্থান গ্রুট্-জুণ্ডার্ট (উত্তর ব্রাব্যাণ্ড)। তাঁর ক্ষণস্থায়ী কর্মজীবন অতিবাহিত হয় লণ্ডন (দ্র), ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি স্থানে। ফলে তাঁর সমগ্র শিল্পভাণ্ডার ডাচ্ আর্টের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ম. আ.

ওলাউঠা কলেরা দ্র

ওলস্টোনক্রাফ্‌ট্‌, মেরি [১৭৫৯—১৭৯৭]

ইংরেজ লেখিকা ও নারীঅধিকার আন্দোলনের (দ্র) অন্যতম অগ্রনায়িকা। মেরির (Mary Wollstonecraft) জন্ম লণ্ডনের (দ্র) কাছে, ১৭৫৯ সালের ২৭শে এপ্রিল।

মেরির শৈশব-কৈশোর খুব একটা সুখের ছিল না। তিনি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করার জন্য জীবনের শুরু থেকেই বেছে নেন শিক্ষকতার পেশা। ১৭৮৭ সালে প্রকাশিত তাঁর রচনা 'কন্যাদের শিক্ষাদান বিষয়ে ভাবনাচিন্তা' (Thoughts on the Education of Daughters) তাঁকে লণ্ডনের বুদ্ধিজীবীমহলে পরিচিতি এনে দেয়। প্রখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক উইলিয়াম গডউইন (১৭৫৬—১৮৩৬)-সহ উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ১৭৯৭ সালের মার্চে তিনি গডউইনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

মেরি ওলস্টোনক্রাফ্‌টের গুরুত্বপূর্ণ রচনাকর্ম হচ্ছে 'নারী-অধিকারের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা' (A Vindication of the Rights of Women, ১৭৯২)। তাঁর চিন্তাধারার মূল বিষয় ছিল নারী ও পুরুষের সমঅধিকার। তাঁর লক্ষ্য ছিল নারীদের জন্য বিভিন্ন পেশার দ্বার উন্মুক্ত করার পাশাপাশি তাদের জন্য সমশিক্ষার ব্যবস্থা করা। দাসসুলভ আনুগত্যের পরিবর্তে নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে একটি যৌক্তিক সম্পর্কের প্রবল সমর্থক ছিলেন তিনি। তাঁর এই চিন্তাধারা তাঁর সমকালীন চিন্তাধারার বহু ব্যক্তি ও মনীষীর বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হলেও উনবিংশ শতকে সূচিত নারী-আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

মেরি ওলস্টোনক্রাফ্‌ট মারা যান ১৭৯৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর, লণ্ডনে।

আ. হু.

ওশেনিয়া (Oceania)

প্রশান্ত মহাসাগরের (দ্র) মধ্যভাগ ও দক্ষিণাংশে অজস্র দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে, সেগুলোকে সংক্ষেপে এক কথায় ওশেনিয়া বলা হয়।

ওশেনিয়ায় যত দ্বীপ কাছে-দূরে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে সেগুলোকে মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ফরাসি অভিযাত্রী জুল্‌ দ্যুমঁ দুর্ভিই (Jules Dumont d'Urville) সর্বপ্রথম 'মেলানেশিয়া' (Melanesia, অর্থাৎ কৃষ্ণদ্বীপ), 'মাইক্রোনেশিয়া' (Micronesia, অর্থাৎ ক্ষুদ্রদ্বীপ) এবং 'পলিনেশিয়া' (Polynesia, অর্থাৎ বহুদ্বীপ) নামে এ দ্বীপগুলোকে চিহ্নিত করেন।

মেলানেশিয়ার অন্তর্গত দ্বীপগুলো হচ্ছে ফিজি (Fiji), পাপুয়া নিউ গিনি (Papua New Guinea) সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, নিউ ক্যালেডোনিয়া (New Caledonia) এবং নিউ হেব্রিডেস্‌ (New Hebrides)। ব্রিটিশ নৌ-অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন কুক (দ্র) অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই দ্বীপগুলো আবিষ্কার করেন।

মাইক্রোনেশিয়ার মধ্যে রয়েছে গুয়াম্‌ (Guam), কিরিবাতি (Kiribati), নাউরু (Nauru) এবং সংখ্যায় ২ হাজারেরও বেশি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ।

পলিনেশিয়ার অন্তর্গত দ্বীপগুলো হাওয়াই (Hawaii), নিউজিল্যাণ্ড (New Zealand) ও ইস্টার আইল্যাণ্ড (Easter Island)-এর মধ্যবর্তী ত্রিভুজের মধ্যে পড়েছে।

হা. মা.

ওসমানী, মহম্মদ আতাউল গনি [১৯১৮—১৯৮৪]

সৈনিক এবং রাজনীতিক। তিনি বৃহত্তর সিলেট জেলার সাবেক সুনামগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) এক সম্ভ্রান্ত

পরিবারে ১৯১৮ সালের ১লা নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

ওসমানী ১৯৩৪ সালে সিলেট সরকারি হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং ১৯৩৮ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। পরে দিল্লিতে (দ্র) অনুষ্ঠিত ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষাতেও তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে দেরাদুন সামরিক একাডেমী থেকে প্রশিক্ষণকোর্স সমাপ্ত করে ১৯৪০ সালের ৫ই অক্টোবর তিনি রাজকীয় কমিশন লাভ করেন। ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন এবং ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে মেজর পদ লাভ করে ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক নিযুক্ত হন।

পাকিস্তান (দ্র) প্রতিষ্ঠার পর (১৯৪৭) ৮ই অক্টোবর তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্নেল পদে উন্নীত হন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন উচ্চপদে এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্ (ই পি আর)-এর অতিরিক্ত কমাণ্ড্যান্টের দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় তিনি যেসব উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, সেগুলো হল—ই পি আর-এ অবাঙালিদের নিয়োগ বন্ধ করা, প্রথম বারের মতো পাবর্ত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের এই বাহিনীতে নিযুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ, চট্টগ্রাম সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করা এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের জন্য অধিক হারে পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। শুধু তাই নয়, তৎকালীন বেঙ্গল রেজিমেণ্ট তাঁর একান্ত প্রচেষ্টাতেই গড়ে ওঠে। এ কারণে তাঁকে 'বেঙ্গল রেজিমেণ্টের জনক' বলেও অভিহিত করা হয়।

১৯৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ওসমানী পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে কর্নেল হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে

সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তি বাহিনীর গার্ড অব অনার গ্রহণ করছেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন প্রধান সেনাপতি কর্নেল আতাউল গনি ওসমানী

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাংলার দামাল মুক্তিযোদ্ধারা

যোগ দেন। এ বছরেই ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগ (দ্র) দলীয় প্রার্থী হিসাবে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে বাংলাদেশের (দ্র) সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ (দ্র) শুরু হলে তিনি তাতে অংশগ্রহণ করেন। এ বছরেই ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে (দ্র) গঠিত বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে তিনি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োজিত হন। তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তিনি জেনারেল পদে উন্নীত হন। ১৯৭২ সালের ৭ই এপ্রিল তিনি সামরিক বাহিনী থেকে অবসরগ্রহণ করেন।

মহম্মদ আতাউল গনি ওসমানী আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দু'বার মন্ত্রী হন। মাঝে এক বার (১৯৭৩) জাতীয় সংসদের সদস্যও নির্বাচিত হন। তবে ১৯৭৪ সালের ১লা মে তিনি একযোগে মন্ত্রিসভা ও সংসদ-সদস্যের পদ থেকে, পরে 'বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (দ্র), অর্থাৎ বাকশাল গঠনের বিরোধিতা করে আওয়ামী লীগ থেকেও পদত্যাগ করেন।

১৯৭৫ সালের ২৯শে আগস্ট তিনি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদের অনুরোধক্রমে প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করলেও ৩রা নভেম্বর (১৯৭৫) পদত্যাগ করেন এবং ১৯৭৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর গঠন করেন নিজস্ব রাজনৈতিক দল 'জাতীয় জনতা পার্টি'। তিনি ১৯৭৮ এবং ১৯৮১ সালে মোট দু' বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। ওসমানী চিরকুমার ছিলেন।

তাঁর স্মরণে ঢাকায় (দ্র) গড়ে উঠেছে 'ওসমানী উদ্যান' ও 'ওসমানী মেমোরিয়াল হল'। এ ছাড়া তাঁর সিলেটস্থ বাসভবনকে পরিণত করা হয়েছে জাদুঘরে। সিলেট শহরে তাঁর নামকরণে একটি হাসপাতালও গড়ে উঠেছে।

তিনি ১৯৮৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি লণ্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

আ. হু.

ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ [১৮৬৩—১৯৬৭]

বিখ্যাত সঙ্গীতগুণী। তিনি যন্ত্রী ও সঙ্গীতাচার্যরূপে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। সুরবাহার বাদনে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিবপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা সবদর

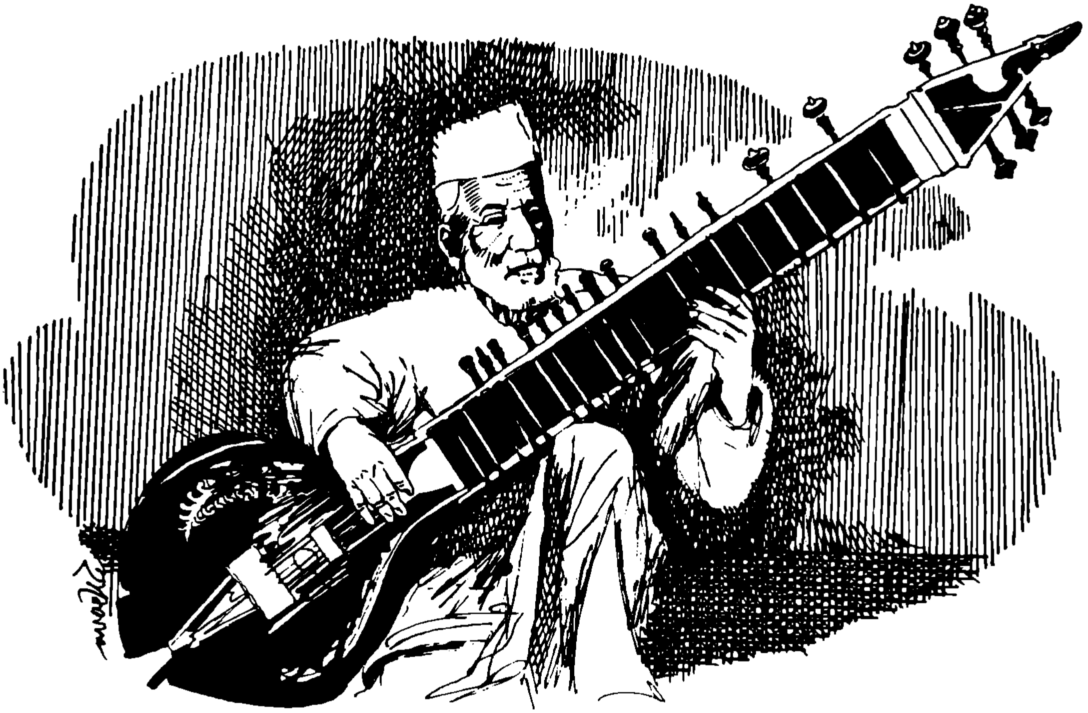

সঙ্গীতচর্চায় ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ

হোসেন খাঁ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আফতাবউদ্দিন খাঁ ও আলাউদ্দিন খাঁ ব্যতীত সেনী বংশীয় বিখ্যাত গুণী ওয়াজির খাঁর কাছে আয়েত আলী সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন। যন্ত্রসঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য তিনি মাইহার ও রামপুর দরবারে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিশ্বভারতীতেও (দ্র) তিনি সঙ্গীতশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। শুদ্ধ ও ভাবগভীর বাদনের জন্য আয়েত আলী যশস্বী হন।

সঙ্গীতে তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ পাকিস্তান সরকার ১৯৬২ সালে তাঁকে 'তমঘা-ই-ইমতিয়াজ' উপাধি প্রদান করে। তিনি তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নরের স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী (দ্র) তাঁকে মরণোত্তর সম্মানে ভূষিত করে।

আয়েত আলীর পুত্রদের মধ্যে আবিদ হোসেন খাঁ ও বাহাদুর হোসেন খাঁ যথাক্রমে সিতার ও সরোদবাদকরূপে যশস্বী হন। তাঁর অন্যতম পুত্র মোবারক হোসেন খাঁ লেখক ও সঙ্গীতশাস্ত্রীরূপে বিশেষ পরিচিত। একটি বৃহৎ ও যশস্বী শিষ্য সম্প্রদায় গঠনও আয়েত আলী খাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি।

ক. গো.

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ [১৮৬২—১৯৭২]

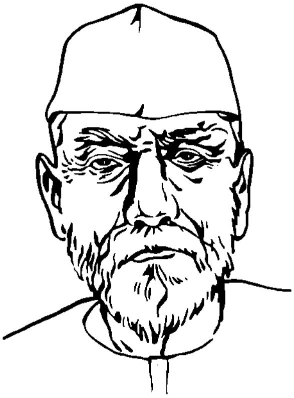

সুবিখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্রী, সঙ্গীতরচয়িতা ও যন্ত্রী। হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ নায়কদের অন্যতম। ১৮৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শিবপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা সবদর হোসেন খাঁ। শৈশবেই লেখাপড়ার চেয়ে সঙ্গীতের (দ্র) প্রতি আলাউদ্দিনের অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ

সরোদ বাদনরত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ

পায়। লেখাপড়ার জন্য মায়ের শাসন কঠোর হলে সঙ্গীত শিক্ষার আশায় প্রায় রিক্ত হস্তে তিনি গৃহত্যাগ করেন। গ্রাম ছেড়ে আলাউদ্দিন প্রথমে আসেন ঢাকায় (দ্র) ও সেখান থেকে কলিকাতায় (দ্র)। সেখানে অশেষ দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে বালক আলাউদ্দিন সঙ্গীতগুরুর সন্ধান করতে থাকেন। কলিকাতায় আলাউদ্দিনের প্রথম গুরু গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁর কাছে দীর্ঘকাল ধরে তিনি কণ্ঠসঙ্গীতের পাঠ গ্রহণ করেন। আলাউদ্দিন কলিকাতায় আছেন খবর পেয়ে তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং আর যাতে গ্রাম থেকে দূরে চলে না যান তার কৌশল হিসাবে তাঁকে বিয়ে দেন। জানা যায় যে বিয়ের রাত্রেই তিনি পালিয়ে কলিকাতা চলে যান। এর মধ্যে গোপাল চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়েছে। আলাউদ্দিনও স্থির করলেন, তিনি গান আর শিখবেন না, এবার শিখবেন যন্ত্র। এবার সুপ্রসিদ্ধ যন্ত্রী হারু দত্ত হলেন তাঁর গুরু। হারু দত্তের প্রকৃত নাম অমৃতলাল দত্ত। তাঁর একটি অর্কেস্ট্রার (দ্র) দল ছিল। আলাউদ্দিন সেই দলেও ভর্তি হয়ে গেলেন। দিনের বেলা তালিম নেন, রাতে অর্কেস্ট্রার দলে বাজান। ফলে তিনি অনেকগুলো যন্ত্র বাজাতে শেখেন। আলাউদ্দিন আগে বাজাতে পারতেন তবলা, ঢোল (দ্র)। এবার সানাই, কর্নেট, ক্ল্যারিওনেট, পাখোয়াজ (দ্র) প্রভৃতি শিখতে লাগলেন। আর বেহালা (দ্র) শিখতে শুরু করলেন পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে কলিকাতার ইডেন উদ্যানের ব্যাণ্ড মাস্টারের কাছে। এই সময়ে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরীর সঙ্গীতসভায় বাজাতে আসেন আলাউদ্দিন এবং সেখানেই সরোদী আহমদ আলী খাঁর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। আহমদ আলীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মুক্তাগাছাতেই থেকে যান আলাউদ্দিন। পরে মুক্তাগাছা থেকে আহমদ আলী খাঁ রামপুর চলে গেলে আলাউদ্দিনও তাঁর সঙ্গে সেখানে চলে যান এবং তাঁর সরোদশিক্ষা অব্যাহতভাবেই চলতে থাকে। কিছু দিন পর আহমদ আলী জানান যে তাঁর কাছে আলাউদ্দিনের শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত, এখন থেকে তিনি যেন

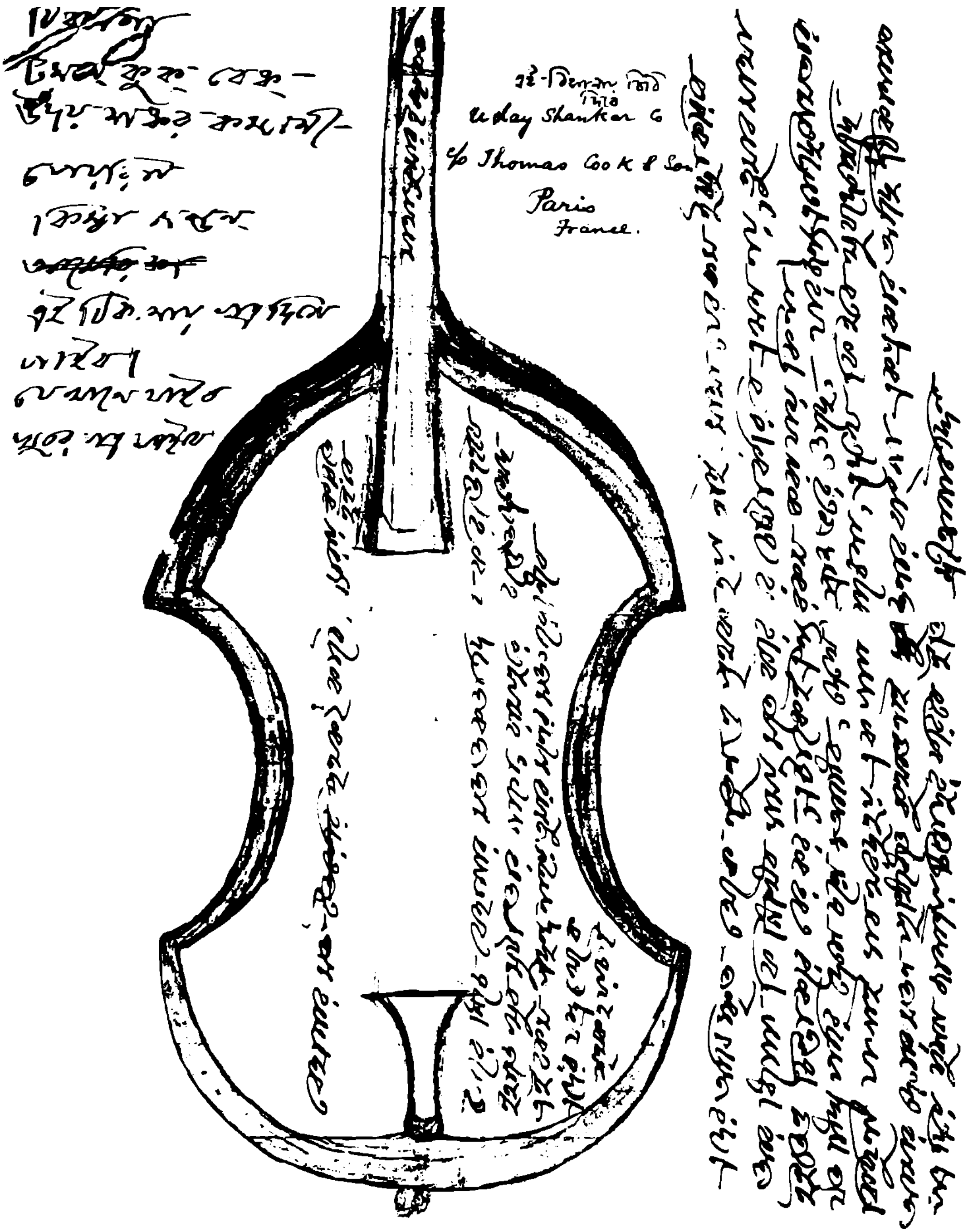

ছোটভাই আয়েত আলী খাঁর কাছে লেখা অসংখ্য চিঠির একটির অংশবিশেষ। চিঠিতে জানাচ্ছেন বাদ্যযন্ত্র তৈরির নকশা ও অন্যান্য পরামর্শ।

রামপুরের সভাবাদক ওয়াজির খাঁর কাছে তালিম নেন। ওয়াজির খাঁ ছিলেন সেই সময় যন্ত্রসঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণী। তাঁর কাছে তালিম নেওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না। আলাউদ্দিন সঙ্কল্প করলেন, যেভাবেই হোক ওয়াজির খাঁর কাছে শিখবেনই। অনেক অপেক্ষা করে, অনেক সাধ্যসাধনার পর তিনি ওয়াজির খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের সুযোগ পান। সুদীর্ঘকাল ওয়াজির খাঁর কাছে সঙ্গীতশিক্ষা লাভ করে আলাউদ্দিন খাঁ তাঁর শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন ও স্বাধীনভাবে সঙ্গীতচর্চার উদ্দেশ্যে কলিকাতা ফিরে যান। মাইহার রাজ্যের রাজা ব্রজনাথ সঙ্গীতগুরুর পদে আলাউদ্দিন খাঁকে বরণ করলে তিনি মাইহার চলে যান ও সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৭২ সালে মাইহারেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আলাউদ্দিন খাঁ উদয়শঙ্করের (দ্র) নৃত্যদলের সঙ্গে ১৯৩৪-৩৫ সালে বিশ্বভ্রমণে বের হন। সারা ইউরোপ তাঁর যন্ত্রবাদনে মুগ্ধ হয়। সেখানে তিনি তাঁর অসাধারণ গুণপনা প্রদর্শন ছাড়াও রাগসঙ্গীতের গভীরতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিশ্বভারতীতে (দ্র) তিনি কিছু কাল আমন্ত্রিত অধ্যাপকরূপে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৫৯ সালে আলাউদ্দিন খাঁ দিল্লির (দ্র) সঙ্গীত-নাটক একাডেমীর পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৪ সালেই তিনি এই একাডেমীর ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। সঙ্গীতে অসাধারণ অবদানের জন্য ভারতসরকার ১৯৫৮ সালে আলাউদ্দিন খাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৬১ সালে বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দান করে। দিল্লি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র) আলাউদ্দিন খাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে।

আলাউদ্দিন খাঁর শিক্ষার্থীজীবন যেমন ছিল দীর্ঘ, তেমনি তাঁর সক্রিয় সঙ্গীতজীবনও ছিল প্রলম্বিত। সঙ্গীতের নানা শাখায় তাঁর অধিকারও ছিল বিস্ময়কর। তাঁর মুখ্য খ্যাতি ছিল সরোদবাদনে। বেহালা, বীণা, সুরশৃঙ্গার, বাঁশি (দ্র), ক্লারিওনেট, কর্নেট, সানাই, ফিড্‌ল্‌, পাখোয়াজ, ঢোল, তবলা, খোল (দ্র) প্রভৃতি বাদ্যেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল। সঙ্গীতগুরু হিসাবে আলাউদ্দিন খাঁর খ্যাতি অতি ব্যাপক। বর্তমান কালের ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় সঙ্গীতগুণীদের অনেকেই তাঁর শিষ্য। পুত্র আলী আকবর ও কন্যা অন্নপূর্ণা ছাড়া তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন রবিশঙ্কর, তিমির বরণ, পান্নালাল ঘোষ, আয়েত আলী খাঁ (দ্র), ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারীন ঘোষ, শ্যাম গাঙ্গুলী, বাহাদুর খাঁ, শরণরানী মাথুর প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ যন্ত্রী। আলাউদ্দিন খাঁ রাগস্রষ্টারূপেও সুখ্যাত। হেমন্ত, শোভাবতী, উমাবতী, নাগার্জুন, দুর্গেশ্বরী, মেঘবাহার, প্রভাতকেলী, হেমবেহাগ, মদনমঞ্জরী প্রভৃতি রাগ (দ্র) তিনি সৃষ্টি করেন। সরোদযন্ত্রের সংস্কার ছাড়াও তিনি চন্দ্রসারং নামে একটি সঙ্গীতযন্ত্র উদ্ভাবন করেন। আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গীতসংগ্রহও ছিল অতি বিপুল। কণ্ঠসঙ্গীতে, বিশেষত ধ্রুপদ (দ্র) ও ধামারে, তাঁর গুণপনা ছিল অসামান্য।

রাগসঙ্গীতে বর্তমান কালের ইতিহাসের বহুমুখী প্রতিভা হিসাবে আলাউদ্দিন খাঁর কোনো তুলনা নেই।

ক. গো.

ওস্তাদ গুল মুহম্মদ খাঁ [১৮৭৬—১৯৭৯]

ধ্রুপদ (দ্র) ও খেয়াল (দ্র) ধারার বিখ্যাত গায়ক। পিতা আহমদ খাঁ। বিহারের দ্বারাভাঙ্গা জেলার তিরহুত শহরে জন্ম। পিতার কাছেই এঁর প্রাথমিক সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ হয়। পিতার মৃত্যুর পর চাচা হায়দার বখ্‌স্‌ ভাইপো গুল মুহম্মদের সঙ্গীতশিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। পরে আগ্রায় গিয়ে আগ্রা ঘরানায় প্রগাঢ় শিক্ষা লাভ করেন। ১৯০৮ সালে গুল মুহম্মদ ঢাকায় আসেন ও এই শহরেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁকে কেন্দ্র করে ঢাকায় একটি বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে পরবর্তী কালে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মুন্সী

রইসউদ্দিন, লায়লা আর্জুমান্দ বানু (দ্র), উৎপলা সেন, সুকুমার রায়, নিবেদিতা মণ্ডল প্রমুখ। বিখ্যাত খেয়ালগায়ক ইয়াসিন খাঁ গুল মুহম্মদের পুত্র। রাগসঙ্গীতে বিশিষ্ট অবদানের জন্য একুশে পদকসহ তিনি নানা সম্মানে ভূষিত হন।

ক. গো.

ওস্তাদ মুহম্মদ হোসেন খসরু [১৯০৩-১৯৫৯]

বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ, সুরকার ও রাগসঙ্গীত শিল্পী। কুমিল্লায় জন্ম। পিতা জায়েদুল হাসান, মাতা আফিয়া খাতুন। প্রথমে কুমিল্লায় ও পরে কলিকাতায় (দ্র) ওস্তাদ মেহেদি হোসেন খাঁর তালিমে মুহম্মদ হোসেনের সঙ্গীতজীবন গঠিত হয়। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা সঙ্গীতকেন্দ্রে ভ্রমণ করে দিক্‌পাল গুণীদের কাছ থেকে রাগসঙ্গীতের পাঠ গ্রহণ করেন। ধ্রুপদ (দ্র), খেয়াল (দ্র), টপ্পা (দ্র), ঠুংরি (দ্র) এই চার ধারাতেই তিনি কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। ১৯৩১ সালে তিনি লখনৌর বিখ্যাত মরিস কলেজ অব মিউজিক-এর সহ-অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। পরে কলিকাতায় একটি সঙ্গীত বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। ১৯৩৩ সালে নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত ইস্ট বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে মুহম্মদ হোসেন খসরুকে 'ওস্তাদ' খেতাবে ভূষিত করা হয়। রাগসঙ্গীতে তাঁর গুণপনার জন্য মুহম্মদ হোসেন খসরু নিখিলভারত সঙ্গীত সম্মেলন ও নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে বিচারক মনোনীত হন। কাজী নজরুল ইসলামের (দ্র) সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি দু'টি নজরুল সঙ্গীতের রেকর্ড করেন ও কয়েকটি গানে সুরারোপ করেন। নৃত্যেও মুহম্মদ হোসেন খসরুর পাণ্ডিত্য ছিল। বিশিষ্ট নৃত্যবিদ বুলবুল চৌধুরী (দ্র) ও আফরোজা বুলবুল তাঁর কাছে নৃত্যের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। ভারত বিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন। মুহম্মদ হোসেন খসরু ঢাকার বুলবুল একাডেমীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর কৃতী শিষ্যের সংখ্যা অনেক। সঙ্গীতে অবদানের জন্য তিনি নানা সম্মানে ভূষিত হন।

ক. গো.

ওহী

'ওহী' আরবি শব্দ, 'ওয়াহা' ক্রিয়াপদ থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ ইঙ্গিত বা প্রেরণ। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ প্রত্যাদেশ—জিব্রাইল (আ.)-এর মাধ্যমে নবীর নিকট পাঠানো প্রত্যাদেশ, নির্দেশ। বাংলায় একে ঐশীবাণীও বলা হয়ে থাকে।

যুগে যুগে মানুষকে সৎ ও কল্যাণের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহ্ (দ্র) বহু নবী-রসূল (দ্র) প্রেরণ করেছেন। তাঁদের নিকট আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা মানুষকে সৎপথে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন, আহ্বান করেছেন। হযরত নূহ (আ.) (দ্র), হযরত মুসা (আ.) (দ্র), হযরত ইউসুফ (আ.) (দ্র) প্রমুখের প্রতি ওহী নাজিল হওয়ার প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে (দ্র) উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সর্বশেষ ওহীপ্রাপ্ত রসূল হচ্ছেন হযরত মুহম্মদ (স.) (দ্র)। তাঁর প্রতি ওহী বা প্রত্যাদেশ আকারে অবতীর্ণ বাণীর সমষ্টিই আল-কুরআন।

মু. মা.

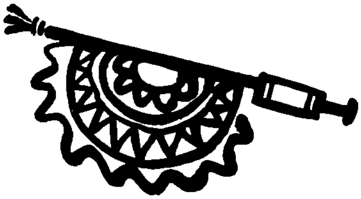

ঔ

ঔষধ/ভেষজ (medicines, drugs)

সাধারণ সংজ্ঞায় রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় উভয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহার্য উপাদানের নাম ঔষধ। ঔষধ দেহতন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে, যেমন—পেশির (দ্র) সঙ্কোচন, স্নায়বিক উদ্দীপনা, হরমোন (দ্র) নিঃসরণ প্রভৃতি।

ঔষধের উৎস বিচিত্র ও ব্যাপক। উদ্ভিদ (দ্র) বা প্রাণীর কোষকলা (দ্র) অথবা অজৈব রাসায়নিক উপাদান ঔষধের উৎস হতে পারে। আয়োডিন (দ্র), লোহা (দ্র), ক্যালসিয়াম (দ্র) বা পটাসিয়াম (দ্র) যেমন ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হতে

পারে, তেমনি প্রোটিন, শর্করা বা তেলজাতীয় কোনো কোনো উপাদানেও রয়েছে ঔষধের গুণাগুণ। ক্যাস্টর অয়েল বা মাছের যকৃতের (দ্র) তেল বহুকাল থেকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মানবদেহের অন্ত্রে বসবাসকারী জীবাণু (দ্র) যেমন ভিটামিন (দ্র) জাতীয় ঔষধ তৈরি করে, তেমনি ছত্রাক (দ্র) থেকে পাওয়া যায় নানা ধরনের এণ্টিবায়োটিক (দ্র)ঔষধ।

প্রতিটি ঔষধ বা ভেষজের যেমন সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া রয়েছে, তেমনি রয়েছে আনুষঙ্গিক ক্রিয়া, দেহযন্ত্রের উপর বিরূপ ক্রিয়া, কখনো-বা বিষক্রিয়া। তাই ঔষধ ব্যবহারে দরকার সতর্কতা, দরকার সঠিক মাত্রার উপর গুরুত্ব আরোপ। ঔষধ মানবদেহে বিভিন্ন পথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন— মুখপথে, পেশিতে বা শিরায়, ত্বকের নিচে ইনজেকশান হিসাবে, নাসাপথে বা পায়ুপথে (সাপোজিটরি হিসাবে)। ঔষধের বিপাক প্রধানত যকৃতের মাধ্যমে, এবং দেহ থেকে নির্গমন মলমূত্র, ঘাম বা শ্বাসপথে।

প্রাচীন কালে ঔষধের প্রধান উৎস ছিল উদ্ভিদ— উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ড, মূল, বাকল ইত্যাদি, সেই সঙ্গে লতা ও গুল্ম। ছিল গুটি কয়েক রাসায়নিক উপাদান। অশোধিত অবস্থায় ছিল এগুলোর ব্যবহার। উদ্ভিদ থেকে বিশুদ্ধ ঔষধ পৃথক ও সংগ্রহ করার কাজ শুরু হয় উনিশ শতকে এসে। এই শতকেই রসায়নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ঔষধের আবিষ্কার হয়। বিশ শতকে উদ্ভিদ ও রাসায়নিক উপাদান এই উভয় উৎস থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ঔষধের বিস্ময়কর আবিষ্কার, যেমন—সালফোনেমাইড (দ্র), এণ্টিবায়োটিক। এ ছাড়াও বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে টিকা (দ্র)। এই সব আবিষ্কার মৃত্যুর হার লক্ষণীয়ভাবে কমিয়ে এনেছে।

ইংরেজি 'ড্রাগ' (drug) শব্দটির প্রতিরূপ ঔষধ বা ভেষজ। মেডিসিন (Medicine) শব্দটিরও তাই। অর্থাৎ বাংলায় ড্রাগ ও মেডিসিন একই অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় শব্দ দুটোর ব্যবহারিক পার্থক্য যথেষ্ট। মেডিসিন বলতে প্রক্রিয়াজাত ব্যবহারযোগ্য ঔষধ বোঝায়। যেমন— প্যারাসিটামল ট্যাবলেট বা সিরাপ, এম্পিসিলিন ক্যাপস্যুল বা ইনসুলিন (দ্র) ইনজেকশান। কিন্তু ড্রাগ বলতে অশোধিত (ক্রুড) উদ্ভিদনির্যাস থেকে প্রক্রিয়াজাত মেডিসিন, অপ্রক্রিয়াজাত ঔষধ-উপাদান কিংবা ঔষধ তৈরিতে ব্যবহার্য সহায়ক উপাদান, যেমন— স্টার্চ বা ল্যাক্টোজ সবই বোঝায়। সে হিসাবে বাংলায় মেডিসিন অর্থে 'ঔষধ' এবং ড্রাগ অর্থে 'ভেষজ' ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত।

আ. র.

ঔষধাসক্তি

ঔষধের (দ্র) ব্যবহার থেকে ঔষধের প্রতি বাধ্যতামূলক নির্ভরতার নাম ঔষধাসক্তি (drug addiction বা drug-dependence)। এই নির্ভরতা নিয়মিত বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর হতে পারে। সাধারণত মানসিক প্রফুল্লতা, সুখানুভূতি, ঘুম বা ঘুমের আমেজ ইত্যাদি আনার কারণে এবং ঔষধ গ্রহণের অভাবে সৃষ্ট অস্বস্তি ও যন্ত্রণা নিবারণের তাগিদে ঔষধের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। তাই ঔষধ ব্যবহারের কুফল জানা সত্ত্বেও ঔষধ বর্জন সহজ হয় না। ঔষধের প্রতি নির্ভরতা যত বাড়ে, ঔষধ ব্যবহারের প্রতি আকর্ষণও সেই অনুপাতে বাড়তে থাকে।

ঔষধ গ্রহণের সূচনা হয় কোনো রোগে ব্যবহার, কোনো মানসিক কারণ, অসৎ সংসর্গের প্রভাব, বন্ধুদের পীড়াপীড়ি অথবা ব্যক্তিগত কোনো সমস্যা থেকে মুক্তিলাভের আশা থেকে। কিন্তু ঔষধের বিষক্রিয়ায় এর পরিণতি ঘটে আসক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্যনাশে ও সর্বনাশে। এর শেষ পরিণাম মৃত্যু।

আসক্তিকর ঔষধ নানা ধরনের। যেমন— সেডেটিভ বা সম্মোহক, বার্বিচুরেট্স, ডায়াজেপাম গ্রুপ, অ্যালকোহল (দ্র), আফিম (দ্র), মর্ফিন, পেথিডিন, কোডিন, হেরোইন (দ্র) ইত্যাদি। এগুলো আবার বেদনানাশক বলে তীব্র বেদনার উপশম ঘটাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ছাড়া রয়েছে উদ্দীপক গ্রুপের ঔষধ, যেমন— কোকেন, এফেটেমাইন এবং অনুরূপ ঔষধ। আরো রয়েছে অমূলপ্রত্যয় (hallucination) সৃষ্টিকারী ঔষধ, যেমন— এল এস ডি (L S D = lysergic acid diethylamide), গাঁজা (দ্র), ভাং, আফিম, মেস্কালিন ইত্যাদি। এণ্টিহিস্টাসিন জাতীয় ঔষধও নেশার উপদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ঔষধে আসক্তির কারণে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নষ্ট হয়ে

যায়। অনেক সময় বাধ্যতামূলকভাবে নানা ধরনের অপ-রাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভিন্ন এক জগতে পৌঁছাতে হয়।

ঔষধাসক্তির চিকিৎসা সহজ নয়। হাসপাতালে সার্বক্ষণিক সতর্কদৃষ্টি ও অনুশাসনের মধ্যে কঠোরভাবে চিকিৎসা চালানোর প্রয়োজন হয়। চিকিৎসায় সুফল অর্জন নির্ভর করে রোগীর সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর।

আ. র.

শিশু-বিশ্বকোষ : প্রথম খণ্ড

অ থেকে ঔ

'বিশ্ব' বলতে আমরা যা যা বুঝি তার সব কিছু নিয়েই বিশ্বকোষ।

আমাদের চেনা-জানা পৃথিবী ও মহাবিশ্বের কাহিনী, ইতিহাস ও পুরাকীর্তি, ভূগোল ও সভ্যতার কথকতা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শন, সমাজ ও সংস্কার এবং শ্রেষ্ঠ মানুষের জীবনী ও তাঁদের অবদান—এসব কিছু নিয়ে অসংখ্য তথ্য আর তত্ত্ব এখানে রয়েছে। গাছগাছালি কি পাখপাখালি, তাও বাদ যায় নি। গান-বাজনা আছে, খেলাধুলো আছে, সিনেমা-যাত্রা-থিয়েটার—এসবও আছে। তবে এই বিশ্বকোষের পরিকল্পনা ও প্রণয়ন সবই করা হয়েছে বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের কথা মনে রেখে।

দেশের অর্ধশতাধিক বিদ্বজ্জন প্রভূত পরিশ্রম করে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর এই 'শিশু-বিশ্বকোষ' বইয়ের ভুক্তিগুলো রচনা করেছেন।

একাধিক খণ্ডে প্রণীত এই বিশ্বকোষের ভুক্তিসংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি। আর পৃষ্ঠাসংখ্যা সব মিলিয়ে দেড় হাজারের মতো। প্রতিটি খণ্ডে রয়েছে সহস্রাধিক রঙ-বেরঙের ছবি—মানুষজনের, পশুপাখির, যন্ত্রপাতির। তার ওপর এতে আছে দেশ-বিদেশের মানচিত্র, পতাকা ইত্যাদি। এসব চিত্ররচনা এবং এর বিন্যাস ও অলঙ্করণের দায়িত্ব পালন করেছেন দেশের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীগণ।

বিশ্বকোষ আজীবন সঙ্গী হয় ধীমান শিক্ষিত মানুষের। ভুক্তি নির্বাচন তাই এভাবেই করা হয়েছে—'শিশু-বিশ্বকোষ' যেন শিশু-কিশোরদেরই শুধু নয়, বড়দেরও প্রয়োজন মেটায়।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

ISBN : 984-09-0332-2